সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [স.] ২০১১ হিজরী ১৪৩২

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১১

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১১

প্র কা শ কা ল
রবিউস সানী ১৪৩২
বৈশাখ ১৪১৮
এপ্রিল ২০১১

প্র চ্ছ দ
মুবাশ্বির মজুমদার

মু দ্র ণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্র কা শ না য়
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৩৩৩২০

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

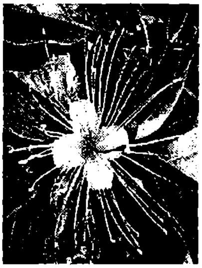

সম্পাদনা পরিষদ

উ প দে ষ্টা

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

মজিবুর রহমান মন্জু

আসাদ বিন হাফিজ

স ম্পা দ ক

মোশাররফ হোসেন খান

স দ স্য

হাসান আলীম

নাসির হেলাল

শরীফ আবদুল গোফরান

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

হারুন ইবনে শাহাদাত

যাকিউল হক জাকী

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

রেজি : নং-৬৯০৯/৯৭/০৭

পরিচালনা পরিষদ-২০১১

সভাপতি	:	অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর
সহ-সভাপতি	:	মজিবুর রহমান মন্জু
সেক্রেটারী	:	আসাদ বিন হাফিজ
সহকারী সেক্রেটারী	:	মো: আবেদুর রহমান
মিডিয়া সম্পাদক	:	মাহবুবুল হক
ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
অর্থ সম্পাদক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সাহিত্য সম্পাদক	:	হাসান আলীম
বার্ষিকী ও স্মারক সম্পাদক	:	মোশাররফ হোসেন খান
নাট্য ও চলচ্চিত্র সম্পাদক	:	শেখ আবুল কাশেম মিঠুন
প্রকাশনা সম্পাদক	:	নাসির হেলাল
শিশুসাহিত্য সম্পাদক	:	শরীফ আবদুল গোফরান
তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক	:	অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক	:	হারুন ইবনে শাহাদাত
শিল্পকলা সম্পাদক	:	ইব্রাহীম মন্ডল
অফিস সম্পাদক	:	মো: আমিনুল ইসলাম
সঙ্গীত-বিষয়ক সম্পাদক	:	আবু তাহের বেলাল
অফিস সহকারী ও পাঠাগার সম্পাদক	:	মো: বিল্লাল হোসেন

www.pathagar.com

নির্বাহী পরিষদ [টীম]-২০১১

১. অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর
২. মজিবুর রহমান মন্জু
৩. আসাদ বিন হাফিজ
৪. মোঃ আবেদুর রহমান
৫. শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
৬. শেখ আবুল কাশেম মিঠুন
৭. শরীফ আবদুল গোফরান
৮. হাসান আলীম
৯. হারুন ইবনে শাহাদাত
১০. অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী
১১. ইবরাহীম বাহারী
১২. ড. মোজাদ্দেদ হাসান তাদনান
১৩. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
১৪. শাহাদাতুল্লাহ টুটুল

জোন ও জোনাল দায়িত্বশীল-২০১১

তত্ত্বাবধায়ক : মজিবুর রহমান মন্জু

জোন-এক

সভাপতি : ইবরাহীম বাহারী
সেক্রেটারী : জোবায়ের আল মামুন
সদস্য : মাহবুবুল হক
মোশাররফ হোসেন খান
আবদুর রহীম খান
খন্দকার মোহাম্মদ সেলিম

জোন-দুই

সভাপতি : শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সেক্রেটারী : যাকিউল হক জাকী
সদস্য : শাহ আলম নূর
মোঃ বিল্লাল হোসেন

জোন-তিন

সভাপতি : শাহাদাতুল্লাহ টুটুল
সেক্রেটারী : মোঃ আমিনুল ইসলাম
সদস্য : নাসির হেলাল

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক : আসাদ বিন হাফিজ

জোন-চার

সভাপতি : অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী
সেক্রেটারী : নূরুজ্জামান ফিরোজ
সদস্য : এনামুল হক মঞ্জু
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

জোন-পাঁচ

সভাপতি : মোঃ আমিনুল ইসলাম [২]
সেক্রেটারী : আবু তাহের বেলাল

জোন-ছয়

সভাপতি : শেখ আবুল কাশেম মিঠুন
সেক্রেটারী : লস্কর মোহাম্মদ তাসবীর
সদস্য : হাসান আলীম
ডা. ইয়াকুব বিশ্বাস
মালিক আবদুল লতিফ

তত্ত্বাবধায়ক : মোঃ আবেদুর রহমান

জোন-সাত

সভাপতি : ড. মোজাদ্দেদ হাসান তাদনান
সেক্রেটারী : হোসাইন আল মামুন
সদস্য : সাইফুল্লাহ মানছুর
ইব্রাহীম মন্ডল

জোন-আট

সভাপতি : হারুন ইবনে শাহাদাত
সেক্রেটারী : মোঃ তৌহিদুর রহমান

জোন-নয়

সভাপতি : শরীফ আবদুল গোফরান
সেক্রেটারী : হামিদ হোসাইন
সদস্য : সরদার শাহাদাত হোসাইন

www.pathagar.com

সূ চি ক্র ম

স ম্পা দ কীয়

রাসূল মুহাম্মাদ [সা] ১৩

চ য় ন ক বি তা

আবদুস সাত্তার ১৭ ॥ আফজাল চৌধুরী ১৮ ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯

না' তে রা সূ ল [সা]

মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান ২০

প্র ব ন্ধ

সীরাতে রাসূল [সা] : চাই পূর্ণাঙ্গ চর্চা ॥ মুহিউদ্দীন খান ২১ ■ মানব জাতির মহান শিক্ষক ॥ প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ২৫ ■ নবী মুহাম্মাদ [সা]-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তিত্ব ॥ সৈয়দ আশরাফ আলী ৩১ ■ শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে মহানবী [সা] ॥ মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান ৩৭

শি ক্ষা

রাসূল [সা] ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান ॥ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ৪২ ■ রাসূলের [সা] শিক্ষানীতি ॥ ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ৫৯

ক বি তা

আসাদ চৌধুরী ৬৫ ॥ আল মুজাহিদী ৬৯ ॥ মজিবুর রহমান মনজু ৭০

www.pathagar.com

সা হি ত্য

বাঙালা কাব্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] ॥ ড. এস.এম. লুৎফর রহমান ৭১

স ং স্কৃ তি

মহানবী [সা]-এর সাংস্কৃতিক আদর্শ ॥ অধ্যাপক আবু জাফর ৮১ ■ সুস্থ সংস্কৃতির ভিত্তি ॥ শেখ আবুল কাশেম মিঠুন ৮৭

প্র ব ন্ধ

মহানবী [সা] ॥ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ৯০ ■ মহান আল্লাহর আইন ও সাম্প্রতিক বিশ্ব ॥ ড. আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম ৯৫ ■ মানবতার ধর্ম ইসলাম ও নবী মুহাম্মাদ [সা] ॥ আফতাব চৌধুরী ১০৫ ■ মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা ॥ আহমদ আবদুল কাদের ১১১

ছো ট গ ল্প

হঠাৎ আলো ॥ মাহবুবুল হক ১১৯

ক বি তা

সোলায়মান আহসান ১২৫ ॥ আসাদ বিন হাফিজ ১২৬ ॥ হাসান আলীম ১২৮

ভ্র ম ণ

কালো গেলাফ ও সবুজ গম্বুজের টানে ॥ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৩১ ■ রাবেতার মাদ্রিদ সম্মেলন : স্বল্প সময়ে অনেক পাওয়া ॥ অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ১৪৫

www.pathagar.com

সা হি ত্য

নাত-ই রাসূল [সা] ॥ মসউদ-উশ-শহীদ ১৫৩ ■ কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' : পূর্বাপর পাঠ ও পর্যালোচনা ॥ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ১৫৯

ক বি তা

আহমদ আখতার ১৬৯ ॥ ফারুক হোসেন ১৭০ ॥ মনসুর আজিজ ১৭২

ছো ট গ ল্প

এলো কে কাবার ধারে ॥ মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ১৭৪

প্র ব ন্ধ

বিশ্বনবীর আবির্ভাব ॥ মো: আতিকুর রহমান ১৭৭ ■ মহানবী [সা]-এর জীবন ও আমাদের আদর্শ ॥ শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ১৮৩ ■ কালজয়ী মহামানব হযরত মুহাম্মাদ [সা] ॥ সাঈদ আহমদ ১৯১ ■ মহানবী [সা]-এর মানবতাবোধ ॥ ইকবাল কবীর মোহন ১৯৫ ■ যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ [সা] ॥ নাসির হেলাল ২০৩

সা হি ত্য

"নিখিল ব্যথিত অন্তরে এর আসার খবর রটে" ॥ শফি চাকলাদার ২২৭

ক বি তা

আবদুল মুকীত চৌধুরী ২৩১ ॥ জয়নুল আবেদীন আজাদ ২৩৩ ॥ আশরাফ আল দীন ২৩৪ ॥ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী ২৩৫ ॥ মানসুর মুজাম্মিল ২৩৬ ॥ মো: ইয়াকুব বিশ্বাস ২৩৭ ॥ আলী আবদুল মুনতাকিম ২৩৮

www.pathagar.com

ন ও মু স লি মে র ক থা

সত্যের আলোয় আলোকিত দু'টি হৃদয়

■ হারুন ইবনে শাহাদাত ২৩৯

প্র ব ন্ধ

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আমানতদার নবী মুহাম্মাদ [সা] ॥ জাফর আহমাদ ২৪৩ ■ রূহ : কুরআন, হাদীস ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ॥ ইব্রাহীম মন্ডল ২৪৭ ■ মনিব, দাস ও দাসত্ব ॥ হেলাল আনওয়ার ২৫৫ ■ মানবতাবাদী মহাপুরুষ ॥ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ২৬১ ■ রাসূলের [সা] কর্মকৌশল : প্রেক্ষিত দারিদ্র্য বিমোচন ॥ এ কে আজাদ ২৬৫

সা হি ত্য

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সীরাতুন্নবী [সা] ॥ ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ ২৭৯

ছো ট গ ল্প

নাজ্জাসীর দরবার ॥ নাজমুস সায়াদাত ২৮৫

প্র ব ন্ধ

মহানবী [সা]-এর জীবনাদর্শ ॥ এ বি এম মুহিউদ্দীন ২৯৩ ■ রাসূলের আপোসহীনতা ॥ এস. এম. জহির উদ্দীন ২৯৯ ■ রাসূলের প্রিয় লোক ॥ আবদুর রহমান ৩০৩ ■ শিশুদের প্রতি রাসূলের [সা] ভালবাসা ॥ মনির হোসেন হেলালী ৩০৫

www.pathagar.com

ক বি তা

মাহফুজ পারভেজ ৩১০ ॥ আবু তাহের বেলাল ৩১১ ॥ রফিকুল ইসলাম ফারুকী ৩১২ ॥ রেদওয়ানুল হক ৩১৩ ॥ রফিক রইচ ৩১৪ ॥ শহীদ সিরাজী ৩১৫

সা হি ত্য

কাব্য-সমালোচনা : রাসূলের [সা] নীতি ও নির্দেশনা ॥ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ৩১৬

ন ও মু স লি মের ক থা

আমার নিকাব গ্রহণ ॥ মূল : সারা বোকার ॥ তরজমা : মুহাম্মাদ ইউছুফ ৩২৮

মা ন বা ধি কা র

সাম্রাজ্যবাদ ও খেলাফতের যুগে মানবাধিকার ॥ তৌহিদুর রহমান ৩৩২

ক বি তা

আবদুল হালীম খাঁ ৩৩৭ ॥ জুলফিকার সাইদুল ৩৩৮ ॥ আমিনুল ইসলাম ৩৩৯ ॥ মাসুদা সুলতানা রুমী ৩৪০ ॥ নাজমা ফেরদৌসী ৩৪১ ॥ খন্দকার মফিজুল ইসলাম বেলাল ৩৪৩

ছো ট গ ল্প

কিসরার পোশাক ॥ জুবায়ের হুসাইন ৩৪৪

www.pathagar.com

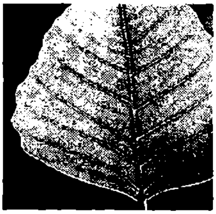

প্র ব ন্ধ

সন্ত্রাস নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মাদ [সা] ॥ এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান ৩৪৯ ॥ মুহাম্মাদ [সা]-এর সাথে কোন ব্যক্তির তুলনা চলে না ॥ ফখরুদ্দীন আহমাদ ৩৫৫

ক বি তা

আতিক হেলাল ৩৫৯ ॥ সোহরাব আসাদ ৩৬০ ॥ নজরুল ইসলাম শান্ত ৩৬১ ॥ জাহিদ আবেদীন ৩৬২ ॥ জ্যাসমিন কানন ৩৬৩

হি জ র ত

হিজরতের প্রতিচ্ছবি ॥ শহীদুল ইসলাম ৩৬৪

প্র তি বে দ ন

বার্ষিক প্রতিবেদন ॥ শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ৩৭৫

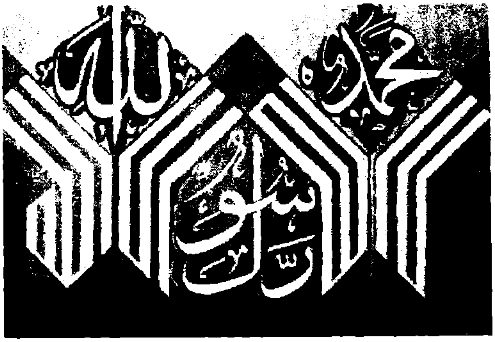

www.pathagar.com

রাসূল মুহাম্মাদ [সা]

রাসূল মুহাম্মাদ [সা]! বিশ্বজাহানের জন্য এক অনুপম আদর্শ। শঙ্কা ও শর্তহীনে আমাদের কেবল তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে হবে। সার্বিক কল্যাণের জন্য এর বিকল্প কিছু নেই, থাকতে পারে না।

মহান রাব্বুল আলামীন রাসূল [সা] প্রসঙ্গে বলছেন, "তোমার পূর্বে আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে আমরা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি [আল্লাহ] ছাড়া আর কোনো 'ইলাহ' নেই। অতএব কেবল আমারই দাসত্ব করো।" [সূরা আম্বিয়া ॥ আয়াত-২৫]

মহান রবের এ এক বিপুল-বিশাল রহমত এবং মেহেরবানী আমাদের জন্য যে, তিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূল মুহাম্মাদকেই [সা] আমাদের সত্যপথের দিশারী হিসাবে মনোনীত করেছেন। উম্মাতে মুহাম্মাদীর [সা] জন্য এটা একটি পরম সম্মানজনক প্রাপ্তি। সেই দিক থেকে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমাদের জন্য আল্লাহপাকের দিকনির্দেশনাবাহী চূড়ান্ত বক্তব্যই হলো, "নিঃসন্দেহে রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে।" [সূরা আহযাব ॥ আয়াত-২১]

আর রাসূলকে [সা] মহান বারী তায়ালা বলছেন-"হে রাসূল! তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা যথাযথভাবে পৌঁছে দাও।" [সূরা মায়িদা ॥ আয়াত-৬৭]

www.pathagar.com

পরপর এই দু'টি আয়াতের মাধ্যমে মহান রব তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনের কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, ঠিক তেমনি তাঁর মনোনীত শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহপাকের করুণাসিক্ত নবী মুহাম্মাদ [সা] নবুওয়ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। শুধু নবুওয়ত জীবনে নয়, বরং আমাদের বিস্ময়কেও হার মানিয়ে তিনি শৈশব থেকে ওফাত পর্যন্ত এমন এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন আমাদের জন্য–যা প্রকৃত অর্থেই তুলনারহিত। রাসূল [সা] তাঁর গোটা জীবনকেই আমাদের জন্য এমন এক অত্যুজ্জ্বল মডেল হিসাবে পেশ করেছেন–যার অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া মুক্তির আর কোনো দরোজাই আমাদের জন্য খোলা রাখা হয়নি। এখানেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যারাই রাসূলের [সা] জীবনাদর্শে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রাঙিয়ে তুলবেন–তারাই সফলতার চূড়া স্পর্শ করবেন। আর বদনসীব তো তাদের জন্য, যারা চেতনে-অবচেতনে কিংবা উন্নাসিকতার কারণে রাসূলের [সা] জীবনাদর্শ কিংবা তাঁর নির্দেশনাকে অবজ্ঞা, অবহেলা বা পাশ কাটিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এধরনের হঠকারী ভাগ্যবিড়ম্বিতদের জন্যই রয়েছে মহান রবের পক্ষ থেকে যত লাঞ্ছনা, গ্লানি, অপমান এবং যাবতীয় ব্যর্থতার কালিমা।

কারণ রাসূল [সা] নিজেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, "সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর [কুদরতী] হাতে [আমি] মুহাম্মাদের প্রাণ! এই উম্মাতের [মানব জাতির] যে কেউই হোক না কেন, [নবুওয়তের] কথা শুনবে অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরীত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান গ্রহণ না করেই মৃত্যুবরণ করবে, সে নিশ্চিত জাহান্নামী হবে।" [মুসলিম]

রাসূলের [সা] এই দ্ব্যর্থহীন উক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলের সর্বাত্মক এবং সর্বাঙ্গীন অনুকরণ, অনুসরণ এবং তাঁর জীবনাদর্শ গ্রহণ ছাড়া আমাদের জন্য বিকল্প কোনো পথ নেই।

আল্লাহপাকের দাসত্ব এবং রাসূলের আদর্শকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে তারই আলোকে আমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাকে পরিচালনার মাধ্যমেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি।

দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সাফল্যজনক কল্যাণ ও মুক্তিই হোক আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন এবং সকল কর্মের উৎসধারা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আহমদ ॥ আ ব দু স সা ত্তা র

আলিফ হে মিম দাল এই চার অক্ষরে যে নাম
সে নাম তো আসমানী; অলৌকিক জ্যোতির তারিফ।
স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক সমন্বয় সেই নামে, দীপ
যেমন প্রোজ্জ্বল থাকে জায়তুনে তেমনি সে নাম।

মিমটা সমগ্র সৃষ্টি। এবং আলাদা করে মিম
স্রষ্টার অস্তিত্বে পাই-অদ্বিতীয় আহাদ স্বরূপ।
যদিবা জ্বালানো যায় সমগ্র সৃষ্টির এই ধূপ
সেই ঘ্রাণে পাবো তাঁকে, না হলে সকলি অন্ধ, হিম।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির এক সমন্বয় আহমদ নামে
এবং এ নাম ঘিরে আল্লার তারিফ, সবকিছু;
সৃষ্টির প্রতীক মিম আহাদের কাছে হলে নীচু
সমগ্র সৃষ্টিই পাবে আহাদকে তারিফের দামে।

'আলিফ হে মিম দাল' এই চার অক্ষরে যে নাম
সে নামতো আসমানী তারিফের পবিত্র কালাম।

রাসূলকে [সা] নিবেদিত কবিতা

www.pathagar.com

ইসলাম তরণীর কর্ণধার ॥ আফজাল চৌধুরী

["ইসলাম তরণীর প্রথম কর্ণধার রাসূল [সা] মধ্যভাগে মাহদী শেষে ঈসা।" [২৯ :৪২৩] মিশকাত শরীফ]

এলো এমন তরণী তুফানে তছনছ হলেও যা ডোবেনা।
কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই তরণীর কথা বলেছেন, সাফায়াত
পাল বাঁধা যার মাস্তুল, আবুকর ওসমান ওমর আলী হায়দার
দাঁড়ী যেত্র-রতণীর, নাই নাই ডর!–এই সেই তরণী, সেই তরণী।
এর কাণ্ডারী হায়াতুন্নবী স্বয়ং রাসূল [সা] তবে এখন ম্যধভাগে
মাহদী যার নাম মুহাম্মাদ, আব্দুল্লাহ ও আমিনা যার পিতামাতর নাম
রাসূলের [সা] খাঁটি উত্তরাধিকার–মুসলিম উম্মাহর প্রতি এক ঐশী উপহার।
এসো এসো জড়ো হই।
বহু মিথ্যাবাদীর উত্থিত হওয়ার পালাও শেষ।
সারা আরবে-আযমে দাজ্জালের প্রেতশক্তি ছড়িয়ে পড়েছে।
এসো তল্লাশি দেই।
ঐশী আয়োজনে একমাত্র মুক্ত এখন মক্কা ও মদীনা।
এসো তল্লশি দেই।
নবীবাক্য মিথ্যে নয় কস্মিনকালেও।–কোথায় কোথায় তিনি?
এসো এসো বের হই, জড়ো হই, তল্লাশি দেই।
–এসো তল্লাশি দেই।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মাদ [সা] আবির্ভাব ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ

ইয়াসরিবের দুর্গ জন্মের তারকা আহমদের
ওই দ্যাখো হতবাক হয়ে দেখছে ইহুদী সমাজ।
পৃথিবীর যুগ-যুগান্তরে আশা পূর্ণ হলো আজ।
সালাম! সালাম! ধ্বনি ছেয়ে গেলো সমস্ত জগতে।

শতাব্দীর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হলো নির্বাপিত।
আলোকিত হয়ে উঠলো সিরিয়ার প্রাসাদমণ্ডলী।
জমিন-আসমান সব নত হয়ে লিখলো গীতাঞ্জলী।
পারস্যের প্রাসাদের চৌদ্দ চূড়া ভূতল-লুণ্ঠিত।

দ্বাদশ রজনী-সোমবার-রবিউল আউয়াল
বক্ষে তাঁকে পেয়ে হলো হর্ষে মত্ত, উদ্দাম, উত্তাল।
সোমবার-রবিউল আউয়াল-দ্বাদশ রজনী-সোমবার
সালামে-চুম্বনে তাঁকে রোমাঞ্চিত নিজেই বারবার ॥

www.pathagar.com

না'তে রাসূল ॥ মোহাম্মাদ রফিকউজ্জামান

অশান্তির এই দুর্দিনে আজ
বক্ষ জুড়ে তোলো আওয়াজ–
ইয়া মুহাম্মদ-ইয়া মুহাম্মদ
সাল্লাল্লা-আলাইহে সাল্লাম।
জাহেলাতের আঁধার ভাঙার
আলো সে তাঁর পবিত্র নাম ॥

বিশ্ব জুড়ে আনতে হলে
শান্তি-সুখের শুভদিন
ভরসা যে সেই খোদার রহম
রহমতুল্লিল আলামীন।
সিরাতুন্ নবী ছাড়া সব
অমঙ্গলেই পায় পরিণাম ॥

শান্তি মানেই– ইয়া মুহাম্মদ
সালাম সালাম– ইয়া মুহাম্মদ
হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি
তন্ত্রে তন্ত্রে টানাটানি–
ওই নামেই সব হবে যে রদ
ইয়া মুহাম্মদ-ইয়া মুহাম্মদ।

এই পথে যে চলবে সেতো
মানবে না আর কোনো ভয়
দিলক্বাবাতেই পাবে সে তার
সত্য সত্যের পরিচয়।
হেরা পর্বতের জ্যোতির্মান
মুহাম্মদ নাম নাও অবিরাম ॥

www.pathagar.com

সিরাতে রাসূল [সা] চাই পূর্ণাঙ্গ চর্চা

মুহিউদ্দীন খান

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পয়গাম নিয়ে এ দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর ২৩ বছরের নবুওয়তি জিন্দেগির মধ্যেই তিনি মানব জাতি, মানব সভ্যতা এবং মানুষের অগ্রগতির কাফেলা যাতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে চলতে পারে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে গিয়ে সাফল্যের সঙ্গে তাঁর রেজামন্দি ও মাগফেরাত পাওয়ার অধিকারী হয়, তারই একটা পরপূর্ণ রূপরেখা রেখে গেছেন।

হুজুর আকরামের [সা] অনুপম সে সিরাতে পাকের বিভিন্ন দিক নিয়ে যদি আলোচনার সূত্রপাত করতে হয়, তবে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে হুজুর [সা] কোন সময়, ইতিহাসের কোন প্রেক্ষাপটে এবং মানব সভ্যতার কোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর দ্বারা মানুষের এ সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রের কতটুকু কাজ হয়েছিল এবং মানুষ কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছিল। অন্যদিকে সর্বপ্রথম তাঁকে যারা গ্রহণ করেছিলেন, যারা তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে পরবর্তী মানব সমাজের জন্য একটা উজ্জ্বল উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তাদের সে কার্যকলাপ এবং সেই সাহাবায়ে-কেরামের আদর্শ চরিত্র কী রকম ছিল। কী

www.pathagar.com

রকম ছিল যারা সাহাবায়ে কেরামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন এবং সে অনুসরণের রাজপথ ধরে আজ পর্যন্ত আল্লাহর দীন, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের [সা] আদর্শকে মানুষের সামনে জীবন্ত নমুনা হিসাবে অম্লান করে রেখেছেন। আমরা যদি সিরাতে পাককে যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই, তবে যেমন আমাদের দেখতে হবে যে, মাত্র দশ বছর সময়কালের মধ্যে, দশ বছর কেন? মাত্র সাড়ে সাত থেকে আট বছর সময়কালের মধ্যে হুজুর আকরাম [সা] এমন একটি বিশাল রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন, যার আয়তন ছিল আমাদের বাংলাদেশের মতো অন্তত ১৬টি দেশের সমান। তাঁর ইন্তেকালের সময় মুসলমানদের জন্য তাঁর রেখে যাওয়া রাষ্ট্রটির আয়তন ছিল পৌনে আট লাখ বর্গমাইল। অথচ বাংলাদেশের আয়তন মাত্র পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল। প্রায় ১৬টি বাংলাদেশের সমান একটি বিশাল রাষ্ট্র হুজুর আকরাম [সা] সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন। মাত্র কুড়ি বছর সময়ের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম [রা] এই রাষ্ট্রের আয়তন ২৬ লাখ বর্গমাইলে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হজরত ওসমানের [রা] খেলাফতকালে দাঁড়িয়েছিল ইসলামী খেলাফতের আয়তন ২৬ লাখ বর্গমাইলে। এটা কোনো গল্প কাহিনী নয়। ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে এবং প্রমাণ মানচিত্র রয়েছে। প্রতিটি মানচিত্রের এই রেকর্ড লিপিবদ্ধ রয়েছে। গবেষণা করলে দেখা যাবে, যেসব এলাকা হজরত ওসমান [রা] শাসন করতেন, সেসব এলাকার আয়তন কত ছিল, কী রকম ছিল তার শাসন ব্যবস্থা। এটাকে আমি সিরাতে পাকের অংশ হিসাবেই আখ্যায়িত করতে চাই।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] একদা মক্কা মোয়াজ্জমায় ঘোষণা করেছিলেন, দেখ আজকের যুগে তোমরা এমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছ যে, একজন মানুষ তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোকলস্কর সঙ্গে নিয়েও এক শহর থেকে অন্য শহরে নিরাপদে পৌঁছতে পারে না। পথে ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে লুটেরো এবং তস্করের দল। অথচ শুধু কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' প্রতিষ্ঠা করলে দেখবে, এমন এক সময় আসবে সুদূর ইয়ামান থেকে কোনো যুবতী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাথার ওপর সোনা-চাঁদির বোঝা নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা পর্যন্ত সফর করবে, তার দিকে চোখ তুলে দেখার মতো কোনো দুষ্কৃতকারীর অস্তিত্ব আর থাকবে না। সাহাবায়ে কেরামের সময়কার শাসন ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই, হজরত ওমর [রা] তার খেলাফতকালের তৃতীয় বর্ষে মদিনা মুনাওয়ারায় ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন এলাকার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এক মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সে মহাসম্মেলনে তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মনে রেখ, এখান থেকে সাড়ে সাতশ' মাইল দূরের ফোরাত নদীর তীরেও যদি একটি কুকুর না খেয়ে মারা যায়, তার জন্য কিয়ামতের ময়দানে ওমরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

এটা বর্তমান যুগের কথা নয়, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগের একটি ঘোষণা। একরম একটি ঘোষণার কথা যদি আজকের যুগের কোনো বিরাট রাষ্ট্রশক্তির প্রধানের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তবে সব মানুষই হাসবে। আজকের আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান, ব্রিটেনের

www.pathagar.com

সরকার প্রধান কিংবা দুনিয়াতে এমন কোনো রাষ্ট্র আছে কি, যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান একথা ঘোষণা করতে পারে যে, আমার দেশে আমার শাসিত এলাকার মধ্যে কোনো মানুষ যদি না খেয়ে মরে, কোনো মানুষ যদি কষ্ট পায় আখেরাতের বিশ্বাসে না হলেও অন্তত দুনিয়ার বুকে আমি তার জন্য দায়ী এবং তার সব দায়-দায়িত্ব বহন করব। আছে কি এরকম কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যার মুখ দিয়ে এরকম দু:সাহসী ঘোষণা উচ্চারিত হতে পারে? নেই, সেটা সম্ভবও নয় তাদের পক্ষে। আমাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন সেই ইসলাম, খেলাফায়ে রাশেদিন, সেই সোনালি যুগের দিনগুলো মাত্র ত্রিশ বছর পরে কেন ভেঙে গেল? এর পরে কেন ইসলাম টিকে থাকল না? আমি বলতে চাই, এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন আর কিছু হতে পারে না। কারণ খেলাফায়ে রাশেদিনের যুগ থেকে শুরু করে আপনারা লক্ষ্য করবেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক [রা] ছিলেন হুজুর আকরামের [সা] প্রথম খলিফা। তিনি 'খেলাফত আলা মিনহাজন্নিবুওয়াত' অর্থাৎ নবুওয়তের আদলে খেলাফত কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তার সূচনা করেছিলেন। তার সূচিত এই খেলাফতের ধারাবাহিকতা বর্তমান শতাব্দীর বিগত ১৯২৪ সালের তুরস্কের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ পর্যন্ত চলে এসেছে। বস্তুত হজরত আবু বকর সিদ্দিক [রা] থেকে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছিল একশ' ছয়জন। আমি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এই একশ' ছয়জন খলিফার মধ্যে মাত্র বিশ-বাইশজন শাসক একটু অসংযমী ছিলেন। মানে হুজুর আকরাম [সা] এবং খেলাফায়ে রাশেদিনের পুরোপুরি অনুসরণ ও অনুকরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এদের মধ্যে অন্তত চল্লিশজন এমন শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের শাসন ব্যবস্থা হজরত ওমর [রা] কিংবা হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজের [রা] শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তারা অন্তত আল্লাহকে মানা, রাসূলের [সা] দেয়া বিধানকে দুনিয়ার বুকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রের যে বিরাট ভূমিকা রেখেছেন, তাদের চরিত্র যেরকম নির্মল ছিল, তাদের শাসন যেরকম দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে, সেসব বিষয় যদি আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ উপস্থাপন করতে পারি, তবে একে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস কারও হবে বলে মনে করি না। স্যার অ্যাডমন্ড বার্ক নামক জনৈক বিখ্যাত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিয়ান তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেছিলেন, 'মুহাম্মাদের [সা] অনুসারীরা যে শাসন ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন, অন্তত পূর্ববর্তী এক হাজার বছরের মধ্যে এমন কোনো দু:সংবাদ আমরা পাই না যে, তাদের দ্বারা শাসিত এলাকার মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে, মানুষ না খেয়ে মরেছে।'

অনেকে বলে থাকে, ইসলামের জন্ম হয়েছে মক্কায়, ইসলাম লালিত-পালিত হয়েছে মদিনায়, ধ্বংস হয়েছে বাগদাদে এবং ইসলামের কবর রচিত হয়েছে ইস্তাম্বুলে। এটা খ্রিস্টানদেরই বানানো কল্পকথা।

আমরা যদি একথা বিশ্বাস করি, তবে আয়িম্মায়ে মোজতাহেদিন, প্রখ্যাত মোফাচ্ছেরিন এবং মোহাদ্দেসিনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের দ্বারা আমাদের যেভাবে সমৃদ্ধশালী করেছেন, ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুনকে যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন,

www.pathagar.com

সেসবের নিরিখে এসব কল্পকথাও মিথ্যাই প্রমাণিত হয়ে যায়।সুতরাং সিরাতকে খণ্ডিতভাবে চর্চা করা এবং পাঠ করার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের গোটা উম্মতে মুহাম্মাদীকে একটিমাত্র ইউনিট হিসাবে কল্পনা করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাতের ওপর দিয়ে যতগুলো যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে তার প্রত্যেকটি যুগে এই উম্মত বিশ্বমানুষের জন্য কতটুকু করেছে, মুসলমানদের কতটুকু অবদান ছিল এবং মুসলমানরা তাদের ঈমান-আকিদার ওপর ভিত্তি করে কতদূর অগ্রসর হয়েছে, যদি এর ওপর একটা সার্বিক পর্যালোচনা না হয়, তবে সিরাতে পাকের আলোচনাই হলো না। সিরাতে পাকের আলোচনা যদি করতে হয়, তবে হুজুর আকরামের [সা] আদর্শকে, তাঁর সুন্নাহকে এবং তাঁর জীবনকে এ যুগ পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই। ■

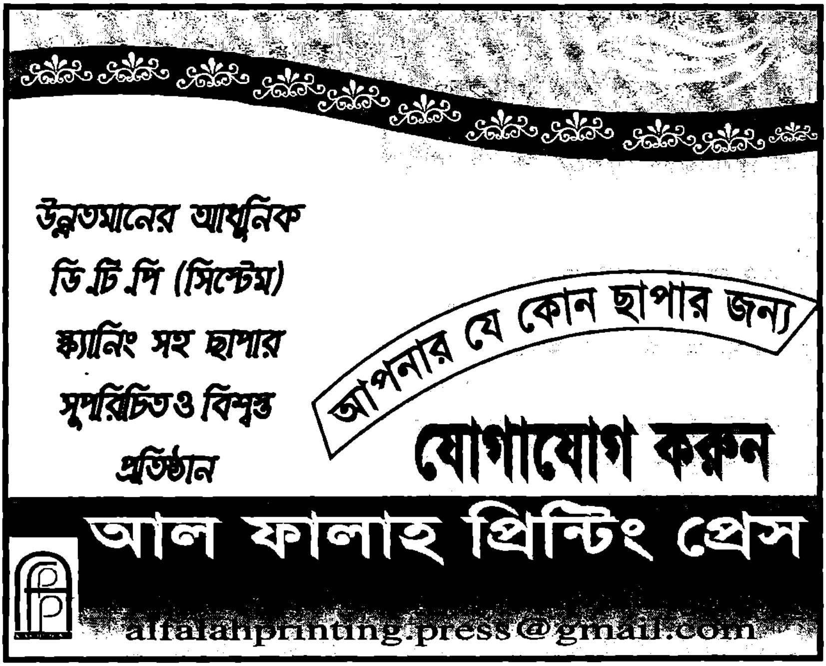

www.pathagar.com

মানব জাতির মহান শিক্ষক

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

মানব জাতির শিক্ষকরূপে বিশ্বনবীর অবদান সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে সর্বপ্রথম ইসলামে জীবনের স্বরূপ ও জীবন দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ আসাদ যা বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অস্ট্রিয়ার এক ইহুদি পরিবারের লিওপোল্ড উইস পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত হয়েও ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ১৯২৬ সালে হয়েছিলেন মুহাম্মদ আসাদ। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মহান ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করে সেই জ্ঞান সমুদ্রের অভ্যন্তর থেকে তিনি তুলে আনলেন এক রাশি মণিমুক্তা। ইসলামের কোন দিকটি তাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এখনো জানি না ইসলামের কোন দিক আমার নিকট সবচেয়ে বেশি আবেদনপূর্ণ ছিল। আমার মনে হয়েছে ইসলাম এক পরিপূর্ণ স্থাপত্য শিল্পের মতো। এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে এমন সুদৃঢ়ভাবে সুবিন্যস্ত যে, এর কোনো একটি প্রয়োজনাতিরিক্ত নয় এবং কোনো একটিরও নেই স্বল্পতা। ফলে তা হয়েছে সুসমন্বিত এবং সুঠাম, সুশান্ত'।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন সমাজে ধর্ম বলতে যা বোঝায়, ইসলাম তা থেকে স্বতন্ত্র। ইসলাম হলো এক জীবন ব্যভস্থা। এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। অন্য ধর্মের মতো ইসলাম শুধুমাত্র বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিন্যাসযোগ্য আধ্যাত্মিক চেতনা নয়। তা হলো সুনির্দিষ্ট নীতিসূত্রের কাঠামোয় স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থার কক্ষপথ। ইসলামের মূলমন্ত্র হলো একত্ববাদ। সমগ্র জীবন ঐক্যবদ্ধ, কারণ তা স্বর্গীয় একত্ব থেকেই উৎসারিত। পার্থিব জীবনে ব্যক্তি যা সম্পন্ন করে সেই ব্যক্তিত্বের সীমারেখায় সব কিছুর মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এক ঐক্যবোধ-তার ভাবনা-চিন্তায়, কর্মে, এমন কি তার সজ্ঞান চেতনায় এক ঐক্যানভূতি। ইসলামের সৌন্দর্য হলো-জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ব্যক্তিকে পার্থিব জীবন পরিত্যাগ করতে হয় না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে ব্যক্তিকে কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে কোনো গোপন পথের অনুসন্ধানে যেতে হয়না। চূড়ান্ত মুক্তি অথবা মোক্ষ লাভের জন্যে মনের ওপর দুর্বোধ্য কোনো তত্ত্বের প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে হয় না। ইসলামে এমন ব্যবস্থা অনুপস্থিত। মুহাম্মদ আসাদের কথায়, 'এটি হলো সহজ সরল জীবন কর্মসূচী, যা পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির জন্যে প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত করছেন। এর শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক দিকের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মধ্যে।

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, পার্থিব জীবন ব্যভস্থার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব। খ্রিষ্টধর্মে বলা হয়েছে, কেবল দৈহিক আকাঙ্ক্ষা দমন করেই এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের মাধ্যমেই ব্যক্তি পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম। হিন্দু ধর্মের বিধান হলো, নিচু স্তর থেকে ক্রমাগত পুনর্জন্মের ধারবাহিক আবর্তনের মধ্য দিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েই ব্যক্তি লাভ করে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মোক্ষ। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে ব্যক্তি সত্তা চূর্ণবিচূর্ণ করে সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্মিলিত হবার আকুতি হল নির্বাণ লাভের মাধ্যম।

ইসলাম কিন্তু বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রদত্ত বিধান পালন করেই, গভীর আনুগত্যের সাথে, সচেতনভাবে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেই একজন মুসলমান পরিপূর্ণ জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারেন। একজন মুসলমানের কর্তব্য হলে সৃষ্টিকর্তা তাঁর অপার কৃপায় অত্যন্ত মূল্যবান নেয়ামত হিসাবে যে জীবন দান করেছেন তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করা। এই সত্য মনে রেখে মানব জাতির শিক্ষকরূপে মহানবী [সা]-এর অবদান পর্যালোচনা করতে হবে।

মানবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ইসলামে রয়েছে এক উন্নততর বিশ্বাস। পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, 'দেখো, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধ পাঠাচ্ছি'। বিশ্বের প্রথম মানব আদম সম্পর্কে আল্লাহ , তা'য়ালা এই উক্তি। এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। মানুষ যে সবকিছুর ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধান করবে, তা পূর্বনির্ধারিত। তবে বিশ্ব চরাচরে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও অগ্রগতি সাধনের ধারণা ইসলামে একটু ভিন্ন। পাশ্চাত্যে এই সম্পর্কিত ধারণা হল-মানুষ উত্তরোত্তর তার আত্মিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে তার জাগতিক উন্নয়ন ও বিজ্ঞানমনস্কতা লাভের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

ইসলামে কিন্তু এই বিশ্বাস রয়েছে যে, মানবগোষ্ঠী ব্যক্তিগত এবংসমষ্টিগত এই উভয় পর্যায়ে আত্মার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে জাগতিক এবং পারমার্থিক উন্নয়নের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক এবং আজো তা অব্যাহত রয়েছে।

মানবজাতির শিক্ষক হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ [সা] ভূমিকা পর্যালোচনার পূর্বে তাঁর জীবনের পর্যায়গুলো অত্যন্ত সাবধানে অথচ সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করা খুব প্রয়োজন। হযরত মুহাম্মাদ [সা] হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন হতেন ঠিকই, এবং উচ্ছনে যাওয়া মক্কা নগরীতে তার মিশন সফল করার জন্যে তিনি ফিরে এসেচেন বারবার। মক্কা নগরী কিন্তু ইসলামের জন্ম নগরী হলেও ইসলাম তার পরিপূর্ণতা লাভ করে মদিনাতেই। হেরাগুহায় মহানবী [সা] ছিলেন উপবাসী, সন্যাসী, সুফি সাধক। তারপর মদীনাতে এসে তিনি হলেন ইসলামের বাণীবাহক। মদীনাতে এসে তিনি হলেন ইসলামের প্রবর্তক। মদীনাতেই ইসলামী চেতনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও স্বচ্চতর হল। পবিত্র কুরআন শরীফেই রয়েছে, 'আজ আমি আপনার দীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ রহমত আপনার দীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ রহমত আপনার ওপর নাযিল করলাম। আমি খুশী যে ইসলাম আপনার দীন। [মাদানী সূরা : কুরআন; আলীয়া ইজেতবেগোভিচ, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলাম, ১৯৯৬, ৭৯]। মক্কায় নয়, মদীনাতেই ইসলামের সার্বিক সামাজিক ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর হেরাগুহায় ধ্যানমগ্নতা, তারপর ব্যস্তবতার জগতে প্রত্যাবর্তন, এক কথায় পারমার্থিকতা ও যুক্তির তথা আধ্যাত্মিককতা ও কর্মনিষ্ঠার সমন্বয়-এই হল ইসলামের বৈশিষ্ট্য। মরমীবাদ দিয়ে যার শুরু, রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে তার পরিপূর্ণতা। এ যেন মানবজীবনের সারবত্তা। মানুষ্য জীবনের মতোই এর রয়েছে একদিকে 'স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ' যা এক মহাকবির মহাকাব্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তবতার সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় গদ্য।

খ্রিস্টবাদ কখনো একেশ্বরবাদে স্থিত হয়নি। খ্রিস্টান গসপেলে [Gospel] তাই দেখা যায়, তিনি সত্তার অবস্থান, ট্রিনিটি [Trinity]। খ্রিস্টীয় তত্ত্বে ঈশ্বর হলেন পিতা, কুরআন শরীফে কিন্তু আল্লাহকে শ্রদ্ধা করেন। মা মেরী ও অন্যান্য সাধু বা সেইন্টরা খ্রিস্টবাদে দেবতুল্য। মুসলমানরা কিন্তু মহানবীকে শ্রদ্ধা করেন একজন পরিপূর্ণ মানবরূপে, কোনো ফেরেশতারূপে নয়। এইভাবে ইসলামী সংস্কৃতি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের মসজিদকে খ্রিস্টানদের গির্জা অথবা হিন্দুদের সাথে তুলনা করলেই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মসজিদে দেখা যায় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার এক মুক্ত ও উদার আবহ। গির্জায় দেখা যায় রহস্যময়তার এক পরিবেশ। মন্দিরে পাওয়া যায় রহস্যময়তার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠ বা বর্ণভিত্তিক কর্তৃত্ব এবং যাজকীয় প্রাধান্যের এক আবহাওয়া। মসজিদের অবস্থান সাধারণত কর্মস্থলে, কোনো বাজার বা বসতির কেন্দ্রে। মসজিদের নামায আদায়ের পরে জাগতিক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। গির্জা কিন্তু বাস্তবতার অনুষঙ্গ থেকে দূরে থাকতে চায়। আনুষ্ঠানিক নীরবতা, অন্ধকার অথবা অতিন্দ্রীয় জগতের অনুভব নির্মাণের প্রচেষ্টা এসব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। খ্রিস্টধর্মের মর্মবাণী অথবা

www.pathagar.com

গসপেলের [Gospel] লক্ষ্য শুধু ব্যক্তি, কিন্তু কুরআনের বাণী ব্যক্তিসমষ্টির জন্যে। গির্জার ব্যবস্থাপনায় দেখা যায় এক ধরনের অভিজাততন্ত্র। ভাবগম্ভীর পরিবেশে যাজবীয় কর্তৃত্বের প্রকাশ। মসজিদে কিন্তু সাধারণ ও অ-সাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্র মূর্ত। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় ইজমা বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ জনগণের ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত, তার মাধ্যমে জনগণের অভিমতের প্রকাশ ঘটেছে ইসলামে।

ইসলামে এভাবে শুধু যে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাই নয়, নতুন সভ্যতার পথও প্রশস্ত হয়েছে। সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী চিত্র হলো শিক্ষা। কুরআন শরীফের প্রথম আয়াতেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তা ছাড়া, কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে করেছেন। মানুষ কিন্তু বিশ্বময় তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে শুধুমাত্র তার বিশেষ জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে, বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে। তাই শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ দুটোই ইসলামে অবশ্য করণীয়। হযরত মুহাম্মাদ [সা] নিজেই বলেছেন, 'আমি দু'জনের বিষয়ে অসন্তুষ্ট : অজ্ঞ ভক্ত এবং নাস্তিক পণ্ডিত' [Ralph waldo emerson. The conduct of life গ্রন্থে উদ্ধৃত]।

এও উল্লেখ্য যে, ক্ষমতাহীন বিশ্বাস, বিশ্বাসহীন শাসক অনেকটা নোংরা শরীরে বিশুদ্ধ আত্মার মতো– মহানবীর বক্তব্য এমনিই ছিল। এই অর্থে ইসলাম হচ্ছে মানুষের জন্যে সর্বাধিক প্রযোজ্য ব্যবস্থা। কারণ, ইসলাম মানব-প্রকৃতির দ্বৈত প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দেয়। অন্য যে কোনো ধর্ম বিকল্প মানবজীবনের খণ্ডিত প্রেক্ষিতকে ধারণ করে মাত্র। এদিক থেকে পর্যালোচনা করে বলা যায়, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্ব প্রকৃতি এবং তার অন্তর্ভুক্ত সকল সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, মানুষের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক গঠন-সবই ছিল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর শিক্ষার বিষয়বস্তু। শুধু তাই নয়, এই নশ্বর পৃথিবী লয় হলেও পারত্রিক জগৎ পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত।

ইসলামে শিক্ষার আদি কেন্দ্র হল মসজিদ। বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম [সা] নবুয়াত লাভের পরে ক্বাবা শরীফকে প্রথমে শিক্ষা কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, মক্কা নগরীতে তিনি 'দারুল আরকাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠানসৃষ্টি করেন। পরে তিনি মদীনায় হিজরত করলে প্রথমে কুবা নামক স্থানে সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে তিনি মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূলুল্লাহ [সা] আসরের নামাযের পরে অধিকাংশ সময় এই মসজিদে শিক্ষাদানে রত থাকতেন। এও জানা যায়, সপ্তাহে একটি দিন তিনি মহিলাদের জন্যেও নির্ধারিত করেন। তা ছাড়া, হযরত আনাস [সা] থেকে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় হিজরীতে মকরামহ ইবনে নাওফেল নামক আনসারের গৃহে 'দারুল কাররাহ' নামে একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল। সাহাবীগণ সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। রাসূলে করিম [সা]-এর জীবদ্দশায় মদীনায় ৯টি মসজিদ ছিল। এসব মসজিদে মদীনা ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে ছেলে-মেয়ে,

www.pathagar.com

মহিলা-পুরুষ সকলেই শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতেন। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আধুনিক কালের শিক্ষাদান পদ্ধতির মতো তখন ভর্তি এবং মাসিক মাইনের দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম কোনোক্রমে সংকোচিত হতো না। মধ্যযুগে ইউরোপে গিল্ডের আকারের যেভাবে বিশেষ কলাকৌশল শেখানোর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হতো, শিক্ষককে প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিয়ে যেভাবে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনসাধারণের নিকট থেকে আড়ালে রেখে সংকীর্ণ এক গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গৃহীত হতো, মদীনায় এবং পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বে তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম বিশ্বে শিক্ষালয় ছিল অবাধ, মুক্ত, সম্মানীবিহীন, সবার ওপরে জীবনমুখী। রাসূলুল্লাহ [সা] ছিলেন এর প্রবর্তক। সৈয়দ আমীর আলি লিখিত History of the saracens গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে, 'মদীনার মসজিদে হযরত আলী [রা] এবং তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ [হযরত আব্বাসের পুত্র] দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আইন অলঙ্কার শাস্ত্রের ওপর প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা করতেন এবং অন্য শিক্ষকরা শেখাতেন অন্য বিষয়'। হযরত মুহাম্মাদ [সা] কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন। এই শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বজনীন দুই অর্থে : এক. গ্রিক পণ্ডিত এরিস্টটলের কথায়, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনের প্রয়োজন এবং টিকে রয়েছে উন্নত জীবনের লক্ষ্যে। রাসূলুল্লাহ [সা] উন্নত জীবনকে যে আলোকে দেখেছেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে সেই নিরিখে সাজিয়ে-গুছিয়ে, সুস্থ দেহে বিশুদ্ধ মনের বিকাশ ঘটাতে এবং শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের জন্যে নয়, আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রস্ফুটিত করতে এবং শুধু ইহলৌকিক নয়, পারলৌকিক জীবনেরও সৌষ্ঠব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্যে প্রস্তুত করেন যাতে কেবল ব্যক্তি জীবন নয়, সামাজিক জীবনও উন্নততর হতে পারে। এদিক থেকে বলা যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। দুই. এই শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু শুধু মুসলমানদের জন্যেই সুনির্দিষ্ট হয়নি, এর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি ছিল সমগ্র উম্মাহর জন্যে এবং মদীনা সনদের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বনু আউফের ইহুদীরা মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ; ইহুদীদের জন্যে তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্যে তাদের ধর্ম, তাদের মাওয়ালী বা আশ্রিত এবং তারা নিজেরাও। অবশ্য যে অন্যায় বা অপরাধ করবে, সে নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের ক্ষতিই করবে। [এই নিবন্ধে মদীনা সনদের বঙ্গানুবাদ গৃহীত হয়েছে আব্দুল ওয়াহিদ রচিত একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মদীনা সনদের গুরুত্ব প্রবন্ধ থেকে, আলোর মিছিল, ১৯৯৯, ২২-৪৫ পৃষ্ঠা]। মদীনা রাষ্ট্রের উম্মাহ শুধু মুসলমানদের নয়, নয় কুরাইশদের অথবা মুহাজির ও আনসারদের। এই উম্মাহ সকলের। ধর্ম ও সমপ্রদায় নির্বিশেষে সকলের। যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে কিন্তু জাতি হিসাবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে সকলেই কৃতসংকল্প।

ইসলামের মৌল ভিত্তি যে একত্ববাদ তা যেমন রাসূলুল্লাহ [সা]-এর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েচে, সেই ঐক্যানুভূতির প্রতিকৃতিও রূপ পেয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

সৃষ্টি মানবের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে সুনির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাক্ষেত্রে বিশ্বময় আজ যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে তথ্য প্রবাহের অবাধ গতির প্রেক্ষাপটে, গণতান্ত্রিকতার বৈপ্লবিক সম্প্রসারণের এ কালে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা প্রতিফলন দেখা যায় বটে কিন্তু তা আংশিক। বিজ্হান-প্রযুক্তি, আইন-চিকিৎসা, অর্থনীতি, পরিকল্পনা, যুক্তিবিদ্যা-প্রকৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গতিশীল হলেও ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, দর্শন ও সৃষ্টিতত্ত্ব, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এখনো অপরিণত ও অপূর্ণ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর শিক্ষা এক্ষেত্রে এখনো পথিকৃৎ, এখনো দিশারিতুল্য, উজ্জ্বল দীপশিখার মতো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ক্ষেত্রকে নৈতিকতার আবরণমুক্ত করে অগ্রসরমান মানবগোষ্ঠী যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তা যে কোনো মুহূর্তে সমগ্র মানব সমাজকে বিপর্যয়ের ফেরে দিতে পারে। তখন কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] শিক্ষা ব্যবস্থাই হতে পারে একমাত্র উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। ■

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদ [সা]-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তিত্ব

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহামানবের মহিমা ও মাহাত্ম্যের রূপকল্প বিধৃত করতে মনীষী এমারসন একটি চমৎকার বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষায় :

"জগতবাসীর মত অনুযায়ী জগতে বাস করা সহজ, নিজের মত অনুযায়ী নির্জনে বাস করাও সহজ। তিনিই মহামানব যিনি লোকালয়ের মধ্যেও নির্জনতার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন।"

সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ [সা] সেই অসাধারণ গুণাবলীরই অধিকারী যার মাধ্যমে সীমার মধ্যে থেকেও অসীমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাস-আলোকে তা তিনি এক ক্ষণজন্মা, মহান, কর্মতৎপর, দূরদ্রষ্টা সত্যবদ্ধ মহাপুরুষ হিসাবে নন্দিত। মানব-সমাজের জীর্ণ, ঘুণে-ধরা কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই তিনি অমিততেজ-ধারী বিরল ব্যক্তিত্বরূপে সমাদৃত। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হৃদয়-গভীরে বরণীয়।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মত নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃতি প্রদান করেছে যে, "জগতের সকল ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা সফল।"

বিশাল মহাসাগরের ন্যায় অতলান্ত ছিল তাঁর সুবিস্তৃত মহান জীবন।

www.pathagar.com

সে রত্নগর্ভ মহাসাগরের মন্থন মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, প্রতিভা ছিল বহুমুখী, অভিজ্ঞতা ছিল সুবিস্তৃত ও জ্ঞান ছিল অপরিসীম। রূপকথার মত স্নিগ্ধ ও চমকপ্রদ, প্রজাপতির পাখার মত বর্ণাঢ্য ছিল তাঁর বৈচিত্য জীবন। বহুবর্ণ বিভূষিত তাঁর স্বপ্নিল জীবনে বহু ঘটনারই আবর্তন ঘটেছিল। এ সমস্ত ঘটনায় তাঁর ঔদার্য ও মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, মনীষা ও তেজস্বিতা প্রকাশমান। স্বভাবতই বিশ্ব মনীষায় তাঁর অবস্থান অতি উর্ধ্বে, শীর্ষদেশে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমাজের প্রতিটি অংগনে, মানব চিন্তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহামানবের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই অনুসারী, ভক্ত ও অনুরাগীদের দ্বারা তিনি নন্দিত এবং ঈর্ষান্বিত, ক্ষুব্ধ বা অজ্ঞ ইসলাম-বিদ্বেষীদের দ্বারা তিনি নিন্দিতও হয়েছেন। বহু সহস্রব্যাপী ঘটনাবহুল মানব-ইতিহাসে নি:সন্দেহে তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ ডব্লু. ডব্লু. মন্টোগোমারী ওয়াট তাঁর শিরোনামীয় গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, "পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মাদ অপেক্ষা অন্য কোন মহামানবকে অধিকতর নিন্দা বা কলুষিত করা হয়নি।"

পাশ্চাত্য জগতে ইসলামের নবী [সা]-এর গৌরবমণ্ডিত অবস্থানের স্বীকৃতি সঠিক অর্থে প্রথম প্রদান করেন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, যখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ, মুহাম্মাদ [সা]-এর ধর্মই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। শেষ নবীর অনুপম চরিত্র ও বহুমুখী প্রতিভায় আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়ে তিনি এ মর্মেও আশা প্রকাশ করেন যে, "আমি আশা করি, সে সময় খুব দূরে নয় যখন সকল দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আমি একতাবদ্ধ করতে এবং কুরআনের যে নীতিসমূহ একমাত্র সত্য ও যে নীতিসমূহই মানবকে স্বস্তির পথে পরিচালিত করতে পারে সে সব নীতির উপর ভিত্তি করে এক সমরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

বিশ্ব মনীষার প্রিয় নবী [সা]-এর সুষমা-স্নিগ্ধ, মহান অবস্থানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত আরও একটি বলিষ্ঠ স্বীকৃতি উচ্চারিত হয় মনীষী টমাস কার্লাইলের কণ্ঠে। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে এডিনবার্গে আয়োজিত সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয় ঈশ্বর প্রেরিত করে রয়েছেন সুদূর আরবের উষ্ট্র চালক হযরত মুহাম্মাদ শিরোনামে প্রদত্ত ভাষণে তিনি নবী করীম [সা]-কেই নবী ও রাসূলগণের মধ্যে হিরো হিসাবে পরিচিহ্নিত করেন। তাঁর প্রাঞ্জল ও অনুপম ভাষায়, "আদিকাল হতে এই আরবজাতি মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করত এক অজ্ঞাত, অখ্যাত মেঘ পালকের জাতি হিসাবে। তারপর, তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন এক বার্তাসহ সেখানে এক ধর্মবীর নবী প্রেরিত হলেন, আর অমনি ম্যাজিকের মত সেই অলক্ষিত, অখ্যাত জাতি হয়ে উঠল লক্ষ্যযোগ্য, জগদ্বিখ্যাত, দীনহীন জাতি হয়ে উঠল জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। অত:পর এক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রানাডা থেকে পূর্বে দিল্লী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হল আরবের আধিপত্য। সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পৃথিবীর এক সুবৃহৎ অংশের ওপর আরবদেশ মহাসমারোহ ও মহাবিক্রমে দ্যুতি বিকিরণ করেছে।"

www.pathagar.com

বিশ্বমনীষার সৌকর্য সাধনে মহানবীর অতুলনীয় অবদানের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রদান করেন অপর এক ইউরোপীয় মনীষী আলফ্রেড দ্য লামার্টিন। তাঁর গ্রন্থে ১৮৫৪ সালে এই ফরাসী ঐতিহাসিক কবি রাজনীতিবিদ উল্লেখ করেন : "দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইন প্রণেতা, মতবাদ বিজয়ী ধর্মমতের এবং প্রতিমাবিহীন উপাসনা পদ্ধতির পুন:সংস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্ম-সাম্রাজ্যের সংস্থাপক কর্তা-এই দেখ মুহাম্মাদ! যে সমস্ত মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় মহত্ত্ব পরিমাপ করা হয়ে থাকে, সেগুলির প্রত্যেকটির আলোকে তাঁকে বিবেচনা করা হলে, আমরা এ কথা সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারি "কোন মানব কি তাঁর অপেক্ষা মহত্তর ছিল?"

জন উইলিয়াম ড্রেপারও ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত A history of the intellectual development of Europe গ্রন্থে স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, "সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বৎসর পর ৫৬৯ [মতান্তরে ৫৭০] খৃস্টাব্দে আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মাদ, যিনি পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মানবজাতির ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করছেন।" বিশ্বখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক ও ভারতের সাবেক গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের ইমপিচমেন্ট সম্পৃক্ত বক্তৃতায় ইসলামের নবী প্রবর্তিত মুসলিম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ঘোষণা করেন : "মুকুটধারী সম্রাট থেকে দীনতম প্রজা পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই মুহাম্মাদ প্রবর্তিত আইন সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাজ্ঞতম মনীষীবৃন্দের চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে গ্রথিত এই ইসলামী আইন হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানসমৃদ্ধ ও উদ্দীপ্ত ন্যায়শাস্ত্র।"

অপরদিকে পিয়েরে ক্রাবাইট নারী মুক্তির পথিকৃৎরূপে নবী করীম [সা]-কে পরিচিহ্নিত করে দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করেন : "পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মাদ [সা]-ই হচ্ছেন নারী-অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।"

মুহাম্মাদ [সা] ও তাঁর ধর্ম ইসলামের সৌন্দর্য-সুষমা, মহত্ত্ব-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে ধর্মপ্রাণ খৃস্টান পাদ্রী রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথও দাবি করেন : "মুহাম্মাদ প্রবর্তিত ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও সফল, সর্বাপেক্ষা আকস্মিক ও সর্বাপেক্ষা অসাধারণ বিপ্লব।...জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুহাম্মাদ সেই একই পদবী দাবী করেছিলেন যা নিয়ে তিনি তাঁর পথ-পরিক্রমা শুরু করেন-ঈশ্বরের নবী হওয়ার দাবি। আমি বিশ্বাস করি, জগতের শ্রেষ্ঠতম দর্শনশাস্ত্র ও বিশুদ্ধতম খৃস্টধর্মও নিশ্চিতরূপে একদিন না একদিন তাঁকে ঈশ্বর-প্রেরিত বিশ্বাসযোগ্য দূত হিসাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে।"। [মুহাম্মাদ অ্যান্ড মুহাম্মাডানিজম, লণ্ডন, ১৮৭৪]

একইভাবে মুহাম্মাদ [সা]-এর সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠলেন বিশ্বখ্যাত মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ। ইসলামের নবী [সা]-এর বহুশাখ, সুবিস্তৃত কমকাণ্ডে অভিভূত হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন : "আমি মুহাম্মাদ [সা]-এর জীবনী নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমরা অভিমতে এই চমৎকার মানুষটি দজ্জাল তো ছিলেনই না, বরং তাঁকে মানবজাতির ত্রাণকর্তারূপে পরিচিহ্নিত করা যেতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদের ন্যায় একজন ব্যক্তি যদি সমস্ত পৃথিবীর একনায়কত্ব গ্রহণ করেন তাহলে তিনি বর্তমান বিশ্বের

৩—

www.pathagar.com

সমস্যাদি এমনভাবে সমাধান করতে সক্ষম হবেন যা বিশ্বের জন্য বহন করে আনবে অপরিহার্য, বহু-প্রতীক্ষিত সুখ ও শান্তি।"

স্বভাবতই মাইকেল হার্টের ন্যায় একজন নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকও হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর বৈচিত্র্যময় গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে পৃথিবীর ইতহাসে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। "দি হানড্রেড" গ্রন্থে তাঁর কুণ্ঠাহীন, অনাবিল উক্তি হল : "পৃথিবীর ইতিহাসে প্রভাবমালী ব্যক্তিবর্গের তালিকায় শীর্ষদেশে মুহাম্মাদ [সা]-কে স্থাপনে আমরা সিদ্ধান্ত বহু পাঠককে বিস্মিত করতে পারে এবং অনেকের নিকটই তা প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় পর্যায়ে চরমভাবে সফলকাম ছিলেন। ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন সংমিশ্রণই তাঁকে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিচিহ্নিত করে।"

স্বভাবতই ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আলোচিত এই মহামানব একইভাবে আলোড়িত ও আকৃষ্ট করেছেন আর্নল্ড টয়েনবী, মন্টগোমারী ওয়াট, কারেন আর্মস্ট্রং, আর্নেস্ট রেনান, এইচ. জি. ওয়েলস, পি. কে. হিট্টি, ভন হ্যামার পার্গস্টল, ভন ক্রেমার, টমাস প্যাট্রিক হিউজ, অঁরি পিরেন, আলফ্রেড গিলম, লিঁও সিটানি, এমানুয়েল ডায়েশ, স্যামুয়েল জনসন, এমারসন, উইলিয়াম ম্যুর, স্টানলি লেনপুল, ম্যাক্সিম রডিনসন, টি ডব্লু আর্নল্ড, ড. মিনগারা প্রমুখ পাশ্চাত্য জগতের অমুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দকে। এঁদের সকলেই যে প্রিয় নবী [সা]-কে প্রশংসা করেছেন তা নয়, তবে সিংহভাগ মন্তব্যই ইসলামের নবী [সা]-কে মহামানবরূপে দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রদান করে।

একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, শুধুমাত্র পাশ্চাত্য জগতেই ইসলামের নবী আলোচিত হননি–প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় অঙ্গনই তাঁর সুবিমল প্রতিভালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে, উভয় অঞ্চলেই তিনি আলোচিত হয়েছেন বিপুলভাবে, নিন্দিতও হয়েছেন, নন্দিতও হয়েছেন। তবে রাহমানুর রহিমের অসীম করুণায়, কতিপয় ইসলাম-বিদ্বেষী কর্তৃক অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বিকৃত ও নিন্দিত হলেও, ইতিহাসে কোন মহামানব অমুসলিমগণ কর্তৃক মুহাম্মাদ [সা]-এর ন্যায় এত সমাদৃত ও প্রশংসিত হননি।

এই উপমহাদেশের কথাই ধরা যাক। মুহাম্মাদ ঘোরী, সুলতান মাহমুদ প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুদের প্রবল সংঘর্ষ হলেও সেগুলি ধর্মযুদ্ধরূপে পরিচিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে অবমাননা করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস গৃহীত হয় সম্রাট আকবরের শাসনামলে, যখন তিনি আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলাম-এর পরিবর্তে দীন-এ-ইলাহী প্রবর্তনের প্রয়াস পান। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রায় কর্পূরের মত ইসলাম-পরিপন্থী দীন-এ-ইলাহী বাতাসে মিলিয়ে যায় এবং নবী করীম [সা] তাঁর পূর্ণ গৌরব ও মর্যাদায় তদানীন্তন ভারতীয় মুসলিমদের হৃদয়ে সমাসীন থাকেন। এমন কি গুরু নানকের ন্যায় জ্ঞানতাপসও তাঁকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে ঘোষণা করেন : "বেদ ও পুরাণের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন কেবলমাত্র কুরআনই পৃথিবীকে পরিচালিত করতে পারে।...সাধু, ঋষি, সংস্কারক, শহীদ, পীর, শেখ ও

www.pathagar.com

কুতুববৃন্দ সকলেই উপকৃত হতে পারেন যদি তাঁরা মহানবী মুহাম্মাদ-এর ওপর দরূদ পড়েন।"

স্বভাবতই পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, রাজপাল, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মহাশয় কৃষাণ, বিচারপতি কুমার দিলীপ সিং প্রমুখ ইসলাম বিদ্বেষী যখন ইসলাম ও তাঁর নবীকে হেয় ও অবমাননা করার প্রয়াস নেয়, তখন মুসলমানেরা আদৌ নিশ্চুপ বা নিষ্ক্রিয় থাকেনি। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীতে প্রকাশ্য জনসভায় ইসলামের নবী [সা]-কে অশালীন ও অমার্জিত ভাষায় গালিগালাজ করায় তাকে ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর আবদুর রহমান হত্যা করে ফাঁসিকাষ্ঠে শাহাদাত বরণ করেন। একইভাবে, লাহোরে প্রকাশিত মহাশয় কৃষাণ বিরচিত কুরুচিপূর্ণ নবী-বিরোধী পুস্তক ভোলানাথ কর্তৃক কলিকাতায় পুন:প্রকাশিত হওয়ায় অমৃতসর থেকে আগত আমির আহমদ এবং লাহোরের শাহ আবদুল্লাহ খান প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালিয়ে ভোলানাথ ও তার সহকর্মীকে হত্যা করেন। হাসিমুখে তাঁরাও ফাঁসিকাষ্ঠে শাহাদাত বরণ করেন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তির গঠনমূলক সমালোচনা মুসলমানেরা সহ্য করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু তথাকথিত সমালোচনার নামে নবীর শানের খেলাপে কুৎসা রটনা করা কোনও ধর্মভীরু মুসলমান কোনদিনও সহ্য করেনি। সহ্যও করা সম্ভবও নয়। আজও তাই ভারতীয় বংশোদ্ভূত কুখ্যাত সালমান রুশদী তার অমার্জনীয়, ঘৃণিত কর্মকাণ্ড "দি স্যাটানিক ভার্সেস"-এর জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। ইরান বা কোন মুসলমান দেশ এই ঘৃণ্য পাপীকে ক্ষমা করতে পারে না।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ উপমহাদেশেও মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, স্যার সি. ভি. রমণ, রামমোহন রায়, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জহরলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, স্যার ছোটু রাম, স্যার গোকুল চন্দ্র নারায়ণ, প্রেম চাঁদ ভাসিন, স্যার সিপি রামাস্বামী, এম.এন.রয়, সাধু টি এল ভাসভানী প্রমুখ মনীষী ইসলামের নবী [সা]-এর সুবিমল চরিত্র-মাধুর্য ও বিভিন্ন গুণের অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করেছেন। যে মহাত্মা গান্ধীর সকল চিন্তা-চেতনা হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত, তিনিও নবী করীম [সা]-এর জীবনী পাঠ করে আফসোস প্রকাশ করেছেন যে, মুহাম্মাদ [সা] সম্বন্ধে অধিকতর বিস্তৃত ও ব্যাপক তথ্য আহরণ করা তাঁর পক্ষে তখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মহানবীর বক্তব্য সম্বলিত স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী বিরচিত গ্রন্থ এর মুখবন্ধ রচনাকালে তিনি সেটি "মানব জাতির অমূল্য সম্পদ" রূপে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় এই গ্রন্থটি পকেটে নিয়েই ১৯১০ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে রাশিয়ার অ্যাস্টাপোভো রেলওয়ে জংশনে নিভৃতে মৃত্যুবরণ করেন।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিশাল কর্মকাণ্ডে ইসলাম বা মুসলমানদের সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য বা আকর্ষণীয় কোন বক্তব্য পেশ করেননি সত্য, কিন্তু তিনিও সৃষ্টির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেছেন : "মানুষের ধর্ম-বুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল; তাকে তিনি [হযরত মুহাম্মাদ]

www.pathagar.com

অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেননি; এর জন্য সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসঙ্কুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ, স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে, উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।" [রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৮]

আজ বিশ্বের দেড় শত কোটি মুসলমান প্রায় সকলেই মহানবী [সা]-এর সুন্নাহ সাধ্যানুযায়ী জানার ও অনুসরণ করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, যে নবী [সা] সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা [রা] উল্লেখ করেন যে, "কুরআনই তাঁর জীবন-চরিত্র" আল্লাহ্ তাআলার বিশুদ্ধ কালাম সম্বলিত সেই আল কুরআনকে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষ তাদের একমাত্র বলে বিবেচনা করে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই তারা নবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর পাক কালাম ও নবীর সুন্নাহই তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করে। ইসলাম-বিরোধীদের চক্রান্ত আজও শেষ হয়নি সত্য, এ কতাও সত্য যে, তাদের নাসারন্ধ্রে ইসলামের সৌরভ কোনদিনও প্রবেশ করবে না, তবুও মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের, সত্যসন্ধ, নিরপেক্ষ ও সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রাজ্ঞ সকল ব্যক্তিই দ্বিধাহীনচিত্তে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, হযরত মুহাম্মাদ [সা] হচ্ছেন ইতিহাসের সর্বাধিক আলোচিত তথা সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।■

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স
১১, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন : ৭১২৪৩২৮,০১৬৭৮-১৪০৩০২

আমাদের প্রকাশিত কতগুলো প্রয়োজনীয় ইসলামী বই

১. কুরআন মাজীদের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
২. আল কুরআন কথা বলে
৩. ইসলামের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দাম্পত্য জীবন
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
৫. ইসলামে নারী বনাম প্রচলিত ভুল
৬. রাসূল (স) এর স্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত
৭. কুরআন হাদীসের আলোকে সহীহ দুআর ভাণ্ডার
৮. হাদিয়াতুল মুসাল্লিন [নামাযের প্রামাণ্য মাসআলা]
৯. আত্মপরিচয়ে আলকুরআন
১০. নবী রাসূলদের অলৌকিক ঘটনাবলী
১১. তাফসীরুল কুরআন সূরা ফাতিহা ও বাকারা
১২. তাফসীরুল কুরআন আমপারা
১৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মকছুদুল মোমেনীন
১৪. প্রশ্নোত্তরে ছোটদের প্রিয় নবী (স)
১৫. মিরাজ ও বিজ্ঞান
১৬. কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইমাম হোসাইনের (রা) শাহাদাত
১৭. শেষ মনযিলের পথে
১৮. আল কুরআনে আলোকিত বিশ্বনবী (স)
১৯. মানবাধিকার সনদ ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন
২০. ইসলাম বনাম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা
২১. সুনির্বাচিত হাদিস সঞ্চয়ন
২২. যুক্তি প্রমাণের আলোকে পর্দার বিধান
২৩. আল কুরআনে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়
২৪. আসহাবুর রাসূল (স) (১ম খণ্ড) [বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী]
২৫. ছোটদের প্রিয়নবীর প্রিয়কথা
২৬. ইসলামের উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার
২৭. রোযা কি, কেন রাখবেন, কিভাবে রাখবেন
২৮. ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর অধিকার
২৯. নারী ও ইসলাম
৩০. তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি
৩১. পরিবেশ ও ইসলাম
৩২. মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বাংলাদেশ
৩৩. মক্কা মদীনা ও হজ্বের বিধি-বিধান
৩৪. দুর্নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ
৩৫. হিজাব, পর্দা ও ফ্যাশন
৩৬. আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র
৩৮. ঈদে মিলাদুন্নবী (স) উৎপত্তি, ভিত্তি ও আপত্তি
৩৯. মাও. মওদূদীর সঙ্গে মরিয়ম জামিলার পত্রালাপ
৪০. জান্নাতের পথ পাথেয়
৪১. আল কুরআনে আস সালাত
৪২. আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল
৪৩. ডাঃ জাকির নায়েক রচনাসমগ্র (১)
৪৪. হাদীসে কুদসী
৪৫. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জিহাদ

www.pathagar.com

শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে মহানবী [সা]

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে মানবজাতির মধ্যে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য। এর ফলে মানুষ হারিয়ে ফেলে ভ্রাতৃত্ববোধ, বিলীন হয়ে যায় তাদের মধ্যকার পারস্পরিক মায়ামমতা বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মধুর সম্পর্ক। তাদের জীবনে নেমে আসে শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের ঘোর অন্ধকার।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]এর আগমনের পূর্বে গোটা পৃথিবী শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যের অতল তলে নিমজ্জিত ছিল। এর ফলে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছিল চরম অস্থিরতা ও বিশৃংখলা। পরিবার সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র পর্যায়ে যুদ্ধংদেহী মনোভাব এমনকি এর ফলে সামান্য কোন তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে প্রতিহিংসার কারণে বছরের পর বছর ধরে তারা যেত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ।

শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যপ্রসূত এমনি এক বিষবৃক্ষের করাল গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]। সাথে নিয়ে এলেন সত্যা মিথ্যার পার্থক্যকারী মহান আল্লাহর বাণী মানুষের জীবন বিধান আল কুরআন এবং নবীর সুন্নাহ।

www.pathagar.com

আল কুরআনের ভাষায় তিনি আহ্বান জানালেন বিশ্বমানবতাকে, "[হে নবী] বলুন, হে কিতাবীগণ! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তার শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া রব হিসাবে কাউকে গ্রহণ না করে।" [আল কুরআন ৩ : ৬৪]

এমনিভাবে মানবজাতিকে একজাতি হিসাবে আখ্যায়িত রাসূলে করীম [সা]কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমের অন্য আয়াতে বলেন, "এই যে তোমাদের জাতি-এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।" [আল কুরআন ২১ : ৯২]

একই বিষয়ে অন্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে... "অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর।" [আল কুরআন ২৩ : ৫২]

মানুষের মধ্যে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূর করে আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা আরও ঘোষণা করেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চিয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" [আল কুরআন ৪৯ : ১৩]

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ ধরনের অনেক আয়াত রয়েছে যার প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বমানব তার মুক্তিদূত নবী আকরাম [সা] তদানীন্তন শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অশান্ত পৃথিবীতে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করে গোটা মানবজাতিকে এক উম্মাহ্ বা জাতিতে পরিণত করাই ছিল নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ [সা]এর একমাত্র মিশন বা গুরুদায়িত্ব, যেখানে 'তাক্ওয়া' ছাড়া মানুষের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের আর কোন মাপকাঠি ছিল না।

আমরা যদি নবী করীম [সা] কর্মময় জীবনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, তিনি মানুষের মধ্যে হতে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূর করে তাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন এবং এই চেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য তার বিদায় হজ্জের মহামূল্যবান ভাষণে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করে গিয়েছেন। এই ভাষণে তিনি আইয়ামে জাহেলিয়াত তথা অন্ধ যুগের যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার ও কুসংস্কারপূর্ণ নিয়ম পদ্ধতির মূলোৎপাটন ও বিলোপ সাধন করার লক্ষ্যে তিনি বলেন, "আইয়ামে জাহেলিয়াতের সকল নিয়ম পদ্ধতি আমার পদতলে পদদলিত!" [সহীহ মুসলমি ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৭]

তিনি আরও বলেন, "ওহে মানবজাতি, নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক। তোমাদের পিতা এক, সাবধান অনারবের ওপর আরবের কিংবা আরবের ওপর অনারবের, কালো বর্ণের মানুষের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে

www.pathagar.com

তাক্‌ওয়া বা আল্লাহভীতি। যে যত অধিক মুত্তাকী, সাবধানী ও পরহেযগার সে তত অধিক শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।" [সীরাতুন্নবী; শিবলী নুমানী ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪২]

"প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং সকল মুসলমান পরস্পর ভাই।" [মুস্তাদরিক, হাকেম, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৩]

"তোমাদের অধীনস্ত দাসদাসীগণ তোমাদেরই। সুতরাং তোমরা যা খাও তাই তাদের খেতে দেবে আর তোমরা যা পরিধান কর তাই তাদের পরিধান করতে দেবে।" [সীরাতুন্নবী, শিবলী নুমানী, পৃঃ ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪৩]

"আইয়ামে জাহেলিয়াতের যাবতীয় রক্তঋণ তথা প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করা হল এবং সর্বপ্রথম আমি নবী [সা] আমার নিজ গোত্রের রবীআ ইবন হারিসের পুত্রের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করলাম। [সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭]

"আইয়ামে জাহেলিয়াতের সমস্ত সুদ বাতিল করা হল এবং সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ বাতিল করলাম।" [সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭]

"নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমাদের যেমন নারীদের ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং নারীদের অধিকারদেরও তোমাদের ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং নারীদের অধিকার যথাযথ প্রদান করো, কেননা তাদেরকে তোমরা আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ।" [সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৪]

শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে বিদায় হজ্জের ভাষণে উল্লিখিত এই মহামূল্যবান নির্দেশনার পাশাপাশি যদি রাসূলে করীম [সা] এর অন্যান্য সুন্নাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যায় যে তিনি সমাজ থেকে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যের মূল উৎপাঠন করার লক্ষ্যে কত বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উম্মুল হোসাইন [রা] হতে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম [সা] বলেছেন, "কোন নাক চেপ্টা গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয় আর সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহলে তোমরা তার কথা অবশ্যই শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।" [সহীহ্ মুসলিম]

নবী করীম [সা]এর দৃষ্টিতে আমীর ফকীর ও ছোট বড় এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সকলকেই তিনি এক নজরে দেখতেন। হযরত সালমান, হযরত সোহাইব এবং হযরত বেলাল [রা] পূর্ববর্তী জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু রাসূলে করীম [সা]এর দরবারে তাদের মর্যাদা কুরাইশ সর্দারগণের সমতুল্য ছিল। একবার হযরত সালমান ও হযরত বেলাল [রা] কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান সম্পর্কে বলতে লাগলেন, এখনও সত্যের তরবারী আল্লাহর এই দুশমনদের গর্দার নাগাল পেল না। এই কথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক [রা] তাদেরকে বললেন, কুরাইশ সর্দার সম্পর্কে তোমরা এত বড় কথা বলছ! এরপর তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে নবী করীম [সা] কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, আবু বকর! আপনি তাদেরকে নারায করেননি তো? কেননা তারা যদি নারায

www.pathagar.com

হয় তবে আল্লাহও আপনার ওপর নারায হবেন। এই কথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক [রা] হযরত বেলাল ও সালমানের নিকট ফিরে গেলেন এবং বিনীতভাবে তাদেরকে বললেন, আপনারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি তো? তারা বললেন, না, আমরা আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। [সহীহ্ মুসলিম]

একবার চুরির অপরাধে আরবের সম্ভ্রান্ত মাখজুম' গোত্রের ফাতেমা নাম্নী এক মহিলা অভিযুক্তা হলেন সম্ভ্রান্ত গোত্রের হিসাবে তার মুক্তির জন্য আরবের বড় বড় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে নবী করীম [সা]এর নিকট সুপারিশ আসতে লাগল। তিনি বললেন আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি একাজ করত আমি চুরির শাস্তি স্বরূপ তার হাত কেটে দিতাম। [বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ]

বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে নবী করীম [সা] এর চাচা হযরত আব্বাসও বন্দী হয়ে এসেছিলেন। এরপর বন্দীপণ আদায় করে একে একে সবাইকে মুক্ত করা হচ্ছিল এমতাবস্থায় আনসারগণের কেউ কেউ নবী করীম [সা] চাচা হিসাবে আব্বাসকে মুক্তিপণ না নিয়ে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করলেন। তিনি জবাব দিলেন কখনও না, এক দিরহামও মাফ করা যাবে না। [বুখারী, ফিদায়া অধ্যায়]

খন্দকের যুদ্ধের সময় মদীনার চারদিকে যখন পরিখা খননের কাজ চলছিল তখন নবী করীম [সা] একজন সাধারণ শ্রমিকের মত সকলের সঙ্গে মাটি কাটার কাজ করেছিলেন। মাটি কাটতে কাটতে তাঁর পেটে পিঠে পর্যন্ত মাটির আস্তরণ লেগে গিয়েছিল। [বুখারী, কিতাবুল মাগাযী]

ঘরের সকল কাজকর্ম তথা ছেঁড়া কাপড়ে তালি লাগানো, ঘর ঝাড়ু দেয়া, দুধ দোহন, জুতা সেলাই, বাজার হতে সওদা বহন করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নবী করীম [সা] নিজ হাতে করতেন। গাধার পিঠে চড়ে কোথায়ও যাওয়া বা ক্রীতদাস এবং গরীব মিসকীনদের সাথে একত্রে বসে খাওয়া ইত্যাদি কাজে তিনি বিন্দুমাত্রও সংকোচ বোধ করতেন না। [শামায়েলে তিরমিযী]

হযরত আব্বাস [রা] বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম [সা] আমার বাড়িতে আসলেন। এসে পানি চাইলেন আমি পানির পরিবর্তে দুধ আনলাম। মজলিসে বামে হযরত আবু বকর [রা] মাঝখানে হযরত উমর [রা] এবং ডান দিকে জনৈক বেদুঈন বসেছিলেন। নবী করীম [সা] এর দুধ পান শেষ হলে হযরত উমর [রা] দুধের পাত্রটি হযরত আবু বকর [রা]কে দেয়ার জন্য ইশারা করলেন। কিন্তু তানা করে দুধের পেয়ালা ডান দিকে বসা বেদুঈনকে দেয়া হল। [বুখারী শরীফ]

মক্কার কুরাইশরা তাদের নিজদেরকে সর্বাপেক্ষা সম্মানী গোত্র বলে মনে করত। হজ্জের সময়ও তারা সাধারণ মানুষের সাথে মিশত না। এজন্য তারা আরাফাতে না গিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করত। নবী করীম [সা] নবুওয়াতের আগে পরে সবসময়ই সাধারণ মানুষের সাথে আরাফাত পর্যন্ত যেতেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি তাঁর জন্য বিশেষ কোন স্থান নির্ধারণ করতে দেননি। তাঁর জন্য ছায়ার স্থান নির্ধারণের অনুমতি চাইলে

www.pathagar.com

তিনি বললেন, যারা আগে আসবেন তারাই সুবিধাজনক স্থানে বসবেন। [মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড]

সাহাবায়ে কিরামগণ যখন সম্মিলিতভাবে কোন কাজ করতেন তখন নবী করীম [সা] তাতে এসে শরীক হতেন এবং সাধারণ শ্রমিকের মত গায়ে খেটে কাজ করতেন। মদীনায় এসে মসজিদ নির্মাণই ছিল সাহাবীগণের প্রথম সম্মিলিত কাজ। এই কাজেই তিনি সাধারণ শ্রমিকের মত ইট পাথর বহন করেন। সাহাবায়ে কেরামের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কখনও কর্মবিমুখ হননি। [সহীহ বুখারী হিজরত অধ্যায়]

পৃথিবী থেকে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করাই ছিল নবী করীম [সা] দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তার সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর জীবনে এই দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করেছেন। ফলে ইতিহাস সাক্ষী, তাঁর আমলে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানে কোন রকম শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যের লেশ মাত্রও ছিল না। আজকের এই অশান্ত, অস্থিতিশীল পৃথিবী হতে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূর শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে নবী করীম [সা] এর অনুসরণ ও আনুগত্য।■

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হলি চাইল্ড কলেজ

বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক

ইসলামী পরিবেশে পৃথক বালক-বালিকা শাখা

সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা। ফোন: ৮৯১৪০৫১, ৮৯১৪০৩৯, ০১১৯০ ৩৬৮৪৮০, ০১৭৪২ ০৯৪৮৬৭

- ভর্তির যোগ্যতা: GPA ন্যূনপক্ষে বিজ্ঞান-৩.৫, ব্যবসায় শিক্ষা-৩.৫, মানবিক-৩
- আসন সংখ্যা সীমিত: বিজ্ঞান-১০০, ব্যবসায়-১০০, মানবিক-৫০
- ভর্তির অযোগ্যতা: ধূমপায়ী, বিবাহিত ও অনিয়মিত শিক্ষার্থী।

২০০৯ সালে শতভাগ সফলতাসহ

ঢাকা বোর্ডে ৮ম ও সকল বোর্ডে ৯ম স্থান অর্জন

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান
- শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ
- সাপ্তাহিক/মাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় কোচিং এবং ক্লাশে উপস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ
- নিরাপদ ও শালীন পরিবেশ এবং ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াস
- যাতায়াতের মাইক্রো / মিনিবাসের ব্যবস্থা (নির্দিষ্ট রুটে)।

মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে GPA-এর ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধা

প্রাপ্ত GPA	কলেজ বিষয়ক	হোস্টেল বিষয়ক (ছাত্রীদের)
বিজ্ঞান- ৫.০০ ব্যবসায়-৫.০০ মানবিক-৫.০০	ভর্তি ও সেশন ফি - ৪০% কম বেতন - ১০০% ফ্রি	ভর্তি ও সেশন ফি - ৪০% কম হোস্টেল ফি - ৩৫% কম
বিজ্ঞান- ৪.৮১ ব্যবসায়-৪.৭৫ মানবিক-৪.৭৫	ভর্তি ও সেশন ফি - ২০% কম বেতন - ৪০% কম	ভর্তি ও সেশন ফি - ২০% কম হোস্টেল ফি - ২০% কম

www.pathagar.com

রাসূল [সা] ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলাম যে 'ইলম তথা জ্ঞানের দিকে আহ্বান জানিয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহ যা শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে তা হলো, এমন প্রতিটি জ্ঞান যা দলিল-প্রমাণের ওপর ভিত্তিশীল। এ কারণে মুসলিম 'আলিমগণ তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণকে 'ইলম তথা জ্ঞান বলে গণ্য করেননি। এজন্য যে, তা হলো কোন রকম দলিল-প্রমাণ ছাড়াই অন্যের কথায় আনুগত্য ও অনুসরণ। আর তাই ইসলামে যা 'ইলম [জ্ঞানী] তা অনেকগুলো ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে অথচ আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের 'ইলম তথা knowledge সেই অর্থ বা ভাব সন্নিবেশ করে না। সুতরাং ইসলামী 'ইলমে অতীন্দ্রীয় জগত, যার জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে লাভ করা যায় তাও শামিল করে। এই ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব রহস্য এবং আদিকাল থেকে মানুষ যে মৌলিক তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তার জবাবও লাভ করেছে।

www.pathagar.com

সেই তিনটি প্রশ্ন হলো:
১. আমার আগমন কোথা থেকে?
২. আমার চলার শেষ কোথায়?
৩. আমি কেন এলাম?

এ প্রশ্নত্রয়ের জবাবের মাধ্যমে মানুষ তার সূচনা, প্রত্যাবর্তনস্থল ও তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে যেমন জেনেছে, তেমনি জেনেছে নিজেকে, তার রব বা প্রভুকে এবং সে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এই 'ইলমকেই প্রকৃত 'ইলম বলা অধিকতর সঙ্গত। ইমাম ইবন 'আবদিল বার এই 'ইলমকেই "আল-'ইলম আল-'আলা" [সর্বোচ্চ 'ইলম] নামে অভিহিত করেছেন।

এই 'ইলমের অধিভুক্ত হলো মানুষ এবং মানুষের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অধ্যয়ন। যেমন: মানবজীবনের বিভিন্ন দিক, স্থান, কাল, ব্যক্তি, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির সাথে তার সম্পর্ক যা মানব ও সমাজ বিদ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঠিত বিষয়। বস্তু ও জড় পদার্থ যা মহাশূন্যে ও এ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তাও এই 'ইলমের একটি ক্ষেত্র। আর তা সন্নিবেশ করে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি, যার ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। এই ক্ষেত্রটি নিয়েই আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ মেতে আছে। তারা যখন 'ইলম নিয়ে কথা বলে তখন এসব বিষয় ছাড়া আর কোন কিছু নিয়ে কথা বলে না। কারণ এ সকল বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিয়াস অনুমানের আওতাভুক্ত। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় এবং ল্যাবরেটরী ও পরীক্ষাগারেও তা ঢুকানো যায়।

বস্তুবাদ যাকে তার বিষয়বস্তু গণ্য করে ইসলাম এ জাতীয় জ্ঞানকে কোন বাধা মনে করে না। ঈমানের পরিপন্থী অথবা বিরোধী বলে গণ্য করে না। যেমন গণ্য করেছিল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য ধর্ম।

একথা স্পষ্টভাবে ও জোরের সাথে বলা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাসমূহ এমন মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে এ জাতীয় 'ইলম অঙ্কুরিত হয়। তারপর তার শিকড় শক্তভাবে গেড়ে দেয়, শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারিত হয় এবং মহাপ্রভূর ইচ্ছায় তা ফল দিতে থাকে। সেই শিক্ষাসমূহের কিছু নিম্নরূপ :

জ্ঞানভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করা

মানুষের মধ্যে সাধারণ অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তির মানুষও আছে, তাদেরকে যা কিছু বলা হয় সাধারণত তাই তারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে যা কিছু অবহিত করা হয় তা গ্রহণ করে। বিশেষ করে তাদের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন: মাতা-পিতা বা এ ধরণের অন্য কারো নিকট থেকে যদি সেই সব কথা শোনে তাহলে বিনা বাক্য ব্যয়ে তা মেনে নেয়। তদ্রূপ অধিকাংশ মানুষকে যে মত-পথের ওপর দেখতে পায়, তা ঠিক হোক বা বেঠিক হোক, কোনরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই তা মেনে নেয়। সেক্ষেত্রে তাদের শ্লোগান হলো: "আমাদের পূর্ব পুরুষদের যার ওপর পেয়েছি আমরা তার ওপর আছি" অথবা তারা বলে: "আমরা মানুষের সংগে আছি- তারা ভালো বা মন্দ যাই করুক না কেন"। এরই বিপরীত হলো বাস্তবধর্মী জ্ঞানগত

www.pathagar.com

বুদ্ধিবৃত্তি : এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি যুক্তি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা, প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু মানেনা। যেখানে দৃঢ় প্রত্যয় ও অকাট্য জ্ঞান দাবি করা হয় সেখানে আবেগ অনুভূতি এবং ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা। জ্ঞানগত বুদ্ধিবৃত্তি যার ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মৌলিক রূপরেখা কুরআন ও সুন্নাহ্ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। আমরা তার থেকে কয়েকটি পয়েন্ট সংক্ষেপে উল্লেখ করছি:

১. দলিল ছাড়া কোন দাবী গ্রহণ করা যাবে না, তা সে দাবীদার যেই হোক না কেন। সেই দলীল হলো, বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়ে যৌক্তিক প্রমাণ। যেমন আল্লাহ বলেন:

...বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।[১]

ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা। যেমন :

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফিরিশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে, তাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে...?[২]

আর বর্ণনা ভিত্তিক বিষয়ে বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও সত্যতা। যেমন:

...পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৩]

২. দৃঢ় প্রত্যয় ও নিশ্চিত জ্ঞান যেখানে দাবি করা হয় সেখানে অনুমান ও ধারণা প্রত্যাখ্যান করা। এ কারণে আল কুরআন মুশরিকদের ইলাহ সম্পর্কের ধারণা ও অনুমান সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন:[৪]

অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।

মাসীহ [আ] কে শুলে চড়ানোর ব্যাপারে ইয়াহূদ ও নাসারাদের ধারণাসমূহকে কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছে এভাবে:

...এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিলনা। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।[৫]

রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন:

তোমরা অনুমান থেকে সাবধান হও। কারণ, অনুমান হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।

৩. যেখানে নিরপেক্ষতা, বাস্তবধর্মিতা প্রয়োজন এবং যেখানে বস্তুসমূহের প্রকৃতি ও সৃষ্টি জগতের নিয়ম-নীতির সাথে কাজ-কর্ম করতে হয় সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আবেগ ও কামনা-বাসনা প্রত্যাখ্যান করা- তার পরিণতি ও ফলাফল যাই হোক না কেন। কুরআন মুশরিকদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে:[৬]

---

১. সূরা আন-নামল-৬৪

২. সূরা আয-যুখরুফ-১৯

৩. সূরা আল-আহকাফ-৪

৪. সূরা আন-নাজম-২৮

৫ সূরা আন-নিসা'-১৫৭

৬. সূরা আন-নাজম-২৩

www.pathagar.com

...তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে...।
দাঊদ 'আলাইহিস সালাম-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন:[৭]
অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।
এমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের রাসূলে কারীমকে [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] লক্ষ্য করে বলছেন:[৮]
অত:পর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত আর কে?
৪. জড়ত্ব, অন্ধভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ এবং চিন্তা ক্ষেত্রে অন্যের লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। তা তারা হোক পিতা, পিতামহ বা পূর্ব পুরুষের কেউ, অথবা হোক ক্ষমতাধর নেতৃস্থানীয় কেউ, অথবা হোক আম জনতা ও সাধারণ মানুষ। যারা একথা বলতো:
"বরং আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যার ওপর পেয়েছি তার অনুসরণ করবো।"
আল-কুরআন অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল-কুরআন বলছে:[৯]
...এমন কি, তাদের পূর্ব পুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত ছিলনা, তা সত্ত্বেও?
অতীতের যে সকল জাতি-গোষ্ঠী তাদের নেতৃবৃন্দ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদের পরিণতির চিত্র তুলে ধরে তাদেরকে কঠোরভাবে ধিক্কার দিয়েছে। সেদিন তাদের এমন নিকৃষ্ট পরিণতির জন্য তারা যে একে অপরকে দোষারোপ করবে সে কথাও কুরআন বলে দিয়েছে। কুরআন বলছে:
...আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ [শাস্তি] রয়েছে, কিন্তু তোমরা জাননা।[১০]
সাধারণ মানুষ যদি কোন ভুলের ওপর থাকে, যেহেতু অসংখ্য মানুষ তার ওপর আছে, এই যুক্তিতে তা মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তেমনিভাবে যে মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্বাধীন ও নেতা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন তার অন্যের অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণের মনোবৃত্তিকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন তিনি বলেন:[১১]
তোমাদের কেউ সুবিধাবাদী হবেনা। যেমন, সে বলবে: আমি মানুষের সাথে আছি,

---

৭. সূরা সাদ-২৬
৮. সূরা আল-কাসাস-৫০
৯. সূরা আল-বাকারাহ-১৭০
১০. সূরা আল-আ'রাফ-৩৮
১১. তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাতি, হাদীছ-২০০৮

www.pathagar.com

তারা যদি ভালো করে, আমিও ভালো করবো, তারা খারাপ করলে, আমিও খারাপ করবো। বরং তোমরা নিজেদেরকে এ অবস্থানে সুদৃঢ় করবে যে, মানুষ ভালো করলে তোমরাও ভালো করবে, মানুষ খারাপ করলেও তোমরা যুলম করবে না।

এই নৈতিক ভূমিকা যা ব্যক্তির আচরণে দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে তা তার চিন্তার ক্ষেত্রেও একটা আদর্শের কথা ঘোষণা করে।

৫. গভীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ:

আর তা হবে আসমান ও যমীনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে। যেমন আল্লাহ্ বলেন:[১২]

তারা কি লক্ষ্য করেনা, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে...?

তেমনিভাবে তা হবে মানুষের নিজের সম্পর্কে। আল্লাহ্ বলেন:[১৩]

নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

তাছাড়া মানব জাতির ইতিহাস, তার উত্থান-পতন এবং মানব সমাজে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নিয়ম-রীতি সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:[১৪]

তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ব্যবস্থা গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম!

৬. নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

যেসব শিক্ষা চিন্তার প্রকাশ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সমাজের মাটিকে প্রস্তুত করে তার একটি হলো, শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁর সময়ে সমগ্র আরবে বিস্তৃত নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই নিরক্ষরতার কারণে তৎকালীন আরববাসীকে 'উম্মী' বলা হতো। আল কুরআনেও তাদেরকে উম্মী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে...।[১৫]

রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিজে ও তার এক বক্তব্যে এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে:[১৬]

আমরা একটি নিরক্ষর জাতি, আমরা লিখিনা, গণনা করি না।

তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই উম্মী নবী তাঁর উম্মী জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম 'কলম' এর মহাত্ম্য ও মর্যাদা ঘোষণা করেন, লেখার বিস্তার ঘটান এবং তাঁর অনুসারীদের নিরক্ষরতা দূর করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

---

১২. সূরা আল-আ'রাফ-১৮৫

১৩. সূরা আয-যারিয়াত-২০-২১

১৪. সূরা আলে 'ইমরান-১৩৭

১৫. সূরা আল-জুমু'আহ-২

১৬. বুখারী, কিতাবুস সাওম

www.pathagar.com

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তাঁর নিকট সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলি নাযিল হয় তাতে পড়া, কলম ও শিক্ষার কথা বলা হয়েছে:[১৭]

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক [জমাট রক্ত] হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

আল-কালাম নামে আল কুরআনের একিট পূর্ণ সূরাই নাযিল হয়েছে, যার সূচনাকে আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষুদ্র জিনিসটির কসম করে বলছেন:

নূন-শপথ কলমের এবং তারা যা লেখে তার।[১৮]

এই কসম দ্বারা বুঝা যায় কলম বস্তুটি অবয়বে ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি ও প্রভাব বিশাল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কিছু মুসলিমকে যখনই লেখা শেখানোর কোন সুযোগ পেয়েছেন, তা মোটেই হাতছাড়া করেননি। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো বদরের যুদ্ধবন্দী। এ যুদ্ধে কিছু কুরাইশ বন্দী লিখতে জানতো। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাদের মুক্তিপণ ঘোষণা করেন যে, তারা প্রত্যেকে দশজন করে মুসলিম সন্তানকে লেখা শেখাবে।

ইবন সা'দ 'আমির আশ-শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:[১৯]

বদরের দিন রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] প্রতিপক্ষের সত্তর [৭০] জন যোদ্ধাকে বন্দী করেন। তাদের সামর্থ অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে তারা মুক্তিলাভ করে। মক্কাবাসীরা লিখতো কিন্তু মাদীনাবাসীরা লিখতো না। যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ ছিল না, তাদের প্রত্যেকের নিকট মাদীনার দশজন করে তরুণকে সোপর্দ করা হলো। তারা তাদেরকে লেখা শেখালো। যখন তারা লেখায় দক্ষ হয়ে গেল, তখন তাই হলো তাদের মুক্তিপণ।

বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] অন্যতম কাতিবে ওহী যায়দ ইবন ছবিতকে [রা] লেখা শেখান এই কুরায়শ যুদ্ধবন্দীরা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এই লেখা শেখানোর পরিকল্পনা নামমাত্র ছিল না, বরং দক্ষতার এমন স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছিল যে তা ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে নিরক্ষর হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে আরেকটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো ধর্মের ভিন্নতা রাসূলুল্লাহ্‌কে [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মুশরিকদের নিকট থেকে তাদের একটি ভালো জিনিস গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এই লেখা শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও উৎসাহ দান কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, নারীদের ক্ষেত্রেও তা বিস্তৃত ছিল। তারই নির্দেশে শিফা বিনত আবদিল্লাহ্ উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনত 'উমারকে [রা] লেখা শেখান।[২০]

---

১৭. সূরা আল-'আলাক-১-৫

১৮. সূরা আল-কালাম-১-২

১৯. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত (বৈরূত), খ.১, পৃ.২২

২০. মুসনাদু আহমাদ, খ.১, পৃ.৩৭২; আবূ দাঊদ, কিতাবুত তিব্ব; নায়লুল আওতার, খ.৯, পৃ.১০৩

www.pathagar.com

পরিসংখ্যান বিদ্যার প্রয়োগ

রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] পরিসংখ্যান বিদ্যা নিজে প্রয়োগ করে সাহাবায়ে কিরামকে [রা] তা শেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আধুনিক যুগে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। নাবী করীম [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বেই এ পদ্ধতির সুবিধা কাজে লাগান। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান [রা] বলেন:

আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সংগে ছিলাম। তিনি বললেন: তোমরা আমাকে গণনা করে বল, কত মানুষ ইসলামের স্বীকৃতি দেয়।

সহীহ্ আল-বুখারীতে এসেছে: রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন:[২১]

জনগণের কতজন ইসলামের স্বীকৃতি দেয় তা আমাকে লিখে দাও। হুযায়ফা [রা] বলেন: আমরা তাঁকে লিখে দেই, একহাজার পাঁচশো জন পুরুষ।

এটা ছিল লিখিত পরিসংখ্যান। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিজের জনবল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে, এই জনবল নিয়ে শত্রুপক্ষের কতজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবেন। এ কারণে কেবল যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সেই সূচনা পর্বে যে পরিসংখ্যানবিদ্যা রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নির্দেশে প্রয়োগ করা হয় তা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইসলাম সকল প্রকার জ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ কাজে লাগানো কে স্বাগত জানায়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা

আদম শুমারী, পরিসংখ্যান যেমন জ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি তেমনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণও অধিকতর স্পষ্ট জ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি। এই পরিকল্পনা নির্ভর করে হিসাব ও পরিসংখ্যানের ওপর। ভবিষ্যৎ সম্ভবনা ধরে নিয়ে বর্তমানে সেই উপযোগী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করে কাজ করাই হলো পরিকল্পনা। অনেকে বিশ্বাস করেন এ ধরনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী কাজ। প্রাচীন কালে যারা জ্ঞানকে ঈমানের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে বলেছে, এ দু'টি হলো পরস্পর বিরোধী বিষয়। এ দু'টির সম্মিলিন সম্ভব নয়। উপারোক্ত বিশ্বাস মূলত এই চিন্তারই ফসল।

ধর্মীয় চিন্তা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর ভিত্তিশীল। একজন ধার্মিক মানুষ আজই আগামী কালের, অন্যকথায় জীবনকালে মৃত্যুর জন্য, ইহকালে পরকালের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সুতরাং চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এই পার্থিব জীবনে অবশ্যই তাকে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য কিছু রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আর সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি।

---

২১. আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.৪৭

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে যে অতীতের ঘটনাবলী ও কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা মূলত: বুদ্ধিমান মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য। সেই সকল কাহিনীর একটি হলো নবী ইউসুফ [আ]-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যার কাহিনী। এই কাহিনীতে আল-কুরআন পনেরো বছরের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছে। ইউসুফ [আ] স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আগামী কয়েক বছর দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদন কম হবে, ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তাই বর্তমানেই তা মুকাবেলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ও তার আশে-পাশের এলাকা সেই দুর্ভিক্ষ থেকে বেঁচে যায়। আল কুরআনে বর্ণিত সেই কাহিনীর কিছু এ রকম:[২২]

ইউসুফ বললো, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে, অত:পর তোমরা যে শস্য কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ব্যতীত সমস্ত শস্যসহ রেখে দেবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এ সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে, তা ব্যতীত। অত:পর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

কিছু লোক মনে করেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ভাবনা অথবা তাঁর তাকদীর ও ফয়সালার ওপর ঈমানের পরিপন্থী কাজ। এ কারণে তারা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চিন্তাকে ধর্মীয় দিক থেকে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করে। তবে সত্য এই যে, যারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] গভীরভাবে অধ্যায়ন করেছেন, তারা জানেন যে, পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত এলোমেলো ভাবে কোন কিছু করা ইসলাম প্রত্যাখান করে। যেখানে কোন নিয়ম-নীতি, সুব্যবস্থাপনা নেই তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কে নেই।

সত্যি কথা এই যে, যারা গভীরভাবে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] অধ্যায়ন করে তাদের নিকট এটা স্পষ্ট যে, যে কোন রকমের তাড়াহুড়ো করা, বিক্ষিপ্ত ও এলামেলো ভাবে কিছু করা এবং কোন রকম নিয়ম-রীতি ছাড়া কোন কিছু করা, কুরআন-সুন্নাহ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাওয়াক্কুল 'আলাল্লাহ [আল্লাহর ওপর নির্ভর করা] দ্বারা একথা বোঝান নি যে, সব রকম উপায় উপকরণ প্রয়োগ করা ত্যাগ করতে হবে এবং বিশ্বচরাচরের যে নিয়ম-রীতি আছে তা অস্বীকার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিকট এক বেদুঈন এসে তার বাহন উটটি মাসজিদের সামনে দাঁড় করিয়ে বলে: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার উটটি বেঁধে রেখে আল্লাহর ওপর তাওয়াককুল করবো না ছেড়ে দিয়ে তাওয়াককুল করবো? রাসূলাল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন; উটটিকে বেঁধে তাওয়াক্কুল করো।

---

২২. সূরা ইউসুফ : ৪৭-৪৯

www.pathagar.com

ইমাম আল-কুরতুবী [রহ] সেই সব লোকের মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা বলে পার্থিব জীবনে উপায় উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী কাজ। তিনি বলেন, প্রকৃত কথা হলো, যে আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে, আর এ বিশ্বাস করে যে, তার জীবনের সবকিছু পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে, তাহলে পার্থিব জীবনে উপায়-উপকরণ প্রয়োগে তার এ বিশ্বাসে কোন ক্ষতি করবে না। কারণ, তখন তার এ কাজ হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়ম-রীতির অনুসরণ। আমরা কি লক্ষ্য করিনা যে, রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] শত্রুর মোকাবেলায় শরীরে বর্ম পরেছেন, শত্রু বাহিনীকে ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য দু'পাহাড়ের মাঝখানের পথে তীরন্দায বাহিনী মোতায়েন করেছেন, মাদীনায় প্রবেশে বাঁধা দেওয়ার জন্য খন্দক খুঁড়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে [রা] হাবশায়, অত:পর মাদীনায় হিজরাতের অনুমতি দিয়েছেন, নিজে হিজরাত করেছেন, পানাহারের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, নিয়ম-রীতি অবলম্বন করেছেন, পরিবারের জন্য খাদ্য-খাবার ঘরে মজুদ রেখেছেন। মোটকথা, পার্থিব জীবনের কোন ব্যাপারে আসমান থেকে আসবে এ ভরসায় বসে থাকেননি। অথচ আসমানী সাহায্য লাভের সর্বাধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি তিনিই ছিলেন।[২৩]

রাসূলুল্লাহ্র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] জীবনী যে কেউ পাঠ করলে দেখতে পাবে, তিনি যে কোন ব্যাপারে সব রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সব ধরনের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছেন, সাথে সাথে বিপরীত মুখী সকল সম্ভাবনা মনে রেখে সতর্কতা গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মাক্কার কুরাইশদের যুলুম-অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁর সাহাবীদেরকে হাবশায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা বা চিন্তা কাজ করেনি একথা বলা যাবে না। বরং এর পশ্চাতে কাজ করে তৎকালীন হাবশার ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি। তিনি আরব উপ-দ্বীপের কোন দূরবর্তী অঞ্চলে তাদেরকে যে যেতে বলেননি, তার পেছনে কোন কৌশল ও পরিকল্পনা কাজ করেনি তাও বলা যাবে না। কারণ, কুরাইশদের যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল তাতে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব ছিল না। তেমনিভাবে রোম ও পারস্যের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলেও তাদেরকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হিকমত ও কৌশল হতে পারতো না। কারণ, তাদের পরিবেশ এই নতুন দীনের দাওয়াত মেনে নিত না। তিনি তাদেরকে চীন বা ভারতবর্ষের মত দূরবর্তী দেশেও যেতে বলেননি। কারণ, তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, যা তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারতো।

প্রকৃত কারণ হলো, হাবশাই ছিল ভৌগোলিক দিক দিয়ে হিজরাতের উপযুক্ত স্থান। দেশটি বহু দূরেও ছিল না, আবার অতি নিকটেও ছিল না। দেশটি ও কুরাইশদের

---

২৩. নায়লুল আওতার, খ.৯, পৃ.৯২

www.pathagar.com

মাঝখানে ছিল বিশাল সাগর। ধর্মীয় দিক দিয়েও ছিল উপযুক্ত। কারণ, দেশটির অধিবাসীরা ছিল খ্রীস্টান। তুলণামূলকভাবে তাদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও ছিল উপযুক্ত। দেশটির তৎকালীন শাসক ছিলেন একজন খ্যাতিমান ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন:

সেখানে একজন বাদশাহ আছে, আমি আশা করি তোমরা তার নিকট অত্যাচারিত হবে না।[২৪]

আমাদের এ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের চারিপাশের বিশ্ব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এবং অজ্ঞ ছিলেন না। তেমনিভাবে তাঁরা তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি, পারসিক ও রোমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কেও উদাসীন ছিলেন না। তাদের সেই দ্বন্দ্বে আরবের মুসলিম ও মুশরিকরাও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে সূরা রূম-এর সূচনাতে নাযিল হয়েছে এভাবে:[২৫]

রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে।

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মাদীনায় হিজরাতের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, তিনি সে ক্ষেত্রে জ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা ও ঈমানী তাওয়াক্কুলের সমন্বয় সাধন করেছেন। দু'টিকেই পাশাপাশি রেখেছেন। এই ঐতিহাসিক সফরের জন্য একজন মানুষের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, প্রয়োজনীয় বস্তুগত সামগ্রী ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তারপর তিনি 'মাহজার' অর্থাৎ যেখানে হিজরাত করবেন, সে স্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের কিছু মানুষ 'আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় রায়'আতে অংশগ্রহণ করার পর। তিনি সেই দু'টি বায়'আতে তাদের নিকট থেকে নিজেদের সার্বিক নিরাপত্তার অঙ্গীকারও গ্রহণ করেন। তারপর তিনি নিজের সহচরদের মধ্য থেকে সর্বাধিক আস্থাভাজন আবু বাকরকে [রা] সফরসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। তেমনিভাবে বেছে নেন নিজের প্রতি উৎসর্গ প্রাণ ও একান্ত বিশ্বাসভাজন 'আলীকে [রা] নিজের বিছানায় রাত্রিযাপন করে শত্রুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। তিনি মক্কা-মাদীনার তৎকালীন পথ বিশেষজ্ঞেরও সহায়তা নেন। তিনি হলেন একজন পৌত্তলিক 'আবদুল্লাহ্ ইবন উরায়কাত। রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এ কর্মের দ্বারা ফকীহ্গণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আস্থাভাজন ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হলে যে কোন বিষয়ে অমুসলিম বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ করা সঙ্গত হবে।

---

২৪. আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.৫০

২৫. সূরা আর-রূম : ২-৩

www.pathagar.com

তারপর তাঁরা পরিকল্পনা করেন কোথা থেকে কখন কিভাবে যাত্রা শুরু করবেন, কোন পথে যাবেন, শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কোথায় কোন গোপন আশ্রয়ে থাকবেন, সেখানে কারা কিভাবে খাদ্য-খাবার পৌঁছাবেন। এই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মাদীনার বহুল ব্যবহৃত পথ ছেড়ে অখ্যাত-অজ্ঞাত পথে যাত্রা করে 'ছুর' পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেন। তেমনিভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী আসমা', 'আবদুল্লাহ ইবন আবীবাকর ও আবু বাকরের দাস 'আমির ইবন ফুহায়রা [রা] তাঁদেরকে ছাগল চরানোর উসিলায় দুধ পান করানোর দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁর হিজরাতের পরিকল্পনায় কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর রাখেননি। যাঁকে যেখানে এবং যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

এত কিছু সত্ত্বেও পরিকল্পনায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। পৌত্তলিকরা 'ছুর' পর্বতের গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাদের কেউ নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকালেই গুহার মধ্যে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ও সঙ্গী আবু বাকরকে [রা] দেখতে পেত। আবু বাকর [রা] ভীত-সংকিত হয়ে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম]!

তাদের একজনও যদি তার পায়ের পাতার দিকে তাকায় তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।

রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] প্রত্যয়দীপ্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন:

...তুমি দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন...।[২৬]

এখানেই রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাওয়াক্কুলের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আর তাহলো একজন মানুষ তার শক্তি ও সাধ্যের মধ্যে যা কিছু আছে তা ব্যয় করবে, যতরকম উপায়-উকরণ ও মাধ্যম আছে তা ব্যবহার করবে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা সহকারে অগ্রসর হবে এবং যা তার সাধ্যের বাইরে তা ত্যাগ করে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। কেবল তখনই [নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন] বাণীটি ফলপ্রসূ হবে।

জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা

জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্ব -স্ব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ জ্ঞান ও বুদ্ধি দাবি করে, আল কুরআনও আমাদেরকে সে কথা শেখায়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

...তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস কর।[২৭]

...মহাবিজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারবে না।[২৮]

...তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর।[২৯]

---

২৬. সূরা আত-তাওবা-৪০

২৭. সূরা আল-ফুরকান-৫৯

২৮. সূরা আল-ফাতির-১৪

www.pathagar.com

সুতরাং যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়সমূহে সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া উচিত। তেমনিভাবে অর্থনৈতিক বিষয়ে অর্থনীতিবিদ্, শিল্প বিষয়ে প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হবে। বদরে রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ও মুসলিমগণ কুরাইশদের মুখোমুখী হন। কুরাইশরা উপত্যাকার শেষ প্রান্তে শিবির স্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বদরের পানির কূপ থেকে দূরবর্তী মাদীনার দিকের প্রান্তে অবস্থান নেন। তাতে কুরাইশরা কূপের পানির ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারতো। এ পর্যায়ে সাহাবী আল-হাব্বাব ইবন আল-মুনযির আল-আনসারী [রা] রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিকট এসে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন:

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই স্থানে কি আল্লাহ আপনাকে অবতরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যা অতিক্রম করার এবং যেখান থেকে পেছনে থাকার অধিকার আমাদের নেই? নাকি এটা আপনার নিজের সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ কৌশল ও শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া?

রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন:

না, এ আল্লাহর নির্দেশ নয়, বরং আমার নিজের সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ কৌশল ও শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া।

হাব্বাব ইবন আল-মুনযির [রা] বললেন:[৩০]

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা শিবির স্থাপনের উপযুক্ত কোন স্থান নয়। আপনি লোকদের নিয়ে সম্প্রদায়ের পানির কাছাকাছি চলুন, আমরা সেখানে অবতরণ করবো। তারপর কূপের পেছনে শিবির স্থাপন করবো। সেখানে একটি হাউজ বানিয়ে পানি দিয়ে ভরে ফেলবো। আমরা সেই পানি পান করবো, আর তারা পান করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন: তুমি একটা চমৎকার কথা বলেছো!

বুদ্ধিদীপ্ত হাব্বাব [রা] প্রথমে রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিকট জানতে চান, তিনি যেখানে অবস্থান নিয়েছেন তাকি আল্লাহর নির্দেশ? যদি তাই হয় তাহলে তো তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে। আর যদি সেই স্থানটি রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিজে একজন সেনাপতি ও সামরিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সে ক্ষেত্রে হাব্বাব [রা] নিজের একটি ভিন্ন মত উপস্থাপন করবেন। কারণ, তিনি উক্ত অঞ্চলের একজন বাসিন্দা হিসেবে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁর মতটি শোনেন এবং সানন্দে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তা গ্রহণ ও সেই মোতাবেক কাজ করেন। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] হাব্বাবের [রা] মতটি স্বাগত জানান যে ভাষায় তা একটু লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি বলেন: "তুমি একটি কথার মত

---

২৯. সূরা আন-নাহল-৪৩

৩০. সীরাতু ইবন হিশাম, খ.২, পৃ.২৭২; আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহারা, খ.১, পৃ.৪২৭

www.pathagar.com

কথা বলেছো, অথবা তুমি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছো।"
এ বছর যুদ্ধে সা'দ ইবন মু'আয [রা] রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] জন্য একটি মঞ্চ তৈরির পরামর্শ দেন, সেখান থেকে তিনি সৈনিকদের সার্বিক কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে দিক নির্দেশনা দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এই পরামর্শের জন্য সা'দকে ধন্যবাদ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেন।
আহযাব যুদ্ধের সময় সাহাবী সালমান আল-ফারেসী [রা] রাসূলুল্লাহ্‌কে [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] খন্দক খননের পরামর্শ দেন। তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করেন। মক্কার পৌত্তলিক যোদ্ধারা ঘোড়া দাবড়িয়ে খন্দকের পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে:[৩১]
আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এ এমন এক কৌশল যা আরবরা কখনো অবলম্বন করেনি।
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিমরা পারস্য, রোম অথবা অন্য যে কোন জাতির যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করে শত্রুকে পরাভূত করবে। শুধু যুদ্ধ নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি ও কল্যাণের জন্য বিজাতীয় যে কোন উপায়-উপকরণ প্রয়োগ ও কৌশল অবলম্বন করবে। মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিধি-বিধান নেই। বিধি-বিধান আছে তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

উপকারী ও কল্যাণকর সকল প্রকার বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি উৎসাহদান

ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর, এমন সকল বিদ্যা শিক্ষার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁর উম্মাতকে উৎসাহিত করেছেন। সে বিদ্যা মুসলিম-অমুসলিম যাদের কাছেই থাকুক না কেন, অর্জনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] একটি বিখ্যাত বাণী উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন:[৩২]
বিজ্ঞতাপূর্ণ কথা মু'মিনের হারানো বস্তু। যেখানেই সে তা কুড়িয়ে পাবে, সেই হবে অধিকতর হকদার।
একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে তিনি বিষয়টি তুলে ধরেছেন। জ্ঞানকে তিনি মু'মিনের হারানো বস্তুর সাথে তুলনা করেছেন। হারানো বস্তুটি যেখানেই খুঁজে পাওয়া যাক না কেন, প্রকৃত মালিক তার অধিকতর হকদার হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মু'মিন ব্যক্তি মুসলিম-অমুসলিম যেখানেই জ্ঞানের সন্ধান পাক সেখান থেকে তা আহরণ করবে। জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক এর চেয়ে উত্তম বাণী আর হতে পারে না।
কল্যাণকর জ্ঞান যেখানেই পাওয়া যাক তা অর্জন করতে হবে, একথা তিনি কেবল মুখে বলেই শেষ করেননি, বরং বাস্তবে তা করে উম্মাতকে দেখিয়ে দিয়েছেন। বদর যুদ্ধে

---

৩১. সীরাতু ইবন হিশাম, খ.১, পৃ.২৩৫
৩২. তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-২৬৮৮; ইবন মাজাহ্, বাবুয যুহ্দ, হাদীছ-৪১৬৯

www.pathagar.com

মুসলিমদের হাতে কুরাইশ বন্দীদের যারা লেখাপড়া জানতো তাদের মুক্তিপণ ধার্য করেন, প্রত্যেকে দশজন করে মুসলিম শিশু-কিশোরকে লেখা শেখাবে। এভাবে তিনি বিপুল সংখ্যক মুসলিম শিশু-কিশোরকে শিক্ষিত করে তোলেন। এ প্রসঙ্গে 'আলীর [রা] একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন:[৩৩]

জ্ঞান হলো মু'মিনের হারানো বস্তু। সুতরাং মুশরিকদের নিকট থেকেই হোক না কেন, তোমরা তা গ্রহণ কর।

নিরেট বস্তুগত জ্ঞানও অমুসলিমদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই, যদি তা যাদের বা যার নিকট থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে তাদের বা তার চিন্তা-বিশ্বাসের প্রতিফলন না ঘটায়। কারণ, বিশ্বচরাচরের সকল প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির বাধ্যতা মু'মিন-কাফির এবং সত্যনিষ্ঠ ও পাপী সকলে সমানভাবে মেনে নেয়। এ কারণে অতীতে মুসলিমগণ জাগতিক সকল জ্ঞান, যেমন চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রীক, পারসিক, রোমান, ভারতীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী জাতিসমূহের নিকট থেকে গ্রহণ করতে কোন রকম কুণ্ঠাবোধ করেনি। তবে দীন, মূল্যবোধ ও আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞান যা আল্লাহ, প্রকৃতি, মানুষ, ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ে ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক সে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেয়নি। কারণ, তাতে মানুষের জন্য কোন কল্যাণ নেই। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের [রা] হাতে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের কপি দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন। কারণ, তাওরাত মানুষের হাতে পরিবর্তীত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল, আল্লাহর কালামের সাথে মানুষের কথা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তা আর সন্দেহ সংশয়ের উর্দ্ধে ছিল না। আর দীনের উৎস তো কেবল সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত ঐশীগ্রন্থ। আর তা কেবল আল কুরআন।

ইমাম আহমাদ জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন:[৩৪]

আহলি কিতাবের এক ব্যক্তির নিকট থেকে পাওয়া একখানা কিতাব হাতে নিয়ে 'উমার ইবন আল-খাত্তাব [রা] নবীর [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিকট আসেন। নবী [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তা দেখে রেগে যান এবং বলেন: খাত্তাবের ছেলে! তোমরা কি তোমাদের আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত? [যে জন্য তোমাদের নবী ও কিতাবের বাইরে অন্যদের নবী ও কিতাব থেকে জ্ঞান নিতে চাও।] যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, আমি তা তোমাদেরকে নির্ভেজাল ও পরিচ্ছন্নভাবে দান করেছি। তোমরা তাদের নিকট কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না। [জিজ্ঞেস করলে] তারা হয়তো তোমাদেরকে সত্য তথ্য দেবে, আর তোমরা তা মিথ্যা বলে অস্বীকার করবে, অথবা মিথ্যা তথ্য দেবে, আর তোমরা তা সত্য বলে মেনে নেবে।

---

৩৩. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম, খ.১, পৃ. ১২১

৩৪. আহমাদ 'আবদুর রহমান আল বান্না, তারতীবুল মুসনাদ, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ-৬২

www.pathagar.com

যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! এখন যদি মূসাও জীবিত থাকতেন তাহলে আমার আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত তাঁরও কোন উপায় থাকতো না।

'উমারের [রা] হাতে তাওরাত দেখে রাগে, উত্তেজনায় রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। অত্যন্ত শক্তভাবে তিনি তার এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তা ছিল একটি দীনের বিষয়। আর দীনের কোন কিছু একমাত্র সত্য-সঠিক উৎস ছাড়া অন্য কোথাও থেকে গ্রহণ করা যায় না। তবে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যা মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল তা মানবজাতির যৌথ সম্পদ। তা যে কোন স্থান, যে কোন পাত্র থেকে গ্রহণ করা যাবে। হোক না জ্ঞান প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের, হোক না তা মুসলিমের বা মুশরিকের। আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] জীবন থেকে এ শিক্ষা পেয়ে থাকি। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বদরের পৌত্তলিক বন্দীদের জ্ঞানের সাহায্য নেন, তিনি পারস্যের যুদ্ধকৌশল কাজে লাগিয়ে মাদীনার চারপাশে খন্দক খনন করেন, তায়িফ অবরোধে 'মানজিনীক' [ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ, যা দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করা হতো] ব্যবহার করেন, মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দান করেন, যার নির্মাতা ছিলেন একজন রোমান কাঠমিস্ত্রী। খুলাফায়ে রাশিদীনকেও আমরা উম্মাতের কল্যাণে এমনসব উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখি যার সাথে আরববাসীর পূর্বে পরিচয় ছিলনা। তারা তা অনারবদের নিকট থেকে মানুষের কল্যাণ চিন্তায় গ্রহণ করেন। যেমন 'উমার [রা] তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীর প্রস্তাব ও পরামর্শক্রমে ইতিহাস লেখার চিন্তা ও দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক গবেষক তো মত প্রকাশ করেছেন যে, লেখা ও দিওয়ানের সূচনা হয় খোদ রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সময়ে। যেমন হিজরাতের পরে রাসূলুল্লাহ্‌ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নির্দেশ দেন লিখিতভাবে আদম শুমারী করার জন্য।[৩৫]

ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন

রাসূলুল্লাহ্‌ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] উম্মাতকে স্বচ্ছ-সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং সব ধরনের ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলে কঠোরভাবে আঘাত করেছেন। তৎকালীন জাহিলী সমাজে এবং অতীতের বহু বিকৃত ঐশীধর্মে যা শক্তভাবে শিকড় গেঁড়ে বসেছিল। ধর্মের লেবাসধারী বহু মানুষ সেই সকল কুসংস্কারকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড বলে প্রচার করেছে। আর সাধারণ মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে তাদের আনুগত্য করেছে। যেমন গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর এবং জ্যোতির্বিদ্যার দাবিদার লোকেরা এই শ্রেণীর অর্ন্তগত। তারা বিশ্বাস করতো, তারা সৃষ্টিজগতের স্বাভাবিক নিয়ম-রীতি ভঙ্গ করতে, অদৃশ্যের প্রাচীর ভেঙ্গে তা অবগত হতে এবং মানুষের মনের কথা জানতে সক্ষম। এ ভাবে তারা মানব সমাজে প্রতারণাপূর্ণ বাজার বসিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিতে থাকে।

---

৩৫. আল-কাত্তানী, নিজামুল হুকূমাহ্‌, খ.১, পৃ.২২৭-২২৮

www.pathagar.com

ইসলামের অভ্যুদয় হলো এবং মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক বাজারের মূলে শক্তভাবে আঘাত করে বন্ধ ঘোষণা করলো। এর ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ীদের প্রতারণার সকল জারিজুরি ফাঁস করে দিল, তাদের সকল পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। সাথে সাথে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করলো যে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহর নিয়ম কেউ ভঙ্গ করতে পারে না, অদৃশ্যের জ্ঞান এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই এবং সকল কল্যাণ কেবল আল্লাহর নিয়ম-রীতিসমূহ শ্রদ্ধাভরে মেনে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত।

ইমাম বুখারী [রহ] মুগীরা ইবন শু'বার [রা] সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। মুগীরা [রা] বলেনঃ ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হলো। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ছেলে এবং মারিয়া আল-কিবতিয়্যার [রা] গর্ভজাত। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ঘোষণা করলেনঃ

সূর্য ও চন্দ্র হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যকার দুটি নিদর্শন। না কারো মৃত্যুর জন্য তাদের গ্রহণ হয়, আর না জীবনের জন্য।

জাহিলী যুগে মানুষের মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল যে, কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু অথবা এজাতীয় কোন কিছুর কারণে সূর্য অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হয়। রাসূলুল্লাহ্‌র [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এই ঘোষণা তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে সমূলে উৎপাটিত করে এবং সাথে সাথে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করে দেয় যে, চন্দ্র-সূর্য হলো আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির মত দু'টি সৃষ্টি এবং তারা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম-রীতি অনুযায়ী আবর্তিত হয়। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এরূপ ভাব ও অর্থের বহু হাদীছ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি হাদীছ বা এর অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হলোঃ

রাসূলুল্লাহ্‌ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেনঃ

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম [রা] বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কি কি? বললেনঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু...। –আল হাদীছ।

যে ব্যক্তি একটি গিরা দিল, তারপর তাতে ফুঁক দিল, মূলত সে যাদু করলো। আর যে যাদু করে, সে শিরক করে। যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝোলালো, মূলত সে তার ওপর নির্ভর করলো।[৩৬]

অর্থাৎ কেউ যদি নিজ দেহে তাবিজ-কবচ-মাদুলী বা এজাতীয় কোন কিছু এই বিশ্বাসে ঝোলায় যে, তা তাকে কুদৃষ্টি অথবা রোগ-ব্যধি থেকে রক্ষা করবে, তাহলে তার ওপরই সে নির্ভর করেছে বলে গণ্য হবে।

যে শুভ-অশুভ নির্ণয়ের জন্য পাখি ওড়ায় অথবা যার জন্য ওড়ানো হয়, অথবা যে ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা যার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, অথবা যে যাদু করে অথবা যার

---

৩৬. নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, হাদীছ-৪০৭৯

www.pathagar.com

জন্য যাদু করা হয়, তাদের কেউই আমার দলভুক্ত নয়। আর যে কাহিন তথা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তাহলে সে মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর ওপর যা নাযিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করলো।[৩৭]
যে গণক অথবা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে তাহলে সে মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর ওপর যা নাযিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করলো।[৩৮]
যে গণকের নিকট যায়, তার নিকট কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না।[৩৯]
এ ধরনের আরো বহু সহীহ্ হাদীছ, হাদীছের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।
উল্লেখ্য যে, 'কাহিন' হলো সেই ভবিষ্যদ্বক্তা যে কিছু গোপন বিষয়ে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথা বলতো, যার কিছু সত্য হতো, আর কিছু হতো মিথ্যা। সে একথা দাবি করতো যে, তার অনুগত জিন আছে, তাকে সে গোপন কথা বলে যায়। যেমন হাদীছে এসেছে:[৪০]
যে ব্যক্তি তারকারাজি থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করলো, সে মূলত যাদুর একটি শাখা অর্জন করলো। তারপর যা বৃদ্ধি করার তা করলো।
তবে জ্যোতির্বিদ্যা ও এই জ্ঞান ভিন্ন। শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করা দোষের কিছু নয়। কারণ এ বিদ্যার ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিয়াস-অনুমান এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার। অতীতে মুসলিম মনীষীরা এ বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করে বিশেষ অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগে এ বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা ও গবেষণা হচ্ছে। যার ফলে মানুষ চাঁদে পৌঁছাতে পেরেছে। এই বিদ্যার মধ্যে দীনের সাথে সাংঘর্ষিক এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভাবের পরিপন্থী কোন কিছু নেই।
মোটকথা রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম] জ্ঞান অর্জনের প্রতি মানুষকে যেমন উৎসাহিত করেছেন, ঠিক তার পাশাপাশি-জ্ঞানের নামে কু-সংস্কার, প্রতারণা, ইন্দ্রজাল ইত্যাদিরও মূলোৎপাটন করেছেন। ■

---

৩৭. আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ.৫৯
৩৮. ইবন মাজাহ্, কিতাবুত তাহারাহ্, হাদীছ-৬৩৯; আবূ দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীছ-৩৯০৪; তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাহ্, হাদীছ-১৩৫
৩৯. মুসলিম, বাবুস সালাম, হাদীছ-২২৩০
৪০. আবূ দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীছ-৩৯০৫; ইবন মাজাহ্, কিতাবুল আদাব, হাদীছ-৩৭২৬; মুসনাদু আহমাদ, খ.১, পৃ.৩১১

www.pathagar.com

রাসূল [সা]-এর শিক্ষানীতি

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

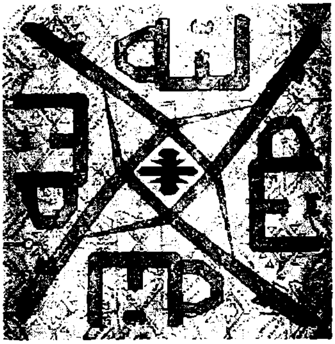

আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রথম বাণীটিই ছিল– "ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক। "পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" পড় দিয়েই শুরু হয়েছে সর্বকালের সেরা মানুষ আমাদের প্রিয় নবী মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ [সা] এর মিশনের যাত্রা। আল্লাহ্ তায়ালা আদম থেকে শুরু করে সকল নবী এবং রাসূলদের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করেই তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্ বলেন : 'হে নবী! আপনাকে আমি এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি যা আপনিও জানতেন না এবং আপনার পূর্বপুরুষও জানতো না।' [৬:৯২] আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানদক্ষতায় রাসূল [সা] এতই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে, শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষকরূপে তার আবির্ভাব হয়েছিল। সেজন্য রাসূল [সা] নিজেও এ পৃথিবীতে রাষ্ট্র প্রধান, সেনাপতি কোন নামেই নিজের পরিচয় তুলে ধরেননি। বরং তিনি নিজিকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেছেন। রাসূল [সা] বলেন : 'বুয়েস্তু মোয়াল্লেমান' 'আমি মানবতার জন্য শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।' আল্লাহ্পাক রাসূল কারীম [সা]-এর পরিচয় দেন এভাবে : "তিনি [আল্লাহ্] যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য হতে তাদেরই একজনকে নবী হিসেবে উন্নীত করেছেন

www.pathagar.com

যিনি নবী-[সা] তাদের কাছে আবৃত্তি বা পাঠ করেন তার [আল্লাহ] নিদর্শনসমূহ, তাদের পূত-পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও জ্ঞান; যদিও তারা পূর্বে মিথ্যা বিশ্বাসের অনুসারী ছিল।" [৬২:২]

হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন উম্মী। মানব রচিত কিতাব বা গ্রন্থজ্ঞান তিনি আহরণ করেন নি। মানব রচিত গ্রন্থের শিক্ষা অর্জন না করার ফলে তিনি কোন লেখক বা গ্রন্থকারের মতবাদ দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া থেকে ছিলেন পাক ও পবিত্র। কারণ গোটা বিশ্বের তথা বিশ্বমানবজাতির যিনি শিক্ষক, তিনি কি করে কোন মানুষ বিশেষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন? তাহলে বিশ্বকে সর্বজনীন শিক্ষা দেবে কে ? আর এ কারণেই আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রাসূল [সা]-এর শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করেছেন। রাসূল [সা] শিক্ষকসুলভ আচরণের মাধ্যমে আরবদের মাঝে লুক্কায়িত সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার কর্মসূচিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানবকুলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে জ্ঞানকেই আখ্যায়িত করলেন। আল্লাহ্ বলেন : "কুল, রাব্বী জ্বিদ্‌নী ইলমা", বল, হে রব আমার, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।"

কুরআনের বাণী: 'যাকে জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহাকল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে।' [২:২৬৯] 'যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে আর যে জ্ঞান রাখে না তারা উভয় কি সমান হতে পারে?' [সূরা জুমার : ৯] রাসূল [সা]-এর হাদিসেও আমরা দেখতে পাই জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ হিসেবে বিবেচ্য। তিনি জ্ঞানান্বেষণে যুক্ত হতে এত বেশি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন যে তাঁর বাণী শিক্ষাদর্শনের কালোত্তীর্ণ উপমারূপে গণ্য হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন : 'রাতের কিছু সময় জ্ঞানের অনুশীলন করা সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।' এভাবেই তিনি নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গঠন, শিক্ষা ও জ্ঞানদক্ষতার উন্নয়নের ধারণা গোটা মানব জাতির সামনে তুলে ধরে শিক্ষার মৌলিকনীতিমালা পেশ করেন।

মূলত রাসূল [সা] এর শিক্ষানীতিতে গোটা মানব জাতির পাঠক্রম হচ্ছে আল-কুরআন এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যসূচী বা Syllabus হচ্ছে রাসূলের জীবন ও কর্ম-পদ্ধতি। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা এই মহান শিক্ষকের জন্য উপহার স্বরূপ প্রদান করেন মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। আল্লাহ্ তায়লা মানব জাতিকে কোন একাডেমিক শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল [সা] কে এ পৃথিবীতে পাঠাননি। একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, শিক্ষার জন্ম ও এর সার্বিক প্রসারে একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কোন মতবাদ বা ধর্মে অনুরূপ কোন ধারণাই ছিল না। বরং শিক্ষা সংক্রান্ত সব মতবাদ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষা হতেই প্রণীত। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে রাসূল [সা] শিক্ষার ক্ষেত্রে যে তিন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন হাদিসের পরিভাষায় যাকে কাওলী, ফেয়লী, ও তাকরীরী বলা হয়, আজকের আধুনিক পৃথিবী সেই শিক্ষা পদ্ধতিই অনুসরণ করেই চলছে।

জাহিলিয়াতের যুগে কাবা শরীফই ছিল শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। অধ্যাপক

www.pathagar.com

পি. কে. হিট্টির কথায় : "The fair of Ukaz stood in pre-Islamic days for a kind of academic franchise of Arabia."

অনেকের মতে রাসূল [সা] তাঁর নবুয়্যতের অতি শৈশব অবস্থায় মক্কা নগরীতে ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে 'দারুল আরকাম' নামেও একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটিই ইতিহাসের সর্বপ্রথম শিক্ষালয়। আজকের বেসরকারী উদ্যোগের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধারণা আধুনিক পৃথিবী এখান থেকেই লাভ করেছ। এ স্থানে তিনি তাঁর নবদীক্ষিত শিষ্যদেরেকে গোপনে নামায ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। পরে তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করে 'কুব্বা' নামক স্থানে সর্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র মসজিদ স্বহস্তে স্থাপন করেন ও পরে তিনি মদীনায় মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূল [সা] আসরের নামাযের পরেই অধিকাংশ সময় মসজিদে শিক্ষাদানে ব্রত থাকতেন। লক্ষ্যণীয়, নারীদের মধ্যে শিক্ষা দান ও প্রচারের জন্য তিনি সপ্তাহের একটি দিনও ধার্য করে রেখেছিলেন। সে দিনটিতে মহিলাগণ নির্ধারিত কক্ষে জমায়েত হয়ে আল-কুরআনের অমিয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহর [সা] সহধর্মীনী ও সিদ্দিক নন্দিনী হযরত আয়েশা [রা] সহ অনেকেই নারী শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নারীর ব্যক্তিসত্তার পরিচর্যা, আত্মিক উন্নয়ন ও নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য নবী [সা] পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও তিনি জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দিতেন। হযরত আনাস [রা] হতে বর্ণিত আছে যে, ২রা হিজরীতে [৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে] মাকরামাহ ইবনে নাওফেল নামক জনৈক আনসারের গৃহে 'দারুল কারবাহ' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল আবাসিক ধরনের। সাহাবীগণ তাঁর গৃহে থেকে জ্ঞানার্জন করতেন।

এভাবে মদিনার আবু উসামা বিন যুবায়ের [রা] বাড়িতে একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের [রা] কে রাসূল [সা] এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। আর এটিই মদিনায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম শিক্ষালয় । মদিনায় দ্বিতীয় শিক্ষালয়টি হচ্ছে হযরত আবু আইউব আনসারী [রা] এর ব্যক্তিগত বাসভবন। আনসারীর [রা] এই ভবনে রাসূল [সা] দীর্ঘ আট মাস শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেন। শিক্ষার আলো মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে রাসূল [সা] আলোকিত মানুষকে নিয়ে আলোকিত সমাজ গড়ার দৃপ্ত শপথ নেন। সাহাবীগণ কুরআন শরীফের আয়াত মুখস্ত করার জন্য তিনি তিনবার আবৃত্তি করতেন। আল-কুরআন শিক্ষা করা ছাড়াও সাহাবীগণ ধর্মীয় বিধান [rituals], কারুময় হস্তলিপি [calliography], বংশ ইতিহাস [geneology], ঘোড়দৌড়, বিদেশী ভাষা ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করতেন। একযোগে দীন ও দুনিয়ার শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ও প্রয়োগ আল্লাহর রাসূল [সা] প্রচলিত করেন। রাসূল করীম [সা]-এর জীবদ্দশায় ৯টি মসজিদ মদীনায় ছিল। এসব মসজিদে মদীনা ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য সমবেত হতো। আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির মত তখন ভর্তি পরীক্ষা ও বেতনের দ্বারা শিক্ষার দ্বার সংকুচিত ছিল না। মসজিদ ছিল তখন একটি উন্মুক্ত বিদ্যালয়, যা হতে বর্তমান বিশ্ব Open University- এবং আবাসিক

www.pathagar.com

হলের ধারণা লাভ করেছে। শিক্ষাদানের বহু প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী সাহাবী তখন ছিলেন শিক্ষকতায় নিবেদিত। তাঁদেরকে ঘিরে রাখতেন ছাত্রগণ মৌমাছির মত।

দূরবর্তী মেধাবী শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উন্নত পাঠদানে পারদর্শী হতেন এদের থেকে নির্বাচন করে গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন এলাকার শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রেরণ করতেন। হিজরী ১১ সনে হযরত মুআয বিন জাবাল [রা] কে ইয়ামেনের গভর্ণর করে পাঠান। সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র পরিদর্শন করা এবং বিভিন্ন অঙ্গনের শিক্ষাবিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধানের নিমিত্তে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবী ছিলেন।

সারা বিশ্বব্যপি একটি নিরক্ষরতা মুক্ত সমাজ গঠনে রাসূল [সা]-এর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। রাসূল [সা] পত্র সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে নবধারা সৃষ্টি করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় আজ বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার আইডিয়া লাভ করেছে। পত্রের মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের একটি উল্লেখযোগ্য হাদীস হচ্ছে- 'নবী [সা] সিরিয়ার সেনাপ্রধানের হাতে পত্র দিয়ে বললেন, তুমি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পূর্বে এ পত্রটি পড়বে না। তোমার বাহিনীর জন্য এ পত্রে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে সেনাপ্রধান পত্রটি খুললেন'। [বুখারী, পৃ. ১৫] তৎকালীন পারস্য সম্রাট পারভেজ বিন হুরমুয বিন নৌশিরাওয়াঁর কাছে আল্লাহর একাত্ববাদে বিশ্বাস ও সত্য জ্ঞান উপলব্ধি করার আহ্বান জানানো হয়। হাদীসে এসেছে :'রাসূল [সা] এক ব্যক্তির হাতে পত্র দিয়ে বললেন, সে যেন পত্রটি পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত বাহরাইনের গভর্ণরের কাছে পৌছে দেয়। তিনি তার কথামত পত্রটি তার হাতে পৌছে দেন'। [বুখারী, পৃ. ১৫] এভাবে পত্রালাপ বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে রাসূল [সা] শিক্ষার আলো বিস্তারে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

ঐতিহাসিক খোদা বকশ 'Islamic Civilization' গ্রন্থে মসজিদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করেন নিম্নভাবে : "For the Muslims the mosque does not bear the same exclusive character as does a church for the hristians. It is not merely a place of worship. The Muslim indeed honours the mosque but he does not hesitate to use it for any laudab purpose". রাসূল [সা] কর্তৃক বিদ্যাপীঠ হিসেবে মসজিদের এই সর্বজনীন প্রশংসনীয় ব্যবহারই উত্তরকালে শিক্ষার গণমুখী প্রসার ও সম্প্রসারণে অতি ব্যাপক ও গভীর ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিক ইয়াকুবের মতে বাগদাতে ৩০ হাজার মসজিদ শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হতো; বড় বড় মসজিদগুলোতে পাঠ্য তালিকা ভাগ করা ছির। শিক্ষকগণ সে পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী বিশেষ পাঠ্যসূচির ওপর বক্তৃতা দিতেন। পরিব্রাজক নাসির খসরুর মতে [একাদশ শতাব্দীতে] মিসরের রাজধানী কায়রোর মসজিদে প্রত্যয় প্রায় ৫ হাজার লোক দীন ইলম হাসিল করার জন্য সমবেত হতো। সাম্প্রতিককালের মিসরের 'জামে আযহার', দিল্লীর 'জামেয়া মিল্লিয়া' এবং 'দেওবন্দ মাদ্রাসা' মসজিদভিত্তিক শিক্ষারই উত্তর ফসল।

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী 'পয়গামে মুহাম্মদী'তে বলেন, "নবুয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

সর্বশেষ শিক্ষায়তনটিতে একই সময়ে এক লক্ষেরও বেশি ছাত্র দেখতে পারেন। তাঁর [রাসূল সা] প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম, পরিচয়, অবস্থা, জীবনচরিত, শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলাফল, প্রত্যেকটি বিষয় ইসলামের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।" আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা-বিজ্ঞানের পরিভাষায় : Follow up study" বা "Cumulative Record"-ও ছাত্রদের জীবন বৃত্তান্ত ততটুকু রাখতে সক্ষম হয়নি, যতটুকু আল্লাহর রাসূল [সা]-এর ছাত্রদের "ইতিহাস বৃত্তান্ত" বর্তমানে সংরক্ষিত হয়ে আছে। হযরত উমর [রা] হতে হযরত বিলাল [রা] পর্যন্ত খলীফা, ক্রীতদাস, আরব, অনারব, প্রতিপত্তিশালী, নিরীহ, সবাই এক কাতারে সমমর্যাদার আল্লাহর রাসূলের [সা] নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভের সমান সুযোগ ও মর্যাদা পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর শিক্ষায়তনে সর্বজনীনতার এ দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বর্ণ ও আকৃতি, দেশ ও রাষ্ট্র, জাতি ও বংশ এবং ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমার কোন প্রাচীরই ছিল না, বরং ঐ সময়ে দুনিয়ার সকল জাতি, সকল বংশ, সকল দেশ ও সকল ভাষাভাষীর জন্য শিক্ষার দ্বার ছিল উন্মুক্ত।

রাসূল [স] শিক্ষাকে বিশ্বজনীন করতে বিদেশী ভাষা বোঝার জন্য যায়িদ বিন সাবিত [রা] কে হিব্রু ভাষা শিক্ষার নির্দেশ দেন। জানা যায়, তিনি মাত্র সতের দিনে এ ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসূল [সা] শিক্ষানীতির আরো একটি অনুষঙ্গ হচ্ছে–অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। মুসলমানদের জন্য নেয়া শিক্ষাকর্মসূচির পাশাপাশি তিনি অমুসলিমদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কেননা এটা ছিল তাদের প্রাপ্য মৌলিক অধিকার। তাই দেখা যায় কখনো কখনো ইয়াহুদীগণ রাসূলের [সা] কাছে আসতো এবং ধর্মীয় জ্ঞানশিক্ষায় অংশগ্রহণ করতো। স্যার উইলিয়াম মূয়ীর : আল্লাহর রাসূলের চরিত্রের প্রভাব ও দীপ্তি তুলে ধরেন এই বলে : "তিনি মধ্যমাকৃতি অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘকায় হলেও দেখতে রাজোপম ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি মাবনকুলের সর্বাপেক্ষা রূপবান, সর্বাপেক্ষা সাহসী, সর্বাপেক্ষা প্রদীপ্ত সুকান্তি বিশিষ্ট ও সর্বাপেক্ষা উদার ছিলেন। তাঁকে দেখলে অনুমিত হত যেন তাঁর মুখমণ্ডল হতে স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুতির হচ্ছে।"

আমরা রাসূল [সা]-এর শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারি আসহাবে সুফফার ৭০ জন সাহাবীর সমষ্টির নিকট থেকে। তাঁরা কৃচ্ছতা সাধন ও জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানীর নজির রেখে গেছেন তা বিশ্বের প্রলয়দিন পর্যন্ত সমুজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে। তাঁরা দিনের বেলায় জঙ্গলে কাঠ কাটতেন জীবিকা নির্বাহের জন্য, আর রাতভর ইবাদত করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে। অনাগত জ্ঞান পিপাসু নতুন প্রজন্মের জন্য এর থেকে বড় দৃষ্টান্ত এখনো অনাবিষ্কৃত। তাই বলা যেতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয় নবী মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ [সা]-এর শিক্ষানীতি, ছাত্র-শিক্ষকসম্পর্ক, চিন্তা ও কর্মময় জীবনকীর্তি ও অবদান আমাদের জন্য অবিস্মরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে।■

www.pathagar.com

Discover Bangladesh with KEARI
ফুল রিজার্ভে বিশেষ ছাড়
KEARI CRUISE & DINE
আমাদের সেবা সমূহঃ
প্রথম শ্রেনীর ভাসমান রেস্তোরাঁ
বুফে লাঞ্চ/ ডিনারের ব্যবস্থা সহ ফ্যামিলি প্যাকেজ
জন্ম দিন, বিবাহ বার্ষিকী, গায়ে হলুদ সহ সকল অনুষ্ঠান
টেকনাফ টু সেন্টমার্টিন
কেয়ারী সিন্দবাদ
গ্রুপ বুকিং এ বিশেষ ছাড়
আমাদের প্যাকেজ সমূহঃ
Keari Tourism
KEARI Tours & Services Ltd.

সবুজ গম্বুজের নিচে ॥ আ সা দ চৌ ধু রী

'আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো নবীজির রওয়াজ'
না, এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি একবারও।
যাঁরা হাত নেড়ে বিদায় জানালেন
দীর্ঘ প্রবাসে তাঁরাই হয়ে উঠেছিলেন আপনজন।
'যাত্রা শুভ হোক'
'ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরুন'
এ-সব শুভ কামনার স্নিগ্ধতা
কোলনের বিষণ্ন-প্লাটফর্মকে নয়
কিন্তু আমাকে স্পর্শ করেছিল।
দু'দুটি বিমান বন্দর পেরোনোর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে
আমরা এখন জেদ্দায়, সপরিবারে সৈয়দ সাহেবের বাসায়।
ক্যামেরা, অলঙ্কার আরও কি সব টুকিটাকি কেনাকাটা শেষ।
তারিখ তো আমার জানাই
ছাড়পত্রেই রয়েছে, বলবো না
মসজিদে তারাবিহ্ পড়তে গিয়েছি হোঁচট খেলাম,
অনেক কিছুই আমি ভুলে গেছি।
দেশে তো বিশ রাকাতই পড়তাম।
অনেক, অনেক বছর পর আমি রোজা রেখেছি।
পরিধানে শেষ যাত্রার দু'ফালি সাদা কাপড়
আল্লাহ্র দু'দণ্ডের মেহমান;
শরীরে, মনে, দৃষ্টিতে, নিঃশ্বাসে
অনেক অনেক গুনাহ্র চিহ্ন,
তাঁর উম্মত হবার দুর্জয় হিম্মত নিয়ে
আমি কালো পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম;
পবিত্র আঙুলের কোন চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না।
কাঙালের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলাম হারাম শরীফের চারপাশে,
পবিত্র চরণচিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না,
চোখের এতো সীমাবদ্ধতা কেন, প্রভু?

এবার আমরা নবীর শহরে যাচ্ছি, যাত্রী কম বলে
জেদ্দার বাস টার্মিনাল থেকে কোনো বাস আজ মদিনা যাবে না, অথচ

www.pathagar.com

আমাদের, মানুষের হাতে গোণা সময়, হায় সময়!
যার কসম আমার আল্লাহর কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।
একটা প্রাইভেট কারে বেআইনীভাবেই আমরা রওনা হলাম;
ড্রাইভার পাকিস্তানী, আমি ওর সঙ্গে উর্দুতেই কথাবার্তা চালাচ্ছি,
ঘৃণা নয়, বরং গোটা পরিবার নিয়ে
নিশ্চিন্তে, ওর সঙ্গে চলছি।
মাঝখানে একটা সরাইখানায় আমরা সেহরী সেরে নিলাম,
যারা খাদ্যসমাগ্রী এনে দিয়েছিলো তারা আমার দেশী মানুষ,
স্বর্ণমুদ্রার জন্য বিদেশে পড়ে আছে।

রাত বাড়ছে, মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, ছেলেরাও,
আমার চোখে ঘুম নেই,
বাংলা, উর্দু বা অন্য কোনো ভাষায়
কথা বলতে ইচ্ছে করছে না
আমার নবীকে সালাম জানানোর মতো
অধিক দরুদ শরীফ কণ্ঠস্থ ছিল না,
চর্চার অভাবে, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার জন্য,
আমি আমার দরিদ্র বাংলা ভাষার বারুদমাখা শব্দ
আর চোখের পানি দিয়ে
সর্বোচ্চ সম্মান আর মর্যাদার অধিকারীকে সালাম জানাচ্ছি।
অন্তরে অনুভব করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।
ড্রাইভার বারবার মনে করিয়ে দিলেন,
পুলিশকে বলতে হবে তিনি আমার চাচাতো ভাই,
এখন অবশ্য আমি তার নাম মনে করতে পারছি না,
আল্লাহ্ তাঁর হেফাযত করুন, ফজরের নামায জামাতে না পড়লে
মেয়েদের জন্য হুজুরের রওজা শরীফ বন্ধ হয়ে যাবে।
তিনি স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে আমাকে বারবার আশ্বস্ত করলেন।

ধীরে ধীরে দু'পাশের রুক্ষ উদ্ধত পাহাড় উঁকি দিচ্ছে,
ছোট ছোট গাছের আভাস টের পাচ্ছি,
বোধ হয় এ সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয়।

www.pathagar.com

মেয়েরা এখন আলাদা, শুধু কোলের ছেলেটা ওর মায়ের সাথে
স্ত্রী পাশে থাকলে ভাল হতো,
ওজুর আরবী নিয়ত অন্তত জেনে নিতে পারতাম।
নামায শেষ, ফজরের সংক্ষিপ্ত নামায,
আর আমি এক সময়, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিন, আপনার পাশে দাঁড়ালাম।

সমুদ্র একদা আমাকে বিস্মিত করেছিল,
ভোগের এবং ত্যাগের আনন্দও আমার অজানা নয়,
কিন্তু এই মুহূর্তের যে অনুভূতি আমি অক্ষম পদ্যকার,
কেমন করে তার বর্ণনা দেব?
আর আমি সে সময় কতটুকুই বা আমি ছিলাম!
১৯৭১-এ
কুমিল্লার ক্যান্টমেন্টের লাইনে দাঁড়িয়েও আমি এতোটা ভয় পাইনি,
আমার ডর লাগছে, ভীষণ ডর,
যদি বেআদবী প্রকাশ পায় আমার আচরণে, কথায়,
আমার ভুল আরবী উচ্চারণে
কিম্বা নিয়ন্ত্রণহীন উদ্ধত চিন্তায়
যা পশ্চিমের দ্বারা প্রভাবিত।
করাচীর ছাপা অজিফার যে বই আমি এনেছিলাম
তার কয়েকটা পৃষ্ঠা পুলিশ না কি ছিঁড়ে ফেলেছে,
আমি এক ভারতীয় অথবা শ্রীলংকার বৃদ্ধের মতো
থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছু পড়ার চেষ্টা করছি।
আপনি, বলুন, আমার এত কাছে,
অথচ কী বিপুল দূরত্বের ব্যবধান!
ভয়ে কম্পমান আমার দেহ।
আমার দুই পা ভীষণ ভারী হয়ে উঠছে;
অদৃশ্য দুর্বার শক্তি টেনে নিচ্ছে আপনার কাছে,
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন এই শরীর কি আমার?
ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনন্দ এবং আরও কিছু
যা মানব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না−
যা শুদ্ধ পবিত্রতার মধ্যে, শুচিতার মধ্যে, স্নিগ্ধতার মধ্যেই
জন্ম নিতে পারে−
আমাকে ঘিরে রেখেছিল।

www.pathagar.com

আমি জেনে গেছি, আপনার পাশে কারা কারা শায়িত,
জানি হযরত ওমরকে শোয়ানোর পর
মা আয়েশা মাথার চুল বস্ত্রাবৃত করে এখানে আসতেন, নিজের ঘরে।
কিন্তু আপনার স্বীকৃতি আর সমর্থন না পেলে
কার সাধ্য সবুজ গম্বুজের নিচে ত্রস্ত ছায়া রাখে?
নিজের যোগ্যতা দিয়ে এখানে আসিনি
নিজের যোগ্যতা নিয়েও এখানে আসিনি
তোমার মেহেরবানী, যুক্তিহীন অপার করুণা আছে, তাই,
দণ্ড দুয়ের তরে এখানে এসেছে গুনাহগার।

শুধু দণ্ড দুই? না, না,
তোমার স্নেহের ছায়া প্রসারিত, সমুন্নত দশ দিকে,
দয়া আর করুণার অফুরান ধারা
থেমে থাকবে সময়ের সামান্য সীমায়? জীবন-মৃত্যুর এপারে ওপারে
জানি, এতোটা বখিল আপনি নন
আপনি তো দয়ার সাগর।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ [সা] প্রথম মানব-মানবীর উত্তরাধিকার ॥ আ ল মু জা হি দী

আমি তো প্রতিদিনই তোমার ওপর শান্তির মহান দরুদ পাঠ করি
তুমিই আলোর উদ্ভাসন এবং অন্ধকার তিমিরের পার্থক্য
দেখিয়ে দিয়েছো আমাকে, মুহাম্মাদ।
আমি আমার চেতনা ও বোধির শিখর স্পর্শ করি
আমি তো প্রতিদিনই তোমার ওপর শান্তির মহান দরুদ পাঠ করি।
তুমিই রূপান্তরমান বস্তুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নির্মাণ করেছো
আর আত্মার গতিকে সোপর্দ করেছো পার্থিব সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে
আমি যখন নগরী ও প্রগতির পথে ম্রিয়মাণ, তুমিই
আমাকে প্রথম উৎসর্গ করেছো একটি গতি ও প্রসারের পেণ্ডুলাম
আদি ও অনাদি। অনন্তের প্রস্রবণ, মুহাম্মাদ।
আমিতো প্রতিদিনই তোমার ওপর পাঠ করি শান্তির মহান দরুদ।
তুমিই আমাকে পৃথিবীর বাগানের অনুপম পুষ্পগুলো
উপহার দিয়েছো আমার আরাধ্য মানবীর জন্যে। যে মানবী
স্বাগত সম্ভাষণে আলিঙ্গন করলো প্রেম, প্রেম এবং প্রেম ধ্রুব পদ
এতো সেই প্রথম মানব এবং মানবীর উত্তরাধিকার।

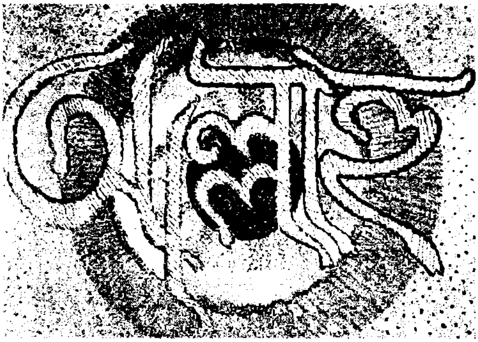

www.pathagar.com

সালাম রাসূল সালাম ॥ মজিবুর রহমান মনজু

প্রিয় নবী মোর সালাম জানিও
বাংলার বুক হতে-
দিবা-রাত্রি স্মরিছে তোমায় হেথা
অগণিত উম্মতে।

হয়তো দেখিনি মা আমিনার শীর্ণ কাঠের ঘর
শুনিনি সৌম্য আবু তালিবের দীপ্ত কণ্ঠস্বর।
পাইনি মমতা হালিমার মতো,নিবিড় শান্ত ছায়া
পুষ্প ছড়ায় পাপড়িতে যেন, স্নিগ্ধ রাতের মায়া ।
মক্কার ধুলো আ'বে জমজম স্বচ্ছ পানির ধারা
বিপদের দিনে খাদিজার মতো সাথী ছিল তথা যারা।
আজান শুনিনি বেলালের সূরে,হাতে নেই শমসির
ওমরের মতো নেতা নেই পাশে, খালিদের মত বীর।

তবু আজ দেখ এই বাংলায়
বনি আদমের ঢল
হে রাসুল তুমি প্রিয়তম-গান গেয়ে
ঝরিছে অশ্রুজল।

মদিনা বাসীর প্রেমের তুল্য নয়তো আমরা কেহ
আনসার আর মুহাজির যেন একাকার এক দেহ
হাসান-হোসেন, বিবি ফাতিমার দেখানো পথটি ধরে
দ্বীনের শিক্ষা হয়েছে বুলন্দ আরবের ঘরে ঘরে ।
বদরের পথে কদম রেখেছে সাহাবী তোমার যারা
জীবনের তরে শির উঁচু করি কালেমা পড়েছে তারা।
হামযার খুনে ওহুদ পাহাড় লালে লাল হল সে যে
এখনো সেথায় পেরেশান দিল শিক্ষার পথ খোঁজে।

হে নবী আমার সান্ত্বনা তবু
এই মন প্রাণ ভরে
বাংলাদেশের কোটি মুসলিম জাগে
তোমারই প্রেমের তরে।

www.pathagar.com

বাঙালা কাব্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]

ড. এস.এম. লুৎফর রহমান

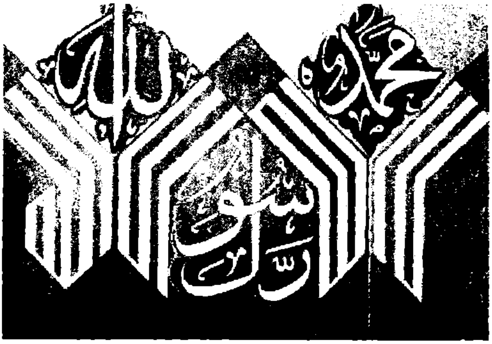

বাঙালা কাব্যে মুহাম্মাদ [সা] একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ হাল আমল তক, বাঙালা কাব্যের এক হাজার বছরের যে সব ঐতিহাসিক নমুনার মোলাকাৎ পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রাচীনতম নমুনাটিতেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক নয়, নিশ্চিত রূপেই ১০০০ থেকে ১০২০ ঈছায়ীর মধ্যে বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিত রচিত "কালিমা জাল্লাল" নামক রচনায়, পহেলা রাসূলে করীম [সা] এর তারিফ করা হয়েছে। যেমন–

ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম হৈল শূলপানি।
গণেশ হৈল গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজী
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥

"শূন্য পুরাণে" সংকলিত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কবিতায় এ অংশ পাওয়া যায়। কিন্তু 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামটি আধুনিক। মূল নাম- "কালিমা জাল্লাল" মূল কবিতার অংশ বিশেষকে আলাদা করে 'শূন্য পুরাণে' ছাপা এ কবিতার পুরো পাঠ পাওয়া যায়–রামাই পণ্ডিতের অপর রচনা "ধর্ম্মপূজা বিধান"–এ।

www.pathagar.com

যা হোক, এগারো শতকের শুরুর দিকের এ রচনার কয়েকশ বছর পর, মুছলিম কবি শাহ্ মুহাম্মাদ ছগীর-এর "ইউছুফ জোলায়খা" কাব্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর মুবারক নামের রোশনী দেখা যায়।

ড. মুহাম্মাদ এনামূল হক-এর মতে ১৩৮৯ থেকে ১৪১০ ঈছায়ীর মধ্যে রচিত ঐ কাব্যে কবি হামদ রচনার পর নাতে রাসূল রচনা করতে লিখেছেন-

"জীবাত্মায় পরমাত্মা মোহাম্মাদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম ॥
জথ ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন।
মোহাম্মাদ হোন্তে কৈলা তা সব রতন ॥
নিরঞ্জন মকারেত প্রেমে সে মজিলা।
এহি লক্ষ্যে জথ জীব সৃজন করিলা ॥
পরম ঈশ্বর তানে বুলিলে বন্ধু।
সপ্ত স্বর্গ মুক্তি পাইল তান পদ বিন্দু ॥
তান প্রেম অনুভাবে সৃজিলা জগত।
কহিতে পারি এ কথ তাঞি যে মহৎ ॥
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীকুল।
মোহাম্মাদ তান মধ্যে প্রধান আদ্য মূল ॥
তান গুণ কীর্তি কথ কহিমু বাখান।
বিস্তারিআ না লিখিলু অল্প সমাধান ॥
অনন্ত ছহিদা মোর সর্বঅঙ্গ ভরি।
মোহাম্মাদ ছগির দাসক দাস তান।
তাহা হোন্তে বড় ভাগ্য মোক নাহি আন ॥"

এভাবে কেবল ছগীর নন, মুছলিম ও বৃটিশ আমলের প্রায় সকল মুছলমান কবিই কাব্য রচনাকালে 'হামদ' সহ বাঙালা ভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর শানে, জীবনী-কাব্যও কম লেখা হয়নি।

এদিক থেকে, মুছলিম আমলের অপর প্রাচীন কবি জৈনুদ্দীন-এর কথা বলা যায়। কবি জৈনুদ্দিন বাঙালার ছোলতান মশহুর ইউছুফ শাহের, সভাকবি ছিলেন। এ হিসাবে তিনি ১৪৭৪ থেকে ১৪৮১ ঈছায়ীর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত কাব্য "রছুল বিজয়"-রচনা করেন। ঐ কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে জনাব আজহার ইসলাম লিখেছেন-"রছুল-বিজয় কাব্যখানি যে, সুধারসে ভর্তি সেই কথার উল্লেখ করে জৈনুদ্দিন বলেন-

রছুল বিজয় বাণী সুধারস সার।
শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার ॥

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত "রছুল-বিজয়" প্রাচীন বিজয়কাব্যগুলোর অন্যতম। কাব্যের বিষয়বস্তুতে গতি সঞ্চার করেছে হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর সঙ্গে তৎকালীন ইরাকাধিপতি জয়কুমের যুদ্ধকাহিনী। গবেষণার দৃষ্টিতে জয়কুম ইরাক অথবা আরমেনিয়ার সম্রাট ছিলেন।"

রছুল-বিজয়ের মূল উৎস ফারছী ও উরদুতে রচিত কিচ্ছা-কাহিনী। এই কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে-কাফেরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ [সা]এর যুদ্ধাভিযানের ইতিহাস।...রাসূলুল্লাহ [সা] মানুষ হিসাবে যেমন বড় মাপের ছিলেন, তেমনি যোদ্ধা হিসাবে অসাধারণ রণকুশলী ছিলেন। যুদ্ধ যাত্রায় তাঁর সুসজ্জিত বাহিনীর ছবি অঙ্কন করতে যেয়ে কবি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার একটি নমুনা-

কেহ অশ্বে, কেহ গজে কেহ দিব্য রথে।
সুসজ্জ হইলা সব সংগ্রাম করিতে ॥
তার পীছে সুসজ্জ হইলা নবীবর।
আকাশে উদিত যেমন হইলা শশধর ॥
ধবল অশ্বেতে নবী আরোহিলা যবে।
আকাশের মেঘে ছায়া ধরিয়াছে তবে ॥
নি:সরিলা নবীবর সঙ্গে অম্ববার।
প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার ॥
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল ॥

এ-যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ [সা] তাঁর বিশ্বস্ত সৈন্যদের সহায়তায় জয়কুম রাজার বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেন। শত্রুপক্ষীয় সৈন্যরা সভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র-পরিত্যাগ করে।...মহানবী জয়কুম রাজার রাজ্য জয় করেন এবং দেশে ইসলামের দাওয়াৎ পৌছে দেন।

একই নামের একই বিষয়ে আর একখানি কাব্য রচনা করেন পরবর্তী কালের কবি সাবিরিদ খান। আনুমানিক ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ এর মধ্যে লিখিত সাবিরিদ খানের "রছুল-বিজয়" এর অপর নাম-'জঙ্গনামা"। কবির আপন ভনিতায় দু'জায়গায় এ দু'টি নামের উল্লেখ দেখা যায়। এই খণ্ডিত কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে মরহুম ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক লিখেছেন- "জৈনুদ্দিনের "রছুল-বিজয়" এবং সাবিরিদ খানের "রছুল-বিজয়" এই উভয় গ্রন্থের মূল বিষয় ও রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তবে, পাণ্ডিত্যে ও কাব্যে-কলায় সাবিরিদ খান জৈনুদ্দিন হইতে শ্রেষ্ঠ।"

এ কাব্যের যেটুকু পরিচয় মরহুম ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক দান করেছেন-তা থেকে কিছু বেশী বয়ান পাওয়া যায় ড. মুহাম্মাদ মজিরউদ্দীন মিয়ার রচনায়। তিনি তাঁর "বাংলা সাহিত্যে রাসূল-চরিত" গ্রন্থে লিখেছেন-"জয়কুম রাজার লড়াই কাহিনী কয়েকজন

www.pathagar.com

কবির কাব্য-বিষয় হলেও সাবিরিদদের [শা'বারিদ] রচনায় কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁর কাব্যে এ যুদ্ধ বর্ণনার মূল আবেগ হল-বিপুল সমর কৃতিত্বের জন্য হযরত আলীর প্রতি রাসূল [সা]এর অভিনন্দন [সংবর্ধনা]।...জয়কুম পুত্র ছালারকে আলী পরাজিত ও বন্দী করেন। রাজা এতে শোকার্ত হয়। তারপর বর্ণিত হয়েছে আলী ও মুলুক শাহের যুদ্ধ। সে যুদ্ধেও আলী বিজয়ী হন এবং মুলুক শাহ বন্দী হয়।...এভাবে একে একে হযরত আলী সবকটি লড়াইয়ে জয়লাভের পর রাসূল [সা]এর নিকট গিয়ে হাজির হন। বাদশা জয়কুমের সঙ্গে লড়াইয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]ও নিজে শরীক হন। সেটি হল কাওয়াছের লড়াই। পঞ্চম লড়াই কবির বর্ণনায়–

কওয়াছ সহিত হইল নবীর সংগ্রাম।
মহা বলবন্ত সেহ রণে অনুপাম ॥
রছুলকে ধরিতে কওয়াছ আইল ধাই।
পয়গাম্বরে তাঁর কটি ধরিলেও যাই ॥
চল্লিশ নবীর বল রছুলের অঙ্গ।
কওয়াছকে ক্ষেপিলেও যেহেন পতঙ্গ ॥

রাসূলুল্লাহ [সা] এর সঙ্গে লড়াই করে জয়কুম তনয় কাওয়াছ পরাজিত হন এবং ইসলাম কবুল করেন। তাঁর কথা অনুসারে পরাজিত বাদশা জয়কুমও নবী করীম [সা] এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুছলিম আমলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর জীবনী ও কর্মভিত্তিক সব থেকে বিশাল কাব্য রচনা করেন কবি ছৈয়দ ছোলতান। তাঁর রচিত কাব্যের নাম-"নবী-বংশ"। একে কাব্য না বলে, মহাকাব্য বলাই বেহতের। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক এ মহাকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন–"কবি সয়িদ সুলতানের গ্রন্থগুলির মধ্যে "নবী-বংশ" কাব্যটিকে 'ম্যাগনাম ওপাস বা কবির শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। ইহা বিষয়-বৈচিত্র্য ও আকারে সপ্তকাণ্ড রামায়ণকেও হার মানাইয়াছে। এই কাব্যটিকে বাংলা মহাকাব্যের একটি মহান আদর্শ বলা চলে। ইহার বিষয়বস্তু এত বিশাল ও বিচিত্র যে, এখানে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে। সৃষ্টিপত্তন অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনী লইয়াই কাব্যখানির আরম্ভ এবং হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর আবির্ভাবে আসিয়াই ইহার শেষ।

বলা দরকার যে, ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক যেখানে "নবী-বংশ" এর শেষে বলেছেন–আসলে সেখানে গোটা মহাকাব্যের আউয়াল পর্বের শেষ। এর পরের অংশ "শবে-মেরাজ"। তারপর আরও তিন পর্ব যথাক্রমে "রছুল-বিজয়" [জয়কুম রাজার সাথে লড়াই], "রছুল-চরিত্র" ও "ওফাতে রছুল"। ড. হক এগুলোকে আলাদা আলাদা কাব্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, আজহার ইসলাম প্রমুখ ঐ পাঁচটি কাব্য একই রচনার অংশ বলে রায় দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ মজির উদ্দীন মিয়া লিখেছেন–"ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি [কবি] হযরত মুহাম্মাদ [সা]এর জীবনী বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন। তাঁর "নবী-বংশ" বিশাল গ্রন্থ। এ গ্রন্থ নবীবংশ, শবে মেরাজ, রছুল বিজয় [জয়কুম রাজার লড়াই] রছুল-চরিত্র, ওফাতে রছুল এই কটি পর্বে বিভক্ত।"

বলা দরকার যে, মহাকাব্যটির আউয়াল পর্বে কুল মখলুকাৎপয়দা হওয়ার আদি থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর জন্ম তক এবং পরের অংশ "শবে মেরাজ" এর তার মহাকাশ গমন তথা গমন সাত-আছমান, বেহেশত-দোজখ, আছমানী ফেরেশতা ও নবীদের দিদার ওগায়রাহের সাথে আরও অনেক বিষয়ের হকিকৎ মেলে। তাই ড. হক লিখেছেন 'হযরতের মিরাজ বর্ণনা এ অংশের মুখ্য বিষয় হলেও তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে, মিরাজ তক বহু ঘটনা কবি এতে বয়ান করেছেন।" তারপর "রছুল-বিজয়" পর্বে হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর যুদ্ধ বিগ্রহ ও ইছলাম প্রচারের কথা বলে হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে–এ অংশ "জয়কুম রাজের লড়াইয়ে' বা ইরাক-বিজয় কাহিনী। 'রছুল-চরিত' অংশে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর সাতটি লড়াইয়ে শরীক হওয়ার বয়ান আছে। সেগুলো হল বদর, ওহোদ, তায়েফ, খন্দক, তাবুক, খায়বর ও মক্কা-অভিযান। আলোচ্য মহাকাব্যের শেষ পর্ব 'ওফাতে রছুল।' এ অংশে কবির জঈফ কালের রচনা। এ অংশের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন–

"আজরাইল মহামতি আইল বায়ুর গতি
রছুলের পুবির দুয়ারে।
রছুলের নাম ধরি ডাকি কহে ভক্তি করি
'আজ্ঞা মাগি' যাইতে অন্ত:পুরে ॥
পয়গাম্বরে ফাতেমারে কহিলেন্ত দেক্ষিবারে
দ্বারেত আসিছে কোন জন।
কি কারণে অন্ত:পুরে ডাকি কহে আসিবারে
বুঝ গিয়া তার বিবরণ ॥
রছুলের আজ্ঞা পাই ফাতেমা গেলেন্ত ধাই
দেক্ষিলা আরব একজন।
বিবি ফাতেমারে দেখি সতত চরিত্র লক্ষি
ছালাম করিলা সেইক্ষণ ॥

যা হোক, গত হাজার বছরের বাঙালা কাব্যধারায় এ মহাকাব্যের মূল্যায়ন করতে ড. মজির উদ্দীন মিয়া বলেছেন– "সৈয়দ সুলতান মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের একজন শক্তিমান কবি। তাঁর নবীবংশ বিশাল কাব্য এবং বাংলায় হযরতের জীবনীমূলক এত বিস্তারিত কাব্য তাঁর আগে এবং পরে আর কেউ রচনা করেননি। ইতিহাস, কিংবদন্তী এবং কল্পনা এ কাব্যের অবয়ব নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।"কথাটা খুবই সত্য। তবে এর থেকে বড় কাব্য পরে রচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এরপর কবি নছরুল্লাহ খানের নামোল্লেখ করা যায়। ড. মুহাম্মাদ এনামূল হক তাঁর জীবনকাল ১৫৬০ থেকে ১৬২৫ ঈছায়ী বলে গণ্য করেছেন। এ কবির "জঙ্গনামা" কাব্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর বিজয়াভিযানের কাহিনী আছে। রচনাটির পরিচয় দিতে গিয়ে "পুথি সাহিত্যের ইতিহাস" নামক পুস্তকে মরহুম আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন লিখেছেন–"ইহা হযরত আলী সহযোগে হযরত মুহাম্মাদ [সা]এর দিগ্বীজয়ের কাহিনী। ইহাতে সর্বত্রই হযরতের [সা] জয় এবং কাফিরগণের পরাজয় ও ইসলাম গ্রহণ।" কাব্য কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় কেউ দেননি।

মুছলিম আমলের অপর কবি শেখ চাঁদ ও মহানবীর বিজয়-কাহিনী নিয়ে "রছুল বিজয়" নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। এ বিষয়ে ড. হক লিখেছেন–"ইহাই কবি শেখ চান্দের শ্রেষ্ঠ বৃহৎ কাব্য। ইহা কবির পীর শাহ দৌলার আদেশে লিখিত হয়।..."রছুল-বিজয়ের" শেষার্ধে ১১৬ অধ্যায়ের পরে, এক বৃহৎ অংশকে কবি "শবে মেরাজ" নাম দিয়েছেন। এতে হযরতের "মিরাজ" হইতে বেহেশত ও দোযখ পরিভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। কাব্যে বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি এই রূপঃ ইবলিশের শোক, তালেব নিধন, মুবারিজের স্ত্রীর শাস্তি, গোয়ালার ইসলাম গ্রহণ, জাকিনামা, মুরীদের কথা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবি শেখ চান্দ মহানবীর জীবন কাহিনীর সাথে অনেক কিছু মিলিয়ে "রছুল-বিজয়" নামক একখানা মহাকাব্য রচনা করেন। "শবে মেরাজ" এই মহাকাব্যেরই অংশ। আলাদা রচনা না হওয়াই সম্ভব। কবি ১৫৬০ থেকে ১৬২৫ ঈছায়ীর মধ্যে এ গ্রন্থ রচনা করেন।

এ কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আজহার ইসলাম লিখেছেন–"রছুল-বিজয়" গ্রন্থখানি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]এর চরিত্রসমৃদ্ধ নবী বংশের ধারায় লিখিত। সৃষ্টিপত্তনের গোড়ার কথা বিবৃত ছলে কবি হযরত জিব্রাইল [আ] কর্তৃক নূর-ই-এলাহী, "মুহাম্মাদ" [সা] রূপীয় বেহেশতি ফুল আবদুল্লাহর হাতে দিলে তিনি তাঁর ঘ্রাণ নেন। এভাবে আবদুল্লাহর মধ্যে হযরত অন্তলীন হন।...এই বিপুলাকার গ্রন্থখানিতে কবির রোমান্টিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হযরতের জীবনে সংঘটিত যুদ্ধকাহিনীও বিবৃত হয়েছে।...[সেই সাথে] ইসলাম প্রচারের ভূমিকাটিও... ।"

তবে এ কাব্য "কাছাছুল আম্বিয়ার" তরজমা বা তার অনুসরণে লিখিত বলে কবি নিজেই জানিয়েছেন। বাঙালা কাব্যধারায় মুছলিম আমলের প্রবাসী মহাকবি আলাওল ও তাঁর "সিকান্দারনামা" কাব্যে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা [সা] এর "মিরাজ" এর কাব্যরূপ দান করেছেন।

তবে এ ধারায় মুছলিম আমলের শেষ মশহুর কবি হেয়াত মামুদ [১৬৮০-১৭৬০ খৃ. অ.] "আম্বিয়া বাণী" কাব্যে নাতে রাসূলসহ তাঁর মিরাজ এর হকিকৎ বয়ান করেছেন।

হেয়াৎ মামুদ-এর পরে বরিশালের কবি ফৈজুদ্দীন "শবে মেরাজ" নামে একই বিষয় নিয়ে আর একখানি কাব্য লেখেন। আদ্যন্ত খণ্ডিত এ কাব্য খুঁজে পান সুলতান আহাম্মাদ ভূঁইয়া। এতে মিরাজের চমৎকার বয়ান আছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর জীবনের খণ্ডাংশ রূপে "মিরাজ" এর মত "ওফাৎ"

www.pathagar.com

নিয়েও এদেশের কবিরা আলাদা কাব্য লিখেছেন। এদিক থেকে ১৭৯০-এ লেখা কবি গোলাম রছুলের "ওফাৎনামা" কিতাবখানি উল্লেখযোগ্য। এ কাব্যে কবি রছুলে করীম [সা]এর ওফাৎ সম্পর্কে লিখেছেন–

"ত্রিষষ্ঠ বৎছর নবির আই পূণ্য [পূর্ণ] হইল।
জিরিলের তরে আল্লা হুকুম করিল ॥
দিন দুনিঞা আর পাইয়া উম্মতে।
আমাকে ভুলিয়া দোস্ত রহিল তথাতে ॥
কহিবা দোস্তের আগে এসব কথন।
শিঘ্র আসি মোর সনে করুক দরসন ॥

এরপর বৃটিশ আমলেও এ ধারায় রাসূল [সা] এর শানে কাব্য-কবিতা অনেক লিখিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রায় সকল মুছলিম কবিই তাদের কাব্যের শুরুতে হামদ ও নাত যেমন লিখেছেন; তেমনি খাছ রাসূলে করীম [সা]এর জীবনী নিয়েও কাব্য রচনা করেছেন। এছাড়া আরও এক শ্রেণীর রচনায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর জীবন ও কর্মের কথা রূপায়িত হয়েছে। সেগুলো হল "কাছাছুল আম্বিয়া" জাতীয় রচনাকে একাধিক কবি রচিত এই নামের ছোট বড় কয়েকখানি কাব্যের মোলাকাৎ পাওয়া যায়। মহাকাব্যের মত বিশাল আকৃতির এসব রচনা একাধিক কবির আনুক্রমিক চেষ্টায় পূর্ণতা লাভ করেছে। বৃটিশ আমলে রচিত ও মুদ্রিত এরকম ঢাউস কিতাবের কিছু কিছু এখনও গ্রাম এলাকায় বিদ্যমান।

যাহোক, বৃটিশ আমলে আখেরী নবী [সা] এর জীবনী বিষয়ক কাব্যের মধ্যে মরহুম ছাদেক আলীর "হালাতুন্নবী" প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। পহেলা এ কিতাব সিলেটি নাগরী হরফে লিখিত হয়; পরে তা রূপান্তরিত হয় বাঙালায়। রূপকার মরহুম মোহাম্মাদ ইউসূফ। পরে এ কাব্যে নবী করিম [সা] এর আবির্ভাবের হাকিকৎ বয়ান করতে গিয়ে কবি লিখেছেন–

"নবী মোহাম্মাদ পয়দা হইলা যখন।
জমিন আছমান তক হইলা রুশন ॥
সেকালে সাগরে পানি না চলিল স্রোতে।
পশুপক্ষী নাহি পারে উপরে উড়িতে ॥

ড. মজিরুদ্দীন মিয়া লিখেছেন–"মোহাম্মাদ ছাদেকের কাব্য রচনার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে গদ্যে অনেকগুলো মুহাম্মাদ [সা] জীবনী রচিত হলেও কাব্য প্রকাশিত হয়েছি বলে প্রমাণ নেই। ড. মিয়ার এ কথা ঠিক নয়। কেননা, ১২৮৬ সালে রচিত মরহুম বেলায়েৎ হোছেনের লেখা "সায়েবে দোজাহান" একখানি মুদ্রিত কিতাব। এ কাব্যে নবী করীম [সা] এর জীবনীর কাব্যরূপ দান করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ে মরহুম আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন লিখেছেন– "ইনি যশোর জেলার অধিবাসী।

www.pathagar.com

কিন্তু কলিকাতায় অবস্থান করিতেন।" এছাড়া মূল কিতাবের আর কোন পরিচয় তিনি দেননি।

বেলায়েৎ হোছেনের পরে, মরহুম মোহাম্মাদ ছায়িদ-এর লেখা "তাওয়ারিখে মোহাম্মাদীর কথা বলা যায়। পাঁচ খণ্ডে রচিত এই "মহাকাব্য" জাতীয় রচনাখানি কারও মতে কবি শেষ করে যেতে পারেননি। এ কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন লিখেছেন-"ইহা একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহা ছন্দে রচিত হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর একখানি বিস্তারিত জীবন চরিত। বর্তমান গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড "মোহাম্মাদী" নূরের সৃজন হইতে কাবাগৃহের পুননির্মাণ [পর্যন্ত]। দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয়বার সীনাচাক হইতে তায়েফের ঘটনা পর্যন্ত। তৃতীয় খণ্ড মিরাজ হইতে হিজরতের পর হযরত ফাতিমার বিবাহ পর্যন্ত। চতুর্থ খণ্ড-হিজরীর প্রথম বৎসরের ঘটনা বদরের যুদ্ধসহ। পঞ্চম খণ্ড উহুদের যুদ্ধ হইতে চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী পর্যন্ত। সুতরাং গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ।" পক্ষান্তরে ড. মুহাম্মাদ মজিরউদ্দীন মিয়া লিখেছেন- "দু'কলমের ছাপা।" তাঁর ভাষায়...মাদারীপুর জুনিয়র মাদরাছার ভূতপূর্ব হেড মৌলবী মোহাম্মাদ ছায়ীদ দশখণ্ডে রচনা করেন তাওয়ারীখে মোহাম্মাদী নামক বিরাট কাব্য। হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর জীবনী পুথির সায়েরদের মত করে পয়ারে রচিত হয়েছে। কাব্যখানির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে নিউ গ্রীন লাইব্রেরী [ঢাকা] থেকে।

পুথিকাব্যের মত এর ভূমিকা অংশে মুনাজাত আল্লাহ তায়ালার হামদ, নাতে রাসূল, কিতাব লিখবার কারণ, আরজনামা ও রচকের পরিচয় আছে। তারপর আছে খণ্ডে খণ্ডে হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা....।

তাওয়ারীখে মোহাম্মাদী গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের প্রচুর উদ্ধৃতি কবিতায় অনুবাদ করা হয়েছে।

এ আমলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর মেরাজ নিয়ে আলাদাভাবে কাব্য রচনা করেছেন কবি মোহাম্মাদ খাতের ও পীর আবদুল কাদির। কবি খাতেরের কাব্যের নাম- "ছহি বড় মিরাজনামা"। আর পীর আবদুল কাদিরের মিরাজ বিষয়ক দু'খানি কাব্য হল- 'নাজাতে কাওছার' ও 'মাজরে ফেরদৌছ।'

আলোচ্য কাব্য ধারায় "কাছাছুল আম্বিয়া" অন্য রীতির রচনা। তাহলো-বিভিন্ন নবীর জীবনীর সাথে রছুলে করীম [সা]এর জীবনকাহিনী আলোচনা। "কাছাছুল আম্বিয়া" ও "খেলাছাতাল আম্বিয়া" নামক এই সারির রচনা হযরত আদম [আ] এর জীবনী থেকে শুরু করে, হযরত রাসূলে করীম [সা] এর সময় তক, প্রধান প্রধান নবী রাসূলদের জীবনকাহিনী বয়ান করা হয়েছে। এরকম কাব্যের মধ্যে "কাছাছুল আম্বিয়া" নামে মুনসী তাজুদ্দীন মোহাম্মাদ, মোহাম্মাদ খাতের ও কবি জোনাব আলী রচিত ছোট-বড় একাধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। "খোলাছাতুল আম্বিয়া" নামে মোহাম্মাদ খাতেরের আলাদা একখানি কাব্যও আছে। এসব মহাকাব্যের ন্যায় বিশাল রচনার মধ্যে নাতে রাসূল ছাড়া, মহানবীর পুরো জীবন-কাহিনীও স্থান লাভ করেছে।

বলা দরকার যে, বৃটিশ আমলে বিশ শতকের প্রথম ভাগেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত

www.pathagar.com

কবিরা রাসূলুল্লাহ [সা] এর জীবন কাহিনী নিয়ে কবিতা, গান ও কাব্য রচনা করেছেন। এসব রচনার মধ্যে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত শেখ ফজলুল করীম এর ২০ সর্গে বিভক্ত পরিত্রাণ, একই বছর প্রকাশিত কবি মোজাম্মেল হকএর হযরত মোহাম্মাদ [সা], কবি দাদ আলীর দু'খণ্ডে প্রকাশিত "আশেকে রাসূল", শেখ জুমন উদ্দীন রচিত "মহামানব" এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত "মরুভাস্কর" এর নাম উল্লেখযোগ্য। এরপরও কবি জুলফিকার হায়দার, রওশন ইজদানী, আ. ন. ম. বজুলর রশীদ এবং কাজী আবুল হোসেন ওগায়রাহ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর জীবন কথা নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু বিশ শতকের কবিদের মধ্যে একমাত্র জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আখেরী নবী [সা] এর জীবনের নানা বিষয় নিয়ে যত গান রচনা করেছেন–তত গান আর কেউ লিখেননি। কবির "মরুভাস্কর" কাব্য গ্রন্থে মহানবী যে জীবন কথা শেষ হতে পারেনি, তা তাঁর গানের মালায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ [সা] এর আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ে "ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম" নামক যে কবিতা লিখে গিয়েছেন–তার তুলনা সারা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। অতএব নবী করিম [সা] এর জীবনের আলো যে আমাদের গত হাজার বছরের বাঙালা কাব্য জগৎ কে রওশন পুর-নূর করে রেখেছে–তা বেশক বলা যায়।■

তথ্যপঞ্জী

১. রামাই পণ্ডিত। শূন্য পুরাণ; উদ্ধৃত-ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও যতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস। ঢাকা-২০০৪, পৃ-১২২।
২. রামাই পণ্ডিত। ধর্মপূজা-বিধান। ননী গোপাল বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। কাল-১৩৩০।
৩. ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক। মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা-১৯৬৫, পৃষ্ঠা-৫৬।
৪. ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক। মুহাম্মাদ এনামুল হক রচনাবলী। ২য় খণ্ড, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৬০৭।
৫. ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক। মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা-১৯৬৫, পৃষ্ঠা-৬০।
৬. আজহার ইসলাম। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি। ঢাকা-১৯৯২। পৃষ্ঠা-২৫-২৭।
৭. দেখুন আজহার ইসলাম। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২।
৮. মুহাম্মাদ মজির উদ্দীন মিয়া। বাংলা সাহিত্যে রাসূল চরিত। ঢাকা-১৯৯৩। পৃষ্ঠা-৫১-৫৩।
৯. মুহাম্মাদ এনামুল হক। মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা-১৯৬৫, পৃষ্ঠা-১৪৭-১৪৯।
১০. মুহাম্মাদ মজির উদ্দীন। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩।
১১. উদ্ধৃত মজির উদ্দীন। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৫।
১২. ঐ; পৃষ্ঠা-৬২।
১৩. এনামুল হক। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭২।
১৪. আবুল কাসিম, মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন। পুথি সাহিত্যের ইতিহাস। ঢাকা-১৯৩৯। পৃষ্ঠা-৫৩।
১৫. মুহাম্মাদ এনামুল হক। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫০-৫১।
১৬. ঐ পৃষ্ঠা-২৪৮।
১৭. আজহার ইসলাম। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০।
১৮. মুহাম্মাদ মজির উদ্দীন মিয়া। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯১।
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩৯।
২০. আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫০।
২১. ঐ, পৃষ্ঠা-১৬২।
২২. মুহাম্মাদ মজির উদ্দীন মিয়া। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৮।

www.pathagar.com

একটি ঐতিহ্যবাহী মুদ্রন ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

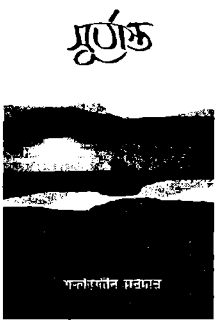

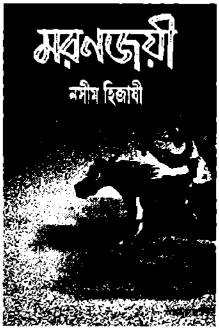

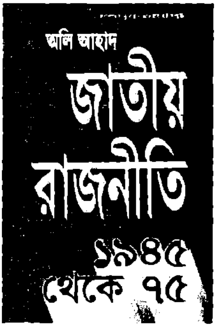

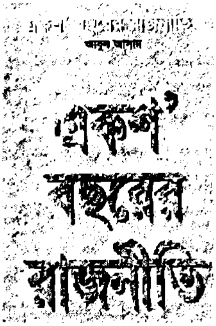

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

হেড অফিস নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩, ০১৭১১-৮১৬০০২

ঢাকা অফিস ১২৫ মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০, পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪, ৯৫৫৯৭৫৩, ০১৭১১-৮১৬০০১

বিক্রয় কেন্দ্র ১৫০-১৫২ নিউমার্কেট ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩ ☐ ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন ঃ ৭১৬৩৮৮৫

E-mail : booksocietyltd@yahoo.com

মহানবী [সা]-এর সাংস্কৃতিক আদর্শ

অধ্যাপক আবু জাফর

প্রাণিজগতে স্বভাব আছে, সংস্কৃতি নেই। অর্থাৎ মূষিক থেকে ঐরাবত, ক্ষুদ্র মধুভৃঙ্গ ও পতঙ্গ-পিপীলিকা থেকে অভ্রভেদী স্বর্ণঈগল পর্যন্ত সবাই স্ব স্ব প্রবৃত্তি ও স্বভাব দ্বারা চালিত। আবহমান কাল ধরে প্রাণীজগত এইভাবেই অব্যাহত আছে। আল্লাহ্ পাক কর্তৃক নির্ধারিত এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু মনুষ্যজাতির ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানুষও তার স্বভাব ও অন্তর্নিহিত প্রেরণ-প্রবণতা দ্বারা চালিত বটে কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি অতিরিক্ত গুণ ও শক্তি আল্লাহপাক দান করেছেন, যার ফলে মানুষ যেমন বশীভূত করতে পারে, স্বভাবের অনুচিত দাবীসমূহকে পরাভূতও করতে পারে। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে তার অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তির নিগড় থেকে মুক্ত করে নতুনভাবে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। আর এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনে অনিবার্যভাবে পুনঃপুনঃ নবোন্মেষ ঘটে, জন্ম নেয় সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি কথাটি সংস্কার শব্দ থেকে গৃহীত, অর্থাৎ সংস্কৃতি আসলে নিজেকে সংস্কার করা, পরিশোধন ও পরিমার্জন করারই একটা প্রচেষ্টা। দৃশ্যত সাধারণভাবে এই প্রচেষ্টা সদর্থক। কিন্তু সমস্যা হলো, সংস্কৃতি সর্বদা ইতিবাচক হয় না, বরং অধিকাংশ সময়

www.pathagar.com

নেতিবাচকই হয়ে ওঠে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপজ্জনক জীবনাচারই প্রাধান্য লাভ করে। কেন এ রকমক হয়, সে এক দীর্ঘ আলোচনার বস্তু। আমরা শুধু সংক্ষেপে এইটুকু বলবো যে, সংস্কারের নামে মানুষ নিজেকে জয় করার পরিবর্তে নিজের কাছে নিজে পরাভব স্বীকার করে নেয়, সুস্থতার পরিবর্তে জীবনে বয়ে আনে এক একটি দুরারোগ্য কুৎসিত উপদংশ এবং মনুষ্যজাতির অমোঘ দুর্ভাগ্য যে, এই আত্মঘাতী ভ্রান্তিবিলাসই সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যচেতনার নামে বার বার মানব সম্প্রদায়কে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তুলছে এবং আরো বড় দুর্ভাগ্য যে, জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক, সমগ্র বিশ্ব মানব সম্প্রদায়ক আজ এই কুৎসিত ও অনভিপ্রেত ব্যাধিকেই সাদরে সাগ্রহে বরণ করে নিতে হচ্ছে। আর বস্তুতপক্ষে অবস্থা এমন যে, প্রতিরোধ তো দূরের কথা, সংস্কৃতি নামাঙ্কিত এই সর্বনাশা প্রবঞ্চনের বিরুদ্ধে ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করাও আজ অসম্ভব!

সত্যই যে অসম্ভব, এ্কটি-দুটি সাধারণ দৃষ্ঠান্ত থেকেই আশা করি সেটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। শেক্সপিয়রের একটি বিখ্যাত উক্তি Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying– জীবন একটি বুরবাক বর্ণিত অসার গল্পকথা, যা কেবল অর্থহীন কোলাহল ও উন্মত্ততা দ্বারা পরিপূর্ণ। পাঠক, চিন্তা করুন, ইংরেজির কোনো শিক্ষকের পক্ষে এই কথা বলা কি সম্ভব যে, শেক্সপিয়রের উক্তিটিই আসলে অসার ও উদ্ভট ও বাস্তবতাবর্জিত? রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। শুনতে যত মর্মস্পর্শীই হোক, কেউ কি বলতে পারবেন যে, ঈশ্বরকে এইভাবে ধুলিধুসরিত চরণযুগলের অধিকারী মানবিক রূপদান করা এমন একটি অমার্জনীয় শিরক ও প্রতিমাকল্প, যা এমনকি বেদ-উপনিষদেও পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ? ইহতো নহী কি তুমসা জাঁহা-এমন নয় যে, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে সুন্দরী কেউ নেই, কিন্তু হৃদয়ের কথা কী বলবো, হৃদয় অন্য কোথাও যেতেই চায় না। উর্দু কবির এই প্রণয়োক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কারো পক্ষে কি এই মন্তব্য করা সম্ভব যে, এই ধরনের উক্তির মধ্যে নান্দনিকতা ও কাব্যগুণ যাই থাক, বস্তুতপক্ষে এই ধরনের কাব্যপংক্তি ব্যভিচারেরই মুখবন্ধ? বিসমিল্লাহ খানের শানাই যখন বাজে, তখন কি এই কথা বলা সম্ভব যে, রাসূল [সা] বলছেন-ফূর্তি ও বাদ্যযন্ত্র উৎখাতের জন্যই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে? বলা প্রায় সম্ভই নয়, বললে, বক্তার সংস্কৃতিচেতনা শুধু নয়, শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধ নিয়েই রীতিমত প্রশ্ন উঠবে এবং আধুনিক সংস্কৃতিজীবীদের মধ্যে সৃষ্টি হবে আক্রমণাত্মক প্রচণ্ড উষ্মা।

যাই হোক, সংস্কৃতি হলো মানুষের বিশ্বাস ও জীবনবোধেরই একটি বহি:প্রকাশ। এই বিশ্বাস ও জীবনবোধ যদি সত্য, শ্লীলতা, নৈতিক দাবী ও প্রকৃত-সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে বাহ্যত যাই-ই মনে হোক, সেই সংস্কৃতি আর সুস্থ মানবিক-সংস্কৃতি থাকে না। তখন সংস্কৃতি হয়ে ওঠে আরণ্যক প্রবৃত্তি ও অদম্য বায়বিক উত্তেজনার স্বাভাবিক শিকার। ফলত মানবিক সকল পরিচ্ছন্ন দাবীকে অস্বীকার করে সংস্কৃতি ও তথাকথিত সংস্কৃতিজীবীরা তখন নানা বেশ ও নানা মুখোশ পরিধান করে ইবলিশের এমন অনুগত কিংকারে পরিণত হয় যে, মানব সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস ও

www.pathagar.com

সর্বনাশ ছাড়া বিশেষ আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের এই বক্তব্য যে আদৌ অত্যুক্তি নয়, আধুনিক বিশ্বের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই সেটা অবিসংবাদিতভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। পশ্চিমাবিশ্বের কথা বলাই বাহুল্য, সারাবিশ্বেই এখন সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনার এক অপ্রতিহত অনিরুদ্ধ প্লাবন নেমে এসেছে। আর এই প্লাবন আজ এতটাই অপ্রতিরোধ্য যে, ব্যভিচার, মধ্যপান, লিভ টুগেদার এমনকি অকথ্য সমকামিতাও [Homo-sexuality] এখন সংস্কৃতির অঙ্গ এবং এমনকি আমাদের এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমস্যাকন্টকিত বাংলাদেশও ইবলিশের পদপিষ্ট এমন কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা অসংখ্য, যারা মদ্যপান ও অবৈধ-নারীসংগকে তাদের মেধা ও প্রতিভার অপরিহার্য জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে, যা না হলে তাদের সাংস্কৃতিক চেতনা একেবারেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সত্যই কী দুর্ভাগ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অদ্যকার এমন অভাবিত সাফল্য সত্ত্বেও শুধু সংস্কৃতির কারণে সভ্য-পৃথিবীর কী অসভ্য চেহারা!

আমরা এখন আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক উপক্রমণিকার পর মূল প্রতিপাদ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি হলো, মহানবী [সা]-এর সাংস্কৃতিক আদর্শ। বলা আবশ্যক যে, ভালো হোক মন্দ হোক, সংস্কৃতি মানব জীবনের একটি অপরিহার্য ভূষণ, সংস্কৃতিকে পরিহার করে জীবন সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোনো না কোনরূপ সংস্কৃতি ও জীবনাচার মানব জীবনকে অধিকার করে রাখবেই। আর এই জন্যই সুস্থ সংস্কৃতির কথা যেমন ওঠে, অসুন্দর অসুস্থ অপসংস্কৃতির কথাও ওঠে। এমতাবস্থায় এটাই স্বাভাবিক যে, সুস্থতা যদি পরাভূত হয়, নির্বাসিত হয় জীবন থেকে, তাহলে ব্যাধি ও অসুস্থতাই প্রবল হয়ে উঠতে বাধ্য। আর সংস্কৃতি-নামাঙ্কিত এই অসুস্থতা অধিকাংশ সময়ই এমন আকর্ষণীয় ও অপ্রতিহত হয়ে ওঠে যখন মনে হয়, রোগ ই সুস্থতা, বহুমুখী অধঃপাতকেই মনে হয় জীভনের সাফল্য ও উৎকর্ষ। অনিবার্য বটে যে, বর্তমান এই সভ্যতা একদিন ধ্বংস হবে। কিন্তু সেই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের অন্যতম একটি বড় কারণ হবে কুৎসিত-কদর্য অপসংস্কৃতির অবাধ ও অপ্রতিহত প্রসার। উল্লেখযোগ্য যে অনেক ঐতিহাসিকের মতে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা যে ক্ষয় পেতে পেতে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল হার্লটদের সর্বব্যাপী বিস্তৃতি ও দুর্দমনীয় দৌরাত্ম্য। তথাকথিত সংস্কৃতির নামে ঘৃণ্য-উপদংশ ও কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত বর্তমান এই বিশ্বনন্দিত সভ্যতার পরিণতিও যে ব্যাবিলনের মত পতন ও ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলেছে, এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কেউ স্বীকার করুক না করুক, এটা অকাট্য সত্য যে, ইসলাম মানব সভ্যতার জন্য আল্লাহপাক প্রদত্ত সৌন্দর্য ও সুস্থতার একমাত্র পূর্ণাঙ্গ পয়গাম, যে কারণে ইসলামকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ জীবনধর্ম [Complete code of life]। আর এটাও সত্য যে, আল্লাহপাকের করুণাস্নিগ্ধ এই পূর্ণাঙ্গ নেয়ামত ও ঐশ্বর্য আমরা পূর্ণাঙ্গরূপে লাভ করেছি মহানবী [সা]-এর মাধ্যমে এবং তাঁর সুন্নাহ অর্থাৎ তাঁর আদেশ-নির্দেশ কথা ও কর্মের যে সহীহ সংকলন, শুধু সেটাই নয়, তিনিই মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের সম্মুখে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন। যিনি যাইই ভাবুন, প্রকৃতপক্ষে আল কুরআন এবং রাসূল [সা]-এর জীবনাদর্শই হলো মুসলিম উম্মাহর তো বটেই সমগ্র

www.pathagar.com

মানব সম্প্রদায়েরই সামগ্রিক জীবনের অব্যর্থ হেদায়াত। অতএব সাংস্কৃতির কথা যদি ওঠে, মানুষকে বিনা বাক্য ব্যয়ে রাসূল [সা] কর্তৃক পেশকৃত আদর্শকে নি:শর্তভাবে মেনে নেয়াই সার্বিকভাবে যুক্তিযুক্ত, অবশ্য মানুষ যদি সুস্থতা চায়, কল্যাণ চায় ও ব্যাধিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে আগ্রহী হয়।

এখন প্রশ্ন, মহানবী [সা]-এর সাংস্কৃতিক আদর্শের যে রূপরেখা, তার স্বরূপ কী? অনেকে অবশ্য ভুলক্রমে হোক বা জেনেশুনে হোক, এ রকম ধারণা পোষণ করে যে, ইসলাম ও রাসূল [সা]-এর জীবনাদর্শের সঙ্গে সংস্কৃতির দাবীকে বিচ্ছিন্ন রাখাই সঠিক ও শ্রেয়। এতে সংস্কৃতিও যেমন অবাধ রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, আবার ইসলামও তার আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম নিয়ে আখেরাতের দিকে নিবিষ্ট থাকতে পারে। উত্তম বিবেচনা! আর এই বিবেচনার আদৌ কোনো বাস্তব যৌক্তিকতা যদিও নেই, তবু এই ধারণা যে কারো কারো মধ্যে খুবই প্রবল এতে সন্দেহ নেই এবং ঠিক এই ধারণাবশতই তারা ইসলামকে যেমন রাজনীতি ও আর্থসামাজিক [Political and socio-economic] ভূমিকা থেকে নিবৃত্ত রাখতে চায়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একইভাবে মহানবী [সা] উপস্থাপিত হেদায়াতকে অর্থাৎ ইসলাম ও মহানবী [সা]-এর জীবনাদর্শকে পরিহার করতে সংকল্পবদ্ধ এবং বলা বাহুল্য, এটাকে নির্দোষ ও অত্যাবশ্যক বলেও অনেকে গণ্য করে [নাউজুবিল্লাহ]। অথচ ইসলাম হলো এমন একটি দীন বা জীবনবিধান ও হেদায়াত, যা সম্পূর্ণরূপে আল কুরআন ও রাসূল [সা]-এর সুন্নাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এক্ষেত্রে কোনোররূপ রদবদলের অবকাশও নেই,হ্রাসবৃদ্ধিরও অবকাশ নেই। অতএব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মহানবীর [সা] পবিত্র জীবন ও শিক্ষাই আমাদের জন্য নি:শর্ত এবং অলঙ্ঘনীয় আদর্শ। পুরোপুরি মান্য করতে পারা না পারা অন্যকথা, কিন্তু কোনো মুসলমানের মধ্যে যদি এই আদর্শের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বিন্দুপরিমাণ অবিশ্বাসও থাকে, সে আর মুসলমানই থাকে না।

বলা আবশ্যক, আসলেই আলাদা করে বিবেচনার কিছু নেই। সংস্কৃতির প্রশ্নে রাসূল [সা]-এর পুরো জীবন এবং সেই পবিত্র জীবনে প্রতিবিম্বিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয় ও ঘটনার সম্বলিত রূপই, মুসলিম উম্মাহর তো বটেই, সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্যই একটি অবশ্য মান্য সাংস্কৃতিক রূপরেখা। এই জন্যই আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য আশীবাদ-স্বরূপ আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেন, তা গ্রহণ করো, যা থেকে বিরত থাকতে বরেন, বিরত থাকো' [আল কুরআন]। এবং আল কুরআনে এই কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে, 'আল্লাহ এবং তাঁর তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়' [সূরা আলে ইমরান আয়াত-১৩২]। আর এই যে অকাট্য বক্তব্যসমূহ, তার মধ্যে কি সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্তি নয়? যদি ইসলাম ও রাসূল [সা]-এর জীবনাদর্শের মধ্যে সংস্কৃতির কোনো দিকনির্দেশনা না থাকে, তাহলে ইসলাম তো একটা অসম্পূর্ণ দীন; ইসলামকে তো আর সর্বতোমুখী ও পরিপূর্ণ জীবনবিধান বলে অভিহিত করার কোনো যৌক্তিকতাই থাকে না।

আসলে সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও অভিজ্ঞান [Identity] নিয়ে যত কথাই বলা হোক, মূল কথা হলো, আল কুরআন এবং রাসূল [সা]-এর জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু করণীয় ও

www.pathagar.com

বর্জনীয় যা কিছু সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ, সবকিছু মিলিয়েই মুসলিম উম্মাহর সংস্কৃতি ও জীবনাচার। মুহাম্মদ [সা] সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর পেশকৃত পয়গাম ও জীবনাদর্শের মধ্যে দিয়েই মানব জীবনধর্ম পূর্ণায়ত রূপ লাভ করেছে। আর ইসলাম নামক এই জীবনধর্ম ঐহিক পারত্রিক উভয় জিন্দিগীর প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এক সুনির্দিষ্ট বাস্তব জীবনদর্শন এবং এই জীবনদর্শন ও বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি তথা মহানবী [সা]-এর সাংস্কৃতিক আদর্শের সারবস্তু। এই জন্যই পার্থিব জীবনকেই যারা চূড়ান্ত ও একমাত্র রঙ্গমঞ্চ বিবেচনা করে, যারা কবিতা-নাটক নৃত্যগীত ইত্যাদি লঘুবিনোদনকে অশ্লীল সংস্কৃতির সুদৃশ্য মোড়কে বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসারে ব্যস্ত, যারা জান্তব প্রবৃত্তির দাসত্বকে জীবনের নান্দনিকতা ও মোক্ষ হিসাবে বরণ করে নিয়েছে, তাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ও নিরর্থক। কারণ তাদের জীবনদর্শনই ইবলিশী কুহক দ্বারা ঘোরতরভাবে আচ্ছন্ন। 'তারা মূক ও বধির ও অন্ধ, তারা আর কখনোই পথে আসবে না' [সূরা বাকারা আয়াত-১৮]। অতএব এই ধরনের সংস্কৃতিজীবীদের কাছে রাসূল [সা]-এর শিক্ষা ও সুন্নাহর কোনো মূল্য নেই, আনুগত্য করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব এদের কথা নিয়ে বাহুল্য সময়ক্ষেপণ খুবই অবান্তর ও অহেতুক। উপসংহারে আমরা বরং আমাদের মূল প্রতিপাদ্যের কাছেই আবার ফিরে আসি।

বার বার বলতে হয়, রাসূল [সা] মানুষের কাছে মনুষ্যজীবনের যে নিখাঁদ কল্যাণ ও সর্বোচ্চ সাফল্যের শাশ্বত সওগাত পৌঁছে দিয়েছেন তাহলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সা] প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্য এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয়। এই তিনটি বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে মানুষের যে জীবন ও জীবনাচার গড়ে ওঠে, বিকশিত হয়ে ওঠে তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে পার্থিব সৌন্দর্য সুষমা, প্রবৃত্তির সকল অনুচিত দাবীকে অগ্রাহ্য করে ইনসাফ ও মনুষ্যত্ব জীবনে যে মহিমা এনে দেয়, অশ্লীলতার পক্ষ থেকে উঠে এসে মানুষ সর্বমানবিক মমতা ও ভালোবাসার যে সৌরভ ছড়াতে শেখে, সেটাই ইসলামের সংস্কৃতি, সেটাই রাসূল মুহাম্মাদ [সা]-এর সাংস্কৃতিক আদর্শ। রাসূল [সা] জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলো ও সর্বমানবিক মুক্তির বার্তা বয়ে এনেছিলেন। এই বার্তা একটি বিপ্লব, একটি অনির্বাণ আলোকবর্তিকা। সংস্কৃতিসহ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক আলোকবার্তা ছড়িয়ে আছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরাই মহানবী [সা]-এর শিক্ষা ও আদর্শ বিচ্ছুরিত এই সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। আর এই অক্ষয় উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করেই কবি ইকবাল বলেন, 'সালারে কারওয়াঁ হায় মেরে হিজায আপনা, ইস নাম সে হায় বাকি আরামে জাঁ হমারা'- 'মানববংশের শ্রেষ্ঠতম সন্তান হিজাযের সেই মহামানব আমাদের নেতা, এই নামেরই মহিমায় আমাদের প্রাণে জেঁকে থাকে স্বস্তি ও আরাম।' শুধু স্বস্তি ও হৃদয় জুড়ানো শান্তির কথাই নয়, যে কোনো সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা ইকবালের ভাষায় এ কথাও বলতে পারি :

'পাশ্চাত্যের চাকচিক্য
আমার চক্ষুকে প্রতারিত করতে পারেনি,
কারণ মদীনার ধূলিকণা
আমার দু'চোখে জড়িয়ে ছিল সুরমা হয়ে।' ■

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুস্থ সংস্কৃতির ভিত্তি

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

আমি সংস্কৃতিবান লোকদেরকে 'সত্যকে' এইভাবে দেখতে বলি যে, আগুন তাপ দেয়, কখনো ঠাণ্ডা দেয় না। আগুন কারো জন্য উষ্ণ কারো জন্য ঠাণ্ডা এমন নয়। আবার ঝড়ের কথা আমরা বলতে পারি, ঝড় গাছ-পালা ভাঙ্গে, ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে-চুরে ফেলে, জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে এবং জান-মালের প্রচুর ক্ষতি করে। ঝড় কালো ফর্সা দেখে না, ধনী-গরিব দেখে না, শিক্ষিত-অশিক্ষিত দেখে না। আগুন বা ঝড় দৃশ্যমান বস্তু। কিন্তু যা অদৃশ্য যেমন ক্রোধ, প্রতিহিংসা বা লালসা এসব বিষয়গুলো নিজের এবং অপরেরের চরম ক্ষতি করে। লোভ-ক্রোধের কাছেও কোন বাছ-বিচার নেই। সবল-দুর্বল, ক্ষমতাবান বা অসহায় সবার সমান ক্ষতি করে। অর্থাৎ যা কিছু মন্দ এবং ক্ষতিকারক তা সবার জন্য মন্দ এবং ক্ষতিকারক। বিপরীতদিকে-যা কিছু ভালো ও সুন্দর তা সবার জন্য ভালো ও সুন্দর।

আজ তুমি ক্ষমতাবান বলে মন্দ কাজে তুমি ভালো ফল পাচ্ছো, এর মানে এই নয় মন্দ ভালো ফল দেয়। তুমি ক্ষমতাবান বলে বস্তুজগতের প্রাণী ও মানুষ যেমন তোমাকে ভয় পায় তেমনি 'মন্দও' তোমাকে ভয় পায়। কাছে ঘেঁষতে চায় না। তাই বলে তোমার সৃষ্টি মন্দ কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় না। সে তোমার জীবনে মন্দ আনবেই।

www.pathagar.com

অনাদিকাল পর্যন্ত, এমনকি তোমার মৃত্যুর পরও সে মন্দ বেঁচে থাকে। মন্দের মন্দ ফল তুমি পাবেই। অথবা আজ তুমি দুর্বল বলে ভাল কাজ করেও মন্দ ফল পাচ্ছো, এর মানে এই নয় যে ভালোর ফল তুমি পাবে না। আজ হোক কাল হোক ভালোর ফল তুমি পাবেই। কারণ তোমার সৃষ্ট 'ভালো'র মৃত্যু নেই। সেও অনাদিকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এমনকি তোমার মৃত্যুর পরও। সে ভালোর ভালো ফল তুমি পাবেই পাবে। ভালো ও মন্দ হচ্ছে গুণ, বস্তু আকৃতিগত দিক দিয়ে নানা রঙের হলেও দৃশ্য বা অদৃশ্য কোন বস্তুর গুণ পরিবর্তন হয় না। মিষ্টির উৎস বিভিন্ন হতে পারে, সেই উৎস বস্তুর পরিবর্তন বা বিবর্তন সাধিত হতে পারে কিন্তু তার যে জাত সত্তা মিষ্টত্ব, এর পরিবর্তন হয় না। ভালো ও মন্দ দুটি পৃথক সত্তা। কোন বস্তু, বিষয় বা মানুষের ওপর আমরা ভালো বা মন্দ সত্তা আরোপ করি। মানুষ নিজে ভালো বা মন্দ নয়। তবে টেলিভিশন বা এই ধরনের বস্তু তৈরির সময় নির্মাতা ইন-বিল্ট হিসেবে এর মধ্যে 'ভালো' ঢুকিয়ে দেন। ভালো গুণটি দুর্বল বা নষ্ট হলে মন্দ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং টেলিভিশনটি নষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহও মানুষসহ সবপ্রাণীর মধ্যে ইন-বিল্ট হিসেবে 'ভালো' ঢুকিয়ে দিয়েছেন। খারাপ উপাদানে ভরা সংস্কৃতিগুলো সেই ভালোকে শুধু নষ্ট করে ফেলে তা নয়, মানুষের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে ফেলে, মানুষের সুবিচারবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ কেড়ে নেয়, নিজের ও নিজেদের প্রতি এক ঘৃণিত ভালোবাসার জন্ম দেয় যা অন্যের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধকে লুপ্ত করে ফেলে। অথচ অন্যের প্রতি ভালোবাসাই মানুষকে মানুষ হিসেবে উন্নিত করে।

এখন প্রশ্ন হলো ভালো ও মন্দের মাপকাঠি কি? অথবা ভিত্তি কি? যা তোমার ভালো মনে হয় তাই-ই কি ভালো? অথবা তোমার গুরুজন যাকিছুকে ভালো বলেন তাই কি ভালো? অথবা বহুলোক বলছে এটি ভালো, অথবা খুব জ্ঞানী-পণ্ডিত কোনো ব্যক্তি বা দার্শনিক বলছেন এটি ভালো, তাই কি ভালো? মনে রাখতে হবে সূর্যকে সবাই সূর্য বলে, লাল রঙকে সবাই লাল রঙ বলে কিন্তু একটি 'ন্যায়কে' সবাই ন্যায় বলে না। একটি 'সত্যকে' সবাই সত্য বলে না। একটি 'উচিৎকে' সবাই উচিৎ বলে না। তাহলে? এসবের সহজ ও সরল উত্তর হলো: যিনি সূর্য, লালরঙ, ন্যায় এবং উচিতের স্রষ্টা তাঁরই মতামতকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তিনি ওপর থেকে মাইক দিয়ে বলবেন না যে কিসে ন্যায় বা কোন বিষয়টি উচিৎ। সেটা বিজ্ঞানের পরিপন্থি। অথচ তিনি বিজ্ঞানময়। নীলাকাশ থেকে বৃষ্টি পড়া বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। সূর্যের কীরণে পানি বাষ্প হবে, বাতাসে ভেসে ভেসে তা আকাশে উঠবে, একত্রিত হয়ে তুলোর মত দল বেঁধে ভাসবে, তাতে একসময় কালো রঙ ধরবে তারপর ঠাণ্ডা বাতাস লেগে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়বে। এটাই বিজ্ঞানভিত্তিক এই কারণে যে এতে চিন্তা-গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ এটাই চান যে মানুষ তার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুক। এতে মানুষের জ্ঞান বাড়বে, সে স্রষ্টার মহত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ নিজেই তাঁর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সেইসব বুদ্ধিমান লোকের জন্য অসংখ্যা নিদর্শন রহিয়াছে, যাহারা উঠিতে বসিতে ও শুইতে সকল অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে। তাহারা স্বত:স্ফূর্তভাবে বলিয়া ওঠে, আমাদের রব! এইসব কিছু তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করো নাই।' [সূরা আল বাকারা : আয়াত-১৯০-১৯১]

অতএব ভালো-মন্দ বিচারের ভিত্তি হলো আল কুরআন এবং আল কুরআন যার মাধ্যমে

www.pathagar.com

এসেছে সেই মহানবী, শেষ নবী এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর সুন্নতে রাসূল তথা হাদিসসমূহ। মহানবী [সা]-এর সাংস্কৃতিক মানদণ্ড কি ছিল! একটি মানুষের সাংস্কৃতিক উপাদান এবং উপকরণগুলো অন্যের জন্য। একজন কারিগর প্লাস্টিক দিয়ে যে খেলনা বানায় তা অন্যের জন্য। কারিগর একজন শিল্পী। শিল্পী যা করে তা অন্যের জন্য করে। কিন্তু এগুলো বৈষয়িক সংস্কৃতি। মানুষের মনকে যা রঞ্জিত করে তাই মানসিক সংস্কৃতি। সঙ্গীত, কবিতা, সাহিত্য, চিত্রকলা, অভিনয়, নাটক, চলচ্চিত্র এসবই মানসিক সংস্কৃতির বিষয়। কাজগুলো বড় গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অন্তর্লোকের সৎ-প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করা অথবা মন্দ-প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করা এই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। এর পরবর্তী পদক্ষেপে মানুষ বৈষয়িক সাংস্কৃতিক কর্মে লিপ্ত হয়। এখন মানসিক সংস্কৃতির ভালো-মন্দের ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা যাক:

এক্ষেত্রে দু'একটা উদাহরণের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। যেমনঃ তুমি একটা অর্ধ-উলঙ্গ যুবতীকে নায়িকা করে নায়ক সেজেছো, নাচছো, গাইছো, জড়িয়ে ধরছো... যুবতী তোমার কোনো আত্মীয় নয়। আচ্ছা ধরা যাক যুবতীটি তোমারই স্ত্রী, কন্যা অথবা বোন, তুমি কি পছন্দ করবে সেও অন্য নায়কের সাথে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে নাচুক বা জড়িয়ে ধরুক! যতোই এটা অভিনয় হোক তুমি কখনোই তা পছন্দ করবে না। আবার অন্যদিক দিয়ে ভাবা যাক, যেমনঃ বেয়াদবীর কারণে একটি ছেলেকে তুমি থাপ্পড় দিলে, এখন তোমার বেয়াদবীর কারণে তোমার চেয়ে শক্তিশালী কেউ যদি তোমাকে থাপ্পড় দেয়, তুমি সেটাকে উচিৎ না অনুচিত বলবে? এসব ক্ষেত্রে এসবের পক্ষে যত যুক্তি এসেছে তাতে দেখা যায় সম্মান, অর্থ, ক্ষমতাশালীর মতো কতোকগুলি শব্দের দোহাই দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলেছে এবং আজো চলছে। অন্যদিকে গালভরা বুলি, 'একটি অপরাধের কারণে একজন সাধারণ মানুষের যে শাস্তি হবে একজন প্রধানমন্ত্রীরও একই শাস্তি হবে। এবং এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত গণতন্ত্র।' কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। এই সংস্কৃতিই দেশে, সমাজে এবং সমগ্র পৃথিবীতে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে। শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা এবং সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

অতএব ভালো এবং মন্দের মাপকাঠি অথবা ভিত্তি হিসেবে আমরা নিশ্চিন্তে ও পরম বিশ্বাসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উন্নত সংস্কৃতির জনক হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর সংস্কৃতিই গ্রহণ করতে পারি এবং তা হলো: 'ভালো তাই যা তুমি নিজের জন্য ভালো মনে করো তা অন্যের জন্যও ভালো মনে করো।' আর মন্দ তাই 'যা অন্যের জন্য মন্দ মনে করো তা নিজের জন্যও মন্দ।' প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এই বিষয়টিকে অন্যভাবে বলেছেন, তিনি বলেছেন, নিজেকে অন্যের মধ্যে অনুভব করা এবং অন্যকে নিজের মধ্যে অনুভব করার নামই সংস্কৃতি। আসলে মহানবী [সা]-এর হাদিসটিকে যে আঙ্গিকেই ব্যাখ্যা করা হোকনা কেন সুস্থ সংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্ব এই হাদিসটিতেই নিহিত। এই তত্ত্বের ভিত্তি শুধু মঞ্চ বা সিনেমা টিভির পর্দাই নয় বরং পরিবার সমাজ দেশ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সুস্থতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।■

www.pathagar.com

মহানবী [সা]

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

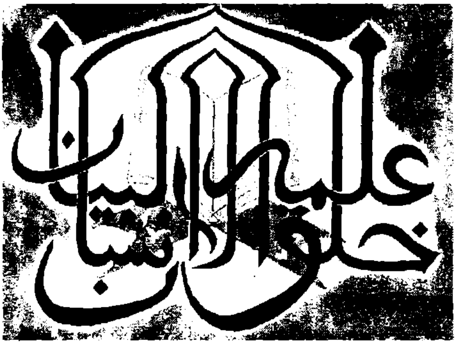

মানবজাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা ইতিহাসের গতিধারাকে পাল্টে দেন, সমাজ ও জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তাঁদের মহত্তম জীবন, প্রচারিত আদর্শ ও কর্ম তৎপরতায় নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয় এমন কি, অনেকে নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটাতে বা বিশ্ব-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হন। মানব সমাজে তাঁদের অসাধারণ অবদানের জন্য আমরা তাঁদেরকে মহামানব বা অন্য কোন সম্মানজনক বিশেষণে আখ্যায়িত করি। এ ধরনের অসাধারণ ব্যক্তি বা মহামানবদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে তাঁদের মূল্যায়ন করা যায়।

প্রথম শ্রেণীতে পড়েন, মহান স্রষ্টার ওহী-প্রাপ্ত, বার্তা-বাহক নবী-রাসূলগণ। নবী-রাসূল হিসাবে তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। মানবজাতির নিকট আল্লাহর দ্বীন প্রচার, মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন এবং মানবজাতিকে ইহ-পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখানোই তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁরা নি:সন্দেহে সকল ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে, উন্নত-মহৎ আদর্শ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কারণ তাঁরা নিজে থেকে কিছু করতেন

www.pathagar.com

না বা বলতেন না। তাই তাঁদের ভুল করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাঁরা আমাদের মতই মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি বা রাসূল হিসাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিলেন আদর্শ, অনুসরণীয় মহত্তম ব্যক্তিত্ব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অসাধারণ ব্যক্তিরা হলেন-নবী-রাসূলদের পদাংক অনুসরণকারী কিছু সংখ্যক মহৎ মানুষ। যুগে যুগে এঁরা আবির্ভূত হয়ে সমাজ ও সভ্যতায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এঁরা নবী-রাসূলদের মত ঐশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু নবী-রাসূলদের পদাংকানুসারী হিসাবে ঐশী জ্ঞানে তাঁরা উদ্ভাসিত ছিলেন এবং নিজের জীবন ও সমাজে সেই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে সদা তৎপর ছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অসাধারণ ব্যক্তিরা ওহীর জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত নন। বস্তুগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁরা জীবন ও জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেযোগ্য অবদান রেখেছেন। মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে তাঁরাও স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের স্ব স্ব মূল্যবান অবদানের জন্য। তবে ঐশী জ্ঞানের অধিকারী না হওয়ায় তাঁরা যত মহৎই হোন না কেন, তাঁরা মানবীয় ভুলক্রটির উর্ধ্বে নন। তাঁদের অনুসৃত আদর্শ বা জীবনাচরণও সর্বাংশে নির্ভুল নয়।

মহানবী মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী-প্রাপ্ত রাসূল। মহান স্রষ্টা যুগে যুগে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ, খাতামুন নাবীইন, ইমামুল মুরসালীন। অতএব, তিনি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রথমোক্তদের মধ্যেও প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন : "... তোমাকে মানুষের জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি; সাথী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। [সূরা নিসা : আয়ত ৭৯-৮০]।

রাসূলগণ [সা] আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। মহানবীও [সা] আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, উপরোক্ত আয়াতে সে কথাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলের আনুগত্য মানে আল্লাহরই আনুগত্য কারণ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর নির্দেশ মতো মানব জাতির কাছে তাঁর মনোনীত দ্বীন প্রচার করেন। তাঁরা যা কিছু বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন। তারা কখনো নিজেদের মনগড়া কোন কথা বলেন না। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন : "বল, 'আমি তো প্রথম রাসূল নাই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে, আমি আমার উপরে যা ওহী হয় কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" [সূরা আহকাফ : আয়ত ৯]।

নবী-রাসূলদের একমাত্র কাজ হলো, দ্বীনের দাওয়াত দেয়া এবং মানুষকে সতর্ক করে দেয়া যাতে তারা আল্লাহর দ্বীন অনুসরণ করে। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে : "হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।" [সূরা আহযাব : আয়ত ৪৫-৪৬]।

উপরোক্ত আয়াতে মহানবীকে [সা] 'উজ্জ্বল আলো রূপে' আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ আলো হলো হিদায়াতের আলো। হিদায়েতের প্রকৃত মালিক স্বয়ং আল্লাহ। নবী-

www.pathagar.com

রাসূলদেরকে তিনি হিদায়াতের মূর্ত প্রতীক করে পাঠান যাতে তাঁদের দেখে অন্যরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। অন্যত্র মহান আল্লাহ আল- কুরআনকে 'নূর' বা আলোকরূপে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য এক শাশ্বত দিক-নির্দেশিকামূলক গ্রন্থ। মহানবী [সা] ছিলেন 'জীবন্ত কুরআন' অর্থাৎ কুরআনের আদেশ-নিষেধ তিনি নিজের জীবনে পুংখানুপুংখরূপে বাস্তবায়ন করেছেন, সমগ্র মানবজাতির নিকট তা জীবন্ত নির্দন হিসাবে পেশ করার জন্য। তাই স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা মহানবীকে [সা] 'উজ্জ্বল প্রদীপ' বলে ঘোষণা করেছেন। প্রদীপ যেমন অন্ধকাররাশি দূর করে পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দেয়, মহানবীও [সা] তেমনি অমানিশার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত পথহারা মানবজাতির জন্য এক শাশ্বত উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ।

আখিরী নবীর পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলই একটি বিশেষ কাল, অঞ্চল ও জনগোষ্ঠির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু মহানবীকে [সা] সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী-রাসূলের আর্বিভাব ঘটবে না। তাই তাঁর প্রচারিত দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। মহান আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন :

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; কিন্তু [সে সম্পর্কে] অধিকাংশ মানুষ অবহিত নয়। [সূরা সাব : আয়াত ২৮]

মহানবীর [সা] আবির্ভাবের কথা তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের ওপর অবতীর্ণ বিভিন্ন আসমানী কিতাবেও উল্লেখ আছে। মহানবীর [সা] দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে এবং মানবজীবনে সাফল্য অর্জন ও সত্যপথ লাভের জন্য তাঁকে অনুসরণ করা অপরিহার্য, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার সুস্পষ্ট ঘোষণা :

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর-যার উল্লেখ তাদের [খৃস্টান ও ইহুদী] নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং সে মুক্ত করে তাদেরকে গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে যা তাদের ওপর ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর [অর্থাৎ আল-কুরআন] তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম। বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই: তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে [অর্থাৎ আল-কুরআন] ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও।" [সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৭-১৫৮]

জীবনে সাফল্য অর্জন ও সঠিক পথের সন্ধান পেতে হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর এবং রাসূলের ওপর অবতীর্ণ ঐশী কিতাবের উপর ঈমান আনতে হবে এবং তা যথাযথরূপে অনুসরণ করতে হবে। এখানে কোন দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই, মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে এ এক সুস্পষ্ট ঘোষণা। এরদ্বারা মহানবীর [সা] একক, সর্বোচ্চ, অতুলনীয় ও অনন্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনের অন্যান্য

www.pathagar.com

স্থানেও মহানবী [সা] সম্পর্কে অনুরূপ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা রয়েছে।

অতএব, সাধারণ মানুষ থেকে মহানবীর [সা] শ্রেষ্ঠত্ব, অন্যান্য মহামানব থেকে এমন কি, অন্যান্য নবী-রাসূল থেকেও তাঁর পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তাই জগতের অন্যান্য মহামানবদের মত তাঁকে শুধু একজন মহামানব বললে তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয়না। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মহামানব। মুসলমানগণ তো বটেই, দুনিয়ার বহু বিশিষ্ট অমুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণও তাঁকে মানব জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

মহানবী [সা] যে ঐশীবাণীর ভিত্তিতে শতধা বিভক্ত অধ:পতিত আরব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিপ্লবী সমাজ গঠন করেছিলেন এবং আইয়ামে জাহিলিয়াত যুগের অসভ্য, বর্বর ও নৈতিকতাবোধহীন মানুষকে উন্নত মানবিক গুণে গুণান্বিত অসাধারণ মানুষে পরিণত করেছিলেন, জগতের ইতিহাসে তা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। মহানবীর [সা] সমকালীন বিশ্বে এবং তাঁর পরবর্তী সময়েও মানব সমাজ ও বিশ্ব সভ্যতায় তাঁর অসাধারণ প্রভাব যুগ যুগ ধরে অনুভূত হচেছ এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন মানুষ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করা আদৌ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তিনি একক ও অনন্য। মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকেই তাঁর শান ও মর্যাদাকে এত সমুন্নত করা হয়েছে।

মহানবী [সা] যে ঐশী জ্ঞানের ভিত্তিতে এ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। সেটা মানব-রচিত কোন মত, আদর্শ বা ধর্ম নয়, মানব-রচিত হলে তার মধ্যে অবশ্যই নানা ভুল-ত্রুটি, অসংগতি, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকতো। কালের পরীক্ষায়ও তা উত্তীর্ণ হতে পারত না। যেহেতু এটা স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত তাই এতে কোন ভুল-ত্রুটি, অসংগতি , দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা নেই। এটা চিরকালীন, শাশ্বত ও সামগ্রিক কল্যাণকর জীবন-ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে, ধর্ম-দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে; এক কথায় জীবনের সাথে যুক্ত সকল ক্ষেত্রে মহানবী [সা] যে বিস্ময়কর ধারণা নিয়ে এসেছেন ও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন তা শুধু আরবের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ব-সভ্যতায় এবং সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য ও বিপ্লবী পরিবর্তনের ধারা সূচিত করে।

মহানবীর [সা] বিপ্লবী জীবনাদর্শ ভৌগোলিক সীমারেখায় যেমন আবদ্ধ নয়, কালের গণ্ডীতেও তেমনি সীমিত নয়। স্থান-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করে চিরকালীন বিশ্ব মানুষের নিকট তার অন্তহীন, শাশ্বত আবেদন সদা বিদ্যমান। একবিংশ শতকেও তাই এ জীবনাদর্শের আবেদন এতটুকু হ্রাস পায়নি; বরং তা আধুনিক সমস্যা-সংকুল বিশ্বে নব উদ্যমে বিশ্বব্যাপী নবজাগৃতির সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। শতধা-বিচ্ছিন্ন, সংক্ষুব্ধ, অশান্তির দাবানলে দগ্ধ, সমস্যাপীড়িত বিশ্ব আজ এক শান্তিপূর্ণ, সুন্দর, নিরাপদ

www.pathagar.com

বিশ্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় উন্মুখ। মানব-রচিত বিভিন্ন মতাদর্শ এ কাংখিত বিশ্ব বিনির্মাণে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে। পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি অসংখ্য তন্ত্রমন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানবজাতি বার বার পরখ করে দেখেছে। কিন্তু একে একে সবই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। তাই বিশ্বের অগণিত মানুষ আজ আবার ইসলামের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। মহানবীর [সা] অনিন্দসুন্দর জীবনাদর্শ, তাঁর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব এবং তার ভিত্তিতে আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে গঠিত শান্তি পূর্ণ, নিরাপদ, সুন্দর, কল্যাণকর সমাজ আজ বিশ্ব-মানুষের নিকট স্বপ্ন-সম্ভাবনার হাতছানি বুলিয়ে যাচ্ছে। কাংক্ষিত সুন্দর সমাজ ও নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, কল্যাণকর বিশ্ব বিনির্মাণে সেই মহান ব্যক্তির অতুলনীয় জীবনাদর্শ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজ আজও মানবজাতির সামনে এক অতুলনীয় মডেল।

মহানবী [সা] ছিলেন সর্বগুণান্বিত এক অতুলনীয় বিস্ময়কর মানুষ। মানবীয় সকল গুণের আঁধার হিসেবে মহান স্রষ্টা তাঁকে মানবজাতির আদর্শ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন : "রাসূলকে [সা] আমি তোমদের [মানবজাতি] জন্য সর্বোত্তম আদর্শরূপে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা আহযাব : আয়াত ২১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন : "তুমি অবশ্যই শ্রেষ্ঠতম চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" [সূরা কলম : আয়াত ৪]

মহান আল্লাহ যাঁকে সর্বোত্তম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম চরিত্রবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাঁকে মানব ইতিহাসের সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যও মনোনীত করেন। ফলে তিনি যেমন মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজও সর্বকালের আদর্শ ও অনুসরণীয় সমাজ। অনরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, হতাশাগ্রস্ত মানুষের মুক্তি ও প্রত্যাশিত সাম্য, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। সেজন্য অবশ্য মহানবীর [সা] আদর্শে অনুপ্রাণিত নিষ্ঠাবান, উন্নত চরিত্রবিশিষ্ট, ত্যাগী মানুষ প্রয়োজন।

এ আদর্শ সমাজের মূলভিত্তি দুটি : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও পবিত্র সুন্নাহ বা মহানবীর [সা] অতুলনীয় জীবনাদর্শ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন-এর ভিত্তিতেই মহানবী [সা] সে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই অনুরূপ আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আল-কুরআনকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী [সা] ধাপে ধাপে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে।

হতাশাগ্রস্ত, অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে আজ শান্তি ও কল্যাণকর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মানুষের। যুগে যুগে বিভিন্ন মত-দর্শন ও পদ্ধতিতে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা মানব জাতির জন্য প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। তাই আমাদেরকে আজ প্রকৃত শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল-কুরআন ও মহানবীর [সা] জীবনাদর্শকে ধারণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বোতভাবে সচেষ্ট হতে হবে।■

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর আইন ও সাম্প্রতিক বিশ্ব

ডক্টর আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম

মহান আল্লাহই হচ্ছেন মানুষের স্রষ্টা। মাখলুক হিসাবে মানুষের রয়েছে অসংখ্য দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা। তন্মধ্যে অন্যতম সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, তার জ্ঞানের কমতি। মহান আল্লাহর বাণীতে এই বাস্তবতাই ঘোষিত হয়েছে– "এবং তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" [আল-কুরআনুল কারীম ১৭ : ৮৫] স্বত:সিদ্ধ এই কথাটার প্রমাণ পাওয়া যায়, মানব জাতির জ্ঞানের পরিধি পরিমাপের মাধ্যমে। অতীতের কিছু কিছু বিষয় তারা মনে রাখতে পারে। ভবিষ্যত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। বর্তমান সম্পর্কে তার ধারনা খুবই সীমিত। তার এই সীমিত জ্ঞান দিয়ে সর্বকালের সর্বযুগের উপযোগী সার্বজনীন আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। সে জন্য মানব রচিত আইন মূলত: হয় অসম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যশীল, সর্ব কালের অনুপোযুক্ত। উক্ত আইন মানুষের জন্য হয়ত সাময়িক মংগলজনক হলেও অদূর ভবিষ্যতে তার গ্রহণ যোগ্যতা থাকে না। বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে উদ্ভাবিত হল সমাজতন্ত্র। ক'দিন যেতে না যেতেই, তা যে মানবতার মুক্তির জন্য ব্যর্থ, সেই কথাটি প্রমাণিত হল। এ কারণেই মানুষের জন্য সর্বময় জ্ঞানী, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন, সেই বিজ্ঞ অভিজ্ঞ মহান

www.pathagar.com

শক্তিধর স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাদের জন্য একটা সর্বজনীন আইন প্রণয়নই ছিল, বাস্তবতার অনিবার্য দাবি। মহামহিম রাব্বুল আলামীন তাই মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্য কালোত্তীর্ণ এক চূড়ান্ত আইন প্রণয়ন করলেন, যার বাস্তব রূপই হচ্ছে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। অবশেষে এটাকে তিনি তার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানব জাতীর জন্য পরিপূর্ণতা দান করলেন। মহান আল্লাহর এই আইনের ধরন, প্রকৃতি, সফলতা; বিশেষ করে মানব সমাজে এর প্রয়োগ না থাকার কারণে সমগ্র পৃথিবীতে যে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা, অনাচার, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতি দিক নির্দেশই হচ্ছে, এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

আইন প্রণয়নের অধিকার

ইসলামী আইন সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। ভৌগোলিক সীমারেখা, বর্ণ, ভাষা, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির পার্থক্য চুরমার করে কিয়ামত পর্যন্ত যে মানুষই পৃথিবীতে আসবে তাদের সকলের জন্যই এ আইন উপযুক্ত। বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন এই আইন বিশ্বনিখিলের রব মহান আল্লাহ সুবহানাহু অতায়ালার পক্ষ থেকেই প্রণয়ন হচ্ছে যুক্তিযুক্ত। এই আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র আধিপত্য শুধু তার জন্যই নির্ধারিত হওয়া বাঞ্চনীয়, সেই জন্য আইন প্রণয়নের এই গুরু দায়িত্বটি মহান আল্লাহই এককভাবে গ্রহণ করেছেন। এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কারো কোন অধিকার রাখা হয় নাই। ঘোষিত হয়েছে- "কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই তিনি সত্য বিবৃত করেন ববেং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ।" [আল-কুরআনুল কারীম ০৬ : ৫৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে-"বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি অন্য কারো ইবাদাত না করতে নির্দেশ দিয়েছেন।" [আল-কুরআনুল কারীম ১২ : ৪০]

বর্ণিত হয়েছে-"শুরায়হ ইবন হানী তার পিতা হানী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রতিনিধি হয়ে গেলেন তখন তারা হানীকে আবুল হাকাম [বিধানদাতা] কুনিয়াতে অভিষিক্ত করছিলেন, সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহই বিধানদাতা, আর বিধান তাঁর থেকেই; সুতরাং কেন তোমাকে বিধানদাতা বলা হয়?" [আল মুসতাদরাক 'আলাসসাহিহায়িন, ১খ. পৃ; ৭৫]

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত যে অন্য কারো কোন অধিকার স্বীকৃত নয়, তার স্পষ্ট প্রমাণও রয়েছে রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনে। তিনি এক সময় বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ কতৃক হালালকৃত কিছুকে হারাম করে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ কোন ছাড় দিলেন না। প্রতিবাদ করে আয়াত অবতীর্ণ করলেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে-

"রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার এক স্ত্রীর ঘরে উম্মি ইবরাহীমের সাথে মিলিত হলে তার উক্ত স্ত্রী তাকে বললেন হে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমারই ঘরে আমারই বিছানায় এই কাজ! তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লাম উম্মি ইবরাহীমকে নিজের জন্য হারাম ঘোষনা করলেন। তার উক্ত স্ত্রী তাকে বললেন হে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপনি কিভাবে আপনার উপর যা হালাল ছিল তা হারাম করছেন? তখন তিনি তার সম্মুখে তার সাথে মিলিত না হওয়ার জন্য শপথ করলেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবতীর্ণ করলেন–

হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা কেন নিষিদ্ধ করছ? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ।" [তাফসীরুত তাবারী,১২খ. পৃঃ ১৪৭]

সুতরাং আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র অধিকারী। এতে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের কোন কিছুই ইসলামে স্বীকৃত নয়। তবে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েও আইন প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন।

আল্লাহর আইনের উৎস

মূলত আল্লাহর আইনের উৎস হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে ওহী মাতলূ', অর্থাৎ ঐ ওহী যা মহান আল্লাহর ভাষায়ই কুরআন হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওহী গায়রী মাতলূ' অথাৎ যা আল্লারই নির্দেশনা তবে তা আল্লাহর ভাষায় অবতীর্ণ না হয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভাষায় না হয় তার সিদ্ধান্তের ও কর্মকান্ডের আকারে উপস্থাপিত হয়েছে । এটির নাম হচ্ছে সুন্নাতুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও অকাট্য সুন্নাহ দু'টিই আল্লাহর আইন হিসেবে গণ্য। এই বাস্তব সত্যই ফুটে উঠেছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভাষায়। তিনি বলেন-

" রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।" [মুয়াত্তা' মালিক, মিশর, তা.বি, ২খন্ড, পৃঃ ৮৯৯]

ইসলামের মানদন্ডে আল্লাহর আইন

ইসলামের মূল দর্শন হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করা। সেই আলোকে মহান আল্লাহ প্রণীত আইনের অনুসারী হওয়া ও যথাসম্ভব তা প্রয়োগ করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য। আল্লাহর আইন মানা মূলতঃ তার ইবাদতেরই শামিল। ইবাদাত যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা শিরক, তেমনি আল্লাহর আইন বাদে অন্য আইন মানাও শিরক।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আইন উপেক্ষা করে ধর্মযাজকদের প্রণীত আইন মানাকে ধর্মযাজকদের ইবাদাত নামে উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন- আদ্দী ইবন হাতিম বললেন, আমরা তো তাদের ইবাদাত করিনা। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা কি হারাম আর তিনি যা হারাম করেছেন তা কি হালাল

www.pathagar.com

করে না? তিনি বললেন, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন এটাই তাদের ইবাদাত।"

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-"নবী আ. বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা এবং তাদের নিকট দু'আ করাকে ইবাদাত গন্য করা হয়নি; বরং হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করাকেই তাদের ইবাদাত করা বলে গন্য করা হয়েছে।" সুতরাং ইবাদাত যেমন একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন বৈধ নয়, তেমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রণীত আইনমান্য করা ও প্রয়োগ করার মাধ্যমে তাদের ইবাদাত করাও বৈধ নয়। এ কারনেই আল্লাহর আইন যাদের প্রয়োগ করার সুযোগ থাকার পরও প্রয়োগ করে না, তাদেরকে কুরআনের ভাষায় 'কাফির', 'জালিম', ও 'ফাসিক' বলা হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ প্রণীত আইনকে উপেক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত।

আল্লাহ প্রণীত আইনের শাসনকে লঙ্ঘন আল্লাহদ্রোহী তাগুতের আইন মানারই শামিল। আর তাগুতের আইন মানা হচ্ছে, গুমরাহীর চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার নামান্তর। ঈমান আনার পর এই অবান্তর কাজকে আল-কুরআনে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

এ আয়াতে মুসলমান হিসাবে দাবীদার হয়েও মানব রচিত আইন যারা প্রয়োগ করে তাদেরকে কঠোর ভাষায় হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। ইমাম ইবন তায়মিয়্যাহ এই আয়াতের ব্যাখায় বলেন-

"যারা পরিপূর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনার দাবি করে তবে কিতাব ও সুন্নাহের আলোকে বিচার ফায়সালা করে না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন বড় আল্লাদ্রোহীর নিয়ম নীতির আলোকে বিচার ফায়সালা করে আল্লাহ তাদেরকে এখানে তিরষ্কার করেছেন।" [মাজমু' ফাতাঅ', ইবন তায়মিয্যাহ, ১২ খ:, পৃ: ৩৩৯-৩৪০]

আল্লাহর আইন প্রয়োগ যে ইবাদত হিসাবে গণ্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় একজন মণীষীর উক্তিতে তা ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন-

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা না করে শুধু মাত্র তারই বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করা আল্লাহরই ইবাদাত করারই নামান্তর।"

সুতরাং আল্লাহ প্রণীত আইন প্রয়োগ ইবাদত হিসাবেই গণ্য। মানব প্রণীত আইন প্রয়োগ কঠোর অপরাধ বলে বিবেচিত শিরকের নামান্তর। এমন কি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহর আইন প্রয়োগ হলে তার নিকট আত্মসমর্পণ না করলে মুমিন না থাকার হুশিয়ারী বাণীও উচ্চারিত হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর আইনের প্রয়োগ ও আল্লাহর আইনের ফায়সালা অকুণ্ঠ মেনে নেয়াই হচ্ছে, ঈমানের অংশ বিশেষ। মু'মিন থাকতে হলে এর বিরোধীতা কখনো সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে ডক্টর আব্দুল আজীজ আলি আব্দুল লতীফ বলেন, ঈমানের জন্য যেহেতু মহান আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা অনিবার্য শর্ত, সেহেতু আল্লাহদ্রোহী ও জাহিলী বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা ঈমানের পরিপন্থী।

আল্লামাহ সা'আদী এ প্রসংগে আরো বলেন যে, ঈমানের দাবীই হচ্ছে,আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা, সুতরাং যে নিজে মুমিন হওয়ার দাবী করে আবার আল্লাহদ্রোহী বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালকে অগ্রাধিকার দেয়, সে মূলত মিথ্যুক।

এমনকি আল্লাহর আইন প্রয়োগ না করাকে সরাসরি কুফরী বলা হয়েছে। এই কারণে আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম খুব কঠোর ছিলেন। এ বিষয়ে তার নির্দেশ হচ্ছে-

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিকটের উপর বর্তাক বা দূরের উপর বর্তাক, আল্লাহর নির্ধারিত সাজা কার্যকর কর, আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরষ্কার কারীকে মূল্যায়ন করো না।" [ইবন মাজাহ, ২খ. পৃঃ ৮৩]

আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আপোষহীন। তাকে বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রয়োগ না করার জন্য তার একান্ত প্রিয় পাত্র উসামাহ ইবন যায়িদ সুপারিশ করলে, তিনি শক্ত ভাষায় তার প্রতিবাদ করে বলেন–

"তুমি আল্লাহর সাজা কার্যকর করার ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এর পর তিনি দাঁড়ালেন ও কৃতবাহ দিলেন। তিনি বললেন নিশ্চয় তোদের পূর্ববর্তীরা এই জন্য ধ্বংস হয়েছে যে যখন তাদের সন্তানতরা চুরি করত তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিত আর দুর্বলরা যখন চুরি করত তাদের উপর সাজা কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাহ যদি চুরি করত আমি তার হাত কেটে দিতাম।" [বুখারী, ৩ খ., পৃঃ১২৮২]

অন্য একটি হাদীছে আল্লাহর আইন প্রয়োগের আরো গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে-

"রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একটি জনপদে সাজা কার্যকর করা সেই জনপদের অধিবাসির জন্য সেখানে চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়ার চেয়ে উত্তম।" [ইবন মাজাহ, ২খ., পৃঃ ৮৩]

সুতরাং মহান আল্লাহ প্রণীত আইনের প্রয়োগ কোন ক্রমেও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। এমনকি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্যও হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রণীত আইনের প্রয়োগ।

আল্লাহর আইন প্রয়োগের অপরিহার্যতা আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এর অনিবার্য শিক্ষাটি হচ্ছে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি যার সামান্যতমও ঈমান রয়েছে, আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার অবহেলা করা কোন ক্রমেও বাঞ্চনীয় নয়।

মহান আল্লাহর আইনের ব্যাপ্তি

মহান আল্লাহ প্রণীত আইন যেমন বিশ্বজনীন তেমনি মানব জীবনে এর ব্যাপ্তিও অসীম।

www.pathagar.com

মানবজীবনের যতগুলো দিক রয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে এই আইনের বিস্তৃতি। এই আইন শুধু ব্যক্তি জীবনের ধার্মিক দিককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় না। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিচার, শিক্ষা, শ্রম, অর্থ; . মোট কথা মানব জীবনের সার্বিক দিক এই আইনের অন্তর্ভূক্ত। সেই জন্য ছালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ্ প্রণীত আইন প্রযোজ্য তেমনি বৈবাহিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক লেনদেন, বিচারকার্য সম্পাদন, রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ প্রণীত আইন প্রয়োগকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। এই ব্যাপকতার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় মহান রাব্বুল আলামীনের বাণীতে।

কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নয় বরং যে কোন বিষয়েই তোমাদের মতবিরোধ হোক না কেন, তার মিমাংসার জন্য আল্লাহ্ প্রণীত আইনই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং বিশেষ কোন বিষয় নয় বরং সকল বিষয়কে কেন্দ্র করেই আল্লাহর আইন আবর্তিত হয়েছে।

অন্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সকল বিষয় আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিল কৃত আইন প্রয়োগের স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কোন বিশেষ দিকে আইন প্রয়োগের কথা বলা হয়নি। বরং সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগের নির্দেশ এসেছে। সুতরাং আল্লাহর আইনের পরিসর অসীম। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। আরো ইরশাদ হচ্ছে-

" আমি এই কিতাবে কোন কিছু লিখতেহ ছাড়িনি।"[আল-কুরআনুল কারীম ০৬ : ৩৮]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল-কুরআন তথা আল্লাহর আইনের ব্যাপকতা সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে,

"আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. বলেন, এই কুরআনে আল্লাহ আমাদের জন্য প্রতিটি বিদ্যা এবং প্রতিটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ রহ. বলেন, প্রতিটি হালাল ও হারাম।" সুতরাং আল্লাহর আইনকে সংকুচিত করার কোন সুযোগ নেই।

সেজন্য বাস্তবতার নিরিখে, নিরপেক্ষভাবে ইসলামী আইন ও ইসলামী অনুশাসনের ব্যপকতা নিয়ে সন্দেহ সংশয়ের কোন সুযোগ নেই। ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে যারা এরূপ সীমাবদ্ধতার অভিযোগ উঠায়, তারা মূলতঃ হয় না বুঝে, অন্যথায় উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়েই এই মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়। তারা বলে থাকে, 'ইসলাম আধ্যাত্মিকতারই নাম। শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়েই এর ব্যাপ্তি। সমাজ জীবনে ও অন্য কোথাও এর পদচারণা নেই। মানব আত্মার সংশোধনই এর একমাত্র কাজ।' ইসলামের বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক নিয়মনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, শ্রমনীতি, শিল্পনীতি, ব্যবসানীতি, কৃষিনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে যারা নূন্যতম খোজ খবর রাখে, ইসলামের দুশমনদের পূর্বোল্লেখিত ধারণা যে কত বড় ডাহা মিথ্যা, তা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং আল্লাহর আইন সীমাহীন ও বিস্তৃত।

মহান আল্লাহর আইন প্রয়োগের দায়-দায়িত্বঃ

www.pathagar.com

প্রতিটি মুসলমানই তার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর আইনকে নিজেই প্রয়োগ করতে বাধ্য। এ ছাড়া অন্যান্য যারাই যে পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাদেরও সেই পর্যায়ে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। যিনি পরিবারের কর্তা তাকে পরিবার সংক্রান্ত আল্লাহর আইন, যিনি বিচারক তাকে বিচার সংশ্লিষ্ট আল্লাহর আইন, যিনি সেনাপতি, তাকে যুদ্ধ সম্পর্কিত, যিনি রাষ্ট্র নায়ক, তাকে রাষ্ট্রবিষয়ক; মোটকথা যিনি যে ময়দানের দায়িত্বে, তাকে তার ক্ষেত্রেই আল্লাহর আইন প্রয়োগ অপরিহার্য। তাকে তার নিজস্ব দায়িত্বের গন্ডিতে আল্লাহর আইন প্রয়োগের ব্যর্থতা সম্পর্কে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট উক্তি হচ্ছে,

"রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল, তোদের দায়িত্বে দেয়া সব বিষয়ে তোমাদেরকে জবাবদিহিতা করা হবে।" [মুসলিম, সহীহ মুসলিম, বায়রূত, তাবি, ৩খ. পৃ. ১৪৫৯]

এই হাদীছটিতে সাধারণ জবাবদিহিতার কথা বলা থাকলেও ইসলামে আল্লাহর আইন প্রয়োগ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু এ দিকটিও এথেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। সেই জন্য কোন বিশেষ দিককে উল্লেখ না করেই, যে কোন বিষয়েই কেউ আল্লাহর আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হলে, আল-কুরআনে তাদের ব্যাপারে কঠের ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদেরকে কাফির, যালিম ও ফাসিক বলে শক্ত ভাষায় গালি দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানই তার অবস্থানে থেকেই আল্লাহর আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে কোন ছাড় দেয়া হয়নি। সেজন্য যে সমস্ত মুসলমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আইন প্রয়োগ করেন না, কুরআনের ভাষায় তাদের অবস্থান কোথায়, তা নির্ধারণের দায়িত্ব তাদেরই উপর বর্তায়। প্রতিটি মুসলমানের দ্বীনের অনিবার্য এই অংশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

সমালোচনার.ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আইন

ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে আল্লাহর আইন প্রয়োগ নিয়ে তাদের ছোট খাট অভিযোগ থাকলেও বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন তথা দন্ডবিধি প্রয়োগ নিয়ে ইসলাম ঐ সব শত্রুপক্ষের বিদ্বানদের কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে আসছে। এর বাহিরে আরো দন্ডবিধি থাকলেও আল কুরআনে ছয় প্রকারের অপরাধের দণ্ড বিধি উল্লেখ হয়েছে। অবৈধ মানুষ হত্যা, ডাকাত, অপবাদ, ব্যাভিচার, চুরি ও বিদ্রোহী। মানবাধিকারের দোহাই তুলে ইসলামী এই সব দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনার ভাষাকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন ড. আল-আশকার। তা হচ্ছে–

"ইসলামের দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করে বলেন যে, এই বিধান হচ্ছে নির্মম যা যুগের সাথে বেমানান। বিধিবিধানে অপরাধীর মানষিক দিক বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ইসলামের দণ্ডবিধি অপরাধীকে বেত্রঘাত করে অথবা হাত কেটে তার মানষিক দিক চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।"

তাদের এই অভিযোগ কল্পনাপ্রসূত, বাস্তবতা বর্জিত, পক্ষপাত দুষ্ট। মূলতঃ আল্লাহ

www.pathagar.com

প্রণীত এই সব দন্ডবিধি প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে, পৃথিবীকে মানুষের বসবাস যোগ্য করে গড়ে তোলা, সকলের জানমাল, ইজ্জত আব্রুকে হেফাজাতের ব্যবস্থা করা, অপরাধ হ্রাস করা। এ প্রসংগে ডক্টর হাম্মাদ বলেন,

"নিশ্চয় ইসলামের দন্ডবিধির প্রয়োগ অপরাধকে হ্রাসের ক্ষেত্রে এমন কি চিরতরে বিলুপ্তির ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে যা দ্বারা সমাজ মানুষের সাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের পরিপূর্ণ উপযোগী হয়।"

ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহিলী যুগের জাহিল মানুষগুলোকে ইসলামের এই আইন প্রয়োগ সর্বকালের সর্বসেরা সুসভ্য মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। ইসলাম বিদ্বেষীরা মানবাধিকারের ছদ্মাবরনে হত্যাকারী, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসীকে লঘু শাস্তির আবদার, মূলতঃ সারা বিশ্ববাসীকে অপরাধীদের কাছে জিম্মি বানানোর পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে তাদের বৈধ মানবাধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এই পর্যন্ত আল্লাহ্ প্রণীত কোন একটি আইন প্রয়োগও আধুনিক যুগে অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়নি বরং যেখানে যতটুকু এই আইনের প্রয়োগ রয়েছে, সে ভূখন্ড তত উচ্ছৃঙ্খল মুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে বা হচ্ছে। মানব ও জীন জগত বাদে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় আল্লাহর আইন প্রয়োগ বলবৎ থাকায়, সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা নেই। সুতরাং দুশমনদের অসাড় অভিযোগ ভিত্তিহীন। বাস্তব কথা হচ্ছে, এ পৃথিবীকে সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে হলে, এই পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর আইন প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই।

সাম্প্রতিক বিশ্বে মহান আল্লাহর আইন

বর্তমান বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রের সংখ্যা সাতান্নটি। এসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীই হচ্ছে মুসলমান। এগুলোর শাসকগোষ্টিও মুসলমান। একমাত্র কুরআনই মুসলমানের জীবন ব্যবস্থা। সেই প্রেক্ষাপটে এই সব মুসলমান রাষ্ট্রে আল কুরআন তথা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দু:খের বিষয় হচ্ছে , বিশ্বের কোন একটি রাষ্ট্রেও পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আইন কার্যকর নেই। তবে তুলনামূলক ভাবে রাজকীয় সৌদি আরবে আল্লাহর আইনের সিংহ ভাগ বাস্তবায়ন রয়েছে। অন্যান্য অধিকাংশ মুসলিম দেশে পারিবারিক ও অন্যান্য সামান্য কিছু আইন ছাড়া অন্য কোন আল্লাহর আইন কার্যকর নেই। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হচেছ, আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এখানে শুধুমাত্র কিছু পারিবারিক আইন ছাড়া আল্লাহর অন্য কোন আইন বলবৎ নেই। এখানের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সুদ ভিত্তিক। বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় বৃটিশ আইনে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশের অবস্থা বাংলাদেশের মতই। আর অমুসলিম দেশেতো আল্লাহর আইন পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষিত। সুতরাং বলা যায়, বিশ্ব নিখিলের মালিক মহান আল্লাহর বিশ্ব আইন আধুনিক বিশ্বে তেমন একটা কার্যকর নেই ।

মানব রচিত আইনের ব্যর্থতার চিত্র

অন্য আইন মানব রচিত। মানুষের সার্বিক সীমাবদ্ধতা সর্বজন স্বীকৃত। সেজন্য মানব রচিত আইন কখনো সার্বজনীন হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই এই আইনে অসংখ্য

www.pathagar.com

ত্রুটি থেকে যায়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর প্রয়োগও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আজ নতুন আইন প্রণয়ন করলে কিছুদিন পরে তা পরিবর্তনের দাবী ওঠে। মোট কথা, এই আইন বসবাস যোগ্য কোন সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে যে সক্ষম নয়, বর্তমানের বিশ্বচিত্র তার বাস্তব নমুনা। এর যৎ সামান্য উদাহরণ হচ্ছে-

ক. বিগত ২০ বছরে বৃটেন আমেরিকায় প্রতি ছয়জনে একজন করে জারজ ছিল। বর্তমানে কোথাও তা অর্ধেক কোথাও বা অর্ধেকের বেশী।

খ. আমেরিকার Federal Bureau of investigation [FBI] এর তথ্য অনুযায়ী, মধ্যবিত্ত মার্কিন পরিবারের ৪ থেকে ১৩ বছর বয়সের যত শিশু কন্যা রয়েছে, তার ২৫% ই প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ দ্বারা শ্লীলতা হানির শিকার। কানাডার ৫৪% মহিলারা বলেছে, তারা ১৬ বছর বয়সে পদার্পনের পূর্বেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ৫১% মহিলারা ধর্ষিত হয়েছে অথবা ধর্ষনের জন্য তাদেরকে আক্রমন করা হয়েছে। সবচেয়ে নিরাপত্তার শহর টরেন্টো এর ৯৮% মহিলা কোন না কোনভাবে যৌন ভোগান্তির শিকার।

গ. বিশ্বে প্রতি বছরে ৮ কোটি মহিলা অনাকাঙ্খিত গর্ভধারন করে। ২ কোটি মহিলা ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য হয়।

ঘ. প্রতি বছর একলাখ মার্কিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মারা যায়। সেখানের ৩০% লোক সমকামী।

ঙ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে [১৯১৪-১৯১৮] এক কোটি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে [১৯৩৯-১৯৪৫] পাঁচ কোটি ৫০ লক্ষ লোক প্রান হারায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খরচ হয় আট হাজার কোটি ডলার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একলক্ষ এগার হাজার ছয়শত নিরানব্বই কোটি ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৪ ডলার। আমেরিকা এই যুদ্ধে প্রতিদিন খরচ করত পঁচিশ কোটি ডলার।

বিশ্বে ৬০ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। ৮০ কোটি মানুষ নিরক্ষর। ১৫০ কোটি মানুষ চিকিৎসা সুবিধা বঞ্চিত। এই সময়ে প্রতি মিনিটে পৃথিবীর সামরিক ব্যয় ২০ কোটি ডলার।

চ. পুঁজিবাদী আমেরিকার ২৭ কোটি জন সংখ্যার মধ্যে ১৫% অর্থাৎ প্রায় এককোটি লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। ১৯৯৫ তে আমেরিকার ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ছিল তিনকোটি। ১৯৯২ সালে তাদের গৃহহীনদের সংখ্যা ছিল ৩০ লাখ, যা ২০০৭ সালে দাড়াবে এককোটি ৯০ লক্ষে।

ছাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ২০ লাখ আমেরিকান লেখাপড়া শিক্ষার পূর্বেই স্কুল ত্যাগ করে থাকে।

জ. সারা বিশ্বে বিদ্যালয় বিমুখ কায়িক শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২৪ কোটি ৬০ লাখ।

ঝ. নগ্নছবি তোলার সংগঠক স্পেন্সার স্টুনিক ১৯৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪০ হাজার নরনারীর নগ্নছবি তুলেছে।

ঞ. ভাগ্যহত অবহেলিত দরিদ্র অভিবাসীদের প্রতি অমানবিক আচরণের জের ধরে সভ্যতার দাবীদার মানবাধিকারের প্রবক্তা ফ্রান্সের প্রায় তিনশত শহরের তিন মাস ধরে

www.pathagar.com

দাঙ্গা ও সহিংসতা সংঘঠিত হয়। দেশটি পরিণত হল হামলা, আগুন, ভাংচুর ও দাঙ্গার নগরীতে। জ্যাক শিরাক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্তমান সময়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজী অভিবাসীদের উত্তরসূরীদেরকে অভিহিত করলেন 'জঞ্জালতূল্য নিকৃষ্ট মানুষ' হিসেবে ব্যর্থতার এই তালিকা দৈর্ঘ্য করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমরা সেদিকে না গিয়ে স্পষ্ট করে বলতে চাই, বিশ্বের এই চিত্র মূলতঃ মানব রচিত আইনের ব্যর্থতারই জাজ্জ্বল্য নমুনা। এই অবস্থা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। মানুষকে মানুষের স্তরে উন্নীত হতে হলে, এই পরিস্থিতির অবসান অনিবার্য।

উপসংহার

আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে, এর সুফলতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব। সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যেখানে অনায়াসে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই আইন প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে। এই আইন প্রয়োগ করলে তার ইতিবাচক প্রভাবের কোন বাস্তব মডেল বিশ্ববাসীর সম্মুখে না থাকায় ইসলামের দুশমনরা এর বিরুদ্ধে যথা ইচ্ছে বিষোদগার করে যাচ্ছে। তারা মিথ্যাচারের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীরাতো বটেই, এমনকি অনেক মুসলমানকেও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। যার অনিবার্য পরিণতিতে এই আইন প্রয়োগের মধ্যে তারা সবাই পশ্চাদপদতা, বর্বরতা ও যুলুমের উপস্থিতি আবিষ্কার করছে। বাস্তবে অবস্থাটি তা নয়। বরং আসল কথা হচ্ছে, শুধুমাত্র এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষের বাস উপযোগী একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। একে উপেক্ষা করে সুশৃঙ্খল কোন পৃথিবীর কল্পনা করাও যে অবান্তর, এই শাশ্বত সত্যটি বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরাই হচ্ছে, সময়ের অনিবার্য দাবী। এ আইন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থ, বিচার; এককথায় মানব জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় যুগোপযোগী। এ আইনকে তারা গুটি কতক অপরাধীর জন্য দৃশ্যত অকল্যাণ ধরে নিলেও এ আইন মূলতঃ বৃহত্তর মানব গোষ্ঠির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম, এই বাস্তবতা সকলের সম্মুখে উম্মোচন আজ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সে জন্য লেখালেখি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বক্তৃতা, ববৃতি, আলোচনা সভা, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতির মাধ্যমে এই আইন সম্পর্কে মানুষদের ভ্রান্তি উম্মোচন করে স্বচ্ছ ধারণা দানের এক জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা প্রতিটি বিবেকবান মানুষের জন্য অপরিহার্য।■

www.pathagar.com

মানবতার ধর্ম ইসলাম ও নবী মুহাম্মাদ [সা]

আফতাব চৌধুরী

মানব সমাজ সম্পর্কে মুহাম্মাদ [সা] ঘোষণা করেছিলেন আল্লাহ্ বাণী : 'হে মানব সম্প্রদায়, আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদেরকে ভাগ করেছি বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে, যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। নি:সন্দেহে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু।'

বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর সকল মানুষ মূলত একজন পুরুষ ও একজন নারীর সন্তান অর্থাৎ একই পরিবারভুক্ত। তাদের মধ্যে দেশ, গোত্র, বর্ণ, বংশ ও জাতির পার্থক্য বলে কিছুই নেই। ওপরের কারো কোনও শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সৃষ্টিগত ও জন্মগতভাবে হতে পারে না। গোত্র বংশের পার্থক্য শুধু পরিচয়ের জন্য, যেমন একেকজন মানুষের একেকটা নাম থাকে। যে নামে তাকে লোকে চেনে। এছাড়া নামের আর কীই বা গুরুত্ব থাকতে পারে? প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে ব্যক্তির ধর্ম বা নৈতিক চরিত্রের মহানতা ও মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগের ওপর।

মুহাম্মাদ [সা] এর আগমনের পূর্বে দুনিয়ার সর্বত্রই ছিল বর্ণ ও বংশের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ও বড়াই।

www.pathagar.com

মানুষে মানুষে উঁচু-নিচু ভেদাভেদের কৃত্রিম দেওয়াল অনেক উঁচু হয়ে উঠেছিল। আরবরা অন্যদের আজম বলত, যার অর্থ বোবা, অর্থাৎ ওরা আরবদের মত বাকশক্তির অধিকারী নয়। ভারতবর্ষে কাউকে মনে করা হত ব্রহ্মার পা থেকে উৎপন্ন বলে অস্পৃশ্য শূদ্র। চিনে মনে করা মত রাজার জন্ম হয় আকাশ ও পৃথিবীর মিলনে, অর্থাৎ আকাশ পুরুষ আর পৃথিবী নারী এ দুয়ের মিলনের ফলে জন্ম হয় রাজার যে জন্মসূত্রেই শাসনের অধিকারী ও সকলে পূজ্য। শ্রেষ্ঠত্বে এরূপ তত্ত্বের জন্যই মানুষ নিজেদের চন্দ্রবংশীয়, সূর্যবংশীয় বলে প্রচার করত। আর এসব মিথ্যে বড়াইয়ের পরিণামস্বরূপ সাধারণ মানুষকে ভোগ করতে হত অনেক দুর্বিসহ নির্যাতন। প্রকৃতপক্ষে বাহু বলে বা মেধার জোরে কেউ যদি শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে সেটা বংশানুক্রমিক হতে পারে না। আর তার দ্বারা তার জন্মের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয় না। মুহাম্মাদ [সা] এ সত্য প্রমাণ ও প্রচার করতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, আরবে আজমে কালো ও গোরায় কোনও ভেদাভেদ নেই, সকল মানুষ সমান, সকলে একে অপরের ভাই।

তিনি প্রমাণ করলেন যে, জন্ম প্রক্রিয়া সকলেরই এক। কর্মের দ্বারাই মানুষের মর্যাদা। মানুষের মিথ্যে বড়াইয়ের মুখে পদাঘাত করে তিনি বললেন, সকলে সে আদমের সন্তান, যিনি মাটি দিয়ে তৈরি মাটির আবার অহংকার কিসের?

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করার বিষয় যে মুহাম্মাদ [সা] শুধু মানুষের সাম্যের কথাই বলেননি। তিনি জোর দিয়েছেন ভ্রাতৃত্বের ওপর। সাম্য-ভাল কথা, আমাদের একান্ত কাম্য, কিন্তু এর দ্বারা পারস্পরিক আত্মীয়তা, রক্তের সম্পর্কও একের ওপর অন্যের অধিকার সাব্যস্ত হয় না। ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে আত্মীয়তা ও অধিকারবোধক। এজন্যই সাম্যের চেয়ে ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বেশি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সকল মানুষ মূলত একই পরিবারভুক্ত। আর শুধু কি তাই? মুহাম্মাদ [সা] শুধু সকল মানুষকেই এক পরিবারভুক্ত বলে ক্ষান্ত থাকেননি, বরং আমাদের জানা ও অজানা সকল সৃষ্টিকেই এক পরিবারভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। সারা সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারের প্রতি যে বেশি প্রেম দেখাবে, আল্লাহ তার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করবেন। সৃষ্টিগতভাবে একটি তৃণখণ্ড, একটি পশু, একটি পাখি, চন্দ্র-সূর্য আর মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এ সকলের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ এবং সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার অর্থাৎ মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং অন্যান্য জীব ও পদার্থের আল্লাহর মর্জিমত ব্যবহার ও প্রয়োগ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মুহাম্মাদ [সা] নিজেকে নবী, সর্বশেষ নবী, নবুওতের পূর্ণাঙ্গতা বিধানকারী হিসাবেই পেশ করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে আমরা দেখেছি যে সত্যিই মুহাম্মাদের [সা] পরে মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আর কোনও মহাপুরুষ আসেননি। কাজেই তিনিই যে শেষ নবী ছিলেন, তাঁর এ দাবি আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারি। আর যেহেতু তিনি শেষ নবী, তাই একথাও মেনে নেওয়া যায় যে, নবুওতের পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত সংস্করণ ছিল তাঁর বাণী ও কর্ম। আর এ কারণেই তিনি যে ইসলামকেই একমাত্র ধর্মরূপে প্রচার করে গেছেন তারও যৌক্তিকতা বুঝতে পারি আমরা যারা প্রত্যাদিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুহাম্মাদ [সা] সততা ও বিনয় এবং উদারতার এটা কত বড় প্রমাণ যে, তিনি নিজেকে একমাত্র নবী বলে দাবি করেননি। তিনি ঘোষণা করেছেন যে,

www.pathagar.com

তাঁর পূর্বে আরও হাজার হাজর নবী এসেছিলেন, তাদের সকলের কামনা ছিল একটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোনও উপাস্য নাই। তাঁরাও গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন, তাদের অনেককেই চিনি। তবে, পরিচিত হয়, অথবা অপরিচিত সবাইকেই স্বীকৃতি দিতে হবে-তাদের কারও মধ্যে আমরা কোনও পার্থক্য করি না [আল কুরআন]। একজন মানুষ যতক্ষণ এ সাক্ষ্য না দেবে, ততক্ষণ সে মুসলমান পদবাচ্য হতে পারবে না। মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন আর কুরআনের বারেবারে পূর্ববর্তী নবীদের বাণী উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদের ওই চির নতুন ও চির পুরাতন বাণীর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য, ওই সকল ধর্মগ্রন্থের সত্যতা প্রতিবাদীদের জন্য এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশে নবীরা যেসব কাজ করে গেছেন তাকে সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপযোগী করে তার চূড়ান্ত রূপায়ণের জন্যই তাঁর আগমন। পাক-কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, এমন কোনও জনগোষ্ঠী নেই যাদের কাছে সাবধানকারী আসেননি। সাবধানকারী মানে নবী ও রাসূল-যারা এসে মানুষকে সাবধান করেন আল্লাহকে ভুলে অন্য মানুষ কিংবা অন্য কোনও কাল্পনিক দেবদেবীকে পুজো করলে আর মানুষের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন না করলে কী মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। তারা সুসংবাদ দেন পরকালের সাফল্যের খোদাভীরুতা আর জীবের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের সুফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তার। আমরা চিনি বা না চিনি, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীতে এসব মহামানব এসেছেন, তারা গ্রন্থও এনেছেন, হয়ত পরবর্তীকালে তাদের আসল পরিচয় লুপ্ত হয়েছে। বিকৃত হয়েছে তাদের বাণী। কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ লুপ্ত ও বিকৃত হয়ে গেছে, তাই বা কী করে বলি! ঐশী বাণীর অস্তিত্ব আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পাই। কুরআনে যে সত্যের কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিধ্বনি বাইবেল, বেদ, উপনিষদ, গীতা, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তার মধ্যেও পাওয়া যায়। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ধর্মের সত্য মূলত এক, মানুষ তাকে বিকৃত ও খণ্ডিত করে অনেক ক্ষেত্রেই বহুতে পরিণত করেছে, করে তুলেছে পরস্পর বিরোধী। একথাও বোঝা যায় যে জগতের সকল ধর্মীয় পুরুষ এক ও অভিন্ন পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত, তাদের পৃথক করে, তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে আমরা আমাদের নিজেদের সংকীর্ণতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দিচ্ছি, মানবজাতির ক্ষতি করছি।

মুহাম্মাদ [সা] যখন নিজেকে শেষ নবী ও ধর্মের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ রূপকারের দায়িত্ববান বলে উপলব্ধি করলেন, তখন এটা তাঁর জন্য একান্তই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে এ বাণী নিয়ে উপস্থিত হবেন, তাঁর কামনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকবে যে সকলেই তার আহ্বানে সাড়া দিক। মানুষের কাছে অনুনয়-বিনয় কাতর আকুতি জানাবেন। কিন্তু মানুষ যে তা গ্রহণ করবেই, সে নিশ্চয়তা কোথায় ছিল? ধর্ম মূলত অন্তরের উপলব্ধির ব্যাপার, বাইরে থেকে জোর করে তা কাউকে গ্রহণ করানো যায় না। এজন্য কুরআনের বলা হল, নিশ্চয়ই তুমি যাকে ভালবাস, তাকেই সুপথ দেখাতে পার না। বলা হল, অবশ্যই তুমি [ভুলে যাওয়া সত্য] স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের জন্য তুমি দারোয়ান ও লাঠিপেটা করে তাদেরকে তোমার দর্মে দীক্ষা দেবে না। আরও বলা হল, ধর্মের ক্ষেত্রে কোনও জোর জবরদস্তি নেই। যদিও এক আল্লাহ উপাসনা আর দেবদেবীর

www.pathagar.com

উপাসনা পরস্পর বিরোধী, তবু ধর্মের সত্য প্রচার করতে গিয়ে যাতে শালীনতা, ভদ্রতা ও শান্তি-শৃঙ্খলার সীমা অতিক্রম করা না হয়, সেদিকে সতর্ক করে দিয়ে কুরআনের নির্দেশ এল, "ওরা আল্লাহকে গালি দিতে পারে।" ফলটা কী দাঁড়াবে? ভুল বোঝাবুঝি, মারামারি, রক্তারক্তি, বিশৃঙ্গলা ও বিপর্যয়-অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ইসলাম এটা পছন্দ করেনি, আল্লাহ্ এর বিরোধিতা করেছেন, মুহাম্মাদ [সা] তাঁর জীবনে এরকম কোনও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেননি।

ধর্মপ্রচারের পন্থা কী হওয়া উচিত? সে বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর হিকমতের দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুকৌশলে, আর সদুপদেশের দ্বারা। আর উত্তমপন্থায় যুক্তি প্রদর্শন কর।' অর্থাৎ আবেদন রাখতে হবে মানুসের হৃদয়ের কাছে, তার মনে আঘাত দিয়ে তাকে উত্তেজিত করে ধর্মপ্রচার হয় না। আরেকটি নির্দেশে বলা হয়েছে, 'বল, যে আহলে কিতাব [অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদিরা] এস এমন একটি বিষয়ের দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে উপাসনা করব না, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করব না আর আমাদের নিজেদের একে অন্যকে প্রভু বলে গ্রহণ করব না... ।' এ নির্দেশ থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, ধর্মপ্রচারের সময় যে বিষয়ে মিল আছে, সে বিষয় থেকে শুরু করতে হবে।

মূলত একাত্মতাবোধের ভিত্তিতেই মুহাম্মাদ [সা] তাঁর ধর্মপ্রচারের সমস্ত কাজ চালিয়েছিলেন। যার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমরা কুরআন-হাদিসে পাই।

মুহাম্মাদ [সা] মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদাবোধের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর বিধান অনুযায়ী একটি মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েরই জান ও মালের মর্যাদা সমান। অন্যায়ভাবে যেমন কোনও মুসলমানের জান বা মালের হানি করা যেতে পারে না, তেমনি কোনও অমুসলিমের জান বা মালেরও না। বরঞ্চ এক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে গিয়ে মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন যে, যদি কোনও মুসলিম রাষ্ট্র দ্বারা কোনও অমুসলিমের প্রতি অবিচার হয়, তাহলে শেষ বিচারের দিন তিনি নিজে সেই অমুসলিমের পক্ষে সওয়াল করবেন আল্লাহর দরবারে। সকল মানুষের প্রতি সমান ব্যবহারের এ নীতি খোলাফায়ে রাশেদীন বা শপথপ্রাপ্ত খলিফা চতুষ্টয়ের সময়ও সমানভাবে কার্যকরী ছিল। হযরত আমর বিন আস [রা] মিশরের গভর্ণর ছিলেন, তখন একজন মিশরীয় অমুসলিম তাঁর বিরুদ্ধে এ নালিশ নিয়ে খলিফার দরবারে উপস্থিত হয় যে, আমর তাকে গোলাম বলে গালি দিয়েছেন।

খলিফা আমরকে কঠোরভাবে তিরষ্কার করলেন, আর সাবধান করার জন্য লিখলেন। সকল মানুষকে তাদের মায়েরা স্বাধীন হিসাবে জন্ম দিয়েছেন, তুমি কবে তাদেরকে গোলাম বানালে? মানবাধিকারের এ নীতি ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি মৌলিক বিধানে পরিণত হয়ে গেছে। প্রখ্যাত আইনবীদ ইমাম শাফিয়ি [রাহ] বলেছেন, আল্লাহ তোমাকে স্বাধীনভাবে জন্ম দিয়েছেন, তুমি সেরকমই থাকবে। অর্থাৎ কেউ কারো স্বাধীনতা হরণ করতে পারবে না, বিকোতেও পারবে না।

মানবীয় ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, পরমত সহিষ্ণুতা ও ধর্মের মূল সত্ত্বেও ঐক্যের এই যে

www.pathagar.com

মহান আদর্শ আমরা পাই মুহাম্মাদ [সা]-এর কাছে, তার কারণ এই যে, তিনি নিজেই ছিলেন সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতিক পুরুষ, বিশ্বনবী, বিশ্বনেতা ও বিশ্বের প্রতি করুণাস্বরূপ। কুরআনে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'আমরা তোমাকে জগদ্বাসীর জন্য করুণাস্বরূপ করেই পাঠিয়েছি।' আরও বলা হয়েছে, তোমাকে সকল মানুষের জন্য সুসংবাদ বাহক ও সাবধানকারী করে বৈ অন্য কোনও উদ্দেশ্য পাঠাইনি। তিনি নিজে বলেছেন, কালো ও গোরা সকল মানুষের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। তাঁর এ আন্তর্জাতিকতার দাবি তাঁর আদর্শের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বলছিলাম মানবতার মূল্যবোধের কথা। মুহাম্মাদ [সা] মানবতাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন সেটা আমরা দেখেছি। তিনি দেখিয়েছিলেন ধর্মের সত্য আসলে একই। মানবতা মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি সকল ধর্মগ্রন্থে একই কথা বলা হয়েছে। কুরআন শরিফে তো মানুষকে দুনিয়ার বুকে আল্লার প্রতিনিধির সম্মান দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থে মানবকে বলা হয়েছে অমৃতের সন্তান। কিন্তু আজকের মানুষের ধর্ম কর্তৃক বিঘোষিত এ মর্যাদা লুপ্ত। এ যুগ মানবতার সংকটের যুগ। এ যুগে আর সব কিছুর দাম আছে, নেই শুধু মানবতার। মানুষ মারা অস্ত্রের ভাণ্ডার তো ফুলে ফেঁপে উঠেছেই, তাছাড়াও মানুষের সঙ্গে মানবের ব্যবহার, যার জন্য আফসোস করে কবি ওয়ার্ডসওয়াডর্থ বলেছিলেন What man has made of man -মানুষ মানবের কী করেছে-পশুর সঙ্গে পশুর ব্যবহারের পর্যায়ে নেমে গেছে। আবার তাও অনেক সময় ধর্মের নামে, সংস্কৃতির নামে। মানুষ এখন দিশেহারা। Feeling of isulation বা একাকিত্ববোধ আর Feeling of insecurity নিরাপত্তাহীনতাবোধ এ যুগের মানুষের বিশেষত্ব হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর একত্বের ওপর ভিত্তিশীল সত্যের দিকে ফিরে যেতে হবে। এ সত্যে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে অখণ্ডতা বোধ জাগতে পারে। সৃষ্টির অখণ্ডতা মানবতার অখণ্ডতা, জীবনের অখণ্ডতা এ থেকে মানুষ আত্মীয়তাবোধ করবে সারা সৃষ্টির সঙ্গে।

এমনিতেই তো কোনও ধর্ম বিশ্বাসীর একাকিত্ববোধ থাকতে পারে না, কেন না, সে বাস করে আল্লাহর সঙ্গে। সে সঙ্গে সে যদি আল্লাহর পরিবার-তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে ও আত্মীয়তা অনুভব করতে পারে, তাহলে তো আর কথাই নেই। আর এ পথেই আসবে মানুষের জীবনে ও সারা দুনিয়ায় শান্তি, মুক্তি, ও আনন্দ। এ পথেই যাত্রা হোক সকল মানুষের, আজকের দিনে এটাই সবচেয়ে বড় কামনা।■

www.pathagar.com

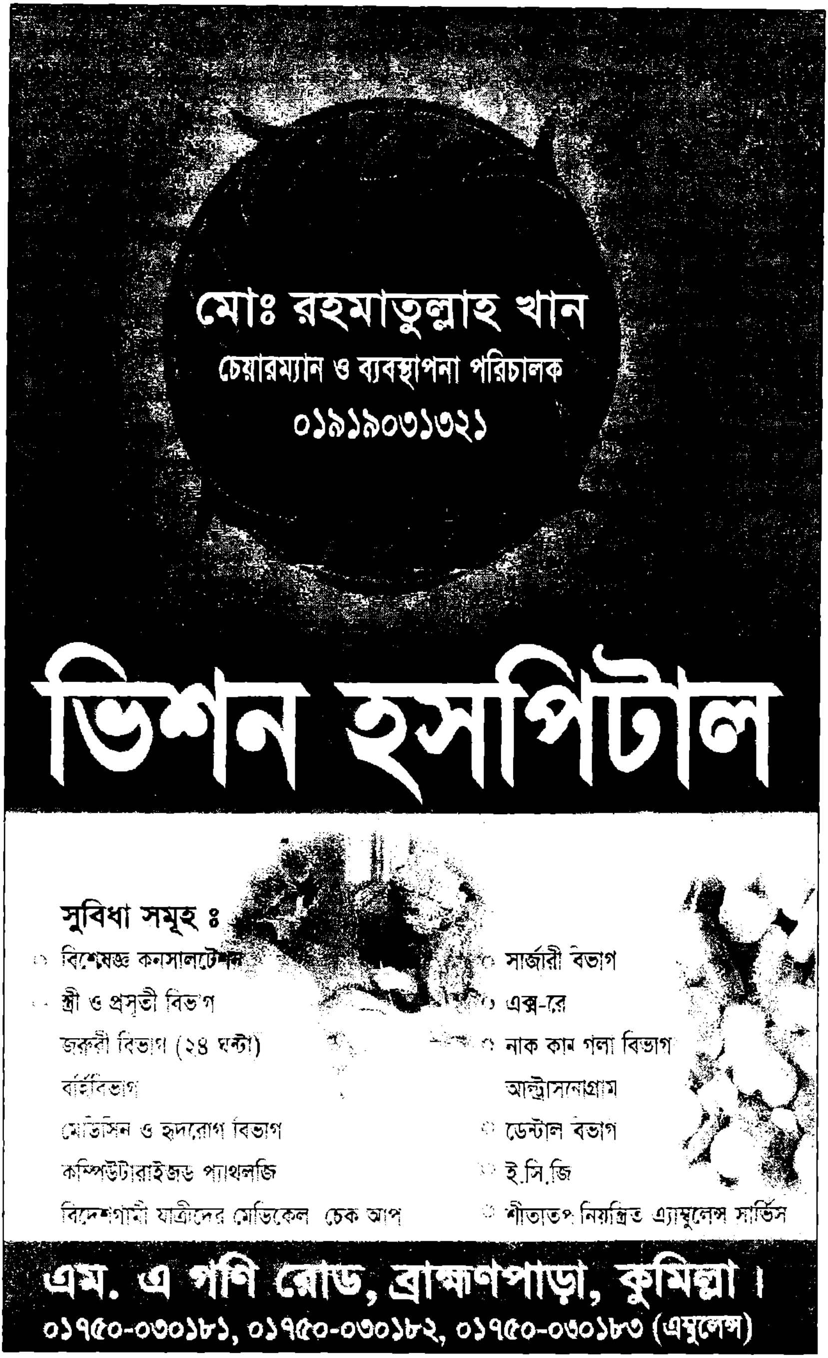

www.pathagar.com

মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা

আহমদ আবদুল কাদের

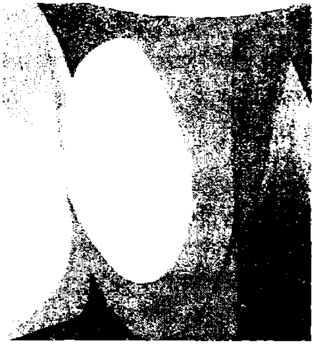

মহানবী [সা] মদীনায় হিজরত করার পর মদীনার সনদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। তিনি দশ বছরের ব্যবধানে মদীনা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। তিনি দশ বছরের ব্যভধানে মদীনা রাষ্ট্রের এমন এক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। মহানবী [সা] ছিলেন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের যুগপৎ রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ বিচারপতি। পার্থিব ক্ষমতার সব কয়টি দিক তার হাতে ন্যস্ত ছিলো। তদুপরি নবী হিসাবে তার ধর্মীয় ও পার্থিব কর্তৃত্ব এবং প্রাধিকার ছিলো প্রশ্নাতীত। তিনি ছিলেন আনুগত্যের কেন্দ্র। এ কেন্দ্র ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দিক দিয়েই।

মহানবীর [সা] সরকারের প্রশাসন দু'ভাগে বিভক্ত ছিলো–[ক] কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও [খ] প্রাদেশিক প্রশাসন। আবার কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুটো ভাগ ছিলো : ১. বেসামরিক ও ২. সামরিক প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসন

কেন্দ্রীয় বেসামরিক প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন মহানবী [সা] স্বয়ং। শীর্ষপদ ছাড়াও আরো কতিপয় পদ সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে

www.pathagar.com

উঠেছিলো। সেগুলো হলো : ১. নায়েবগণ ২. উপদেষ্টাবৃন্দ ৩. বিচার বিভাগ ৪. সচিবগণ ৫. কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ ৬. ধর্মীয় বিষয়ক কর্মকর্তা : দায়ী, মুয়াল্লিম, মুফতি ও ইমামগণ এবং হজ্জ কর্মকর্তা ৭. কবি ও বক্তাগণ [শুয়ারা ওয়া খুতাবা] ৮. বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৯. বাজার প্রশাসন ১০. অধঃস্তন কর্মকর্তাবৃন্দ। আর সামরিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহানবী [সা] স্বয়ং। তদসঙ্গে ছিলো বিভিন্ন অধিনায়কগণ ও অন্যান্য বিভাগীয় সামরিক কর্মকর্তাগণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

প্রাদেশিক প্রশাসন : নিম্নের পদসমন্বয়ে প্রাদেশিক প্রশাসন গঠিত ছিলো : ১. ওয়ালী বা গভর্নর ২. প্রাদেশিক বিচারকগণ ৩. রাজস্ব বিভাগের প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণ ৪. স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় বেসামরিক প্রশাসন

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী ছিলেন মহানবী [সা] স্বয়ং। তাঁর অধীনে ও তত্ত্বাবধানে বাকি প্রশাসন পরিচালিত হতো। প্রশাসন পরিচালনার সুবিধার জন্যে রাষ্ট্রের জন্যে তার অধীনে কতিপয় পদ সৃষ্টি করা হয়।

১. নায়েবগণ

রাজধানীতে মহানবীর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব যারা পালন করতেন তাদেরকে বলা হতো নায়েব বা নুওয়া। যখনই নবী [সা] কোন ধর্মীয় বা সামরিক অভিযানে মদীনা ত্যাগ করতেন তখন তার অনুপস্থিতিতে জনগণের বিষয়াদী দেখাশোনা করার জন্যে তিনি একজন প্রতিনিধ নিয়োগ করে যেতেন। প্রথমবার তিনি এ পদে সাদ বিন উবাদাহ [রা] কে, দ্বিতীয়বার তিনি সাদ বিন মুয়াজকে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে জায়েদ বিন হারেসা, উসমান ও আলীও [রা] এ পদে নিয়োগ লাভ করেন। বস্তুত দশ বছরে মোট ৫টি গোত্র থেকে ১৩জন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে ৩২ বার এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। সর্বাধিক বার যিনি এ পদে নিয়োগ পান তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উম্মে মখতুম [রা] যিনি মোট তের বার এ পদে নিযুক্তি পান।

২. উপদেষ্টাগণ [মুশির]

আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক তিনি জাতীয় [সামরিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি] গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদীতে সাহাবীদের সেঙ্গ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এ উপদেষ্টাগণ সুনির্দিষ্ট ছিলো না। যে বিষয়ে যাকে বা যাদেরকে উপযুক্ত মনে করতেন তার/তাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন। তবে তার উপদেষ্টামণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত হামযা, হযরত সাদ বিন উবাদা, সাদ বিন আউস, সালমান ফারসী, সাদ বিন মুয়াজ প্রমুখ। তিনি জাতীয় সন্ধিক্ষণে নারীদের সাথেও পরামর্শ করেছেন যেমন তার স্ত্রী উম্মে সালামা। হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে তিনি উম্মে সালামার সাথে পরামর্শ করেছিলেন এবং তার দেয়া পরামর্শ গ্রহণও করেছিলেন। মোটকথা উপদেষ্টাগণ মহানবীর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। তিনি যাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন তারা প্রায় সবাই জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

৩. সচিবগণ [কাতিবগণ]

ওহী লিখা, বিভিন্ন দলিলপত্র-চুক্তিপত্র তৈরি ইত্যাদির জন্যে নির্ধারিত ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়াও সাদাকাহর হিসাব সংরক্ষণ করার জন্যেও নির্ধারিত ব্যক্তি ছিলেন। তাদেরকে

www.pathagar.com

বলা হতো কাতিব। কাতিবগণ স্থায়ী, প্রায় স্থায়ী, খণ্ডকালীন বা অস্থায়ীভাবে নিযুক্তি লাভ করতেন। ওহী লেখকগণ ছিলেন সর্বাধিক গুরুপূর্ণ সচিব। মহানবী [সা] ১৩টি গোত্র থেকে মোট ৪৪জন কাতিব নিয়োগ করেছিলেন। এর মধ্যে ওবাই ইবনে কাব ও যায়িদ বিন সাবিত ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এক বর্ণনা অনুসারে তাদেরকে মুখ্য ও সহকারী মুখ্য সচিব বলা হতো। তাছাড়াও যারা গুরুত্বপূর্ণ সচিব ছিলেন তারা হচ্ছেন হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত খালিদ বিন সাইদ, হযরত শুরাহবীল সাবিত কায়েস, হযরত আরকাম বিন আরকাম [রা] প্রমুখ।

৪. কূটনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ

মদীনা রাষ্ট্রের অন্যতম কার্যক্রম ছিলো দ্বৈত কর্ম বা সিফারাহ। বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনা, চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন শাসক ও রাজন্যবর্গের নিকট নবী করিমের [সা] চিঠি পৌছানো ইত্যাদি কূটনৈতিক কার্যক্রমের জন্যে দূত নিয়োগ করা হেতা। দূতগণ অস্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করতেন। মহানবী [সা] মোট ১৬টি গোত্র থেকে মোট ৩৮ ব্যক্তিকে ৪২টি নিযুক্তি প্রদান করেছিলেন। এসব কূটনৈতিক কর্মকর্তাগণ সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

৫. বিচার বিভাগ/বিচারকগণ

বিচার বিভাগ মদীনা রাষ্ট্রের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিলো। মহানবী [সা] স্বয়ং সর্বোচ্চ বিচারক হিসাবে অসংখ্য বিচার কার্য সম্পাদন করেচেন। তবে অনেক সময় অন্যরাও কাযীর দায়িত্ব পালন করতেন। বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায় যে তার কাছে যে মামলা পেশ করা হেতা তার কোন কোন মামলার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অন্যদের উপর অর্পণ করতেন। এক্ষেত্রে হযরত ওমর, হযরত মাকিল ইবনে ইয়াসার ও হযরত উকবাহ [রা]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া প্রাদেশিক পর্যায়ে যারা কাজীর দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত আলী, হযরত মুয়াজ ও হযরত আবু মূসা আশআরী [রা] প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য যে, নবী করিমের [সা] যুগে বিচার বিভাগ আজকের মতো প্রশাসনিক বিভাগ থেকে পৃথক ছিলো না। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসকগণও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তি এক হলেও তাদের কার্যক্রম পৃথক হতো। তার যুগে বিচার বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে কখনই প্রশ্ন ওঠেনি। প্রশাসকগণ কখনও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন কালে তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন না। বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হতো। এমন কি প্রশাসকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসলে তার বিচারের ভার অন্য বিচারকদের উপর অর্পিত হতো। সেক্ষেত্রে প্রশাসককে সাধারণ বিবাদীর মতো আদালতে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে হতো।

৬. রাজস্ব বিভাগ/রাজস্ব কর্মকর্তাগণ

রাজস্ব বিভাগ গোড়া থেকেই রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ বিবাগ ছিলো। রাজস্ব আয়ের উৎস ছিলোঃ যাকাত, ওশর, খুমুস, জিজিয়া, বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ইত্যাদি। এসব সংগ্রহের জন্যে কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হতো। প্রাদেশিকভাবেও কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো। হিসাব সংরক্ষণও তাদের দায়িত্ব ছিলো। মহানবী [সা] ১৪টি গোত্র থেকে

www.pathagar.com

মোট ২৬ জনকে বিভিন্ন এলাকায় রাজস্ব আদায়ের জন্যে নিয়োগ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সাদাকাহ আদায়ের কর্মকর্তা মহানবীর [সা] নিজ পরিবার/ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন থেকে নিয়োগ দেননি। প্রাদেশিক গভর্নরের তত্ত্বাবধানে প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তাগণ রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রীয় সংগ্রাহকের নিকট সোপর্দ করতেন। সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে জমা হতো। এবং কুরআন ও মহানবীর [সা] নির্দেশনা অনুযায়ী তা ব্যয় করা হতো। প্রাদেশিক ব্যয়ও তাথেকেই মিটানো হতো। কেন্দ্রীয়ও স্থানীয় কর সংগ্রহক ছাড়াও এ বিভাগে আরো কতিপয় কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হতো। তারা হচ্ছেন : ক. খারিস বা কর নির্ধারক খ. সাহেবুল ইমা বা চারণভূমির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। খারিস যিনি ফসল, ফলাদির কর কত হবে তা নির্ধারণ করতেন আর সাহেবুল ইমা হচ্ছে যেসব ভূমি সরকারের অধীন থাকতো তা তত্ত্বাবধান করা। তাছাড়াও সাদাকাহর হিসাব রাখার জন্যে নির্ধারিত কাতিব ছিলেন। জুবায়ের ইবনুল আওয়াম ছিলেন রাসূলুল্লাহর [সা] সাদাকাহ সংক্রান্ত কাতিব। মোটকথা মহানবীর [সা] রাজস্ব বিভাগ খুবই সুসংগঠিত ছিলো।

৭. ধর্মীয় বিষায়ক কর্মকর্তাগণ

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কাজ হচ্ছে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও মুসলিম জনগণকে ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা। গোটা প্রশাসনই একাজের দিকে লক্ষ্য রাখতো। তবে বিশেষভাবে এর জন্যে নবী কারিম [সা] মুবাল্লিগ [ধর্ম প্রচারকদল] পাঠাতেন, মুয়াল্লিম বা শিক্ষাদাতা, মুফতি বা আইন বিশেষজ্ঞ এবং জামাতে সালাত আদায় করার জন্যে হজ্জ্ব কর্মকর্তাও নিয়োগ দিতেন।

ক. মুবাল্লিগ [প্রচারক]

মদীনায় প্রথমে যাকে মুবাল্লিগ বা প্রচারক ও মুয়াল্লিম বা শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেন তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত সাহাবী মুসয়াব ইবনে উমায়র [রা]। তার সহকারী রূপে খাজরাজ গোত্রের সাদ ইবনে যুরারা কাজ করেন। ৪ হিঃ সফর মাসে মুনযির ইবনে আমর আস সাঈদীর নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি দল নাজদে প্রেরণ করেন। অবশ্য এ দলটিকে বিরে মাউনার নিকটে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। একই সময়ে আল রাজি নামক স্থানে আরেকটি দল প্রেরণ করা হয়। তাদের পরিণতিও মর্মান্তিক হয়।

এসব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে মহানবী প্রচারকদলের নিরাপত্তার বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময়ে উমানে প্রচারকার্য চালাবার জন্যে আমর ইবনুল আসকে এবং বাহরায়নে পাঠানো হয় ইবনুল হাযরামীকে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে তিনি বনু জাযীমা ও বনু আল হারিস ইবনে কাব গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। আলী [রা] পাঠানো হয় হামদানের অধিবাসীদের মধ্যে। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ব্যাপকভাবে প্রচারকদল ও দূত পাঠান।

খ. মুয়াল্লিম [শিক্ষক]

মুসয়াব ইবনে উমাইরকে মুয়াল্লিমরূপে মদীনায় প্রথম প্রেরণ করা হয়। আসহাবে সুফফার সদস্যগণ প্রায় সবাই ছিলেন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে নিরত। তাছাড়াও চার জন সাহাবী [রা] শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তারা হলেন:

www.pathagar.com

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ২. উবায় ইবনে কাব ৩. সলিম এবং ৪. মুয়াজ ইবনে জাবাল। তাছাড়াও আবান ইবনে সাঈদ, প্রথম চার খলিফা, আবু হুরাইরা, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সাদ হুজাইফা, সালিম, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] প্রমুখ শিক্ষক হিসাবে খুবই বিখ্যাত ছিলেন।

গ. আইন শাস্ত্রবিদ বা মুফতি

মহানবী [সা] তার জীবদ্দশায় কুরআন সুন্নাহর একদল ব্যাখ্যাকারী সৃষ্টি করে যান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, মুয়াজ ইবনে জাবালসা, উবায় ইবনে কাব ও যায়দ ইবনে সাবিত [রা] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা, আনাস ও বিবি আয়েশা, উম্মে সালামা, ইবনে জুবায়র [রা] প্রমুখ। তারা জাতির আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঘ. সালাতের ইমাম

মহানবী [সা] মদীনা তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের মসজিদে নিয়মিত সালাতের জামায়াত কায়েমের জন্যে ইমাম নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। মদীনার বিভিন্ন গোত্রের জন্যে ৯টি মসজিদ ছাড়াও আশে পাশে আরো অন্তত ২১টি মসজিদ ছিলো যেখানে স্থায়ী ইমাম নিয়োগ করা হয়েছিলো। প্রতিটি প্রদেশের গভর্নর ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন।

ঙ. মুয়াজ্জিন

মহানবী [সা] ইমাম নিয়োগের পাশাপাশি আযান দেয়ার জন্যে মুয়াজ্জিনও নিয়োগ দিতেন। মসজিদে নববীর প্রধান মুয়াজ্জিন ছিলেন হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ [রা]। হাদিস থেকে আরো কয়েকজন মুয়াজ্জিনের নাম জানা যায়। তারা হচ্ছেন হযরত আওস ইবনে মিয়ার আবু মাহযুরা [রা] আমর ইবনে মাখতুম [রা]।

চ. হজ্জ্ব ব্যবস্থাপনা

মহানবী [সা] হজ্জ্বের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যে দায়িত্বশীল নিয়োগ করতেন। কারণ দ্বীনি বিধান অনুযায়ী একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে ও আয়োজনেই হজ্জ্ব অনুষ্ঠিত হতে পারে। ৬৩০ খৃ.মক্কা বিজয়ের পর থেকেই মহানবী [সা] হজ্জ্ব এর আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা করেন। প্রথম হজ্জ্ব প্রধানের [আমিরুল হজ্জ্ব] পালন করেন আত্তার ইবনে আসীদ। পরের বছর আমিরুল হজ্জ্ব হিসাবে হযরত আবু বকর [রা] নিয়োগ পান। শেষ বছর অর্থাৎ বিদায় হজ্জে স্বয়ং মহানবী [সা] আমিরুল হজ্জ্বের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি কাবা ও হারাম শরীফের রক্ষণাবেক্ষণেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এ জন্যে হযরত আব্বাসকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। হজ্জ্বের সময়ে কুরবানীর পশু তত্ত্বাবধানের জন্যেও তিনি কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। আসলাম গোত্রের নাজীয়্যা ইবনুল জুনদুব বিশেষভাবে এই দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন।

হজ্জ্বেও সময় মহানবীর [সা] ভাষণের কথাগুলো জোওে প্রচার করার জন্যে রাবীয়াহ

www.pathagar.com

ইবনে উমাইয়া বিল খালাখ, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী, আওস ইবনে হাদসান বিন হাওয়াজিন প্রমুখ ঘোষকের দায়িত্ব পালন করেন।

মোটকথা তিনি হজ্জ্ব ব্যবস্থাপনার জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন।

৮. বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিবিন্ন জনকে বিশেষ দায়িত্বভার প্রদান করতেন। যেমন, রক্ত পণ আদায়, হজ্জ্ব কায়েম করা, মসজিদে জেরার ধ্বংস করা ইত্যাদি। রাসূলের [সা] এর জীবদ্দশায় ৫টি গোত্র থেকে মোট ১৩জন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো।

বাজার প্রশাসন

বাজারের কার্যক্রম ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে মহানবী [সা] সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলেন। মহানবী [সা] কখনও ককনও স্বয়ং বাজারে যেতেন এবং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতেন এবং কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তার সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন এলাকার বাজার পর্যবেক্ষণের জন্যে তিনি বাজার কর্মকর্তাও নিয়োগ করতেন।

৯. কবি ও বক্তাগণ [শূয়ারা ওয়া খুতাবা]

মহানবী [সা] দরবারে কবি ও বক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিলো যারা শত্রুদের সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। মদীনার তিনজন প্রখ্যাত কবি হাসান বিন সাবিত, কাব বিন মালিক ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা– যারা শত্রু পক্ষের কবিদের নিন্দা, কুৎসা, অপবাদ ও সামলোচনার নিয়মিত জবাব দিতেন এবং প্রতি-আক্রমণও করতেন। তাছাড়াও ছিলেন বড় বড় বক্তা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত জাফর, হযরত সাবিত বিন কায়েস, আমর বিন সুহায়েল প্রমুখ। তারা ইসলামের বিরাট খিদমত আনজাম দিয়েছেন। আর সবচেয়ে বড় বক্তা ছিলেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ [সা]। তাঁদের তৎপরতার ফলেই শত্রু পক্ষের সাংস্কৃতিক আক্রমণ ও আগ্রাসন অনেকটা দুর্বল হয়ে আসে।

১০. নিম্ন স্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ

মহানবীর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন, দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব পালন, তাঁর গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হতো।

মোট কথা মহানবী [সা] ইসরামী রাষ্ট্রের জন্যে এক দক্ষ ও সুবিচারপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

সামরিক প্রশাসন

হিজরতের পর পরই মাহনবী [সা] সেনাবাহিনীর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ধীরে দীরে এক বৃহৎ সেনাবাহিনী গড়ে উঠে। মহানবী [সা] ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। হিজরতের ৬মাসের মধ্যে সামরিক তৎপরতা শুরু করতে তিনি বাধ্য হন। মহানবী যে সব মাসরিক অভিযান প্রেরণ করেন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ১. যে সব অভিযানে অন্য কারো অধিনায়কত্বে প্রেরিত হতো সেগুলোকে বলা হতো সারায়া ২. যেসব অভিযান স্বয়ং মহানবীর [সা] অধিনায়কত্বে

www.pathagar.com

পরিচালিত হতো সেগুলোকে বলা হতো গাজওয়াত। মহানবীর [সা] সময়ে মোট ৭৪টি সারায়া অভিযানের জন্যে ৪৯ জন অধিনাক নিয়োগ করা হয়। কখনও কখনও একই ব্যক্তি একাধিক অভিযানের নেতৃত্ব যাদের হাতে দেন তারা সবাই নেতৃত্বের গুণাবলী ও সামরিক দক্ষতার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর অধিনায়কগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত ছিলেন হযরত জায়িদ বিন হারিস, উসামা বিন জায়িদ, আবদুর বিন আউফ, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস, আলী ইবনে আবি তালিব, আল কামাহ বিন মজাযযিয [রা] প্রমুখ। তাঁর সরাসরি অধিনায়কত্বে ২৮টি অভিযান বা গাজওয়াত পরিচালিত হয়। তার মেধ্য উল্লেখযোগ হচ্ছে : বদর, ওহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খায়বার, মক্কা বিজয় অভিযান, হুনাইন ও তাবুক অভিযান।

মহানবী [সা] সেনাবাহিনী কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিলোঃ ১. পদাদিক বাহিনী [মুশাত] ২. অশ্বারোহী বাহিনী [আল খায়ল] ৩. তীরন্দাজ বাহিনী [রুমাত] ৪. বর্মধারী সৈন্য বাহিনী [আহলুল সিলাহ], এবং রসদবাহী সৈন্য [রিসসাহ]। সাধারণত এক বাহিনীর দায়িত্ব এক একজনকে দেয়া হতো।

সামরিক প্রশাসনের আরো কয়েকটি পদ ছিলো : ১. আল হারাস বা মহানবীর অনুপস্থিতিতে রাজধানীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি গ্যারিসন। ২. পর্যবেক্ষণ বাহিনী : এ বাহিনী শত্রুর নৈশ আক্রমণ করার লক্ষ্যে শিবির স্থাপন ও বিশেষ করে রাতের বেলা শত্রু বাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখতো। ৩. শিবির অধিনায়ক : বিভিন্ন অভিযানে বিভিন্ন ব্যক্তিকে শিবির অধিনায়কের দায়িত্ব দেয়া হতো।

সোনাবাহিনীর আরো কয়েকটি বিভাগ

পতাকাবাহী নিয়োগ

প্রত্যেক অভিযানেই পতাকা বহনকারীর পদ থাকতো। মহানবী [সা] পতাকা বহনকারী হিসাবে ১২টি গোত্র থেকে ৫২জনকে ৮৬টি নিয়োগ প্রদান করেন।

গোপন পর্যবেক্ষণ দল বা তালিয়াহ গঠন ও প্রেরণ

তালিয়া ছিলো ৩-২০ জনের ছোট বাহিনী। তারা প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাতো। তারা অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে প্রেরিত হতো। মহানবী [সা] ১০টি গোত্রের ২২জন কমান্ডারকে তালিয়াহর ২৬টি ক্ষেত্রে নিয়োগ দান করেন।

গুপ্তচর [উয়ুন] নিয়োগ : সেনাবাহিনীর জন্যে গুপ্তচর নিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী সেনাবাহিনীতেও যোগ্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হতো। মহানবী [সা] গুপ্তচর বিভাগে ১৬জনকে ১৭টি নিয়োগ দিয়েছিলেন।

দালিল [পথ প্রদর্শক] নিয়োগ : ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে প্রতি অভিযানেই পথ প্রদর্শক নিয়োগ করা হতো। মহানবীর [সা] কর্তৃক ১৪জন দালিল নিয়োগের কথা জানা যায়।

যুদ্ধলব্ধ মালামাল ও যুদ্ধবন্দীর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা : যুদ্ধলব্ধ মালামাল সংরক্ষণ ও যুদ্ধবন্দীদের ব্যবস্থাপনা ও দেখাশোনার জন্যে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো। যতদূর জানা যায় যে এ পদে ২৮জনকে ৩২টি নিয়োগ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

মোট কথা মহানবী [সা] এমন এক সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন যা তদানীন্তন বিশ্বে ছিলো অতুলনীয়।

প্রাদেশিক প্রশাসন

প্রাদেশিক প্রশাসন গড়ে ওঠে যখন বিভিন্ন অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাদেশিক প্রশাসনের শীর্ষ দায়িত্বে থাকেতন ওয়ালী বা গভর্ণর। তার পর থাকতেন বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ- যেমন সামরিক, বিচার, রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। তাছাড়া থাকতেন স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ। এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো :

ওয়ালী বা গভর্ণর : যখনই মদীনার বাইরের কোন অঞ্চল মদীনা রাষ্ট্রের অধীনে আসতো তখনই তার জন্যে একজন ওয়ালী বা গভর্ণর নিয়োগ করা হতো। তারাই তাদের প্রশাসনের এলাকায় কেন্দ্রের অধীনে স্বাধীন শাসকের মতো দায়িত্ব পালন করতেন। তারা তাদের প্রদেশের সব ব্যাপারেই জবাবদিহির অধীন ছিলেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জাকাত সহ বিভিন্ন কর আদায়ের তত্ত্বাবধান, ধর্মীয় বিষয়াদীর তত্ত্বাবধান, জনকল্যাণ ও নিরাপত্তাসহ যাবতীয় বিষয় তারা দেখাশুনা করতেন। মহানবী [সা] সময়ে ১১টি গোত্র থেকে মোট ৩২জন গভর্ণর নিয়োগ দেয়া হয়।

কখনও কয়েকজন গভর্ণরকে একজন গভর্ণর জেনারেলের অধীনে দেয়া হতো যিনি স্বীয় প্রদেশের গভর্ণরদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন।

স্থানীয় প্রশাসন : ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি এলাকায় নিযুক্ত বা অনুমোদিত প্রশাসক ছিলো। এক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্বের বিষয়টি সাধারণত গোত্র ভিত্তিক ছিলো। তবে সব সময় গোত্রের প্রধানগণ স্থানীয় প্রশাসক হতেন না। স্থানীয় প্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় লক্ষ্য রাখা হতো : এক. স্থানীয় প্রশাসন চালানোর যোগ্যতা, দুই. ইসলামী আদর্শ ও বিধানাবলী বুঝার ক্ষমতা। প্রশাসন চালাবার সাথে সাথে তারা স্থানীয় কর সংগ্রাহকও ছিলেন।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হলো যে মহানবী [সা] রাষ্ট্রের যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন তা ছিলো খুবই সুশৃঙ্খল, বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর প্রশাসনিক কাঠামো একদিকে যেমন এক কেন্দ্রিক ছিলো আবার অন্যদিকে তা ছিলো বিকেন্দ্রিকও। বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতেন। যথোপযুক্ত শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমেই তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন। তিনি তার প্রশাসন এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যাতে তা ন্যায় ও ইনসাফ সম্মত হয় অন্যদিকে যাতে দক্ষতা ও সুশাসন নিশ্চিত হয় তারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। এক কথায় বলা যায় যে মহানবী [সা] এক সর্বাধিক দক্ষ, কার্যকর ও ইনসাফপূর্ণ প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন যা বিশ্ববাসীর জন্যে আদর্শ হয়ে আছে।■

www.pathagar.com

হঠাৎ আলো

মাহবুবুল হক

হঠাৎ করে পাহাড়ী ঢলে এলাকাটা ডুবে যায়। কিছুক্ষণ আগেও রৌদ্রের তাপটা এখানে আগ্নেগিরির লাভার মত মনে হচ্ছিল। এক ফোঁটা বাতাসের চিহ্ন ছিল না আশেপাশে। খাঁ-খাঁ করছিল চারদিক। অল্প আগে ভেড়ার পাল নিয়ে অদূরে ঐ পাহাড়ের কোলে চলে গেছে মেষ পালক। তাপদগ্ধ স্থানে টিকতে পারছিল না মেষ শাবকগুলো। উটের পাল নিয়ে বন্ধু আব্দুল হামেদ তাকে ছেড়ে চলে গেছে দূরে, অনেক দূরে। যাওয়ার সময় বার বার উসমানকে বলছিল চল ঐ দিকে একটা মাজরা আছে। ঐ দিকেই চল। এখানে বসে পুড়ে পুড়ে লাভকি। উসমান যায়নি। বন্ধু আব্দুল হামেদের অনুরোধ সে কখনও উপেক্ষা করে না। কিন্তু আজ সে উপেক্ষা করে। কেন করলো তাও সে জানে না। কেন যেন তার আজ এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কেন কিসের আকর্ষণে এই পাহাড়ের পাদদেশে সে বসেছিল তাও সে জানে না। মাঝে মাঝে তার এমনই হয়। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে ঝিম ধরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। চার পাশটা ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করে। দেখতে ইচ্ছে করে পাহাড়-পর্বত, মরুভূমির ধু ধু বালুচর। বালুচরের ছাড়া ছাড়া কাঁটাগাছ। হঠাৎ করে দৌড়ে পার হওয়া মরুভূমির ক্ষুদ্র কোন সরিসৃপও। অপরাহ্নে ধীরে

www.pathagar.com

ধীরে বয়ে চলা উটের সারি। অথবা মেষের পাল। পাহাড়ের সানুদেশে ভেসে আসা এক চিলতে পানি যেন একখণ্ড মুক্তা। স্বচ্ছ সাবলিল ক্রিস্টাল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে জড়িয়ে থাকা গুল্ম লতা। হঠাৎ করে উড়ে আসা কোন পাখি।

অদূরে তার মাটির বাড়ি। বাড়িতো নয় যেন কয়েকটি ঘরের কারাগার। শুধু শাসন আর নিয়ম। এটা কর, ওটা করবিনা, এর আশপাশে কোন খেজুরের বাগান নেই। বাগান আছে নাঈমাদের বাড়ির কাছে। নাঈমা ওর মামাতো বোন। ধনীর দুলালী। ওদের অনেকগুলো খেজুরের বাগান। খেজুর পাকলেই ওরা তা বিক্রি করে দেয়। অনেক দিরহাম পায় খেজুর বিক্রি করে। ওদের বাড়ি চুন-শুরকির। ওদের পাড়াটা দালান কোঠায় ভরে গেছে। শুধু কি খেজুরের বাগান! নানা শাক সবজি ও ফলের বাগান করা মাজরাগুলো থেকে ঐ মহল্লার লোকেরা অনেক আয় করে। এ মহল্লার লোকেরা গরীব। এরা ঐ মহল্লায় গিয়ে খেজুর বাগান ও মাজরায় কাজ করে। দিনমান কাজ করে কিছু দিরহাম ও খেজুর পায়। ঐ দিয়েই এ মহল্লার লোকদের জীবন নির্বাহ হয়। উসমান ঐ মহল্লায় যায় না। টনটনে ওর আত্মসম্মানবোধ। ঐ মহল্লা ওর নানা-মামাদের মহল্লা, ওখানে গিয়ে ও কি করে কাজ করবে। কাজ করলে ও ছোট হবে, ওর মা, বাবা ছোট হবে। নিজেকে এবং মা-বাবাকে ছোট করে ও কাজ করতে চায় না। অথচ তাদের তীব্র অভাব। দুবেলা পেট পুরে ওরা খেতে পায় না। বাবা মাসুদ মক্কা থেকে পণ্য কিনে বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রি করেন। দু'মাস পরপর বাড়িতে এসে এক মাস কাটান। আবার দু'মাসের জন্য এলাকা ছেড়ে বাইরে চলে যান। যখন চলে যান, তখন থেকে অভাব শুরু হয়। অন্ত ত মাস খানেক তারা তীব্র অভাবে দিন যাপন করেন।

মা আয়েশা বছরে একবার নাওরী যান। ফেরার সময় খেজুর, ফল-মূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস যাই পান তাই নিয়ে আসেন। নানা বাড়ি থেকে আনা খাদ্য সামগ্রী দিয়ে বেশ কটা দিন চলে যায়। সংসারে তো তেমন একটা বেশি লোক নেই। উসমানরা মাত্র দুই ভাই-বোন।

দুই.

সে কি করবে বুঝতে পারে না। বোনের বিয়ে আগে দেবে, না নিজে আগে বিয়ে করবে? কোনটি তার করা উচিত, বুঝতে পারে না সে। পাড়া-পড়শিরা বলে আগে নিজে বিয়ে করো, বিয়ে করলে কোন না কোনভাবে হাতে কিছু অর্থ আসবে, সেই অর্থ দিয়ে বোনের বিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ কথার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পায় না সে। কারণ, রাসূলের আগমনের পর এসব বিষয়তো এখন মিটে গেছে। বিয়ে-শাদীতে এখনতো আর পাওয়ার কিছু নেই, মুনাফার কিছু নেই। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, সবইতো এখন সমান। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে। সামাজিক বন্ধনের ব্যাপ্তি বিস্তারিত করবে। রাসূল তো এমন কথাই বলেছেন। বরং, খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিচেনা করলে দেখা যাবে মেয়েরা বিয়ে-শাদীতে কিছুটা পায়, যেমন মোহরানা ও খোরপোষ। কনে বরের কাছ থেকে মোহরানা পায়, আবার অভিভাবকদের কাছ থেকেও কিছু না কিছু পায়। বরতো থোক কোন অর্থ পায় না। অভিভাবক বা আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে সামান্য উপহার পায়,

www.pathagar.com

যা পণ্য করার বিষয় নয়। বিয়েতে বরকেই খরচ করতে হয়, মোহরানা দিতে হয়, গহনা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে কনেকে তো তেমন কোন খরচ করতে হয় না। আগে অবশ্য কনেকেই বেশি খরচ করতে হতো। সেসব রসম-রেওয়াজতো এখন আর নেই। নারীর অধিকার এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে কি বোনের বিয়ের আয়োজনই সে আগে করবে? কিন্তু এতে তার লাভ কি? বোন মোহরানা পাবে, গহনা পাবে, এতে বোনের জীবনে সুখ আসবে, শান্তি আসবে, আসবে স্বস্তিও। কিন্তু তার তো কোন লাভ হবে না। বোন কি তাকে সাহায্য করবে, সহযোগিতা করবে? বিয়ে দেয়ার পর বোনের কাছ থেকে টাকা সে নেবে কী করে? হঠাৎ তার একটি কাহিনী মনে পড়ে গেলো।

যা হযরত আবু হুরাইরাহ [রা] বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ [সা] এরশাদ করেছেন : এক ব্যক্তি মাঠ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মেঘের আড়াল হতে কাউকে বলতে শুনলো– হে মেঘ, অমুক ব্যক্তির বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ কর।

তখন মেঘ একদিকে চলে গেল এবং এক মাটি বিশিষ্ট পাহাড়ী জমিতে সমস্ত পানি ঢেলে দিল। ওখানে একটি নালা ছিল। সেটা সমস্ত পানি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তা নিষ্কাশিত করে দিল। এই মুসাফিরও ঐ পানির সঙ্গে চলতে থাকল। কিছু দূর গিয়ে সে দেখল এক ব্যক্তি নিজের বাগানে দাঁড়িয়ে পানি যাতে বাগানের গাছ পর্যন্ত যেতে পারে সেজন্যে বেলচা দিয়ে পানির গতি পরিবর্তন করছে। তখন মুসাফির বাগানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল–ওহে আল্লাহর বান্দাহ, তোমার নাম কি? সে যে নামটি বলল মেঘের মধ্য থেকে অদৃশ্য আওয়াজে সে তাই শুনেছিল।

তখন বাগানওয়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করল–তুমি আমাকে আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?

মুসাফিরটি বলল–আমি মেঘওয়ালাকে [আল্লাহকে] এ কথা বলতে শুনেছি-যাও, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর। বল, তুমি নিজের বাগানে এমন কি আমল কর যার জন্যে তোমার ওপর আল্লাহর এ রহমত বর্ষিত হল? বাগানওয়ালা বলল-যখন তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করে বসেছ এবং সবকিছু জেনেই ফেলেছ, তখন আমি বলছি এই বাগান থেকে যা আমি পেয়ে থাকি তাকে তিন ভাগে ভাগ করি। এক তৃতীয়াংশ এই বাগানে [জলসেচ এবং সার ইত্যাদিতে] লাগিয়ে দিই। [মুসলিম]

সে ভাবতে লাগলো তা হলে তার নানার বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই এই কাহিনীটি জানে। তারা নিশ্চয়ই ঐ ধরনের আমল করে থাকে। না হলে ওদের মতো এতো ফসল হয় কী করে? তা হলে, মামারা যে খেজুর ও ফলমূল পাঠায় সেসব ঐ এক-তৃতীয়ংশের অংশ? হয়তো তাই। আবার এমনওতো হতে পারে তাদের অংশ থেকেই এখানে পাঠায়?

মনটা আবার বিগড়ে যায়। কী ছাই-পাস সব ভাবছে! এত্তোসব নিয়ে কেন সে ভাববে? তারতো একটা কাজ দরকার। রোজগার দরকার। বোনটাকে বিয়ে দিতে হবে। বোনটাকে বিয়ে দিতে এখনতো আর বেশি দিরহাম লাগবে না। লাগবে শুধু একটা সুন্দর ছেলে। একটা বিশ্বাসী ছেলে। যে কীনা সারাজীবন আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত থাকবে।

www.pathagar.com

তবে ছেলেটারতো কিছু সামর্থ্য থাকা দরকার। না হলে সংসার চালাবে কী করে? আচ্ছা, ভগ্নিপতি হিসাবে আবদুল হামেদ কেমন হবে? রাখাল বালক! না বালক নয়, যুবক, রাখাল যুবক! হোক না রাখাল যুবক, দেখতে তো শাহানশাহের মতো! চোখজোড়া যেন ফ্যালকনের ডানা। বুকের পাটা যেন টান টান পাহাড়, শীশা ঢালা প্রাচীর! গায়ের রং ঠিক যেন উটের পালের মত। উটের পালের মাঝে সে যখন ঢোকে, তখন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু হামেদেরতো মেয়ে ঘটিত কী একটা বদনাম ছিল। সবই অস্পষ্ট! কিছুই তার মনে নেই। পাহাড় লোকরা বসে কী একটা সালিশ করেছিল। উসমান সালিশে ছিল না। ঐ সময় সে নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। নাঈমা তখন কাছে কাছে থাকতো। মধুর মধুর কথা বলতো। বড় বড় দানার কালো কালো খেঁজুর এনে উসমানের হাতে তুলে দিতো। দেয়ার সময় উসমানের সরল-সাবলীল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। "ভাইয়া, তুমি কী বোবা, কথা বলো না কেন?"–উসমান হাসতো।

সেবারই প্রথম কথা উঠেছিল, নাঈমার সাথে উসমানের বিয়ে হবে। কথাটা নানীই তুলেছিলেন। বলেছিলেন বয়স হোক, খুব ধুম-ধামের সাথে বিয়েটা দেব। আশ-পাশের সব পড়শীকে দাওয়াত দেব। কথাটা শুনেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল উসমানের মুখমণ্ডল। সে আর দেরি করেনি। নানার বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে এসেছিল। আসলে কী হবে? নাঈমার কথা সে ভুলতেই পারেনা। নাঈমাকে নিয়ে সে নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নের দেহে পাখা গজায় প্রতিদিন। সে সব পাখায় ভর করে বহু দূর-দূরান্তে পাড়ি জমায় উসমান।

না এখন নাঈমার কথা সে ভাবেনা। ভাববে হাবসার কথা। হাবসাকে বিয়ে দিতে হবে। হাবসাকে বরের হাতে তুলে দিয়ে নাঈমার কথা ভাববে। আচ্ছা হাবসার বিয়ের সময় নাঈমার সঙ্গে তো দেখা হবে। কিন্তু দেখা হলেও কথাতো বলা যাবে না, ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে না। নবীর আদর্শ তাইতো বলে!

তিন.

উসমান মাঝরাতে বসে বসে ভাবে–মাত্র ক'দিন আগে নাঈমা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতো, মামার সাথে এ পাড়ায়ও আসতো। আমাদের বাড়িতে ২/৪ দিন থাকতো। আম্মাজানের কোলে বসে থাকতো। বিড়ালের পিছু পিছু ছুটে বেড়াতো। হাত ভাংতো, পা ভাংতো। ফুফুর গলা ধরে হাসতো, কাঁদতো। আবদার করে বলতো "এই ফুফু আমাদের বাড়িতে আসো না কেন? আম্মার সাথে কী ঝগড়া হয়েছে? আব্বুর সাথে মনোমালিন্য? ওটাতো তোমারও বাড়ি–আসোনা ফুফু ক'টা দিনের জন্য। খুব মজা হবে। আমরা সবাই মিলে গান গাবো, খেলবো। মাঝরাতে শুয়ে, বসে এবং খেলে একটা দিন কাটিয়ে দেব।" দূর থেকে নাঈমা ভেংচি কাটতো। কাছে এলে সুবোধ বালিকার মত চুপচাপ, যেন এক্কেবারে ছোট বোন। কূপের পানি তুলতে তুলতে নাঈমা একদিন কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলো, আচ্ছা ভাইয়া তোমার সাথে নাকি আমার বিয়ে হবে? কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

আমি আমতা আমতা করে বলেছিলাম, জানিনাতো। নাঈমা তার চিকন ঠোঁট উল্টিয়ে কূপের পাড় থেকে চলে গিয়েছিলো। সেসব কথা, সেবব স্মৃতি এখন খুব মনে পড়ছে। চঞ্চলা হরিণীর মতো নাঈমার এখন আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। সে কি ভয় পেয়ে গেছে? সে কি নবতর আদর্শের অনুসারী হয়ে গেছে? নবতর আদর্শ কি জীবনকে, জীবনের লাবণ্যকে অস্বীকার করছে? রাসূলের আদর্শ কি জীবনকে ম্লান বা নিথর করে দিচ্ছে? সহজতা-সাবলীলতা কি তাহলে জীবন থেকে পালাবে? মরুভূমির জীবন কি তাহলে জীবনের সীমা রেখা?

না, তা হতে পারে না। রাসূলের কথা যা শুনেছি, তাতে তো মনে হয়েছে জীবন পূর্ণিমার চাঁদের মতো স্নিগ্ধ আলোয় ভরে উঠবে। মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো জীবন আবার খল-বলিয়ে উঠবে।

গাছে গাছে ফুল ফুটবে, ফল আসবে, ফল ভারে নত হবে ঋজু খর্জুর বীথি। প্রজাপতি আর মৌমাছিরা ইয়াসরিবের বাতাসকে ভারী করে তুলবে। বাতাসে বইবে বেহেশতি সৌরভের অবারিত কণা। মানুষে মানুষে সৃষ্টি হবে প্রেম, ভালবাসা আর মমতা। নারী তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে। মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সে সমাসীন হবে- এসবই তো সে শুনে আসছিলো আর বিগলিত হচ্ছিল।

চার.

হঠাৎ কাঁধে হাত রাখে আবদুল হামেদ। কী বন্ধু কী ভাবছো এতো? হকচকিয়ে যায় উসমান : না তেমন কিছু নয়-

লুকাচ্ছো কেন! আমিতো তোমার বন্ধু! তোমার পেরেশানিতো আমার পেরেশানি! তোমার মঙ্গলতো আমার মঙ্গল! বলেই উসমানকে জড়িয়ে ধরে।

সত্যি কথা বলবো? বলেই উসমান হামেদের দিকে তাকায়। এখনতো আর মিথ্যা বলার অবকাশ নেই। রাসূলতো মিথ্যা বলা হারাম করে দিয়েছেন। লজ্জা পায় উসমান। বলে নাঈমার কথা ভাবছিলাম।

আগে হাবসাকে বিয়ে দাও, তারপর নাঈমার কথা ভেবো!

ঠিকই বলেছ। নাঈমার কথা ভাবলেই হাবসার কথা মনে পড়ে আবার হাবসার কথা ভাবতে গেলেই নাঈমার কথা মনে পড়ে। কি যে জ্বালা হয়েছে না!

সব আমি বুঝি! তুমি আমার বন্ধু! তোমার সব কথা আমি জানি।

কিন্তু তোমারতো বদনাম আছে। নইলে....।

তুমি কি ঐ হাদীসটি শুননি? তাহলে শোন : বনী ইসরাইলের মধ্যে কিফল নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে সর্বদা গুনাহ করে বেড়াতো এবং কখনও তওবা করার অনুভূতি তার মধ্যে জাগতো না। এক সময় তার কাছে একটি মহিলা আসে যার সঙ্গে ষাট দীনারের বিনিময়ে সে ব্যভিচারের কথা ঠিক করে। কিন্তু ব্যভিচারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী লোকটি কাঁপতে থাকে ও কেঁদে ফেলে। তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করে-তুমি কাঁদছ কেন, আমি

www.pathagar.com

কি তোমাকে এ কাজে বাধ্য করছি? সে বলে– না, কিন্তু এ হল এমন যা আমি এর আগে কখনও করিনি। এখন কেবল মাত্র দারিদ্র্যই আমাকে এ কাজে উদ্যত করেছিল।

সে বলে– যখন এখনও পর্যন্ত তুমি নিজেকে সংযত রেখেছে, তখন তেমনি থাকো। তারপর সে তার কাছ থেকে সরে আসে এবং বলে : যাও, এই ষাট দীনারও আমি তোমাকে দিলাম; এবং আল্লাহর কাছে তওবা করছি যে এখন থেকে কিফল আর কখনও আল্লাহর নাফরমানী করবে না।

বাহ চমৎকার হাদীস তো, আগে বলনি কেন?

মাত্র সেদিন শুনলাম। এর মাঝেতো তোমার সংগে দেখাই হয়নি।

চলো তাহলে উঠে-পড়ে লাগি–

তা তো লাগতেই হবে! অন্তত নাঈমার প্রয়োজনে। দু'বন্ধু আপন মনে কোলাকুলি করে। হঠাৎ হাবসার আর্বিভাব–

ভাইয়া একটা খুশির খবর আছে–

কীরে, কিসের খুশী?

নাঈমারা এসেছে। বাড়ি ভর্তি এখন মেহমান!■

www.pathagar.com

নতুন দিনের বার্তা ॥ সোলায়মান আহসান

আর কোন স্বস্তিকর খবর আছে কী কোনো দিকে?

–মানুষ মরছে সারি, বনি আদমের আহাজারি
হনন প্রক্রিয়া চলে চারিদিকে মৃত্যুধ্বনি তারি,
লোহিত সাগর আরো লাল হলো মাটি হলো ফিকে।
মানুষ মরছে দেখো, মানচিত্র জুড়ে, প্রতিক্ষণ
যেথায় করছে বাস–মুসলিম, ভাগ্য বিড়ম্বিত
লড়াই করছে তারা দৃঢ়তায় আর অকম্পিত
অবসান চায় যতো আসুরিক শাসন ত্রাসন।

আফগান, মিন্দানাও, কাশ্মীর, ইরাক, তিউনিসিয়া
মিসর, লিবিয়া জুড়ে আওয়াজ : ফুরালো সে দিন–
মানব-প্রভুত্ব শেষ–ঘন্টাধ্বনি উঠেছে বাজিয়া
আসবে এবার তারা কালেমার পতাকা উড্ডীন–
বিজয় ঘোষণা দেবে, কুরআন-সুন্না হাতে নিয়া
আর, আমরাও স্থির, হাতে নিয়ে উদ্ধ্যত সঙগীন।

www.pathagar.com

সবুজ দেশের অবুঝ কবির আলাপন ॥ আ সা দ বি ন হা ফি জ

কবির প্রশ্ন :

পাহাড়ের পর পাহাড় দেখেছি রুক্ষ ভয়ংকর
দৃষ্টি অথৈ সীমানা বিহীন শুষ্ক তেপান্তর।
পাথরের পর পাথর দেখেছি বালুকার পর বালি
বৃক্ষসবুজ গুল্মবিহীন; সেখানে রহম ঢালি-
দিয়েছো খোদা আজ সে দেশ বিশ্বসেরা ধনী
কি এমন পুণ্য করেছে তারা আল্লাহ্ কাদের গনি?

উত্তর :

কোন সে পুণ্য করে নাই তারা সবুজ দেশের কবি?
তারা কি বলেনি আল্লাহ্ একক; মুহাম্মাদ তাঁর নবী?
দ্বীন কি তারা ধরেনি আঁকড়ে সীরাত মুস্তাকীম
মারেনি কি তারা অন্তর পশু, বরফ শীতল হীম
করেনি কি হৃদয় মরু বেদুঈন হাজার বছর ধরে
পরম মমতায় আল্লাহর ভয় পোষেনি কি অন্তরে?

মরু বেদুঈন হয়েছে মানুষ, মমতা অপার ঝর্ণা
বক্ষে ধরেছে ক্ষমতা অসীম প্রেম রঙিন বর্ণা।
তাই বালুকা পাথর হয়েছে সম্পদে সীমাহীন
পুণ্য ফসলে উপচে পড়ে আঁকড়ে ধরলে দ্বীন।

কবির প্রশ্ন :

তাঁরা দেখেছে নবীর কান্তি, তাঁরেই বেসেছে ভালো
নবীর প্রেমের জোয়ারে তাঁরা ধুয়েছে হৃদয় কালো।
তার চেয়ে মোরা কম কিসে খোদা নবীকে দেখিনি তবু
বেসেছি ভাল নবীরে তোমার; ভুলিনি তোমায় কভু?
এখনো করি নামাজ রোজা অন্তরে তব ভয়
হররোজ তবু দু:খ কেন সঙ্গী আমার রয়?
এ কেমনতর ইনসাফ খোদা; বুঝি না অধম আমি
এই কি তোমার সুবিচার খোদা বলো না অন্তর্যামী

www.pathagar.com

যেখানে সূর্যের উদয় অস্ত আজানের সুরে হয়
তবু কেন হায় দু:খ কষ্ট সবুজের দেশে রয়?

উত্তর :

কবির মত কথাই বটে, বাইরেটা শুধু দেখো
তার সাথে হৃদি রঙ মিশিয়ে কাব্যকথা লেখো।
আমি তো দেখি অন্তর-বাহির, ভুত ও ভবিষ্যত
তার নিরিখেই লেখা হয়ে থাকে মানুষের কিসমত।

অন্তরে যারা হিংসা-বিদ্বেষ ঘৃণা সর্বদা পোষে
নিজেরা করে হানাহানি আর অন্যকে শুধু দোষে
মিথ্যা বলে, সুদ-ঘুষ খায় বাসে না কাউকে ভালো
সে কি করে পাবে আল্লাহর নূর কিংবা হেরার আলো?

ডুবে থাকে পাপে, আল্লাহকে ডাকে–দুমুখো সাপ
রহমত নয়, এভাবে কুড়ায় আল্লাহর অভিশাপ।
নিজেরা ভণ্ড, তাই প্রতারক শাসক ওরা পায়
নিজের বানানো দু:খ কষ্টে নিজেরাই তড়পায়।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ [সা]

আপনার কাছে নালিশ ॥ হা সা ন আ লী ম

মুহাম্মাদ আপনি এত নিশ্চুপ নীরব নিঃশব্দ কেন?
কেন আপনার সিনা উগলে বদ দোয়ার
আগ্নেয়গিরি উথলি ওঠেনা,
কেন অগ্নি প্লাবনে পাথর ঝড়ে মিছমার হয়না
মিথ্যাবাদীর খামার, ভণ্ডনবীর আস্তানা
খল নায়ক, ধূর্ত চিত্রকরের আড্ডাখানা
শো-গ্যালারীর নগ্নউৎসব!
মুহাম্মাদ আপনি বলুন-
কেন ভূয়া ঈশ্বরের বুৎখানা
শুঁড়ীখানা
অগ্নি সমুদ্রে বিপন্ন হয় না,
মুহাম্মাদ আপনার স্রষ্টা আপনাকে
ভালোবাসেন খুব খুউব-
যারা আপনাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে
সুতীব্র কটাক্ষ করে,
যারা আপনার বাণীকে প্রলাপ মনে করে
পরম প্রভুর মহাবাণী ছুঁড়ে ফেলে
ডাগাড়ে, চরম
অপমানে করে পদদলিত মথিত-
তাদের প্রকাশ্যে শাস্তি হয় না কেন?
কেন আসমানী গজবের ফনা
তাদের গ্রাস করে না?
কেন তোমার প্রিয় মহান প্রভু এসবের
করেনা বিচার গণ আদালতে-
সবার সম্মুখে?
মুহাম্মাদ আপনার প্রতি দরুদ সালাম।

ইয়াহুদী নাসারার খাদ্য তালিকায়
দেড়শ কোটি বলদ গরু-

www.pathagar.com

মোটা তাজা করণ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষার
প্রহর গুণছি–
হে প্রভু আমরা এখন কুরবানীর গাভী
আমাদের হেফাজত কর প্রভু,
প্রিয় ইসমাঈলের মত।
আমাদের ধৈর্য্যের তীর সুতীব্র কর
প্রত্যাঘাতের ক্রুসেডে
ওহুদের প্রান্তরে বদরের মাঠে
আমাদের আবার বিজয়ী কর।

মুহাম্মাদ আপনি প্রার্থনা করুন
আপনার প্রিয় উম্মৎ
বড় মছিবতে আছে–
আপনার সবুজ গম্বুজে যেন
না বসে কোন দাঁড় কাক।
কোন শকুন, ভল্লুক
কিংবা কোন বন্য বরাহ, সারমেয়
করেনা বসত জাজিরাতুল কোবা
ওয়াদি ফাতিমা কিংবা তারিখ
সুলতানায়।

মুহাম্মাদ আপনার সুগন্ধী ঘ্রাণে আবার
ভরপুর হয়ে যাক
খশবু পাগল হয়ে যাক
নাপাক পৃথিবী।

www.pathagar.com

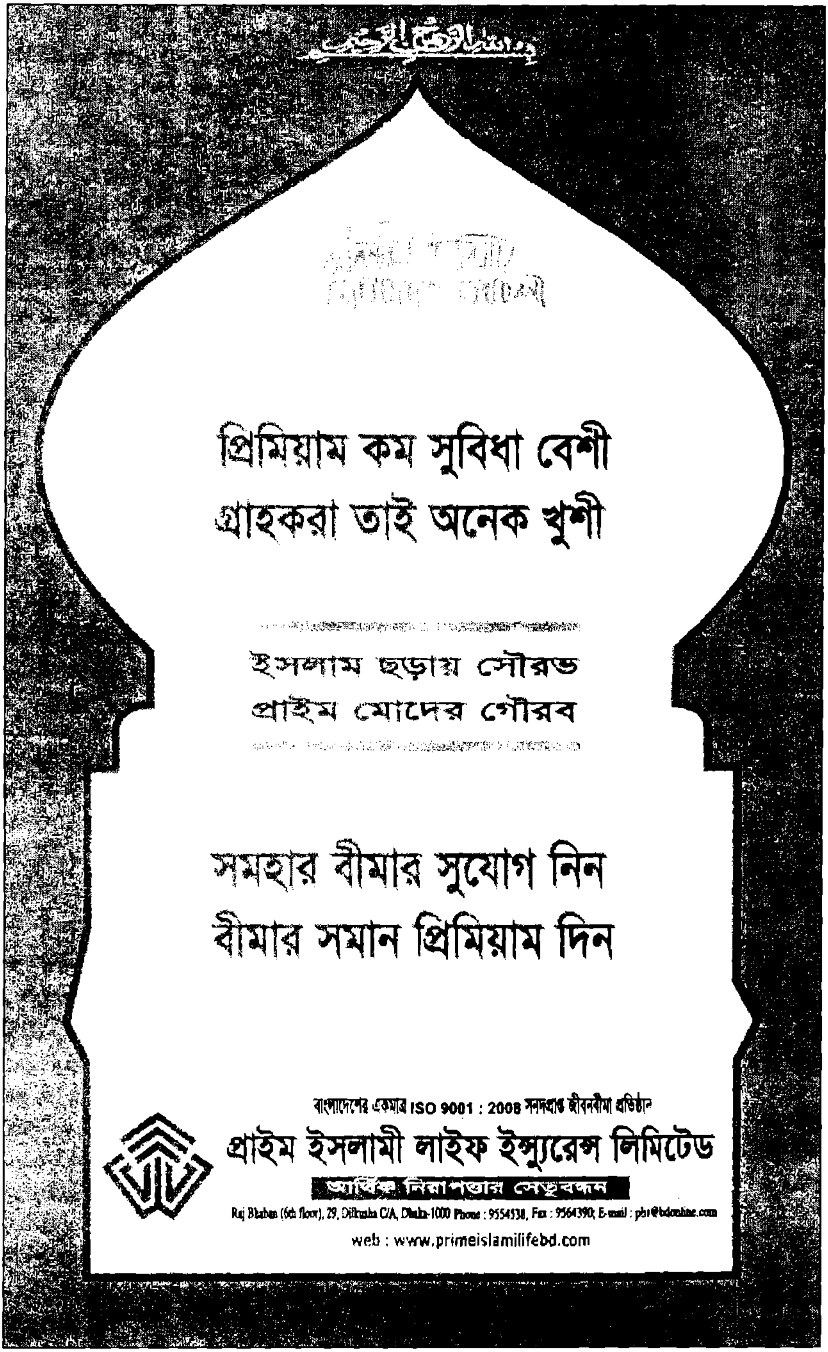

www.pathagar.com

কালো গেলাফ ও সবুজ গম্বুজের টানে

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

[দ্বিতীয় কিস্তি]

[১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে আমি সৌদি আরব যাই ইসলামী ব্যাংক-এর প্রতিনিধিরূপে। আমি তখন ব্যাংকের এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট। রিয়াদে অফিস। নতুন কর্মস্থলে সব কিছু গুছিয়ে মক্কা শরীফ রওনা হতে কয়েক সপ্তাহ দেরি হয়। সেই হলো শুরু। প্রায় পাঁচ বছর সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় ছয়টি দেশে দায়িত্ব পালনকালে বহুবার মক্কা-মদীনার মুসাফির হই। চার-চারবার হজ্জের সফর। অন্যান্যবার উমরা। কোন কোন রোযায় ইতেকাফ। আরব উপদ্বীপের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে বেড়াই। দেখার সুযোগ হয় কুরআনে বর্ণিত বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন। মাদায়েন সালেহ। মাগায়েরে শুয়ায়েব। আসহাবুল উখদুদ। ইসনে আশারা আইন। আদ ও সামুদ জাতির নানা পরিত্যক্ত ভূমি। নবী-রাসূদের জনপদ মিদিয়ান। এছাড়া হাইলে হাতেম তাঈর ঘরবাড়ী। সাকাকা-দুমাতুল জন্দলে ইহুদিদের পরিত্যক্ত প্রাচীন দুর্গ ও ইমরাউল কায়েসের প্রাসাদ। হযরত উমর রা.-এর মসজিদ। রিয়াদের অদূরে ইয়ামামা যুদ্ধের শহীদানের বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্র। সে সব সফরের কিছু বিবরণ ও অনুভূতি ডাইরির পাতায় লিখে রাখি। সেখান থেকে কিছু কিছু বিবরণ কোন কোন পত্রিকায় ছাপা হয়। মক্কা-মদীনায় আমার প্রথম সফরের কিছু কথা ইতোপূর্বে 'প্রেক্ষণ'-এর হজ্জ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। মক্কা-মদীনায় আমার পরবর্তী সফরের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি।]

www.pathagar.com

মক্কায় দোসরা সফর : প্রথম হজ্জ

সৌদি আরবের লোকেরা চাইলেই প্রতি বছর হজ্জে যেতে পারেন না। সে জন্য কিছু নিয়ম মানতে হয়। তিন বছর পর একবার হজ্জে যাওয়া যায়। ভীড় এড়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। সৌদি প্রবাসীদের জন্যও হজ্জ করার বিশেষ নিয়ম। তাদের ইকামায় হজ্জ কর্তৃপক্ষ সিল মেরে অনুমতি দেন। তাও প্রতি বছর নয়। তিন বছর পর পর।

এরূপ কোন বাধা-নিষেধ আছে বলে আমি মনে করিনি। যখন জানলাম তখন দেরি হয়ে গেছে।

আমি সৌদি আরবে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করি আল-রাযী ব্যাংকের ভিসায়। তাদের দেয়া ইকামায় আমার চলাফেরা। হজ্জের সিল লাগানোর জন্য আল রাযী ব্যাংকের পার্সোনেল বিভাগে ইকামা জমা দিলাম দশ এপ্রিল। ব্যাংকের সুদানী কর্মকর্তা আবদুল মুনায়েম বললেন, 'তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ।'

অল্প ক'মাসে আবদুল মুনায়েমের সাথে আমার ভালো খাতির জমেছে। তিনি চেষ্টা করবেন। এক সপ্তাহ পর ইকামা ফেরত নিতে বললেন।

ইকামার বদলে 'ওরাকা' পেলাম। ইকামা আর 'ওরাকা' প্রবাসীদের মুখে মুখে সবচে বেশী উচ্চারিত শব্দ। এ বস্তু ছাড়া সৌদি আরবে ঘরের দরজা খোলাও বিপদ! বাসের টিকেট পেতে তো ইকামা বা ওরাকা লাগবেই।

ওরাকা সম্বল করে রওনা হই আবহা-খামিস মুশায়েত সফরে। রিয়াদ থেকে আবহা বারো শ কিমি পথ। দক্ষিণ আরবের এ এলাকার কথা শুধু নামেই জানি। বাকি সব অপরিচিতির পর্দায় আচ্ছন্ন।

আবহা-খামিস মুশায়েত-জিজানে সংক্ষিপ্ত কিন্তু দুর্দান্ত সফর হলো। প্রাকৃতিক বৈচিত্রে এ এলাকার জুড়ি নেই। আবহায় যখন বরফ পড়ে কিংবা কম্বল মোড়ানো শীত, সুদা পর্বতের ওপাশে লোহিতের পারে জিজানে তখন হাপড় তাঁতানো গরম!

পর্বত, তিহামা ও সাগরমথিত এসব এলাকা আগে ইয়ামেনের অংশ ছিল। এখন সৌদি রাজত্ব। ক'দিনের একটা দ্রুত ও উত্তেজনাকর চক্কর সেরে একুশ এপ্রিল রবিবার জিজান থেকে জ্বর নিয়ে রিয়াদে উড়াল দিলাম। আমাকে যে ফিরতেই হবে! আমার হৃদয় এখন কাবার গিলাফ স্পর্শ করার জন্য উন্মুখ।

১৯৯৬ সালের তেইশ এপ্রিল। এদিন মঙ্গলবার ছয় জিলহজ্জ। দুপুরে রওনা হই মক্কার উদ্দেশ্যে। বাথার সাপটকো স্টেশন থেকে বাসে উঠি। সে বাস আমাদেরকে হজ্জযাত্রীদের নির্ধারিত স্টেশনে পৌছে দেয়। সেখান থেকে একের পর এক বাস ছুটছে মক্কার পথে।

'আগে এলে আগে সিট'। আমি ও শাহজাহান ভাই বিসমিল্লাহ বলে বাসে চাপি। সিট একেবারে পিছনে। এ নিয়ে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।

ভিতরে দারুণ উত্তেজনা। বুকের ভেতর টিপ টিপ শব্দ শুনছি। আর ভাবছি! ...হজ্জের

www.pathagar.com

এ সফরের জন্য কত স্বপ্ন দেখেছি। আলস্নাহর কাছে দোয়া করেছি কত রাত আর কত ভোর। কত শত হজ্জযাত্রীকে নিজ হাতে ফরম পূরণ করে দিয়েছি! হজ্জ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছি। বিদায় বেলায় হাত ধরে অনুনয় করেছি : আল্লাহর ঘরে গিয়ে বলবেন, আমিও যেন কাবার গেলাফ ছুঁতে পারি!

বাসে বসে আমেনা বিলাল ফিলিপের লেখা একটি বই পড়ছি। হজ্জের নিয়ম-কানুন আর হজ্জের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন পশ্চিমা এই নও মুসলিম চিন্তাবিদ।

মরুভূমির পথ বেয়ে ছুটতে ছুটতে আমরা দু'একটি সরাইতে থামি। সর্বশেষ যাত্রা বিরতি হয় তায়েফের মিকাতে। সেখানে অযু করে ইহরাম বাঁধি। দুই রাকাত নামাজ পড়ে ওমরার নিয়ত করি। এর আগে আল্লাহর ঘরের কত লক্ষ কোটি মুসাফিরের মস্তক এ মিকাত মসজিদের মাটি স্পর্শ করেছে। হাজার বছরের সে অভিন্ন পথ পরিক্রমার অংশ ভেবে নিজের ভিতরে কি অদ্ভুত অনির্বচনীয় শিহরণ আমি অনুভব করি।

তায়েফ থেকে বাস ছুটছে ক্বাবার পানে। বাসের ভিতর ভাষা-বর্ণ-দেশ-গোত্রের পার্থক্য মুছে গেছে। সবার একই রকম পোশাক। দু'খন্ড সাদা চাদর। যেন কাফনের কাপড়। সবাই অভিন্ন গন্তব্যের মুসাফির। সকল চিত্ত ক্বাবামুখি। মুখে অভিন্ন উচ্চারণ। লাববায়েক! আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক! হাজির হে প্রভু তোমার দরবারে। তোমার দাওয়াতে। তোমার মেহমানখানায়!

আমরা মক্কা আল মুকাররমার মিসফালা বাসস্ট্যান্ডে যখন পৌছি তখন রাত দুপুর। কিছুমাত্র দেরি না করে মসজিদে হারামের অনন্ত মানবস্রোতে মিশে যাই। কোন্ অতীতে এ স্রোতের উদ্বোধন! সেই থেকে এ স্রোতে মিশেছে কত মানবধারা। আমিও সেই মহাস্রোতের অংশ হই। নিজেকে আবিষ্কার করি এক মহা অস্তিত্বের অংশরূপে।

আল্লাহর নির্দেশে ক্বাবা ঘর পুণর্নির্মাণ করেন ইবরাহিম [আ]। সেই কবে চার হাজার বছর আগে! আল্লাহর নির্দেশেই তিনি এ জনমানবশূণ্য প্রান্তরের এক উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মানুষকে ডাকেন : আসো ক্বাবার দিকে!

কে শুনবে এ আওয়াজ? আল্লাহ বলেন, তুমি ডাক! আমি সে আওয়াজ পৌছে দেব!

ইবরাহিমের সে ডাকে ক্বাবাপানে ছুটছে মানুষের অন্তহীন মিছিল। কাফেলা ছুটছে মিনা-মুজদালিফা-আরাফার পানে। এ মানবমণ্ডলি ইবরাহিমের ডাকে আল্লাহর মেহমান। জৈয়ফুর রহমান।...

তাওয়াফ-এর জন্য এ মাতাফে আগেও দাঁড়িয়েছি। আজ আবার এ পবিত্র প্রান্তরে দাঁড়ালাম। আজ যেন কাবাকে নতুন দেখছি।

এ কেমন ঘর! কাবার দিকে যত লক্ষ-কোটিবার তাকাই প্রতিবার নতুন লাগে! পলকের জন্যও এর আকর্ষণ কমে না। কাম্যতার ক্রমিক হ্রাসের সকল তত্ত্ব এখানে অসার প্রমাণিত হয়।

হজ্জ উপলক্ষেও আজকের হারামের চেহারা ভিন্ন। জনতার সাগরে আজ জেগেছে নতুন উর্মিমালা।

www.pathagar.com

হাজরে আসওয়াদ বরাবর হাতের ইশারা করে কাবার ঘূর্ণিপাকে আমি ঘুরতে শুরু করি। তাওয়াফ শেষে সাফা পর্বতের উঁচুতে কালো পাথরে গিয়ে দাঁড়াই। সেখানে মা হাজেরা আমার জন্য দু'ফোটা পানির খোঁজে দাঁড়িয়েছিলেন। তার মতো করে আমি মারওয়ার দিকে দৌড়াতে শুরু করি।

এ দৌড়ে এখন লাখো মানুষ। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে মারওয়ার চূড়ায় দাঁড়াই। আবার ছুটতে থাকি সাফা পর্বতের দিকে! হাজেরার পায়ের দাগ অনুসরণ করে অন্তহীন ছুটে চলা।... আবে জমজমের খোঁজে। আবে হায়াতের তালাশে। জরা, ক্ষুধা ও ভীতি থেকে শান্তি স্বস্তি তৃপ্তি আর মুক্তির মঞ্জিল হাসিলের তামান্না বুকে নিয়ে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে ছুটছেন সকলে!

এক সময় সাঈ শেষ হয়। এরপর মাথার চুল কামিয়ে 'হালাল' হই। আর তখনি হারাম শরীফের উঁচু মিনার থেকে ফজরের আযান উচ্চারিত হয়। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ! আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্ নাউম। ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম।...

আজ রাতে তো আমরা ঘুমাইনি! আমরা জেগে আছি! সত্যিই কি জেগে আছি আমরা? মুসলিম উম্মাহ্ জেগে থাকলে বিশ্বকে এত লাঞ্ছনা আর মানবতাকে এত গঞ্জনা সইতে হবে কেন?

আমরা কাবার পথের পথিক হয়েছিলাম ছয় জিলহজ্জ। ওমরা শেষ করে সাত জিলহজ্জ বুধবার ফজরের নামাজ ক্বাবা শরীফে আদায় করে এক সুদানী দোকানে নাশতা সারলাম। এরপর শিরশা মহল্লায় শহীদ ভাইর আস্তানায় হাজির হই।

এ আস্তানা ব্যক্তি-শহীদ ভাইর নিবাস মাত্র নয়। মক্কায় এটি বহু বাংলাদেশীর ঠিকানা। ইতোমধ্যে দশ দিগন্ত থেকে আগত অনেক মেহমান এ বাড়ির পরিবেশকে আমোদিত করে তুলেছেন।

বিকালে গোসল সেরে ইহরাম বেঁধে হজ্জের নিয়ত করি। সন্ধ্যায় রওনা হই মিনার উদ্দেশ্যে। মিনায় আগেও গেছি। আজকের সফর অন্য রকম। হযরত ইবরাহিমের কোরবানী আর ইসমাইলের অসাধারণ সবর ও ত্যাগের নযরানার স্মৃতি বুকে নিয়ে মিনার প্রান্তর প্রতি বছর জিলহজ্জ মাসে আল্লাহর লাখ লাখ মেহমানকে নিজের কোল বিছিয়ে দেয়। আমরা এখন যাচ্ছি সেই মিনার পানে!

মক্কা থেকে মিনা। মাত্র তিন মাইল পথ। কিন্তু এ-তো পথ নয়। মানুষ আর গাড়ির সমুদ্র। কুল-কিনারাহীন সেই আবেগ-উত্তাল সাগরের ঢেউ-এর মাঝে হাবুডুবু খেতে খেতে রাত দুপুরে আমরা মিনায় পৌঁছি। আমাদের তাঁবু পূর্ব নির্ধারিত। সেখানে প্রায় সাড়ে তিনশ নারি-পুরুষের থাকার আয়োজন।

আমরা ক'জন স্বেচ্ছাকর্মী কাজে লেগে যাই। বিছানা ও বালিস পেতে দেই। এজতেমায়ী হজ্জের ভাই-বোনদের নিয়ে রাসূল [সা]-এর বাড়ির পাশের নির্ধারিত জায়গা থেকে একের পর এক গাড়ি এসে হাজির হয়।

আমরা আল্লাহর মেহমানদের স্বাগত জানাই। এ এক অন্যরকম মিলন মেলা। অনন্য

www.pathagar.com

উৎসব। আমরা প্রত্যেকের হাতে পরিচিতিমূলক হলুদ রং-এর বেল্ট আর সেফটিপিন দিয়ে কাপড়ে নাম ঠিকানা সম্বলিত কার্ড গেঁথে দেই।

সবাই রাতের খাওয়া সেরে এসেছি। তবু এখন রাত দেড়টা-দু'টায় কারো ক্ষুধা লাগার কথা। আমরা রুটি ও কলা বিতরণ করি।

পঁচিশ এপ্রিল বৃহস্পতিবার। আট জিলহজ্জ। মিনার তাঁবুতে ভোর হয়। তাঁবুর কাছাকাছি টয়লেট ও অযুর জায়গা রাতেই দেখে রেখেছি। আমাদের তাঁবুতে আযান হয়। ঘোষিত হয় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা। আমরা যথাসময়ে ফজরের জামাতে শরীক হই।

সকালের নাশতা রুটি ক্রিম জেলী।

নাশতার পর আমাদের তাঁবুর এজতেমায়ী হাজীদের পরিচিতি অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে আমাদের দল পরিচালনার দায়িত্ব ভাগ হলো। মক্কার শহীদ ভাই ক্যাম্প পরিচালক। রিয়াদের এরশাদুল্লাহ ভাই সহকারী। জেদ্দার ড. হাফেজ হাসান মুঈনুদ্দীন দারুল ইফতা বিভাগের প্রধান। মদীনার ডা. সাইফুল ভাই ও মক্কার শফিউলস্নাহ ভাইর দায়িত্ব খাদ্য সরবরাহ। আমার দায়িত্ব খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনা। মক্কার আজিয়াদ হাসপাতালের ডা. এনায়েতুল্লাহ চিকিৎসা বিভাগের প্রধান। জেদ্দার বজলুর রশীদ ভাই কোরবানীর তত্ত্বাবধায়ক। আরো ক'জনকে বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন করা হলো।

আমীরে হজ্জ নির্বাচিত হলেন জনাব শামসুর রহমান।

হজ্জের মাঠে মিনার তাঁবুতে আমরা সবাই স্বেচ্ছাকর্মী। পুরো ক্যাম্পকে ছয় ভাগে ভাগ করে ছয়টি নাম দেয়া হলো। শাহ মখদুম গ্রম্নপ, আদম শহীদ মক্কী গ্রুপ, শাহ জালাল গ্রুপ, খান জাহান আলী গ্রুপ, হাজী শরীয়তউল্লাহ গ্রুপ, তিতুমীর গ্রুপ। বাংলার আসমানের উজালা তারকাগুলি এভাবে মিনার সামিয়ানায় উদ্ভাসিত হলো।

রিয়াদের আবদুল বারী ফারুকী, রাফার ডা. মোস্তফা কামাল, মদীনার হাফেজ আবদুল মান্নান, রিয়াদের মওলানা শহীদুল্লাহ, ঢাকার প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান সহ ছয় জন নির্বাচিত হলেন এসব গ্রুপের দায়িত্বশীল। ক্যাম্পের মহিলা বিভাগেও এভাবে দায়িত্ব ভাগ করা হলো।

দুপুরের খাবার মেন্যু ভাত ও মুরগীর গোশত। এক নম্বর ও ছয় নম্বর গ্রুপ খাবার পরিবেশন করেন। এরপর বিশ্রাম।

আছর নামাজের পর ব্যক্তিগত পড়াশুনা। মাগরিবের পর প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা। এ অনুষ্ঠানে দারুল ইফতা গ্রুপের দায়িত্বশীল মক্কার উম্মুল করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হাফেজ হাসান মুঈনুদ্দীন হজ্জের বিভিন্ন 'মানাসিক' বা করণীয় সম্পর্কে চমৎকারভাবে সকলকে বুঝিয়ে দেন। প্রশ্নোত্তর পর্বটি এ দারুণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে তোলে।

রাতের খাবার পরিবেশন করেন দুই ও পাঁচ নম্বর গ্রুপ। এর পর মেঝের ঢালাও বিছানায় শয্যাগ্রহণ ও বিশ্রাম।

www.pathagar.com

মিনার তাঁবুতে পূর্ণ একটি দিনের পরিক্রমা এভাবে শেষ হলো।

ছাব্বিশ এপ্রিল শুক্রবার। নয় জিলহজ্জ। আজ ওকুফে আরাফা। হজ্জের দিন। ভোর হলো নতুন আবেগ আর ভিন্ন স্বপ্ন নিয়ে।

ফজরের পর থেকেই মিনার বিশাল পাহাড়ি উপত্যকার চারদিকে সাজ সাজ রব। চলো চলো আরাফা চলো। ...

আমরা যাবো আদম ও হাওয়ার সেই মহামিলনের প্রান্তরে! বাইরের প্রস্তুতি দু'খণ্ড শাদা চাদরের অভিন্ন আচ্ছাদন! সে প্রস্তুতি তো আগেই নিয়েছি। এখন মনকে সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্য তৈরি হতে বলি।...ও-মন মনরে আমার...।

আরাফাতের প্রান্তরে যাওয়ার জন্য সাথে হালকা সামান। পাতলা মাদুর। চাদর। ছাতা। ইত্যাদি।

যথাসময়ে বাস ক্যাম্পের গেটে দাঁড়ায়। মহিলা ও প্রবীণদেরকে বাসের ভিতরে জায়গা করে দিয়ে আমরা 'যুবক'রা ছাদে ঠাঁই নেই।

চারদিকে যদ্দূর চোখ যায় আরাফামুখি লাখো মানুষের উত্তাল ঢেউ। বাস, মিনিবাস আর নানা দেশের নানা রকম যানবাহনে চরে এবং লাখো মানুষ পায়ে হেঁটে মিনা থেকে আরাফার প্রান্তরে ছুটছেন।...

কবে শুরু হয়েছে মানুষের এই পথচলা! পৃথিবীতে কবে পড়েছে মানুষের প্রথম পায়ের ছাপ? ...

এই সে আরাফার প্রান্তর! এখানে প্রথম মানব-মানবী পৃথিবীতে পুনর্মিলিত হন। এই মর্তভূমিতে এই সে মিলন কেন্দ্র। মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছে এখানে। মানব সংস্কৃতির উৎসভূমি এই আরাফার মাঠ। এখানে মানব-মানবীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে আজকের আরাফা পরিণত হয়েছে এক নতুন মিলন মেলায়।... আমরা দেরি না করে আদম-হাওয়ার সন্তানদের এই মহাস্রোতে মিশে যাই।

আরাফায় পৌছি সকাল দশটায়। সূর্য ইতোমধ্যে প্রখর তীব্রতা নিয়ে তার প্রতাপ দেখাতে শুরু করেছে।

তাঁবুর কাছেই অযু গোসল ও টয়লেটের চমৎকার ব্যবস্থা। আরামে গোসল করি। জমজমের পানি পান করি। শহীদ ভাই কোত্থেকে অনেকগুলো তরমুজ জোগাড় করেছেন। সকলকে তরমুজ পরিবেশন করি। প্রচন্ড গরমে সুমিষ্ট এই রসালো ফল সবাই দারুণ পছন্দ করেন।

দুপুরে মসজিদে নিমেরায় হজ্জের খোতবা শুরু হলো। আমাদের তাঁবু মসজিদে নিমেরা থেকে বেশ দূরে। আমরা রেডিওর সাথে মাইক্রোফোন লাগিয়ে ক্যাম্পের সকলকে হজ্জের ও জুমার খোতবা শুনাই। রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা মওলানা শামসুদ্দোহাকে চেহারা-সুরতে আরব ছাড়া ভাবাই যায় না! তিনি চমৎকার বাংলায় সে খোতবার তরজমা পেশ করেন।

www.pathagar.com

মসজিদে নিমেরায় জুমা ও আছরের নামাজ শেষ হয়। এর পর আমরা আমাদের তাঁবুতে প্রথমে জুমা ও এরপর দুই রাকাত আসরের নামায জামাতে আদায় করি। আশপাশের বিভিন্ন তাবুর লোকও এ জামাতে শরিক হন। মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মঞ্জুরে ইলাহি জুমার নামাজে ইমামতি করেন। এই তরুণ ইমাম মিনায় আমাদের জুমার জামাতে হৃদয়স্পর্শী খোতবা দেন। হজ্জের শিক্ষার আলোকে পৃথিবীকে ফের মানুষের শান্তির আবাসস্থলে পরিণত করার স্বপ্নের কথা বলেন তিনি। ...আর আমি ভাবি, আমাদের প্রবীণরা যা পারেননি এ তরুণদের নেতৃত্বে পৃথিবীতে তা সম্ভব হবে। পৃথিবীতে প্রায় সকল বড় আর ভালো পরিবর্তন তো তারুণ্যেরই অবদান।

আরাফাতের প্রান্তরে আজকের দুপুরের সহজ মেন্যু ভুনা খিচুরী। সেই সাথে আচার ও লাবান। তিন ও চার নম্বর গ্রুপ আরাফার মাঠে আল্লাহর মেহমানদের এ জিয়াফতে খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করেন।

আজ হজ্জের দিন। আজ উকুফে আরাফা। আরাফার প্রান্তরে উপস্থিতি। এই তো হজ্জ-এর প্রধান অনুষ্ঠান।

এ দিন মহা ঐক্যের এবং মহা মিলনের। আজ প্রার্থণার দিন। আজ ক্ষমা লাভের দিন।

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার সাথে সাথে আরাফাতের প্রান্তর রূপান্তরিত হয়। এক অন্য রকম ময়দানে। সবাই ভিক্ষুক-কাঙালের মতো ছুটছেন চারদিকে। মনের মতো একটি জায়গা বেছে নিয়ে দু'হাত তুলে সারা জীবনের ভুল ত্রম্নটি ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছেন আল্লাহর কাছে। কেউ একা রোদন করছেন আল্লাহর দরবারে। কোথাও দলবদ্ধ মানুষের ক্রন্দনধ্বনী আকাশে বাতাসে করুণ শিহরণ তুলছে।

সবকিছু দেখে হাশরের ময়দানের দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টা করি। আমি এক অতিশয় গুণাহগার ও দুর্বল বান্দাহ। সারা জীবনের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলি।... রোজ হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার...!

গুণাহ মাফের এ ময়দানে দাঁড়িয়ে আজ সারাজীবনের দোষ-ক্রটির কথা মনে পড়ছে। সে-সব অন্যায়-অপরাধের অনুশোচনা করার জন্য এরচে উপযুক্ত জায়গা কোথায়? এখানে দাঁড়িয়ে বিশেষভাবে মনে পড়ে আমার রহমদিল মা-বাবার কথা। আমার শৈশবের সবচে ঘনিষ্ট সাথি ও বন্ধু শতায়ু জ্ঞানবৃদ্ধ আমার জীবনের মহত্তম শিক্ষক আমার দাদা মরহুম মৌলবি আজিমউদ্দীনের কথা। একজন অতি দয়ার্দ্র কঠোর পরিশ্রমি মহীয়সী নারী আমার নানীর কথা। আর আমার দয়ার্দ্র হৃদয় নি:সন্তান চাচা দীন মোহাম্মদ ও আজীবন সংগ্রামি মামা আবদুর রহমানের কথা। তারা সবাই আজ পরপারে। ...আর আমার স্ত্রী ও কন্যাগণ। মাকসুদা আর তিন মোহসিনা! একই বৃন্তবদ্ধ আমার দুই সহ-উদর আবুল হাসনাত ও আবদুল হালিম। ...

আরো কত স্বজন। জীবিত ও মৃত অসংখ্য ভাই-বন্ধু-সহকর্মী। মাহবুব। সেলিম। আবদুল হান্নান। শাহ আবদুল হালিম। কাজী মরতুজা আলী। সানাউল্লাহ আখুঞ্জি।... হৃদয়ে আঁকা কত শত ছবি।...

www.pathagar.com

...জীবনের বাঁকে বাঁকে কত মানুষের সাথে মেশামেশি। আমাদের ছোট জীবনতরী একেবারে ছোট কি?

কত মানুষের আশ্রয়-প্রশ্রয়-আদর-সোহাগ ভালোবাসা পেয়ে এটুকু পথ এসেছি। কত মানুষ হাত ধরে খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়েছেন। পথ চিনিয়ে দিয়েছেন। পথশ্রমে যখন ক্লান্ত হয়েছি তখন কেউ বা সাহস উৎসাহ আর প্রেরণা যুগিয়েছেন। আর সেই সব জ্ঞানী শিক্ষকেরা! যাদেরকে আমি দেখিনি কিন্তু তাদের কাছ থেকে জীবনের পাথেয় পেয়েছি...! শিখেছি...। আর...হজ্জে যাচ্ছি শুনে কতজন হাত ধরে বলেছেন : আমার জন্য দোয়া করবেন!... কত কত মানুষ।...

প্রাণের কি অপূর্ব আকুতি! এ আকুতি মুক্তির। এ প্রার্থনা মহাপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির। আর মহান মালিকের প্রতি সর্বোচ্চ ভয় ও পরম ভরসার।

...আত্মীয় স্বজনের জন্য, বন্ধু-বান্ধবের জন্য, প্রিয় বাংলাদেশের জন্য মুসলিম উম্মার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি। সারা দুনিয়ার সকল মানুষের হেদায়েত ও নাজাতের জন্য দোয়া করি। সকল প্রাণের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি। বিশেষভাবে দোয়া করি সারা দুনিয়ায় যারা আল্লাহর বিধান ও ব্যবস্থাপনাকে পুরাপুরি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছেন তাদের জন্য।...দোয়া করি আমার রক্ত আর ঘাম মেশানো প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জন্য। এ প্রতিষ্ঠানের জীবিত ও মৃত সকল উদ্যোক্তা, পরিচালক, ব্যবস্থাপক আর অযুত সমর্থক শুভানুধ্যায়ীর জন্য।...

...সব কথা বলা হয় না। সব কথা কি বলে শেষ করা যায়! এই বিশাল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে লাখো মানুষের বিশাল স্রোতরাশিতে আমি কত ছোট আর অকিঞ্চিতকর এক সত্তা। আমি কত দুর্বল। আমার মনের ভাব আর আবেগ প্রকাশে আমি কত অক্ষম! ...কে বলে মাতৃভাষায় আমার কিছুটা অধিকার আছে। আমি সবচে প্রয়োজনীয় কথাগুলিই গুছিয়ে আমার মনিবের কাছে পেশ করতে পারছি না! জীবনের এ পরম মুহূর্তে নিজেকে বড়ই অসহায় আর খেইছাড়া লাগছে! ...

...এক জায়গা থেকে অন্যত্র ছুটে যাই। একের পর এক জায়গা বদলাই। দিগ্বিদিক ছুটি। এক পর্যায়ে খুরশিদকে নিয়ে উঠে যাই দূরের এক পাহাড়ে। সেখানেও চারপাশে অসংখ্য নর-নারির ভিড়। তপ্ত দুপুরের পাথর গলানো ঝলসানো রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে, বসে, একাকি কিংবা দলবদ্ধভাবে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন লাখ লাখ বনি আদম। কোথাও স্বামী-স্ত্রী এক সাথে হাত তুলে আছেন। কোথাও মা-বাবা ও সন্তান। ...আমি পাহাড়ের ওপর একটি পাথরে বসে আমার জীবনের ছোট-বড় পাপরাশির কথা স্মরণ করি। আর আসমানের দিকে তাকাই।... চোখে অশ্রুর ধারা বয়।... আল্লাহ! তুমি কি আমাকে মাফ করেছো?

এই আরাফাতের ময়দানে হযরত আদম [আ] কে আল্লাহ মাফ করেছেন। এখানে সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশে শেষ নবী মুহাম্মাদ [স] বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়েছেন। ...সেই প্রান্তরে আমি আজ আমার পরম প্রভু মেহেরবান আল্লাহর দরবারে মাগফেরাতের জন্য দু'খানি হাত তোলার তওফিক পেয়েছি। এই তো যথেষ্ট! লাখো শোকরিয়া মাবুদ

www.pathagar.com

তোমার দরবারে। তুমি আমার ফরিয়াদ শোন। তুমি আমার প্রতি দয়া করো। আমার পাপরাশি আজ এ ময়দানে তুমি ধুয়েমুছে সাফ করে দাও। তুমি আমাকে পবিত্র ও মাসুম করো। বাকি জীবন তোমার সন্তুষ্টির পথে থেকে সর্বোত্তম কল্যাণকর দায়িত্ব পালনের তওফিক তুমি আমাকে দান করো।

এক সময় পাহাড় থেকে তাঁবুতে ফিরি। সেখানে অনেকে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করছেন। আমিও সেই দলে শামিল হয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলি। এক ভাই খুবই করুণভাবে তার ফরিয়াদ প্রকাশ করছেন আল্লাহর কাছে।...আমি তো এত চমৎকারভাবে আমার কথাগুলি বলতে পারি না। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে শুধুই 'আমিন' 'আমিন' বলতে থাকি।

সবশেষে আমীরে হজ্জ জনাব শামসুর রহমান সকলকে সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তোলেন। তার সাথে মিলে আমরা সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করি। হে আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা করো। আমাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করো। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তার সব কিছু তুমি আমাদের দান করো। আর যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তা থেকে আমাদের হেফাজত করো। হে আল্লাহ! তোমার প্রিয়তম বান্দাহ হযরত মুহাম্মাদ [সা] যে সব কল্যাণের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন সেসব কল্যাণ তুমি আমাদেরকে দান করো। যেসব অকল্যাণ থেকে তিনি পানাহ চেয়েছেন, সে সকল অকল্যাণ থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও! ইয়া রব! তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো।

সূর্যাস্তের পর আরাফাহ থেকে যেতে হবে মুজদালেফা। সেখানে গিয়ে মাগরিব ও এশা আদায় করতে হবে। রাত কাটাতে হবে সে উপত্যকায়।

শহীদ ভাই বললেন, পথে প্রচন্ড ভীড় হবে। তাড়াহুড়া করলে ভিড়ে আটকা পড়তে হবে। তাই আমাদের গাড়ি রাত আটটার দিকে রওনা হবে। শহীদ ভাই অভিজ্ঞ মানুষ। প্রায় দুই দশক তিনি এভাবে এজতেমায়ী হজ্জ আয়োজন করে হাজীদের খেদমত করছেন।

রাত আটটায় আমরা গাড়িতে উঠলাম। গাড়ির ভিতরে মহিলা, শিশু প্রবীণদের অগ্রাধিকার। প্রতিটি গাড়ি গাইড করে নেয়ার দায়িত্ব আমরা ক'জন স্বেচ্ছাকর্মী ভাগ করে নেই। একটি বাসের দায়িত্ব সাইফুল ভাই ও আমার ওপর। সাথে বাবুল হোসেন।

মুজদালিফায় পৌঁছি রাত বারোটায়। লক্ষ লক্ষ বনিআদমের সাথে খোলা আকাশের নীচে আমাদের রাত কাটাতে হবে কাঁকর বিছানো এই পাথুরে উপত্যকায়। এ এক অন্য রকম আবেগ আর উত্তেজনা। আমরা সুবিধামতো একটু খালি জায়গা দেখে মাদুর পাতি। অযুর জায়গা কাছেই। আবদুল বারী ফারুকী ভাইর ইমামতিতে মাগরিব ও এশার জামাত আদায় করি।

রাত কাটে এক ভিন্ন স্বাদ ও আনন্দিত অভিজ্ঞতায়। শাহজাহান ভাই ও আমি চারপাশ ঘুরে ঘুরে চোখ ও মনকে বারবার অবাক হতে সাহায্য করি।

সাতাশ এপ্রিল শনিবার। দশ জিলহজ্জ।

www.pathagar.com

ভোর হয় মুজদালিফায়। ...দিন রাতের ফারাক তো ক'দিনে ভুলে গেছি। মাঝে মধ্যে নামাজের আযান জানিয়ে দেয় কখন ভোর। কখন সন্ধা। কিংবা কখন রাত। এখানে কালের আবর্তন যেন অন্য রকম। জীবনের পথচলাকে নতুন গতি আর নতুন সম্বিত দেয়ার জন্য এই হজ্জের আয়োজনে সব কিছুতেই ভিন্নতা।

ইতোমধ্যে বাস্তবে বুঝেছি, হজ্জের অনুষ্ঠান সুফি-দরবেশের আস্তানায় কোন আত্মমগ্নতার অনুষ্ঠান নয়। পাহাড়ে-কন্দরে-প্রান্তরে এ এক অন্তহীন কুচকাওয়াজ। ডান-বাম-ডান। বিরতিহীন ছুটে চলা। দৌড়-ঝাপ-দৌড়। জীবন যেমন সংগ্রামমুখর। হজ্জে তারই উচ্চতর প্রশিক্ষণ। আল্লাহর রাহে সংগ্রামশীল জীবন পরিচালনার অনুপম প্রশিক্ষণ হজ্বের অনুষ্ঠান। সব কিছুর একটাই নিশানা। আল্লাহর রাজ্যে সুন্দর নেতৃত্ব কায়েমে ব্যক্তি ও ব্যষ্টিকে যোগ্য করে তৈরি করা।

কাবা পৃথিবীর হৃতপিণ্ড। হৃতপিণ্ডের কাজ শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ সচল ও সতেজ রাখা। সারা দেহের রক্ত নিজের কাছে টেনে নিয়ে শোধন করে হৃদপিন্ড রক্তকে ফের সারাদেহে সঞ্চালিত করে। ...এক অবিরাম প্রক্রিয়ায় হৃদপিন্ড দেহকে সতেজ আর সক্রিয় রাখে সারাক্ষণ। তেমনি পৃথিবীর হৃতপিন্ড কাবা। কাবা মানুষকে প্রতিনিয়ত নিজের কাছে টানে। তাকে পরিশুদ্ধ করে। তারপর পরিশুদ্ধ রক্তধারার মতোই এই শুদ্ধ মানুষগুলিকে ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর শিরায় শিরায়। পরিশুদ্ধ মানুষদের মাধ্যমে পৃথিবীতে ন্যায় ও কল্যাণের ফলগুধারা প্রবাহিত করাই তো হজ্জের লক্ষ্য!

কাবা মানব জাতিকে আরেকটি অতিবড় মৌলিক শিক্ষা দেয়। কাবা স্মরণ করায় সকল মানুষের আদি উৎস এক। তারা সকলেই তাদের আদি বাবা-মা আদম ও হাওয়ার সন্তান। ...নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ! জগত ভরমিয়া দেখি একই মায়ের পুত!... আদমের সব সন্তানরা মিলে তারা সকলেই অভিন্ন লক্ষ্যে আল্লাহর রাজ্যের সুশৃংখল কর্মীদল।

মুজদালিফার প্রান্তরে আমাদের ভোর হয় দশই হিলহজ্জ। ফজরের নামাজ শেষে সূর্যোদয় পর্যন্ত দীর্ঘ মুনাজাত পরিচালনা করেন আবদুল বারী ফারুকী ভাই। আমরা আমিন আমিন উচ্চারণে তার সাথে মিলে আল্লাহর দরবারে আমাদের মিনতি জানাই। মুজদালিফার প্রান্তরে অসংখ্য জামাতে নর-নারীরা এভাবেই কান্নাকাটি করছেন।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে অসংখ্য কাফেলা রওনা হয় মিনার উদ্দেশ্যে।

মুজদালিফা থেকে মিনার সীমানার মাঝখানে কিছু জায়গা বিশেষভাবে চিহ্নিত। এ যেন 'নো ম্যানস ল্যান্ড'। এখানে আবরাহার হাতী বাহিনী কাবাঘর ধ্বংশ করতে এসে আল্লাহর কুদরতে আবাবিল পাখির হামলায় নিজেরা বরবাদ হয়। ...এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। ...সে জায়গাটি সকল যুগের মানুষের জন্য শিক্ষার নিদর্শন রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। ... গজবের এ জায়গা আমরা দ্রুত পার হয়ে যাই।

মিনায় পৌছেই নাশতার পর 'বড় জামরা'য় পাথর মারার প্রস্তুতি। আমরা আট দশজন একসাথে জামরাতুল আক্বাবায় 'বড় শয়তান'কে পাথর মারতে যাই।

www.pathagar.com

মুজদালিফা থেকে কাল রাতে উনপঞ্চাশটি পাথর কুড়িয়ে এনেছি। অতিরিক্ত নিয়েছি আরো গোটা দশেক। মটর দানার মতো ছোট পাথর। ছুঁড়তে সুবিধা।

পাথর মারা একটি প্রতীকী অনুষ্ঠান। ইবরাহিম [আ]-এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল মিনার উপত্যকায়। তিনি আল্লাহর হুকুমে তার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কোরবানী করতে এনেছিলেন এখানে। শয়তান তাকে আল্লাহর অবাধ্য বানাতে মিনার তিনটি জায়গায় ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। ইবরাহিম [আ] শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দিয়ে অবিচলভাবে আল্লাহর নির্দেশ পালনে এগিয়ে যান।...আমরাও সে ধারা অনুসরণ করে সকল শয়তানী বাধা দূর করার অনুশীলন করি এবং আল্লাহর পথে অবিচলভাবে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেই শয়তানকে পাথর মারার এই প্রতীকী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

...শয়তানকে পাথর মারার মিছিল ক্রমেই বড় হয়। 'লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' ধ্বনী তুলে মিছিল আগে বাড়ে।...দলে দলে লোক যোগ দেন সে মিছিলে। শয়তানের মুকাবিলায় ইবরাহিমের অনুসারিরা কাতারবন্দী হয়ে এগিয়ে যায়...।

আমার গলায় যতটা শক্তি আছে সবটা একত্রিত করে আওয়াজ তুলি : লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। সারা জীবনব্যাপী আমি আমার গলায় এ শক্তি সঞ্চিত রেখেছি মিনার প্রান্তরে এই শ্লোগান দেয়ার জন্য। হ্যাঁ, আমার গলার আওয়াজ উচ্চ থেকে উচ্চতর নিনাদে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে! গোটা উপত্যকা জুড়ে যেন হাজার হাজার বনি আদম আমার শ্লোগানের প্রতিধ্বনি করেন। এভাবে আমাদের মিছিল বড় হয়। সাদা-কালো-বাদামি, পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের সব মানুষেরা আমরা দৃপ্ত পায়ে ছুটে চলি শয়তানকে পরাজিত করে পৃথিবীতে শান্তি ও সুখের আবাদি গড়ার জন্য।

ইবরাহিম [আ]-এর আহবানের প্রতিধ্বনি করে আমরা কাবার প্রান্তরে লাব্বায়েক বলেছি। আরাফাতের প্রান্তরে আমাদের হাজিরা পেশ করেছি। আর মুজদালিফা উপত্যকায়ও আমরা আল্লাহর হুকুমের কাছে নিজেদের সোপর্দ করেছি। আর এখন মিনার প্রান্তরে শপথ নিচ্ছি! দুনিয়াকে আমরা সকল খারাবি থেকে নিরাপদ করবো! ...

আমরা যতই জামরাতুল আকাবার দিকে এগোই ভিড় ততই বাড়ে। ভিড়ের চাপে রাস্তার ওপর কারো এহরামের চাদর, কারো স্যান্ডেল আর কারো বা ছাতির স্তূপ জমা হয়েছে। তার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলে একের পর এক সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ।

এমন ভিড়ের মাঝে জামরায় পাথর মারা শক্ত কাজ। হাজার হাজার লোক এক সাথে ভিড় করেন এখানে। নানা দেশের নানা সামর্থের মানুষ। আফ্রিকার কিছু কিছু এলাকার লোকদের শারীরিক গঠন ও সামর্থ বেশী। সেই তুলনায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার লোকেরা কম শক্তিশালী। তারপরও কিছু নিয়ম মান্য করলে এখানে ভীড় ও চাপ এড়ানো সহজ হয়। এখানেও আমি চাপ এড়িয়ে আল্লাহর রহমতে খুব কাছে থেকে পাথর মারার সুযোগ পেয়ে আল্লাহকে শুকরিয়া জানাই।

এরপর তাঁবুতে ফিরে কোরবানীর জন্য অপেক্ষা। ...বজলুর রশীদ ভাই কোরবানী সম্পর্কে তথ্য জানাচ্ছেন। যাদের কোরবানী হয়েছে তারা মাথার চুল কামিয়ে হালাল

www.pathagar.com

হন।... এক সময় আমার সুখবর পৌছে। আবদুস শাকুর ভাই যত্নের সাথে আমার মাথা মুন্ডন করে দেন। ঠান্ডা পানিতে গোসল সেরে আরাম পাই। ক'দিন পর এহরামের কাপড় ছেড়ে স্বাভাবিক কাপড়-চোপর পরে দেহ ও মনের দিক থেকে হালকা হই।

দুপুরের পর জনাব শামসুর রহমান, শাহজাহান ভূঁইয়া, খুরশিদুল ইসলাম খোকন, জাকির হোসেন ও আমি জিয়ারতে ইফাদার জন্য একটি জিএমজি গাড়ী নিয়ে হারাম শরীফ রওনা হই। মিনা থেকে লাখো মানুষের স্রোত এখন কাবামুখি। প্রচন্ড ভিড়ের কারণে গাড়ি এগোয় ধীরে। অতি ধীরে।

এক সময় আমরা গিয়ে হাজির হই কাবার চত্বরে। আমাদের সাথে একজন অশীতিপর মুরুব্বী আছেন। খোকন ও শাহজাহান ভাই শামসুর রহমান সাহেবের দুই পাশে হাত ধরেন। পিছনে আমি ও জাকির। যাতে তার অশক্ত শরীরে কোন দিক থেকে চাপ না লাগে! অশীতিপর বৃদ্ধ আমীরে হজ্জ জনাব শামসুর রহমানকে নিয়ে তাওয়াফ করে আমরা বাড়তি আনন্দ অনুভব করি।

তাওয়াফ শেষে যথা সম্ভব মাকামে ইবরাহিম সামনে রেখে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করি। ইতোমধ্যে মাগরিবের আযান হয়। আমরা কাবার ইমামের পেছনে কাতার বেঁধে দাড়াই।

এরপর সাঈ শুরু করি। প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে সাফা থেকে মারওয়া আর মারওয়া থেকে সাফা পৌছাতে দীর্ঘ সময় লাগে। মাঝখানে এশার আযান হয়। আমরা সকলের সাথে সাঈতে বিরতি দিয়ে কাতার বেঁধে জামাতে দাঁড়াই। কাবার ইমাম উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শায়খ আবদুর রাহমান সুদাইসী নামাজে ইমামতি করেন। তাঁর তেলাওয়াতের প্রতিটি শব্দ ওজস্বী উচ্চারণে হারামের আকাশ-বাতাস অলিন্দ-প্রান্তরে অনুরণন তোলে।

এশার জামাত শেষে সাঈর বাকি চক্কর শেষ করি।

একজন প্রবীণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষের সাথে হাত ধরে জিয়ারতে ইফাদা পালনের অনির্বচনীয় আনন্দ নিয়ে মিনার দিকে রওনা হই। তাবুতে পৌছাতে রাত প্রায় দু'টা বাজে।

আল্লাহর শুকরিয়া। ইতোমধ্যে হজ্জের প্রধান প্রধান ফরজগুলি আমাদের আদায় হয়ে গেল।

আটাশ এপ্রিল রবিবার। এগারো জিলহজ্জ।

সকালে নাশতা ও জোহরের পর দুপুরের খাবার পরিবেশন শেষে জামরাতে তিন শয়তানকে পাথর মারি। আজকের দিনে মিনায় এটাই প্রধান আনুষ্ঠানিকতা। আল্লাহর রহমতে প্রতিটি জামরাতে একেবারে কাছ থেকে নিশানা ঠিক করে পাথর মারার মওকা পাই। দোয়া করি, যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে শয়তানের সকল ওসওয়াসা মোকাবিলা করে সঠিক লক্ষ্যে পথ চলতে পারি।

ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতিমূলক কাজ। সাথি ভাইদের সাথে মত বিনিময়। দিনে তিন

www.pathagar.com

বার পুরুষ ও মহিলা ক্যাম্পে খাবার ব্যবস্থাপনা। পরামর্শ বৈঠক। এসব কিছুতে আজো আমার ব্যস্ত দিন কাটে।

উনত্রিশ এপ্রিল সোমবার। বারো জিলহজ্জ। আজ বিকালে শেষ হবে ইজতেমায়ী হজ্জের সকল আয়োজন।

সকালে নাশতার পর বিদায়ী অনুষ্ঠান। ক্যাম্প পরিচালক শহীদ ভাই এজতেমায়ী হজ্জ ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে গত ক'দিনের খরচের হিসাব পেশ করেন। মাথাপিছু প্রত্যেকের কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে। সেটি যার যার পাওনা। ব্যবস্থাপনার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকলে সেজন্য তিনি সকলের কাছে ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে ক্ষমা চান। আমার চোখ এ সময় অজান্তে ভিজে ওঠে।

বিদায়ী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ইজতেমায়ী হজ্জে বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহণকারী ভাইয়েরা তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আমি বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের যে সব আন্তর্জাতিক ইন্সটিটিউশন গড়ে উঠেছে সে আলোকে বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের একটি সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরি। জনাব শামসুর রহমান বিদায়ী বক্তব্য রাখেন। মুনাজাতে সকল অন্তর মোমের মতো গলে গলে একাকার হয়।

বিকালে তিন শয়তানকে পাথর মারতে যাই। জামরার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাথর মারি। অন্যান্য বছর জামরায় পাথর মারার সময় ভিড়ের চাপে হতাহতের ঘটনা ঘটে। এ বছর যাওয়া-আসার আলাদা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এক দল পাথর মেরে যাওয়ার পর আরেক দলকে এগাতে দেয়া হচ্ছে। এ বছর ভিড় নিয়ন্ত্রণে শৃংখলা বেশী। এটা এক অতি বিশাল ব্যবস্থাপনা। ক'বছর আগে জামরাতে পাথর মারতে গিয়ে কেনিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী ভীড়ের চাপে মারা যান। এ বছরও ভিড়ের চাপে দু'একজন সংজ্ঞা হারিয়েছেন।

এ বছর বাংলাদেশ থেকে আমার অনেক আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতজন হজ্জে এসেছেন। আমি জড়িত থেকেছি এজতেমায়ী হজ্জের সাড়ে তিনশ লোকের খেদমতের কাজে। সিটি কলেজের অধ্যাপক জায়েদের সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। এ ছাড়া আর কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে আমার সাক্ষাত হয় নি।...

নাহ!...কথাটা ঠিক বলা হলো না! হজ্জের মাঠে মিনা-আরাফা-মুজদালিফা কিংবা কাবার চত্বরে যাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে তারা তবে কারা? তারা সবাই আমার ভাই অথবা বোন। আদম-হাওয়ার সাথে পৈত্রিক সম্পর্কের সুবাদে তাদের সাথে আমার সম্পর্ক রক্তের। তারচে বড় কথা তাদের সাথে আমার বন্ধন বিশ্বাসের। আমাদের মনিব অভিন্ন। আমাদের পথ অভিন্ন। আমাদের দায়িত্ব অভিন্ন। আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন। আমরা সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। আর আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই নাজাতের ফয়সালা। শান্তি ও স্বস্তির জান্নাত।...

আছর নামাজের পর মিনার ক্যাম্প থেকে বিদায়ী তাওয়াফের উদ্দেশে রওনা হই।

www.pathagar.com

হারামের কাছাকাছি পৌঁছার সাথে সাথে চারপাশে এশার আযান ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। হারাম শরীফের ভিতরে বাইরে জনসমুদ্র। মক্কা-নগরী যেন জনপ্লাবনে ভাসছে। সেই স্রোতে খর-কুটার মতো আমরাও মিশে গেছি।

আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে এশার নামাজ আদায় করি। এরপর বিদায়ী তাওয়াফ। শামসুর রহমান সাহেবকে মাঝখানে রেখে দু'পাশে খোকন ও শাহজাহান ভাই। আমার পাশে শফিক আহসান। সামনে জাকির। আমরা বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করি।...

বিদায়ী তাওয়াফ! ...এই ছোট শব্দ-বন্ধের মধ্যে কী বিশেষ ব্যঞ্জনা! সে কথা অনুভব করে এই মাতাফের লক্ষপ্রাণে আজ আবেগের এক অন্য রকম উথাল-পাথাল! জীবনে কি ফের কখনো এসে আল্লাহর ঘরের পাশে প্রাণভরা আকুতি নিয়ে এভাবে দাঁড়াতে পারবো? হাজরে আসওয়াদ...রুকনে ইয়ামেনী...কাবার দরওয়াজা। কাবার কালো গেলাফ...হাতিম... মাকামে ইবরাহিম। নিরাপত্তার নগরী মক্কা আল-মুকাররমা। ...এসব থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার এ অনুষ্ঠান। বড় আবেগ মথিত এ বিদায়ী তাওয়াফ!... বড় কষ্টের এ বিদায়!

চারদিকের তাওয়াফকারীদের চোখে-মুখে বেদনাবিধুরতা। অনেকে তো ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। হায় প্রেম! হায় প্রার্থণা!

এতো রাতে রিয়াদগামী কোন বাস নেই। অগত্যা শহীদ ভাইর বাসায় পৌঁছি রাতের তৃতীয় যামে। সেখানে শামসুর রহমান সাহেবকে একটি তক্তপোশে জায়গা করে দিয়ে আমরা *ঠেলেঠুলে* মেঝেতে শয্যা পাতি। যা ক'দিনে সব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।■

www.pathagar.com

রাবেতার মাদ্রিদ সম্মেলন : স্বল্প সময়ে অনেক পাওয়া

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

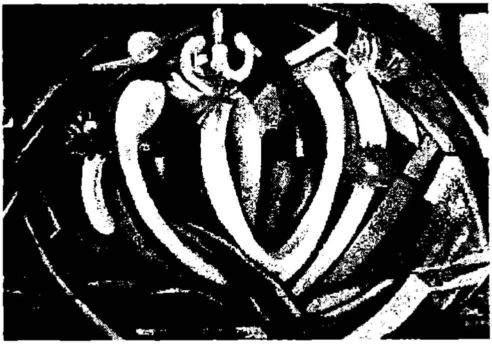

রাবেতায় আল ইসলামী ইংরেজীতে মুসলিম ওয়ার্ল্ডলীগ, যার সদর দপ্তর পবিত্র মক্কাতুল মুকাররমায়। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও সেতু বন্ধন রচনার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে ২০০৮ সালে আয়োজিত আন্ত:ধর্ম সংলাপের মক্কা সম্মেলনে যোগদানের পরের বছরই সম্মেলনের আয়োজন হয় স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে। বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক জনাব আবুল আসাদের পাশাপাশি আমিও আমন্ত্রিত হই। কিন্তু সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র যখন আমাদের কাছে আসে তার মাত্র দুই দিন পরই সম্মেলন শুরু। তার মাঝে ভিসা ও আনুসঙ্গিক সব কাজ বাকী। শ্রদ্ধাভাজন আবুল আসাদ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের যিনি অনেক অভিজ্ঞ। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আশংকা প্রকাশ করলেন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ প্রশ্নে। আমার উৎসাহটা একটু বেশী ছিলো। তার অন্যতম কারণ এক সময়ের অন্ধকার ইউরোপের আলোকবর্তিকা স্পেনকে কাছ থেকে জানা।

www.pathagar.com

মাদ্রিদ গেলে যে গ্রানাডা, কর্ডোভাটা মিছ করবো না সে বিশ্বাস ছিল। আমি আসাদ চাচাকে বললাম আমাদের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালানো উচিত। তিনিও সম্মতি জানালেন। সমস্যা হলো স্পেনের ভিসা নিয়ে। সৌদি এম্বেসী থেকে বাংলাদেশের স্পেনিশ এম্বেসীতে চিঠি পাঠালো আমাদের ভিসা দেয়ার জন্য আর আমাদের বলা হলো স্পেনের এম্বেসীতে যোগাযোগের জন্য। খোঁজ নিয়ে জানলাম স্পেন এম্বেসেডর ওয়েস্টিন হোটেলে থাকেন নিজস্ব অফিসে এখনো ওঠেননি। আমরা সরাসরি ওয়েস্টিন হোটেলে চলে গেলাম। রিসিপশন থেকে কথা বললে তিনি অপেক্ষা করতে বললেন। আমি অভিভূত হলাম ইউরোপের উন্নত একটা দেশের এম্বেসেডর পাঁচ মিনিটের মাথায় লিফট থেকে নেমে আমাদের সাথে কথা বলতে চলে আসলেন। আমাদের মতো অতো প্রটোকল মেইনটেন করলেন না। তিনি জানালেন বাংলাদেশ থেকে স্পেনের ভিসা এখনো চালু হয়নি। তিনি দিল্লী থেকে ভিসা নিতে বললেন। চলে গেলো একটি দিন। তার মাঝে দিল্লী থেকে ভিসা নিতে হলে আবার ইন্ডিয়ার ভিসা লাগবে, সেটা একদিনে কিভাবে সম্ভব এটা ভেবে শ্রদ্ধাভাজন আবুল আসাদ সম্মেলনে যোগদান আমাদের জন্য যে কঠিন তা জানালেন। আমি প্রচেষ্টা চালানোর পক্ষে মত দিলাম। আমার অনুরোধে তিনি ইন্ডিয়ান এম্বেসীর Ist Secratery [Information] কে ফোন করলেন। কেন যেনো মনে হলো তিনি গুরুত্ব দিবেন। সাথে সাথে ভদ্রলোক এম্বেসীতে আসতে বললেন। আমরা সরাসরি তার সাথে দেখা করলাম। তিনি সহযোগিতা করলেন। কথার মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা বলোতো তোমরা আমাদের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা কেনো রাখো? কেন বার বার আমাদের বিরুদ্ধে লেখো? আমি দেখলাম জনাব আবুল আসাদ প্রজ্ঞাবানের মতো জবাব দিচ্ছেন। তিনি বললেন আমরাতো তোমাদের দেশের বিরুদ্ধে কথা বলিনা। বলি তোমাদের নীতির বিরুদ্ধে। তোমাদের সরকার যদি আমাদের সাথে সদাচারণ করে তাহলে আমরা কেন তোমাদের বিরুদ্ধে বলবো? আমরা ছোট দেশ, তোমরা বড় প্রতিবেশী, আমরা তোমাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আমরা প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক প্রত্যাশা করি। দেখলাম ভদ্রলোকটি কোন প্রতিবাদ করলেন না। তিনি বললেন আগামীকাল ভিসা নিয়ে যেও। আরো একদিন চলে গেলো। এদিকে মাদ্রিদ সম্মেলন শুরু হয়ে গেছে আর আমরা ঢাকায়। এখনো হাতে নেই কোন টিকেট, নেই ভিসা। সকালে আমি চলে গেলাম সৌদি এম্বেসীতে। মাননীয় এম্বেসেডর বুশাইরী খুবই প্রাণবন্ত এক মানুষ। তাকে জানালাম সম্মেলনের শেষটাও যদি ধরতে পারি তাহলেও উদ্দেশ্য সফল হবে। তিনি ব্যক্তিগত প্যাডে একটা চিঠি দিলেন এবং তার স্টাফ জনাব ইউসুফ সাহেবকে বললেন যাবতীয় সহযোগিতা করতে। ইউসুফ সাহেব সৌদি এয়ারলাইন্সে যোগাযোগ করলেন। দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজনে আমরা ঢাকা-কলকাতা-দিল্লী যাওয়ার জন্য জেট এয়ারওয়েজের টিকেট নিলাম। সেখান থেকে যাওয়া হবে স্পেনে। আমি চলে এলাম এয়ারপোর্টে। কিন্তু পার্সপোর্ট তখনো ইন্ডিয়ান এম্বেসীতে।

www.pathagar.com

আবুল আসাদ চাচা সকালে চলে গেলেন ইন্ডিয়ান এম্বেসীতে। তিনি এম্বেসীতে পৌঁছা মাত্র রাস্তায় অপেক্ষারত এম্বেসীর একজন কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান ভিসাসহ আমাদের পার্সপোর্ট দু'টো তার হাতে দিলেন। এয়ারপোর্টে পৌঁছুলাম বিমান ছাড়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে। বিমানে আরোহণ করলাম। ঢাকা-কলকাতা ফ্লাইট। কোলকাতা পৌঁছে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা তারপর দিল্লী ফ্লাইট। রাতে দিল্লী পৌঁছুলাম। এক অজানা গন্তব্যে যাত্রার মতই। স্পেনের ভিসা নেই কিন্তু যাচ্ছি সে পথেই। রাতে একটা হোটেলে উঠলাম। সকাল থেকে সারা দিনের ধকল সইতে গিয়ে শরীরে অবসাদ নেমে এলো। সকালে উঠেই আরেক সংগ্রামের প্রস্তুতি। এখন মাদ্রিস সম্মেলনের ২য় দিন চলছে। তাই আজই স্পেনের ভিসা পেতে হবে আর যেতেও হবে আজ। সকাল ৯ টার মধ্যে আমরা দিল্লীর স্পেনিস এম্বেসীতে পৌঁছুলাম। গেটে নক করায় দারোয়ান সাড়া দিলো। আমরা বিস্তারিত বললাম, কি বুঝলো জানি না, সাথে আমাদের কার্ড দিলাম, গার্ড জানালো অপেক্ষা করতে। কোন খবর থাকলে জানাবে। ঘন্টা খানেক পর পাশের গেইট দিয়ে ভিতরে গেলাম। এক মহিলা আমাদের সাথে কথা বললেন। বুঝলাম ঢাকা থেকে স্পেনের এম্বেসেডর আমাদের ব্যাপারে Message দিয়েছে। তবে ভিসা দেবে কি না দেবে তা বললো না, বিকাল ৪টায় আসতে বললো। ঐদিন রাতে সৌদি এয়ার লাইন্সে দিল্লী মাদ্রিদ ফ্লাইট বুকিং আমরা ঢাকা থেকেই করে এসেছিলাম। এখন যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে ভিসা পেলে মাদ্রিদ যাওয়া, না পেলে ঢাকা ফিরে আসা। এখন বেলা ১২ টা। হাতে আর ৪ ঘন্টা বাকি। ভাবলাম সময় ও সুযোগটা কাজে লাগাই। একটা গাড়ী নিলাম ৪ ঘন্টায় দিল্লীর উল্লেখযোগ্য স্থানে আমাদের নিয়ে যাবে। দিল্লী জামে মসজিদসহ ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো দেখতে বের হলাম। আমার ভালো লাগলো এমন একজন ব্যক্তিত্ব আমার সফরসংগী যিনি শুধু সাংবাদিক নন, ইতিহাসসচেতন একজন লেখকও বটে। দেশের জনপ্রিয় উপন্যাস সাইমুম সিরিজের পাঠক মাত্রই সে কথা জানেন। আমার প্রতি সফরের সফরসংগী ডিজিটাল ক্যামেরাটা সাথে নিতে ভুল করিনি। দিল্লী জামে মসজিদে ঢুকলাম। ভিডিও গ্রাফির জন্য এক্সট্রা চার্জ করলো। আমি ছবি তুলছি আর হারিয়ে যাচ্ছি অতীত স্মৃতিতে। দিল্লী মসজিদ কমপ্লেক্সে সাক্ষাৎকার নিলাম জনাব আবুল আসাদের। এমনটাই হয়। পরিকল্পনা করেও অনেক সময় যা করা যায় না তা আবার কখনো কখনো সহজেই হয়ে যায়। দিল্লী জামে মসজিদের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্রটি যখন পবিত্র রমজানে চ্যানেল ওয়ানে সম্প্রচারিত হলো তখন আবুল আসাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার আমার ডকুমেন্টারীকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে বলেই মনে হয়েছে। দিল্লী জামে মসজিদের চারিদিকেই মুসলিম জনপদ। হোটেল রেস্তোঁরা আর দোকানপাটের জমজমাট আয়োজন দেখলে মনে হয় মুসলিম অধ্যুসিত কোন দেশ ভ্রমণে এসেছি। দিল্লী জামে মসজিদের প্রশস্ত আঙ্গিনায় নামাজ আদায় করে খুব ভালো লাগলো। মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা বুঝতে হলে দিল্লীর এসব ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখা খুব জরুরী।

www.pathagar.com

এরপর লালকেল্লা ও অন্যান্য স্থান দেখতে দেখতে চলে গেল ৪ ঘন্টা। আমরা চলে এলাম স্পেন এম্বেসীতে, দেখলাম ভিসাসহ পার্সপোর্ট ফেরত দিলো। ঐ গাড়ীতে করে হোটেলে গিয়ে সাথে সাথে রওনা দিলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে, সন্ধ্যা ৬ টায় পৌঁছে গেলাম বিমান বন্দরে। বিমান ছাড়ার কথা রাত ৮টায়। সেখানে গিয়ে হলো আরেক বিপদ। সৌদি এয়ারলাইন্সের রিয়াদ থেকে আসা ফ্লাইট দিল্লী হয়ে স্পেন যাবে। কাউন্টার থেকে জানানো হলো আমাদের সিট কনকার্ম করা নেই, বিমানে কোন সিটও নেই তাই যাওয়া যাবে না। আমি জানালাম সৌদি এয়ারলাইন্স থেকেই টিকেট দেয়া হয়েছে, কনফার্মের বিষয়টা আমরা কিভাবে বুঝবো? শত চেষ্টায়ও কোন কাজ হলো না। স্পেনের উদ্দেশ্যে বিমান ছেড়ে চলে গেলো। আমরা অসহায়ের মতো দিল্লী বিমান বন্দরে থেকে গেলাম। জীবনে অনেক দেশে অনেক বার গিয়েছি। বিমান বন্দরে এ রকম পরিস্থিতিতে কখনো পড়েছি বলে মনে নেই। আবুল আসাদ চাচা বললেন চলো দেশে ফিরে যাই। আমি বললাম পেছনে যাওয়া আরো কঠিন। আমাদের হাতে দিল্লী ঢাকার টিকেট নেই, আছে দিল্লী স্পেনের টিকেট। আমি সৌদি এয়ারলাইন্সের দিল্লী স্টেশন ম্যানেজারের রুমে গেলাম। তার সাথে পুরো বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম। বললাম আজ যেতে না পারলে সম্মেলন শেষ হয়ে যাবে। তিনি ঢাকার সাথে কথা বলে লুথ্থানসা এয়ারলাইন্সে টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিমানে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুটে কয়েক ঘন্টা যাত্রা বিরতির পর পৌঁছলাম মাদ্রিদ এয়ারপোর্টে। আমাদের ধারণা ছিলো এয়ারপোর্টেই সম্মেলনের রিসিপশন কাউন্টার পেয়ে যাবো। কেননা যে সম্মেলনে সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ আর স্পেনের প্রেসিডেন্ট থাকছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। কিন্তু এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সম্মেলন শেষ পর্যায় তাই সংশ্লিষ্টরা সম্ভবত আগেই চলে গেছেন। Information এ জিজ্ঞাসা করায় তারা হোটেলের নাম বললো আমরা হোটেলের গাড়ীতেই পৌঁছুলাম সম্মেলন স্থলে। হোটেলে পৌছামাত্র দেখলাম শেষ অধিবেশন চলছে। আমরা লাগেজগুলো এক কোণায় রেখে ঢুকে পড়লাম হল রুমে। সাংবাদিক আবুল আসাদ বসে গেলেন সাংবাদিক লবিতে আমি খুললাম ক্যামেরার ব্যাগ। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম সম্মেলনে পৌছার তৌফিক দেয়ার জন্য। ৩ দিনের সম্মেলনের ১ম দিন যেখানে আমরা বাংলাদেশে নেই ভারত, স্পেনের ভিসা সেখানে ৩য় দিন মাদ্রিদ সম্মেলনে উপস্থিত ভাবতে অবাক লাগল। একেই বলে তক্দির। সম্মেলন শেষে আমরা সব ডকুমেন্টারী, পেপার, ক্যাটালগ সংগ্রহ করলাম। দেখলাম সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ, স্পেনের প্রেসিডেন্ট, বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারসহ বিশ্বেও নামীদামী ব্যক্তিত্ব। সম্মেলন শেষ, এবার আমরা গেলাম সম্মেলনের রিসিপশন কাউন্টারে হোটেলের রুমের জন্য। হাট ভাঙলে যেমন সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় ঠিক তেমনি আমাদের কথা শুনার জন্য কাউকেই পাচ্ছি না। শ্রদ্ধাভাজন আবুল আসাদ কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করে হতাশ হলেন। আমি তাকে

www.pathagar.com

লাগেজগুলোসহ একটা সোফায় বসিয়ে বের হলাম কিছু করা যায় কিনা। ভাষা একটা বড় সমস্যা। স্পেনে ইংরেজী ব্যবহার নেই বললেই চলে, আর সম্মেলনে আছে আরবী ভাষা জানা আরব ভাইরা যে ভাষায় আমি অদক্ষ।

আমি মিডিয়া সেন্টারে ব্যস্ত ও কর্মরত সবার দিকে দৃষ্টি রাখছি আর চেষ্টা করছি কাকে বিষয়টা জানাবো তা বের করার জন্য। একজন ব্যস্ত মহিলাকে দেখলাম। তিনি যেমন আরবীতে পারদর্শী ঠিক তেমনি ইংরেজীতে ও প্যানিস ভাষায়ও কথা বলছেন। আমি তাকে আমাদের সমস্যার কথা বলায় তিনি বেশ তৎপর হলেন। তিনি ঘুরে ঘুরে বের করলেন কর্তা ব্যক্তিদের। তাদেরকে আমাদের সমস্যার কথা বলায় সর্বশেষে রুমের চাবি হাতে মিললো। আমাদের ফিরতি ফ্লাইট তিন দিন পর। রাতে হোটেলের ক্যাফেটেরিয়ায় ডিনার করছি। এমনি দেখা Peace Tv'র রিসার্চ স্কলার ও উপদেষ্টা নিসার ভাইর সাথে। তার সাথে আমার সখ্যতা মক্কা সম্মেলন থেকে। তিনি জানালেন ইন্ডিয়া থেকে আগতরা গ্রানাডা কর্ডোভা যাচ্ছে আমি যাবো কিনা। আমি সাথে সাথে আমন্ত্রণ লুফে নিলাম। আমরা টিমে মোট ৮ জন। পরের দিন সকালে আমরা ট্রেন স্টেশনে পৌঁছুলাম। ট্রেন চললো গ্রানাডার পথে। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরের পথ। ইউরোপে ট্রেনভ্রমণ খুব আরামদায়ক। দু'পাশে জয়তুনের বাগান, জনবসতি খুব কম, দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো ট্রেন। আমাদের গ্রুপে আরো আছেন সম্মেলনে আমন্ত্রিত Peace Tv 'র আরেক উদ্যোক্তা ড. শোয়েব। ড. জাকির নায়েক অন্য প্রোগ্রামে থাকায় আসতে পারে নি। আমি তাদের টিভি স্টেশনের কথা জানলাম কিভাবে অল্প আয়োজনে শুরু হয়েছিলো Peace Tv । অনেক কথার মাঝে কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করলাম "তোমাদের চ্যানেলে মিউজিকসহ ইসলামী গান চালাও না কেন"। দু'একজন ইসলামী চিন্তাবিদের নাম বললাম যারা একে সমর্থন করেছেন। নিসার ভাই বললেন, বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদরা একে জায়েয বলেননি। আরো জানালো আমরা শুধু মিউজিক কেন ইসলামের সাথে বিন্দুমাত্র সাংঘর্ষিক হয় এমন কোন কিছু আমাদের চ্যানেলে চালাবো না। যদি ব্যয় নির্বাহ করতে না পারি তাহলে টিভি স্টেশন বন্ধ করে দেবো। তাদের ঈমানের দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হলাম। তিনি জানালেন তাদের সহযোগিতার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেই সুধীজনরা এগিয়ে এসেছেন। দেখতে দেখতে কর্ডোভা চলে এলাম। সেখানে নেমে আমরা দুইটা গাড়ী ভাড়া করলাম সারা দিনের জন্য। প্রথমেই গেলাম কর্ডোভার ক্যাথিড্রালে যা এক সময়ের কর্ডোভার কেন্দ্রীয় মসজিদ ছিলো। প্রবেশ পথেই রয়েছে বিশিষ্ট দার্শনিক ইবনে হাজমের প্রতিকৃতি। পরিবেশটা কেমন যেন নস্টালজিয়ার সৃষ্টি করলো। কালের স্বাক্ষী হয়ে অনেক নিদর্শন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অধিকাংশ ট্যুরিস্ট ইউরোপিয়ান, চাইনিজ জাপানীজ ইত্যাদি। মুসলমানদের খুব কমই দেখলাম। লক্ষ্য করলাম নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই যেনো আমরা ৮ জন হাঁটছি। আমাদের খুব পরখ করা হচ্ছে। ভিতরে মসজিদের মিম্বার, নামাজের জায়গা সবই আছে, আছে কোরানের আয়াত সম্বলিত শত শত ক্যালিগ্রাফি

www.pathagar.com

কিন্তু নেই শুধু মুসলমানের স্বাধীনতা। সেখানে চলছে গীর্জার ঘন্টা ধ্বনি ও প্রার্থনা। আমাদেরই একজন মসজিদের মর্যাদা স্মরণে জুতা খুলতেই নিরাপত্তা কর্মীরা জুতা পরতে বাধ্য করলো। একজন ওজু করতে গেলে তাকে তাও করতে দেয়া হলো না। নামাজ পড়াতো দূরে কথা। পরে জেনেছি সেখানে নামাজ পড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। পাশেই বিক্রি হচ্ছে বই ও ক্যাটালগ। সেখানে লেখা এটি আসলে গীজা ছিলো, স্পেনের মুসলিম শাসনামলে এটিকে জোর করে মসজিদ বানানো হয়। পরে খৃস্টানদের হাতে মুসলিম বাহিনীর পতনের পর এটি আবার গীর্জায় রুপান্তর করা হয়, খুব খারাপ লাগলো ইতিহাস বিকৃতি দেখে। সে সময় লিখিত কোরানের আয়াত সম্বলিত ক্যালিগ্রাফি এখনো দেয়ালে শোভা পায়। চমৎকারভাবে লিখিত এসব ক্যালিগ্রাফি যে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তারপর আমরা রওনা দিলাম গ্রানাডার পথে। রাস্তার দু'পাশে উঁচু নিচু জমি। মাঝে মাঝে দেখছি পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত মসজিদের গম্বুজ। সেগুলোতে এখন আজান হয় বলে মনে হলো না। শহরে নিরাপত্তা চৌকির পাশে মসজিদ নির্মাণ সম্ভবত সে সময়ের সংস্কৃতি ছিলো। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলাম গ্রানাডার ঐতিহাসিক আল হামরা প্রাসাদে। দৃষ্টিনন্দন আর কারুকাজে পূর্ণ পুরো প্রাসাদ। পাহাড়ের শীর্ষদেশ জুড়ে প্রাসাদটি নির্মাণ করায় সেখান থেকে আল হামরার পাশের গ্রামগুলোর বাড়ী খুব ছোট মনে হয়। ফুলে ফুলে সুশোভিত পুরো প্রান্তর। আমরা সেখানে কয়েক ঘন্টা সময় পেয়েছি। পুরো প্রাসাদ দেখা একদিনে সম্ভব নয়। আমি ক্যামেরায় যা পাচ্ছি তাই ধারণ করছি আর দ্রুত ছুটছি।

ক্যামেরায় ছবি ধারনের ক্ষেত্রে ফ্রেমিং একটা বড় বিষয়। আমি দেখলাম যেখানে লেন্স ওপেন করি সেখানেই ছবির গভীরতা ফুটে ওঠে। খুব আবেগতাড়িত হলাম। এই প্রথম তীব্রভাবে অনুভব করলাম আল্লাহ মানুষের চোখের যে ক্ষমতা দিয়েছেন তার কোন তুলনা হয় না। ছবি তুলছি আর বুঝতে পারছি আমার পক্ষে আল হামরা ধারন সম্ভব হচ্ছে না। বিশাল ওয়াল জুড়ে নিখুঁত ক্যালিগ্রাফির কাজ। লক্ষ্য করলাম স্পেনিস গাইডরা বলছে "This is Spanish & Arabic Culture" এগুলো যে কোরানের আয়াত তা তারা বলতে একদম নারাজ। আল হামরার বিশাল লাইব্রেরী ভবন দেখলাম। ইউরোপের অন্ধকার যুগে গ্রানাডা কর্ডোভাকে আলোকবর্তিকা বলা হতো। এখানে যে জ্ঞানের চর্চা হতো তা ইউরোপকে আলোকিত করেছিলো। জ্ঞান বিজ্ঞানই একটি সভ্যতাকে গড়ে তোলে। আমরা দেখেছি চেংঙ্গিস খানেরা যখন বাগদাদ দখল করে তখন প্রথমেই সেখানকার লাইব্রেরীগুলো তারা ধ্বংস করেছে। দু:খ লাগলো মুসলমানরা আত্মকলহ আর ভোগবিলাস কিভাবে তাদের পতনকে নিশ্চিত করেছে। দেখতে দেখতে সময় শেষ হয়ে এলো। এখন ফিরতে হবে কর্ডোভায় তারপর মাদ্রিদ অনেক দূরের পথ। রাতে ফিরে এলাম হোটেলে। ক্লান্ত শরীর নিয়ে রুমে গেলাম। এক দারুণ অনুভূতি কাজ করলো। স্পেন সফরটা যে শতভাগ সফল হলো সেটা ভেবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। পরের দিন গেলাম মাদ্রিদের

www.pathagar.com

কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মসজিদ কাম কমপ্লেক্স দেখতে। বিশাল এক আয়োজন। মসজিদের পাশাপাশি লাইব্রেরী, স্কুল, রেস্তোঁরা, মহিলাদের জন্য লেডিস কর্নার ইত্যাদি অনেক অনেক আয়োজন। জোহরের নামাজ আদায় করে ইমাম সাহেবের রুমে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিলাম। মাঝে পরিচয় হলো ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এক স্পেনিশ ভায়ের সাথে। আমাদের পরিচয় জেনে তিনি সংগ দিলেন। হোটেলে খাওয়ালেন। মনে হলো অনেক দিনের পরিচয়। মুসলমানরা যে একই উম্মাহ্ আর একই আত্মার আত্মীয় তা প্রকাশ পেলো দারুণভাবে। শ্রদ্ধাভাজন আবুল আসাদ খুব আবেগ আপ্লুত হয়ে বললেন "এটা কি দেখছি? আমার সাইমুম সিরিজে কয়েক বছর আগে আমি লিখেছি মুসলমানরা স্পেন থেকে বিতাড়িত হবার পর তারা মাদ্রিদে ইসলামের দাওয়া সেন্টার খুলে আবার সংগঠিত হবার চেষ্টা করছে। আমি তো মাদ্রিদে তাই দেখছি"। আমি বললাম আল্লাহ হয়তো আপনার মনে এটা জাগিয়ে দিয়েছেন তাই এই লেখা। পুরো কমপ্লেক্স ভিডিওতে ধারন করলাম। সেখানে সৌদি টেলিভিশনের এক সাংবাদিক বন্ধু আমার সাক্ষাৎকার নিতে চাইলো। আরবী না জানায় মনের আবেগ প্রকাশ করতে পারিনি। চলে এলাম হোটেলে। মাদ্রিদ ইসলামিক সেন্টারের ডাইরেকটর বেশ ব্যস্ত মেহমানদের বিদায়ের কাজে। কারণ একে একে চলে যাচ্ছে মেহমানরা। আমি সুযোগ মতো তার সাক্ষাৎকার নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করায় সময় দিলেন। হোটেল লবিতে আবুল আসাদ সাক্ষাৎকার নিলেন তাঁর। সংক্ষিপ্তভাবে বললেন এই কমপ্লেক্সে প্রতি সপ্তাহে শত শত স্পেনিস জনগণ আসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে, আরো জানালেন প্রতি সপ্তাহেই কেউ না কেউ মুসলমান হচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম কে জানে এক সময় কর্ডোভা গ্রানাডার মতো ইউরোপের স্থাপনাগুলো হয়তো আবার আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলমানদের পদচারণায় মুখরিত হবে। দেখতে দেখতে সময় চলে এলো ফিরে আসার। বিমানে উঠছি আর ভাবছি কি স্বপ্নময় একটা সফর হয়ে গেলো! কত ভিডিও চিত্র ক্যামেরা বন্দি হলো! মনে মনে ভাবলাম এই সফর শুধু লেখা নয়, তথ্য চিত্রের মাঝে অমর হয়ে থাকবে আগামীর জন্য। আল্লাহ যেনো তা বকুল করেন। ■

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নাত-ই-রাসূল [সা]

মসউদ-উশ-শহীদ

হযরত ঈসার [আ] পর মানুষ নানা বিভ্রান্তিতে আল্লাহকে ভুলে বসলো। শয়তানের কুমন্ত্রণায় দুনিয়া অন্যায়-অবিচারে ভরে গেলো। কোথাও আর ভালো মানুষ রইলো না। আর যারা ভালো আল্লাহকে মানে তারা ভয়ে মুখ লুকায়। তারা খারাপ মানুষদের মাঝে মিলে-মিশে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও কি শান্তি আছে?

মানুষ আল্লাহকে ভুলে মূর্তি পূজা, অগ্নি পূজা, বৃক্ষ পূজা- এমনকি পশু পূজাও করতে লাগলো। এ সবেও কি শান্তি আছে?

না, কোথাও শান্তি নেই। এভাবে দেখতে দেখতে ৫৭০ বছর কেটে গেলো।

এবার তো শান্তি চাই। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে শান্তির এক দিশারীকে পাঠালেন। তিনি হচ্ছেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]।

তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫৭০ খৃস্টাব্দে। সোমবার। বারোই রবিউল আউয়াল। সুবহে সাদিকের পর মুহূর্ত। আঁধার থেকে আলো পৃথক হয়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্ত।

তাঁর জন্মের মুহূর্তে অপূর্ব সব ঘটনা ঘটতে থাকে। ঐতিহাসিকরা বলেন,

www.pathagar.com

সেই মুহূর্তে পারস্যের হাজার বছরের পূজার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিভে যায় নিমেষের মধ্যে। কাবার ৩৬০টি মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে যায়। রুক্ষ, শুষ্ক সামাওয়া উপত্যকায় বেরিয়ে আসে শীতল পানির ফোয়ারা। বাদশাহ নওশেরওয়ার মাথা উঁচু করা দালানের চৌদ্দটি চূড়া ভেঙে খান খান হয়ে পড়ে যায়। আর আকাশের বড় বড় তারাগুলো নিচে নেমে পৃথিবীর কাছে চলে আসে মহানন্দে। নেমে আসে স্বাগতম জানাতে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কে।

সেদিন খুব সকালে ইয়াসরীরের এক দুর্গের চূড়ায় এক মহা হুলস্থুল পড়ে যায়। একজন ইহুদি জ্যোতিষ দুর্গের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে– শোন, শোন, সব ইহুদি শোন। আজ রাতে আকাশে একটি নতুন তারা উঠেছে। আর সেই তারার নিচে জন্ম গ্রহণ করছে আহমদ।

তাঁর জন্মের পূর্বে বিবি আমেনাও স্বপ্নে দেখেন, কে যেন তাঁকে বলছেন– আপনার ছেলেও নাম রাখুন আহমদ। আহমদ মানে চরম প্রশংসাকারী।

দেখতে দেখতে সাতদিন এসে গেলো। বৃদ্ধ দাদু আবদুল মুত্তালিব সেই নাতির আকিকার আয়োজন করলেন। আকিকা অনুষ্ঠানে শিশুর নাম রাখা হবে। আমন্ত্রিত অতিথিরা ভাবলেন– কী নাম রাখা হবে?

কিন্তু নাম তো রাখবেন মক্কার দলপতি আবদুল মুত্তালিব। তিনি মহানন্দে ঘোষণা করলেন : আমার দাদুর নাম হবে মুহাম্মাদ।

মুহাম্মাদ! এ কেমন নাম? এ নাম তো শুনিনি কোনদিন? সবার একই প্রশ্ন!

দাদু বললেন : না, আমার নাতির নাম মুহাম্মাদ-ই হবে। মুহাম্মাদ মানে চরম প্রশংসিত। সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত।

তিনি উচ্ছল আনন্দে বললেন, শুনুন, আমার এই নাতি হবে বিশ্ববরেণ্য। বিশ্বের সবাই তার মহিমা গাইবে। সবার মুখে মুখে প্রশংসিত হবে তার নাম।

আবদুল মুত্তালিবের কথা শুনে সবাই খুশি হলো। শিশু মুহাম্মাদকে দোয়া করে সবাই বিদায় নিলো। শুধু দোয়াই করলো না, মনে মনে সম্মানও দেখালো।

আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে সম্মান দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন শরীফে আছে 'আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ' করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। "মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা আহযাব : ৫১)

এদিকে হাদীস গ্রন্থেও আছে– হযরত আবু হুরাইরা [রা] হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : "যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ১০ বার রহমত নাজিল করবেন।" (মুসলিন)

আরেক হাদীসে আছে– দুনিয়াময় ফেরেশতাগণ ঘুরে বেড়ান– কোথাও আমাদের প্রিয় নবীকে [সা] সালাম জানালে তাঁরা সেই সালাম প্রিয় নবীর [সা] কাছে পৌছেন। তাঁর রওজা শরীফেও সালাম গ্রহণের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন।

www.pathagar.com

বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবের সেই ভবিষ্যত বাণী– আজ মহাসত্যে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার তাবৎ মানুষ– শুধু মুসলমান নয় অন্য ধর্মের ভাল মানুষগুলোও আমাদের প্রিয় নবীকে সম্মান দেখাচ্ছে! তাঁর প্রশংসা করছে।

তাঁর জীবনী আলোচনা করছে। তাঁর আদর্শের প্রশংসা করছে। এমনকি তাঁকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর কবিতা ও গান লিখছে।

তাঁকে নিয়ে যাবতীয় লেখাকে নাতে রাসূল বলা হয়। এই নাতে রাসূল শুরু হয় তাঁর দুধমাতা হালিমার সাত বছরের শিশু কন্যা শায়েমার অপূর্ব একটি নাত দিয়ে। শায়েমা শিশু নবীকে কোলে নিয়ে আদর করে বলতেন–

বেঁচে থাকুক এই মুহাম্মাদ
দীর্ঘজীবী হোক
চির তরুণ, চির কিশোর
চির মধুর হোক
হয় যেন সে মহান নেতা
পায় যেন সে মান
শত্রু যেন না থাকে তার–
ঘুচুক অকল্যাণ।
মুহাম্মাদের দিকে খোদা
দয়ার চোখে চাও
চির গৌরব তাকে তুমি
অকাতরে দাও।

এই যে শুরু হলো নাতে রাসূল [সা] – আর থামেনি। অজস্র ঝর্ণা ধারার মতো দুনিয়ার হাজার হাজার মানুষ তাঁর নামে নাত রচনা করে যাচ্ছেন।

হিজরতের সময় মদীনার দালানের ছাদ থেকে মেয়েরা আনন্দে গেয়ে উঠলো–

তালাআল বদরু আলাইনা
মিন সান ইয়াতিল বিদায়ী
ওয়াবাশ শুকরু আলাইনা
মা-দাআ লিল্লাহি দায়ী...।

ঐ সময় নাজ্জার গোত্রের ছোট ছোট মেয়েরা তাঁকে ঘিরে গাইতে লাগলো–

নাহনু জাওয়ারু
মিন বনী নাজ্জারী
ইয়া হাব্বাজা
মুহাম্মাদান মিন জারি।

www.pathagar.com

তাঁকে নিয়ে কতো নাত রচনা হয়েছে তার হিসাব কখনোই দেয়া যাবে না। তার মধ্যে কিছু কিছু নাত তো বিশ্বখ্যাত হয়ে আছে। শেখ সাদীর সেই নাত এখনতো মানুষের মুখে মুখে–

বালাগাল উলা বিকামালিহি
কাশাফাদ দুজা বিজামালিহি
হাসুনাত জামিউ খিসালিহি
সাল্লু আলা ওয়া আলিহি

এভাবে দুনিয়ার প্রায় সকল প্রধান প্রধান ভাষায় নাত রচিত হয়েছে।

আমাদের বাংলা ভাষাতেও অগণিত নাত রচিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তো একাই শতাধিক নাত রচনা করেছেন।

বাংলা ভাষায় শাহ মুহাম্মদ সগীর প্রথম রাসূলকে নিয়ে লিখেন তাঁর ইউছুফ জোলেখা কাব্যে– তিনি লেখেন–

জীবাত্মায় পরমাত্মা মুহাম্মাদ নাম
প্রথম প্রকাশ তথি হৈলা অনুপম
যথ ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন
মুহাম্মাদ হস্তে কৈলা তা সব রতন।

শাহ মুহাম্মাদ সগীরের এই যাত্রা পথে এখন হাজার হাজার নাতে রাসূল আমাদের বাংলা সাহিত্যে। জার্মান দু'একজন প্রধান কবি ছাড়া প্রায় সকলেই নাত রচনা করছেন।

কবি গোলাম মোস্তফা একটি নাত তো মিলাদ মাহফিলে কেয়ামের সময় কী সুন্দর ভাবেই না সকলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়–

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি–
ইয়া নবী সালাম আলাইকা

কবি জসীম উদ্দীন লেখেন–

রাসূল নামে কে এল মদীনায়
আকাশের চাঁদ কেড়ে
ওকে আনল দুনিয়ায়।

কবি আজিজুর রহমান লেখেন–

মুহাম্মাদের মধুর নামের

www.pathagar.com

গভীর অনুরাগে

হেজাজ থেকে অধীর হাওয়ায়

দোলা এসে লাগে।

কবি ফররুখ আহমদ লেখেন–

জাগলে আঁধার রাতের ডালে

নবী মুহাম্মাদ

হেরার আলোয় পথ দেখালে

নবী মুহাম্মদ।

প্রায় ৬০০ বছর ধরে এরকম অগণিত নাত রচিত হয়েছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে। বর্তমানে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের সাহিত্যিকগণ যেভাবে আন্তরিক উচ্ছলতা নাত রচনায় এগিয়ে এসেছে তার তুলনা হয় না। এই প্রাণবন্ত নাত বাংলাদেশের নাত চর্চায় একটি সোনালী যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে।

তবে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাত-এর কোন তুলনাই হয় না। তাঁর, তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে, মুহাম্মাদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তই আগে, মুহাম্মাদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে, আমায় মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়, নাম মুহাম্মাদ বোলরে মন, নাম মুহাম্মাদ বোল, তৌহিদের মুর্শিদ আমার মুহাম্মাদের নাম, মুহাম্মাদের নয়ন মণি, মুহাম্মাদ নাম জপমালা, সাহারাতে ফুটল রে রঙিন ফুলের লালা, ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর, নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া যে এলো মক্কায় আমিনার কোলে, হেরা হয়ে হেলে দুলে নূরানী তনু ওকে আসে, হায়, এ কোন মধুর শরাব দিলে আল আরাবী সাকী, দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে, পুবাল হাওয়া পশ্চিমে যাওয়া কাবার পথে বইয়া, ইয়া মুহাম্মাদ বেহেশত হতে/খোদার পাওয়ার পথ দেখাও।– এরকম শতাধিক নাত আমাদের বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ হয়ে সাহিত্যের অঙ্গনকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।

আমাদের কামনা বাংলা সাহিত্যে যেন চিরকাল ঝর্ণাধারার মতোই এ ধরনের নাত প্রবাহিত হয় যার কোন অন্ত নেই যার সীমা পরিসীমা নেই।■

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' পূর্বাপর পাঠ ও পর্যালোচনা

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পঠিত গ্রন্থ আল কুরআন। 'কুরআন' শব্দের অর্থ হল 'পঠনীয় গ্রন্থ'। আর বিশ্বব্যাপী শতকোটি মানুষের অনবরত পঠন অধ্যয়নে এ মহাগ্রন্থ আলাহ প্রদত্ত 'কুরআন' নামের মাহাত্ম্যকে করেছে প্রতিষ্ঠিত-উচ্চকিত। আল কুরআনের নির্দেশনায় গড়ে ওঠা বাস্তব প্রায়োগিক রূপ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর নবুওতী জীবন। আর এ কারণেই জীবনী চর্চায় বিশ্বে শীর্ষ স্থানে রয়েছে মহানবী [সা] এর জীবন। তাঁর মহান কর্মবহুল জীবন নিয়ে জীবন চরিত, ইতিহাস, গবেষণা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, না'ত, কবিতা, ক্বাসিদা, গজল, কাওয়ালী সব মিলিয়ে কত বই রচিত হয়েছে তারও হিসাব নিতে গেলে খণ্ডের পর খণ্ড প্রয়োজন হবে শুধু এর সূচি তৈরীতেই। পৃথিবীর প্রায় সকল জীবন্ত ভাষায় তাঁর ওপর অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষায়ও নবী জীবনী মূলক রচনা অসংখ্য। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলোতে তাঁর আগমনের পূর্ব থেকে 'আগমনী সংকেত ধর্মী শ্লোক' আমরা লক্ষ্য করি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ, উপনিষদ ইত্যাদিতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে রচিত রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পূরাণ'এ–

www.pathagar.com

ব্রহ্মা হৈলা মহাঁমদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর

আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি।

কাব্য ভাষায় 'মহামদ' শব্দটি দিয়ে বাংলা ভাষায় মধ্যযুগে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর প্রাসঙ্গিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। ভারতীয় লেখকগণ স্থানীয় নিরিখে যাঁকে তাঁরা 'ব্রহ্মা' বলে ডেকে থাকেন তাঁর সাথে তুলনা করে 'মহাঁমদ' নামটির প্রয়োগ করেন। এতে 'মহামদ' নামটির প্রতি তাঁরাও দেবত্ব আরোপ করে সম্মানের সাথেই নামটির প্রয়োগ করেন। এর পর কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর [১৩৩৯-১৪১০] রচিত 'য়ূসুফ-জলিখা' কাব্যে রাসূল প্রশস্তি রচনার প্রথম প্রয়োগও আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু বাংলা ভাষায় 'রাসূল বিজয়' নামে প্রথম কাব্য রচনা করতে দেখি ১৪৭৪-১৪৮১ সময়কালের কবি জৈনুদ্দিনকে। এরপর এ ধারায় প্রায় প্রত্যেক মুসলমান কবি তাঁদের কাব্য রচনা শুরু করেছেন রাসূল প্রশস্তি দিয়ে। তবে শুধু নবী [সা] এর জীবনী বিষয়ে বই লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান [১৫৫০-১৬৪৮] রচিত 'নবী বংশ' এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। হযরত আদম [আ] থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ [সা] পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণের জীবনীমূলক এটি একটি বিশাল কাব্যগ্রন্থ। কবি আবদুল হাকিম [১৬০০-১৬৭০] রচিত 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থ সীরাত কাব্য সাহিত্যে অন্যবিধ কারণে আরও বেশী সমাদৃত। এ কাব্যের মধ্যেই বাংলা ভাষায় মাতৃভাষার সপক্ষে প্রথম শক্তিশালী পঙক্তি রচনা করতে দেখা যায়;

'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥'

এ অমর পঙক্তিমালা সীরাত সাহিত্যেরই অংশ। শেখ মুত্তালিব সহ মধ্যযুগের অন্য কবিদেরকে সীরাত সাহিত্য রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলতে দেখা যায়। ইংরেজ আমলের দুর্দিনে পুঁথিকারগণ এ ধারাক্রমকে রক্ষার পাশাপাশি এগিয়ে নেন তাদের নিজস্ব ভাষা ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে।

ইরানের কবি শেখ সাদী তাঁর অন্যান্য কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে কবি প্রতিভার যতই পরিচয় দিন না কেন, সীরাত সাহিত্যের বিষয়টি কখনো বিস্মৃত হননি। তাঁর কয়টি অমর পঙক্তিমালা বিশ্বসাহিত্যে এবং বিশ্ব সীরাত সাহিত্যে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। যুগ থেকে যুগান্তরে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে সারা পৃথিবীর শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে তাঁর সীরাত বিষয়ক সে অমর পঙক্তিমালা কোটি কোটি মানুষের মুখে নিত্য উচ্চারিত হয়ে থাকে পরম শ্রদ্ধা এবং বিনম্র ভক্তির সাথে :

'বালাগাল উলা বিকামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বিজামালিহি
হাসুনাৎ জামিয়ু খিসালিহি
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি।'

আমাদের বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে কবির সীরাত বিষয়ক

www.pathagar.com

কবিতার পঙক্তি সারাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মুখে মুখে ফেরে তিনি হলেন কবি গোলাম মোস্তফা। তাঁর রচিত অমর পঙক্তিমালা হলো–

'ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা
সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।'

বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের প্রায় জনেরই কণ্ঠস্থ এ কবিতা। আর সীরাত কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে এভাবেই জনজীবনের অত্যন্ত গভীরে স্থান করে নিয়েছেন কবি গোলাম মোস্তফা।

কবি হিসেবে বিশেষভাবে স্বনামখ্যাত ও সমাদৃত হলেও গোলাম মোস্তফার [১৮৯৫-১৯৬৪] সবচেয়ে বড় খ্যাতি গদ্যভাষ্যে রচিত তাঁর সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ 'বিশ্বনবী'। ১৯৪২ সালে রচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর জীবনীমূলক এ গ্রন্থ রচনার মধ্যদিয়ে তিনি সীরাত সাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা করেন। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে 'বিশ্বনবী'র যে সংস্করণটি রক্ষিত তা ১৯৮০ সালে আহমদ পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত এবং এতে উল্লেখ রয়েছে সপ্তদশ সংস্করণ হিসেবে। ১৯৯৫ পর্যন্ত এর সংস্করণ সংখ্যা ছিল ষষ্ঠবিংশতিতম অর্থাৎ ২৬ তম। একটি বিপুলায়তন গ্রন্থ কী পরিমাণ জনপ্রিয়তা লাভ করলে এর সংস্করণের পর সংস্করণ বের হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। লেখকের জীবদ্দশাতেই এর অষ্টম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন এর উর্দু অনুবাদ হয়ে গেছে। কিন্তু আত্মগর্বে গরীয়ান আমরা নিজ দেশের সীমানায় থাকতেই যেন বেশী পছন্দ করি। তা'না হলে এতদিনে পৃথিবীর প্রায় সবকয়টি ভাষায় বিশ্ব নবীর অনূদিত বিশ্ব সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ত কবি গোলাম মোস্তফার খ্যাতি। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে শান্তির ধর্ম, ন্যায়ের ধর্ম, মানবতার ধর্ম ইসলাম এবং ইসলামের নবী সম্পর্কে বিশ্ববাসী হতে পারত আরও অবগত। কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' রচনার পূর্ববর্তী কয়েক দশকে সীরাত সাহিত্যে বেশ কয়টি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটে। এরমধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' [১৮৮৫-১৮৯১] নিখাঁদ সীরাত সাহিত্য না হলেও কাব্যিক-উপন্যাসিক আমেজে ধর্মীয় সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ জনপ্রিয় গ্রন্থ। মীর মশাররফ হোসেনের একটি মাত্র বইয়ের পরিচিতিতে তাঁর লেখক সত্তার পরিচয় খুঁজলে এ বইটিই সামনে এসে দাঁড়ায়। মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত' [১৯১১] উল্লেখযোগ্য সীরাত গ্রন্থ। মুসলিম মহিলা লেখিকাদের মধ্যে নবী জীবনী রচনায় অগ্রজ ভূমিকা পালন করেন বেগম সারা তৈফুর। তাঁর রচিত 'স্বর্গের জ্যোতি' বইটি একটি শিশুতোষ নবী জীবনী। ১৯১৭ সালে তাঁর এ বইটি প্রকাশিত হয় ইসলামিয়া প্রেস, সাতরওজা, ঢাকা থেকে। বাংলা ভাষায় শিশুতোষ নবী জীবনী রচনায় তিনি পথিকৃৎ। এরপর আসে এয়াকুব আলী চৌধুরীর সীরাত বিষয়ক গ্রন্থটি। কবি

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফার অগ্রজ কুশলী গদ্য শিল্পী এয়াকুব আলী চৌধুরী [১৮৮৮-১৯৪০] রচনা করেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'নূরনবী' [১৯১৮]। এ বইটি বাংলা সাহিত্যের সকল ধারার পাঠককে নবী জীবনী অধ্যয়নে, পঠনে, আত্মস্থকরণে ও নবী জীবনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির' পত্রিকা 'সাহিত্যিক' [১৯২৬] যৌথভাবে সম্পাদনার সুবাদে এঁরা দু'জন এক সময়ের সহকর্মীও। এয়াকুব আলী চৌধুরীর ঐতিহ্যাভিসারী শিল্পোত্তীর্ণ গদ্যভাষ্যে রচিত 'নূরনবী' নামক নবী জীবনীর পাঠকপ্রিয়তা কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য মানসে হয়ত প্রভাবও ফেলতে পারে। এ সময় ও তার পরবর্তী দশকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের না'ত জাতীয় গান ও আব্বাস উদ্দিনের মন কেড়ে নেয়া সুর সীরাত সাহিত্যে এনেছিল এক বিপ্লবের জোয়ার। কবি নজরুলের 'মরু ভাস্কর' সমকালীন মুসলিম জাগরণের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে একজন বাঙ্গালী মুসলমান কবির আত্ম উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞতার ফসল।

এ সময়ে সীরাত বিষয়ক আরেকটি বড় কাজ করেছেন মোবিনুদ্দীন আহমদ জাঁহাগীর নগরী। তাঁর রচিত মেফতাহুর ফুরকান বা কোরআন তত্ত্ব নামক ছয়খণ্ডে প্রকাশিত কোষগ্রন্থটির [১৯২৫] প্রথম খণ্ড থেকে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত নবী জীবনী স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডে সৃষ্টি তত্ত্ব, প্রাচীন নবীগণের ইতিবৃত্ত ও তাঁদের অমূল্য ধর্মোপদেশ রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ইসরাইল বংশোদ্ভূত নবীগণের ইতিবৃত্ত ও তাদের ধর্মোপদেশ এবং খাতামুল মুরছালিন হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা [সা] এর সম্বন্ধে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর ভবিষ্যৎবাণী সমূহ উলেখ করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা [সা] এর আদর্শ জীবনী ও তাঁর অমূল্য বাণী নিচয় বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে। এ খণ্ডটি ১৯২৫ সালে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৩১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কলিকাতা টেক্সটবুক কমিটি কর্তৃক তৃতীয় খণ্ডটি- Notification No. 7 T.B. dated 11.11.1932 of the Education department, Bengal, Calcutta Gazettee dt.24.11.1932 কর্তৃক দীনিয়াত শিক্ষার জন্য নির্বাচিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিল। এ গ্রন্থটি ১৯৮২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'নবী শ্রেষ্ঠ' নামে পুনঃ মুদ্রিত হয়।

কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' রচনার পেছনে এসব সীরাত বিষয়ক প্রকাশনার ক্রমধারা তাঁর দায়িত্ব, উপলব্ধি এবং নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সময়ের প্রয়োজন পূরণে আরেকটি সীরাত গ্রন্থ রচনায় তৎপর করে তোলে। তাঁর কাব্য মানসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে পারিবারিক ও এলাকাভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করে। মরহুম সানাউলাহ্ নূরী [১৯২৮-২০০১] তাঁর এক আলোচনায় এ প্রসঙ্গটি টেনেছেন খুব চমৎকারভাবে। কাজী পরিবারের সন্তান গোলাম মোস্তফার পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যের রেশ ছাড়াও তাঁর ওপর ঐ এলাকার বেশ কয়জন কবির প্রভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়- "ভাবতে অবাক লাগে একত্ববাদী দর্শনের অনুসারী এবং 'বিশ্বনবী' রচয়িতা কবি গোলাম মোস্তফার প্রতিবেশেই জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পূর্বগামী স্রষ্টা প্রেমিক বিশিষ্ট কবিদের অনেকেই। লালন এবং পাগলা কানাই ছাড়া এঁদের মধ্যে আরও ছয়জন এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন।

www.pathagar.com

এঁরা হলেন : হাকিম শাহ, দুদ্দুশাহ, পাঞ্জুশাহ, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মুনশী ময়েজ উদ্দিন এবং শাহ সুফী মুহাম্মদ আব্দুল করিম।" প্রসঙ্গত সানাউলাহ নূরীর লেখক মানসেও আমরা পাই গোলাম মোস্তফার ধারার প্রভাব। হৃদয় কন্দরে তোলপাড় তোলা ব্যতিক্রমী প্রভাব ছাড়াও মূলত গদ্য লেখক সানাউল্লাহ নূরী কেনইবা রচনা করবেন 'আন্দোলিত জলপাই' নামক কাব্য গ্রন্থ। একজন মুসলমান লেখক হিসেবে তাঁর আদর্শের আলোক বর্তিকা স্বরূপ মহানবীর জীবনী অবশ্যই তাঁর মানসপটে প্রভাব ফেলবে। কবি বা সাহিত্যিকগণ তাঁর সাহিত্য মনীষার পরিপূর্ণতায় সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে তাই কাব্যে বা গদ্যে লিখে যান মহানবীর প্রতি তাঁর অভিব্যক্তি। সানাউল্লাহ নূরীও একজন ঐতিহ্য সচেতন আদর্শবাদী লেখক হিসেবে তাঁর এ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর অভিপ্রায়-উপলব্ধিকেই আমাদের সামনে রেখে গেছেন। ফলে 'আান্দোলিত জলপাই' নামক তাঁর এ কাব্য গ্রন্থটিই হয়তো তাঁকে আরো ব্যাপক পাঠক সংলগ্ন করবে এবং এমনটিই কাঙ্খিত ও স্বাভাবিক। এছাড়া কবি গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবী' রচনা চলাকালীন সময়েও ঐ সময়ের আরেক খ্যাতনামা লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী [১৮৯৬-১৯৫৪] রচিত নবী জীবনী 'মরুভাস্কর' [১৯৪১] ও কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন [১৯০১-১৯৮১] রচিত শিশুতোষ নবী জীবনী 'আমাদের নবী' [১৯৪১] প্রকাশিত হয়। ফলে এসব বই অধ্যয়ন ও এর সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যুগের চাহিদা পূরণে একটি পৃথক অথচ পূর্ণাঙ্গ নবী জীবনী রচনা তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। মাওলানা আকরম খাঁর 'বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' এবং ঐতিহাসিক ধারা বর্ণনায় তাঁর 'মোস্তফা চরিত' রচিত হলেও সেখানে বেশী যুক্তির আশ্রয় নিতে গিয়ে মৌলিক বিশ্বাসের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে, গোলাম মোস্তফা তা সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছেন। একজন কবির হাত দিয়ে জীবনী রচনায় তাও আবার মহানবী [সা] এর জীবনী ভাবালুতার দ্বারা আক্রান্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর এ ভাবালুতাকে 'বিষয় নির্মাণ ও ভাষার দেহ নির্মাণ' এসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। 'শিল্পী হিসাবে এখানেই তাঁর সার্থকতা' ফুটে উঠেছে। সমকালীন বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চার প্রসঙ্গটি ছিল তাঁর চোখের ওপরে। এছাড়া ঐ সময় পর্যন্ত বিশ্বের নামকরা লেখকগণের রচিত তেষট্টিটি গ্রন্থ থেকে তিনি নবী জীবনী রচনার মাল-মশলা গ্রহণ করেন। এসব বিশ্বসেরা গ্রন্থগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর কবিসুলভ শিল্প সুষমায় অবগাহন করিয়ে তথ্য এবং সত্যকে শিল্পীর তুলিতে পালিশ করে উপস্থাপন করেছেন। যে জন্য রচনার পর পরই তাঁর বইটিও হয়ে ওঠে ঐসব রেফারেন্স বইগুলোর মতই একটি। হযরতের জীবনের খুঁটিনাটি দিকের আলোচনাই শুধু তিনি করেননি, পর্যালোচনাও করেছেন। যে সমস্ত বিষয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মনে প্রশ্নের উদয় হবে তিনি নিজের উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞতায় সেখানেই বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তিভিত্তিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে উত্তর দাঁড় করিয়েছেন। দুই খণ্ডে রচিত গ্রন্থটিতে কুরআনের আয়াত, হাদিছের উদ্ধৃতি শুদ্ধ বাংলায় করায় যে কোন বাংলা ভাষাভাষি পাঠক এটি সহজে মুখস্থ করতে পারবেন। পাশেই সূত্রের উল্লেখ থাকায় গবেষকগণ যেমন ইচ্ছা করলে বিষয়ের গভীরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন তেমনি সাধারণ

www.pathagar.com

পাঠকগণও প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে পারবেন। শুধু নবী জীবনী নয়, বিজ্ঞানের আলোকে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোকে, ইতিহাসের আলোকে, নৃ-তত্ত্বের, সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে, যুক্তির আলোকে গোটা ইসলাম ধর্মের বিশ্লেষণের নানা দুয়ার একজন পাঠকের সামনে উন্মোচিত হবে বইটি পড়ে। ১৯৪২ সনে গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবী' বইটি প্রকাশের মাধ্যমে সীরাত সাহিত্য চর্চার যে বিপ্লব সূচিত হয় তা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ফলাফল দিচ্ছে। বাংলা ভাষায় আগের রচিত বইগুলোকে মিলিয়ে নেয়া এবং পরবর্তীতে বহু বইয়ের জন্ম দিতে 'বিশ্বনবী' পালন করেছে একটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা।

গোলাম মোস্তফা তাঁর এ অসাধারণ কর্ম সম্পর্কে নিজেও উপলব্ধি করতেন প্রত্যয়ের সঙ্গেই। তাঁর সম্পর্কে কবি আবদুস সাত্তারের [১৯২৭-১৯৯৯] স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখায় আমরা এর সমর্থন পাই। তিনি বলেন, "বিশ্বনবী" সম্পর্কে কথা বললে তিনি আবেগে আপ্লুত হতেন। বলতেন- "আমি তো গোলাম মোস্তফা মানে হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা [সা]-এর গোলাম বা দাস। গোলাম হিসেবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি মাত্র। তাঁর প্রশংসা লিখি এমন ক্ষমতা আমার নেই।" গোলাম মোস্তফা যেন তাঁর পিতা-মাতার রাখা নামের যথার্থতাই প্রকাশ করলেন তাঁর এ বিনয় এবং কর্মের মাধ্যমে। মানুষ হিসেবে তাঁর সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব তিনি যে তা অবহেলা করেননি সে পরিশ্রমের স্বাক্ষর অবশ্যই রয়েছে তাঁর এ মহামূল্যবান আকর গ্রন্থে। বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতজনেরা 'বিশ্বনবী' নামক বইটিকে 'ইসলামী' শিক্ষার এক মহান বন্ধু হিসেবে পান।

বাংলা ভাষায় দীর্ঘ দিনের সীরাত চর্চার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে, সে ধারায় বিশ শতকের প্রতিনিধিত্ব করলেন কবি গোলাম মোস্তফা। কিন্তু তাঁর অন্য কোন বই তাঁকে এ দুর্লভ সম্মান দেয়ার ক্ষমতা রাখেনা তা নি:সন্দেহে বলা যায়। নতুন শতাব্দী অর্থাৎ একুশ শতাব্দীতেও বাংলা ভাষায় এ বইকে অতিক্রমকারী বই যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'বিশ্বনবী' নামক তাঁর এ গ্রন্থটিই এক্ষেত্রে আমাদের সামনে সীরাত সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে। কবি গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবী' রচনার দীর্ঘদিন পর হাত দেন খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী রচনায়। এর প্রথম উদ্যোগে হযরত আবুবকর সিদ্দিক [রা] এর জীবনী গ্রন্থ রচনায় তিনি রত ছিলেন। এরপর দুই ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পান এরপরই ইন্তিকাল করেন। এভাবে আমৃত্যু ইসলামের নবী ও তাঁর খলিফাগণের মহামূল্যবান জীবনী চর্চায় তাঁর যে অবদান বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণ তা যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। তাঁর সরচ রচনা থেকে রস সংগ্রহ করে নিজেরা ধন্য হবে। তবে একথা সত্য যে, বাংলা ভাষাভাষী কবি সাহিত্যিক লেখকগণ গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' পাঠে উজ্জীবিত হয়েছেন, তবে থেমে যাননি। তবে একটি স্থবিরতা এর মধ্যে বিরাজ করছিল। কিন্তু উলেখযোগ্য হাদিছ গ্রন্থ সমূহের একাধিক অনুবাদ, সাহাবীগণের জীবনী প্রকাশ ইত্যাদি ছাড়াও বিশ্বখ্যাত সীরাত গ্রন্থসমূহের বাংলায় অনুবাদের ফলে সামগ্রিক সীরাত চর্চার প্রসার ঘটেছে।

www.pathagar.com

এরই ধারাবাহিকতা আমরা লক্ষ্য করি কবি ফররুখ আহমদের রচনায়। ১৯৫২ সনে প্রকাশিত হয় কবি ফররুখ আহমদের [১৯১৮-১৯৭৪] 'সীরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থ। ফররুখের গোটা সাহিত্যে ইসলামী রেনেঁসার যে আহ্বান, মানবতার মুক্তির যে অভিযান তার চূড়ান্ত প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি 'সীরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থে। তাঁর "কে আসে, কে আসে, সাড়া পড়ে যায়/ কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া/ জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।" কাব্যিক ধারায় মহানবী [সা]-এর সীরাত চর্চায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। আধুনিক কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর ফররুখ আহমদের হাতেই আমরা সীরাত চর্চার একটি নতুন ঢং ও অভিনবত্ব লক্ষ্য করি। এক্ষেত্রে তাঁর কর্ম যথার্থ, যুগোপযোগী এবং সার্থক। অবশ্য শতাব্দীর শুরুতে কবি দাদ আলী [১৮৮৫-১৯০৬] আশেকে রাসূল [১৯০৭] কাব্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ব্যাপক পাঠকনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে স্বচ্ছ সুন্দরের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত ফররুখের এ কাব্য ধারা সীরাত কাব্য সাহিত্যের উন্নয়ন উত্তরণে ব্যাপক পাঠকনন্দিত হয়। অর্ধযুগ পর আজও ফররুখ তাঁর 'সীরাজাম মুনীরা'য় সমান শক্তি নিয়ে উপস্থিত। একটি কাব্য গ্রন্থের বহু সংস্করণ বাঙলা কাব্যে তাঁর সবল উপস্থিতিরই সাক্ষ্য বহন করে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার [জ.১৯৪৯] শিশুতোষ নবী জীবনী 'মহানবী' [১৯৮৩] বইটি। কয়েক ডজন বইয়ের প্রণেতা মুহম্মদ নূরুল হুদার রয়েছে নিজস্ব কাব্য ভাষা। গদ্যেও তাঁর যে রয়েছে ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ এটি তাঁর 'মহানবী' গ্রন্থটি পাঠ করলে অনুধাবন করা যায়। ইতোমধ্যে তাঁর এ বইটির বেশ কয়টি সংস্করণ বের হয়েছে। সীরাত সাহিত্য রচনায় ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী [জ.১৯৩৭] 'বিশ্বনবী' ধারার লেখকদের এ সময় পর্যন্ত ধারাবাহিকতার একজন প্রতিনিধি। তাঁর রচিত 'আমার প্রিয় হযরত' ১৯৯৭ সনে প্রকাশিত হয়। একজন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কয়েক যুগ ধরে না'ত পরিবেশনে তাঁর আন্তরিক উপস্থাপন-উপহার হিসেবে শ্রোতাদের করে চলেছে মোহমুগ্ধ। তাঁর কন্ঠশীলনে যে আবেগ ও দরদ লক্ষ্য করি এর সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর 'নাম মোহাম্মদ' [২০০১] বইটিতে। ইতোমধ্যে তাঁর এ বইটি সুধী মহলে আলোড়ন তুলেছে। ড. কাজী দীন মুহম্মদের [জ. ১৯২৭] মহানবীর বাণী শতক [১৯৯৮], Thus spoke Prophet Muhammad [S] [২০০০], এবং ছোটদের মহানবী হযরত মুহম্মদ [সা] [১৯৯৯] সীরাত ধারার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান [জ.১৯৩৪] এর সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলী, অনুবাদ ও সীরাত বিষয়ক কার্যক্রম, মদীনা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, পদক প্রদান ইত্যাদি উল্লেখ করার দাবি রাখে। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার 'সীরাতে ইবনে হিশাম' এর বঙ্গানুবাদ সহ বেশ কয়টি সীরাত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। আধুনিক প্রকাশনী মাওলানা মওদূদী [রহ.] এর সীরাতে সারওয়ার ই আলম সহ বেশ কয়টি সীরাত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এ লাইনে আরো বহু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা,অনুবাদ ইত্যাদি প্রকাশ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঁঞা [জ.১৯৩৬] এর সীরাত বিষয়ক বেশ

www.pathagar.com

কয়টি বই রয়েছে এর মধ্যে 'বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা' [১৯৮৮] উল্লেখযোগ্য। কবি আল মাহমুদের [জ.১৯৩৬] 'মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] [১৯৮৯], এ.জেড.এম. শামসুল আলমের [জ.১৯৩৭] 'মহানবী ও শিশু' সহ বেশ কয়টি সীরাত বিষয়ক বই, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমানের [জ. ১৯৪১] মহানবীর আদর্শ সমাজ [১৯৯৭], মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী [জ. ১৯৪০] এর রাসূলুল্লাহর [সা] মোনাজাত সহ বেশ কয়টি সীরাত গ্রন্থ এবং সারাদেশে তাঁর আজীবন ওয়াজে নবী [সা] এর জীবনী আলোচনা উল্লেখের দাবিদার। এ লাইনে দেশের আরো অনেক লেখক ও উলামায়ে কেরাম অবদান রেখেছেন [স্থানাভাবে ও নিজের অক্ষমতার কারণে সবার নাম এ স্থানে যুক্ত করা গেল না] যাঁদের প্রতি আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা। প্রসঙ্গক্রমে এ লাইনে কবি আসাদ চৌধুরীর 'সবুজ গম্বুজের নীচে' কবিতাটি উল্লেখ করতে হয়। উল্লেখ করতে হয় ইশারফ হোসেন সম্পাদিত রাসূল [সা] কে নিবেদিত কবিতা এবং কবি আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত 'রাসূলের [সা] শানে কবিতা সংকলন দু'টিকেও। কবি হাসান আলীমের 'সবুজ গম্বুজের ঘ্রাণ', মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের 'বিষয়ে বৈচিত্র্যে সীরাত' গবেষণা গ্রন্থ [মদীনা পাবলিকেশন্স ২০০৯], কবি মোশাররফ হোসেন খানের 'ক্রীত দাসের চোখ' কাব্যগ্রন্থ ও 'ছোটদের বিশ্বনবী' এবং নাসির হেলালের 'আহলে বাইত বা বিশ্বনবীর পরিবার' সহ বেশ কয়টি বই উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নবী দিবসে মিলাদুন্নবী উদযাপন সহ নানা ভাবে দিবসটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে শহরে কলেমা পতাকা টানানো সহ আলোকসজ্জা করা হয়। দেশের সরকারী বেসরকারী অফিসগুলোতে ছুটি থাকে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন্নবী পালনসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিত্তাহর হাদিছ সমূহের অনুবাদ, বেশ কয়টি সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ, সীরাত বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ সমূহের বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় সীরাত সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। ফাউন্ডেশনের সীরাত বিষয়ক কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ফাউন্ডেশন সীরাতুন্নবী উপলক্ষে প্রতি বছর বই মেলা ও আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ, বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ সহ নানা কর্মসূচী আয়োজন করে এ লাইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ সীরাত মিশন দীর্ঘদিন যাবৎ নবী জীবনীর বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। মাওলানা আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে পরিচালিত এ সীরাত মিশনের একটি সীরাতুন্নবী সম্মেলনেই দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘোষণা দেন। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র [বর্তমান নাম সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র] প্রতি বছর সীরাতুন্নবী [সা] উপলক্ষে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদি করে থাকে। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ স্থানীয়ভাবে সীরাতুন্নবী স্মারক প্রকাশ, সীরাতুন্নবী পদক প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে সীরাত চর্চার ধারাকে সমুন্নত রাখার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন, পীর সাহেবানগণের খানকা শরীফ ইত্যাদির উদ্যোগে জছনে

www.pathagar.com

জুলুস পালন করা হয়ে থাকে। এ লাইনে আরো বহু প্রতিষ্ঠান নানা ধারায় সীরাতের ও মিলাদের কার্যক্রম পালন করে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে মহানবী [সা] এর জীবনীমূলক বই, বুকলেট, চল্লিশ হাদিছ, ক্যাসেট ইত্যাদি বিলি করে থাকে। কোন কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে মহানবী [সা] এর নামযুক্ত কালেমা তৈয়্যবার স্টিকার গাড়ির সামনে লাগানোর কার্যক্রমও পালন করে থাকে। এভাবে বাংলাদেশে নবী জীবনী চর্চার সার্বিক আয়োজনটি অনেক বড় আকার ধারণ করেছে। সীরাত চর্চার এ পথ ক্রমশঃই ব্যাপক হতে থাকবে বলে আশা রাখি।

ইতোমধ্যেই দেশের প্রতিনিধিত্বশীল কবি-সাহিত্যিকগণ সীরাত সাহিত্যের ভুবনে যেভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করে চলেছেন এতে এটি একটি আলাদা ধারায় ব্যাপক পরিসরে বিকশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' রচনার পূর্বাপর আলোচনার এ বিরাট অধ্যায়ে আমার অনেক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে যা পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি।■

www.pathagar.com

Land Wanted
for JOINT VENTURE DEVELOPMENT

মিরপুর-২ঃ ৯৫০ বর্গফুট (রেডিফ্ল্যাট)
মিরপুর-১ঃ ৯৫৫, ১১৪০, ১১৮৫ বর্গফুট
এলিফ্যান্ট রোডঃ ১৬০০ বর্গফুট
মগবাজারঃ ১০৯৬ বর্গফুট (রেডিফ্ল্যাট)
শুক্রাবাদঃ ১০৪৯ - ২৩০০ বর্গফুট
দারুসসালামঃ ১০৮০-১১০৫ বর্গফুট
মালিবাগঃ ১০৫০-১২০০ বর্গফুট
মিরপুর-১০ঃ ১১০০-২২০০ বর্গফুট
বানিজ্যিক স্পেসঃ ২১০০-৪৪০০ বর্গফুট

(1 sft. = 0.0929 sqm. appx.)

MEMBER REHAB

For Ideal Homes...

CRESCENT HOLDINGS LTD.

Abosar Bhaban, 3rd Floor, 7-13 Sat Masjid Road, Dhanmondi, Dhaka-1209
Tel: 9121135, 9142268, 8118698, 9121400 Fax: 88-02-8151068
Mobile: 01713-043878, 01713-034490, 01819-229532
Website: www.crescentholdings.net

www.pathagar.com

প্রত্যাশার সিঁড়ি বেয়ে ॥ আহমদ আখতার

বিশ্বনবীর বিদায় হজ্বের ভাষণ শুনে
স্বপন সাহাকে দেখি কঁাদছেন।
ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] উপলক্ষে
আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমনটাই দেখেছি।

চিরায়ত ভাষণের মানবিক আর্তিতে অন্যরাও অভিভূত
বিশ্বধর্মের মাহাত্ম্যে মোহিত সবাই

মনের নিগূঢ় অন্ধকারে টের পাই
অদৃশ্যে আলোর সংকেত
ক্রমান্বয়ে প্রত্যাশার সিঁড়ি বেয়ে উঠি।
আর তাই বোধের গভীরে বোধ
জন্ম দেয় সম্প্রীতির আশিষে মাখা
নয়া সহস্রাব্দের

সপ্ত আকাশ ছাপিয়ে উঠছে তখন
তকবির ধ্বনি : আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

মহানবী ॥ ফা রু ক হো সে ন

তিনি সত্যের তিনি শান্তির
তিনি মুক্তির তিনি কান্তির
তিনি আল্লাহর শেষ প্রতিনিধি
নিখাঁদ আর নিখুঁত,
তিনি স্রষ্টার পাঠানো, বিশ্বে
সর্বশ্রেষ্ঠ দূত।

তিনি ডাকলেন বিশ্ববাসীকে,
ছেড়ে দাও পথ সর্বনাশীকে,
সত্যের পথে এসো মানুষেরা
যেওনা বিপথে যেথা।
মহানবী তাই এই বিশ্বের
সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।

তিনি বললেন বিপথগামীকে
ভুলো অহমিকা দম্ভ-'আমি'-কে।
একালে ওকালে মুক্তির পথ
কুরআনের পথই ঠিক
এই দর্শনে মহানবী হন
শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

তিনি রুখলেন অপকাহিনীকে
তিনি চললেন নিয়ে বাহিনীকে
জেহাদের পথে সাথে নিয়ে দৃঢ়
ইমানের সংহতি,
মহানবী তিনি এই বিশ্বের
সবসেরা সেনাপতি।

ব্যভিচারী আর মিথ্যাচারীকে
কপটতা কালো মুখোশধারীকে

www.pathagar.com

শোনালেন মহা স্রষ্টার কথা
চির মুক্তির বাণী,
সত্য উদ্ভাবনের নীতিতে
তিনি সেরা বিজ্ঞানী।

তিনি ফরমান পত্নি ও পতি
হক আছে একে অন্যের প্রতি
খুশি খোশরাজে জীবনযাপন
চলবে শান্তিকামী
মহানবী তিনি এই পৃথিবীর
সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী।

তিনি আঁকলেন কলেমা কালিতে
মানুষের মন মননঢালিতে
হেদায়েত দিয়ে এলেমের রঙে
ইমানের পাক ছবি,
এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আঁকিয়ে
আমাদের মহানবী।

পাঠ করো আর শোন পেতে কান
মহান কবিতা গ্রন্থ কুরআন
নাজিল হয়েছে শ্রেষ্ঠ এ বই
তাঁর কাছে,- মহানবী
এই পৃথিবীতে তিনিই শ্রেষ্ঠ
সবার শ্রেষ্ঠ কবি।

তিনি বললেন এবাদৎ করো
গুনাহের কাজ যত রদ করো
মুক্তির পথ ইসলামে এসো
এই পথটাই হক,
মহানবী এই সৃষ্টিকুলের
পথের প্রদর্শক।

www.pathagar.com

সুষমার লালিত্য মেখেছি দু'হাতে ॥ ম ন সু র আ জি জ

সুষমার লালিত্য মেখেছি দু'হাতে
দু'চোখে সুরমা মেখেছি তোমার নামে
দু'ঠোঁটে বিগলিত দরূদ মূর্ছনা ছড়ায় আমার ঘরে
হৃদয় বাগানে হাসে লাল নীল সাদা ফুল
গন্ধে মাতোয়ারা হৃদয় বাগান

জানালায় বাতাসে দুলতে থাকে পাতা
খুলে যায় তন্দ্রা লাগা চোখ
স্বপ্নের বাতিঘর বলে দেয় সমৃদ্ধির পথ
ধানের বাজনায় পথ চলি পশ্চিমে।

মদিনা আমাকে ডাকে
উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাই পাহাড় পর্বত মাড়িয়ে
ঘোড়ার কেশরের মতো উড়তে থাকে চুল
ক্লান্ত পদভার তবু তৃপ্ত উহুদের মাঠে
মদিনায় স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে মরে সুরমা মাখা চোখ
সৌরম্য প্রাসাদে ছোটে না দৃষ্টির ফলা
বিনম্র দৃষ্টি খোঁজে খেজুরের চাটাই
বিমুগ্ধ শ্রোতা আমি
রাত জেগে শুনে যাই নবীর বয়ান।
কামনার উনুন
আমার অশান্ত মনে তুমি তুলে দিলে কামনার ঝড়
বৈরী বাতাসে জীবনের উনুন নিভু নিভু
জানালার কাচের সাথে মিতালি এবার রাখো
পর্দার নেকাবে আঁড়াল কোরো না হৃদয়ের কথামালা।

খোঁপায় তোমার কামিনীর গন্ধ মেখে
পাতার আঁড়ালে কতো হবে লুকোচুরি
পাঁচটি গাছের পাতার ফোঁকর ভেদে
দৃষ্টিরা গাঁথে অজানার মঞ্জরি।

www.pathagar.com

রাসূলকে [সা] নিবেদিত কবিতা

মেঘের আঁধারে লুকায়ে তোমার কায়া
সোনারোদে মাখি তোমার রূপের ছায়া
তোমার কণ্ঠ ভরেছে গানে বসন্তবেলা পাপিয়া কোকিল
আমার কণ্ঠে মেলে না কথা চিরকাল আমি কথার বোখিল।

চাঁদের মতোন হাসিতে পারি না চাঁদমাখা মুখ তবু
আমাকে পাবে না তোমার হৃদয়ে আঁধারের মাঝে কভু।

www.pathagar.com

এলো কে কাবার ধারে

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে সারা মক্কায়। বাঁচতে হলে পালাতে হবে। মুহাম্মাদ আসছে। সাথে দশ হাজার দু:সাহসী ক্যাডার। ধরবে আর তামাক পাতার মত কাটবে।

–হায় হায়, এখন উপায়? বাব দাদার ভিটে বাড়ি ক্ষেতে খামার ছেড়ে কোথায় যাব? কি খাব?

–কেন? সারা জীবন শ্লোগান দিছি, আবু লাহাব যেখানে, আমার আছি সেখানে। আমাদের কি দোষ? আমরা শুধু হুকুম তামিল করেছি। এখন আমাদের যেখানে নিয়ে যায়, সেখানে যাব।

–নেতারা সব চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে ভাগতেছে। আমাদের খোঁজ নেয়ার সময় নাই।

–অত সোজা না। আমাদের বিপদে ফেলে তারা পালিয়ে জান বাঁচাবে? চল ব্যাটাদের আটকাই।

আতংকিত চ্যালা চামুন্ডারা দৌড়ায় নেতাদের বাড়ির দিকে। আর শ্লোগান দেয়–

যারা মারে ফটকা, আটকা ওদের আটকা
হৈ হৈ রৈ রৈ নেতারা সব গেলি কই!

www.pathagar.com

বিক্ষুব্ধ জনতার রুদ্ররোষ থেকে বাঁচার জন্য নেতারা বোল পাল্টায়। বক্তৃতা শোনায় নতুন সুরে।

–চেয়ে দেখ, মক্কার ভ্যাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। তোমাদের জন্য আমরা কি না করেছি? আমাদের ইতিহাস দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। আমরা বদরে রক্ত দিয়েছি। ওহুদে বিজয়ের দারপ্রান্তে যেয়েও সংগ্রামের ফসল ঘরে তুলতে পারি নাই। খন্দকের ময়দান থেকে শুধু তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কুকুরের মত জান নিয়ে পালিয়ে এসেছি। হুদাইবিয়ার শত্রুদের আত্মঘাতি সন্ধি চুক্তিতে বাধ্য করেছি।

–রাখেন এইসব কচকচানি প্যান প্যানানি! আমরা আশ্রয় চাই, আমরা বাঁচতে চাই। আমরা এখন কোথায় যাব, সে কথা বলেন। আমাদের সাথে নিয়ে চলেন।

–ধৈর্য ধর, ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার। প্রতিবেশী দেশের সাথে আছে আমাদের গভীর ভালবাসা। আমরা আগে যেয়ে জায়গা নেই। পরে তোমাদের ব্যবস্থা হবে।

ভীড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ায় বীর উত্তম আবু সুফিয়ানের স্ত্রী মক্কার অগ্নিকন্যা বেগম হিন্দা চৌধুরী।

–শুভেচ্ছা স্বাগতম, হিন্দা আপার আগমন।

–আমি তোমাদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছি। তোমাদের আর পালাতে হবে না।

–বক্তৃতা অনেক শুনেছি। কি খবর, তাই বলেন।

–তোমাদের প্রিয় নেতা বীর যোদ্ধা আবু সুফিয়ান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুহাম্মাদের সাথে দেখা করেছেন, তার সঙ্গিদের সাথে কথা বলেছেন। মুহাম্মাদ নিজ মুখে ওয়াদা করেছেন, কাউকে হত্যা করা হবে না, কাউকে গ্রেফতার করা হবেনা, কারো বিরুদ্ধে মামলা করা হবে না। সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা।

–এরকম ওয়াদার বক্তৃতা অনেক শুনেছি। অত সহজে ছাড়বে না আমাদের। আমাদের কুকর্মের ইতিহাস অত সহজে কেউ ভুলবে না। নামাজরত অবস্থায় মুহাম্মাদের ঘড়ে উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছি। ফুলের মত নিষ্পাপ কিশোরী সুমাইয়াকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছি। খাব্বাবকে জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে রেখেছি। বিল্লালকে উটের পায়ে বেঁধে মরুভূমিতে হেঁচড়ায়েছি। এসব ভুলা যায় না। মনের ঝাল তারা মিটাবেই।

–না না, এসব তোমাদের ভুল ধারণা। তোমরা আর কি করেছ? আমি মুহাম্মাদের প্রিয় চাচা আমীর হামজার মৃত দেহের ওপর নৃত্য করেছি। কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছি। আমাকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন।

–কন কি ম্যাডাম? এমন মানুষও দুনিয়ায় আছে? তবে আর দেরি কেন? আমরা সবাই গিয়ে দেখা করি। মাফ চাই। আপনে সামনে থাকলে আমরা ভরসা পাই। সবার সাহসতো সমান না। সবাইতো মানুষ কামড়াইতে পারে না!

–তোমরা যাও। তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন। আমাকে ও উয়াশীকে মাফ করেছেন, কিন্তু সামনে যেতে নিষেধ করেছেন।

–কেন? এ আবার কোন্ কিসিমের মাফ করা?

–সে তোমরা বুঝবেনা। আমি ঠিকই বুঝেছি। আবেগের কথা নয়, বাস্তব কথা বলেছেন

www.pathagar.com

তিনি। আমাদের সামনে দেখলে তার চাচার মৃতদেহের ওপর পৈশাচিক নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠবে। অন্তর থেকে বদ দোয়া এসে যাবে। নবী পাকের বদ দোয়া যার ওপর পড়বে, তার খবর আছে!

ইতিমধ্যে আরো কয়জন গোয়েন্দা খবর নিয়ে এসেছে, নবীজী কারো সাথে দুর্ব্যবহার করেনি। মক্কার কুখ্যাত গড ফাদার বলে খ্যাত সন্ত্রাসীরা নবীর সাথে দেখা করে এসেছেন। সবাইকে তিনি মাফ করে দিয়েছেন এবং নতুন করে দেশ গড়ার কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

পলায়নরত বিভ্রান্ত মক্কাবাসীরা ঘুরে দাঁড়ায়। দলে দলে এগিয়ে চলে খানায়ে কাবার দিকে। রুক্ষ মক্কাবাসীদের কণ্ঠস্বর বদলে গেছে। মোলায়েম কণ্ঠে গাইছে–

ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানিনা
ভাইরে, ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না।
কোন রাজা, মহারাজার, ধার মোরা আর ধারি না
ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না।

তিল ধারনের জায়গা নেই বাইতুল্লাহর চত্তরে। দূর থেকে দেখছে কাবার ছাদে দাঁড়িয়ে বিলাল আজান দিচ্ছে–

"সর্ব শক্তিমান মহান আল্লাহ
তিনি ছাড়া আইনদাতা, হুকুমদাতা, বিধানদাতা কেহ নেই।
হযরত মুহাম্মাদ তাঁর প্রেরীত সুসংবাদদাতা।
নামাজের দিকে আস
কল্যাণের দিকে ফিরে আস।"

লাত, মানাত, ওজ্জা ও হোগলের বিশাল মূর্তিগুলো একে একে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে কাবার বাইরে। হাতুড়ী শাবল দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়া গুঁড়া করছে সমবেত মক্কাবাসীরা। আর উচ্চ কণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে–

"সত্য সমাগত
মিথ্যা অপসৃত
মিথ্যা অপসৃত হওয়ারই যোগ্য।"

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মনের আনন্দে গাইছে–

মানাতের শেষ হলো দিন, আজকে বিলীন
ঘোর আঁধারের যুগ
কাবাঘর দীপ্ত আবার, আলোয় হেরার
সমাপ্ত দুর্ভোগ
আযাযিল আজ হতবাক এ কোন্ বিপাক
আসলো হাঁকিরে
এলো কে কাবার ধারে আঁধার চিরে
চিনিস না কি রে?■

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর আবির্ভাব

মোঃ আতিকুর রহমান

আবির্ভাব পূর্বে আরবের অবস্থা :

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পূর্বে গোটা আরব ছিলো জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। নিকৃষ্ট ধরনের গোমরাহীতে লিপ্ত। সেখানে ছিলোনা কোন অনুসরণযোগ্য নিয়ম-নীতি বা আইনকানুন। ছিলোনা কোন জীবন-পদ্ধতি। সেখানে চালু ছিলো এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা। গোটা জাতি চাপা পড়েছিলো অন্ধকারের এক শক্ত আবরণের নীচে যা ভেদ করে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো প্রবেশ করা ছিলো খুবই দুরূহ। কোনরূপ দীনী (ধর্মীয়) নিয়ম-নীতি থেকেও তারা ছিলো বঞ্চিত। সেখানে চলতো শক্তির দাপট যদিও শক্তিধর ব্যক্তিরা অবস্থান করতো সত্য থেকে বহুক্রোশ দূরে। আর দুর্বলরা বঞ্চিত হতো ন্যায় বিচার থেকে, যতই হোক সে সত্যের অতি নিকটবর্তী।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তারা ছিলো এক অদ্ভুত চিন্তার অধিকারী। কল্পনার জগতে ছিলো তাদের বিচরণ। আর এ কল্পনার বশবর্তী হয়েই তারা তৈরি করেছিলো অসংখ্য দেবদেবী ও উপাসনালয়।

www.pathagar.com

প্রতিটি উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদের নিকট ধরা দিত খোদার প্রতিভূরূপে। কখনো তারা পাথর খোদাই করে মূর্তি নির্মাণ করতো এবং বিনয়াবনত হয়ে তার উপাসনা করতো। আবার কখনো তারা পাথর ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারাও তাদের মা'বুদ (উপাস্য) তৈরি করতো। হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খেজুর দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করেন। ক্ষিধে পেলে তার থেকে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতেন। খোদ কাবাগৃহে তারা স্থাপন করেছিলো ৩৬০টি মূর্তি। এমনকি কা'বার চারদিকে নারী-পুরুষে একত্রে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করাকে তারা অশেষ পূণ্যের কাজ বলে মনে করতো। আরো একটি লোমহর্ষক চিন্তাধারা তাদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছিলো। তাহলো কন্যা শিশুর জন্মকে তারা নিজেদের জন্য অশুভ ও অপমানকর মনে করতো। তাই লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুতে ফেলতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতো না। হযরত উমার (রা)-এর ঘটনা। তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার জীবনে এমন দু'টি ঘটনা ঘটেছে যার একটি মনে পড়লে এখনো আমার হাসি পায়। আর অপরটি মনে করলে কান্নায় আমার বুক ভেসে যায়। লোকেরা ঘটনা দুটো জানতে চাইলে তিনি বললেন, যে ঘটনাটি মনে পড়লে আমার হাসি পায় তাহলো আমি যে দেবতার উপাসনা করতাম তার বয়স হয়েছিলো অনেক। যার ফলে তার হাত পা গুলো ভেঙ্গে গিয়েছিলো। এতে আমার খুব দুঃখ হলো। আমি অনেক কষ্ট করে তার হাত-পাগুলো জোড়া লাগালাম। অত:পর তাকে পূজা করলাম। এ কথাটা মনে পড়লে আমার ভীষণ হাসি পায়। এ কারণে যে, এমন এক অথর্ব দেবতার সামনে আমি উমার মাথা নত করলাম যে আমার উপকার করাতো দূরের কথা নিজকে রক্ষা করতেও অক্ষম। আর দ্বিতীয় যে ঘটনাটি আমাকে কাঁদায় তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমার আড়াই-তিন বছরের একটি কন্যা সন্তান ছিলো। একদিন আমি তাকে পূতে ফেলার জন্য মরূভূমিতে নিয়ে গেলাম। গর্ত খনন করতে গিয়ে আমার দাড়িতে কিছু বালি এসে পড়লো। মেয়েটি বসা থেকে উঠে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে দাড়ি থেকে বালিগুলো ঝেড়ে ফেললো। যে মেয়েটি আমার দাড়ি থেকে বালুকণা ঝেড়ে ফেললো সে আদরের মেয়েকে আমি সেখানে পুতে আসলাম। এতটুকু বলেই হযরত উমার (রা) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সত্য ও সঠিক চিন্তার সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কও ছিলোনা। বাপ-দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রসম-রেওয়াজ ও রীতি-নীতিকেই তারা অনুসরণ করতো। তারা ছিলো চরম জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা পরায়ণ। প্রতিশোধ স্পৃহা তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, কথায় কথায় এক গোত্র অপর গোত্রের ওপর হামলা করে বসতো, লুটতরাজ চালাতো। কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়তো।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত বা সামাজিক বন্ধনের কোন গুরুত্ব তাদের নিকট ছিলো না। মনগড়া দৃষ্টিভংগি ছিলো তাদের চালিকা শক্তি। প্রতিশোধ স্পৃহা ও হত্যার নেশা যখন তাদেরকে পেয়ে বসতো মুল্যবান জীবনগুলো তখন তাদের নিকট অতি তুচ্ছ মনে হতো।

আবির্ভাব :

অবস্থা যখন এতটা নাজুক পর্যায় অতিক্রম করছিলো এবং গোটা বিশ্ব যখন প্রতীক্ষা করছিলো এক মহান সংস্কারকের, তখুনি বিশ্ব স্রষ্টার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপ নিলো। ৯ই রবিউল আউয়াল মতান্তরে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারের সুবহি সাদিক। রহমতে ইলাহীর ফায়সালা মুতাবিক জন্মগ্রহণ করলেন সেই মহামানব, সারা দুনিয়া থেকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার বিদূরিত করে হিদায়াতের আলোয় গোটা মানবতাকে উদ্ভাসিত করার জন্য যাঁর আবির্ভাব ছিলো একান্ত অপরিহার্য। যিনি ছিলেন রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন-বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ।

নবুওয়াত লাভের আগে :

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের মধ্যে বর্তমান ছিলো যুদ্ধ-বিগ্রহের এক সুদীর্ঘ ও অসমাপ্য ধারা। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো আরবের শত শত পরিবার। ছিলোনা গণ-মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা। তাছাড়া মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব, গরীবদের ওপর ধনীদের দৌরাত্ব, সমাজে ছড়িয়ে পড়া নানাবিধ কুসংস্কার ও নৈতিক পদস্খলন যেনো গোটা সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। সমাজের এ অবক্ষয় ও বীভৎস রূপ বালক মুহাম্মাদের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিলো। তিনি ভাবতে শুরু করলেন কিভাবে এ সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। এক পর্যায়ে তিনি 'হিলফুল ফুযুল' নামক যুব সংগঠনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন যারা পাঁচটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো :

১. দেশ থেকে অশান্তি দূরা করা।
২. পথিকের জানমালের হিফাযাত করা।
৩. গরীবদের সাহায্য অব্যাহত রাখা।
৪. মাযলুমের সহায়তা করা।
৫. কোন যালিম ও সন্ত্রাসীকে মক্কায় আশ্রয় না দেয়া।

এ সময় তাঁর বয়স ছিলো ১৭ বছর। তখন থেকে নবুওয়াত লাভের আগ পর্যন্ত এক টানা ২৩ বছর তিনি নানাভাবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তার চেষ্টা কাংখিত সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হলোনা। অথচ নবুওয়াত লাভের আগেও তিনি ছিলেন তৎকালীন সমাজের সবচাইতে ভালো মানুষ। তিনি ছিলেন আল আমিন ও সত্যবাদী।

এক সময় তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছলো। হঠাৎ তার জীবনে সূচনা হলো এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের। তিনি নির্জনে একাকী আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থেকে সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় অধ:পতন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় মশগুল হয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

তিনি ভাবতে থাকেন, তার কওমের লোকেরা কিভাবে নিজের হাতে গড়া মূর্তিকে মা'বুদ ও উপাস্য বানিয়েছে। নৈতিক দিক থেকে তারা কতইনা অধ:পাতে গিয়ে পৌঁছেছে। এ অবক্ষয় থেকে কওমকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়। এমন অসংখ্য রকমের চিন্তা ও প্রশ্ন তার মনে তোলপাড় করতে লাগলো। এক পর্যায়ে তিনি হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে অবস্থান নিলেন এবং নিবিষ্ঠ চিত্তে চিন্তা-ভাবনা ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকলেন। এভাবে কেটে গেলো দীর্ঘ ছয় মাস। ইতিমধ্যে তিনি চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। এ কদিন তিনি যথারীতি আল্লাহর ধ্যানে মশগুল। হঠাৎ তার সামনে আত্ম প্রকাশ করলেন আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা জিবরাঈল (আ), যিনি যুগে যুগে নবী-রাসূলদের নিকট আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আসতেন। জিবরাঈল (আ) তাঁকে তিনবার বললেন : 'পড়'। তিনি জবাব দিলেন, 'আমি পড়তে জানিনা'। শেষবারে জীবরাঈল (আ) বললেন, 'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন... (৯৬ : সূরা আল আলাক, আয়াত : ১-২)।' এটাই ছিলো সর্ব প্রথম ওহী এবং তাঁর নবুওয়াতের সূচনা।

নবুওয়াত লাভের পর :

হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের পর প্রায় ছ'মাস জীবরাঈলের (আ) আগমন বন্ধ ছিলো। এরপর জীবরাঈল (আ) আগমন করলেন সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নিয়ে :

'হে কম্বল আচ্ছাদনকারী ওঠো এবং (বিপথগামী লোকদেরকে) ভয় দেখাও। স্বীয় প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।' (অর্থাৎ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা কর 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ) (৭৪ : সূরা আল মুদ্দাস্‌সির, আয়াত : ১-৩)।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন ও মানবতার মুক্তির জন্য দীর্ঘকালব্যাপী তিনি যে ধ্যান করেছেন তার দিক নির্দেশনা এসে গেছে। তিনি ডাক দিলেন তার কওমকে এক মহাসত্যের দিকে। আর তাহলো মহা বিশ্বের একজন প্রভু ও স্রষ্টা রয়েছেন। মানুষ তারই বান্দাহ্ বা গোলাম। বস্তুত : সত্যের এ আহ্বানই ছিলো বিশ্ব নবীর সূচিত বিপ্লবের বীজ। এই বীজ থেকেই জন্ম নিয়েছিলো নিষ্কলুষ সভ্যতার সেই মহীরূহ বৃক্ষ যার শেকড় মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত এবং যার ডালপালা উচ্চ আকাশে বিস্তৃত।

বিশ্বনবী যে বিপ্লবী কালেমার দাওয়াত দিয়েছিলেন, আমরা সবাই জানি, তা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' তিনি তার কওমকে ডেকে এ আহ্বানই জানিয়েছিলেন : 'কূলূ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুফলিহুন' অর্থাৎ তোমারা বল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এতেই হবে তোমরা সফলকাম।

শাব্দিকভাবে এই কালেমাটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু মর্মার্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। এই কালেমার অর্থ : 'এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র ইলাহ।' ইলাহ সেই শক্তি বা সত্তাকে বলে যার গোলামী করা যায়।

www.pathagar.com

যার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে মানুষ উপাসনা করে। যার জন্য মানুষ নিজেকে ও নিজের যথাসর্বস্বকে অকাতরে উৎসর্গ করতে পারে। যার সর্বাত্মক প্রশংসা, গুণগান, পবিত্রতা ঘোষণা ও বন্ধনা করতে পারে। যার কাছে মানুষ সর্ব প্রকার কল্যাণের আশা করে। যার পাকড়াওকে ভয় করে। যার কাছে সৎ কাজের পুরস্কারের আশা ও অসৎ কাজের শাস্তির আশংকা করে। যাকে নিজের নিরংকুশ মালিক-মোখতার মনে করে। যাকে শাসক ও আইনদাতা মানে। যার আদেশ পালন করে ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে। যার দেয়া নীতিমালাকে নিজের জীবনের নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করে। যার ঘোষিত হালাল-হারামের বিধানকে বিনা বাক্য ব্যয়ে কার্যকরী করে। যাকে নিজের জন্য হেদায়াতের উৎস মনে করে। যার ইচ্ছা ও মর্জি মুতাবিক জীবন বিধান তৈরি করে এবং যার সন্তুষ্টি অর্জন জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। একটিমাত্র শব্দ 'ইলাহ'র মধ্যে এই ব্যাপক তাৎপর্য নিহিত ছিলো।

তৎকালীন মানব সমাজ 'ইলাহ'র এ অধিকারগুলোকে এক আল্লাহর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ভাগ বাটোয়ারা করে রেখেছিলো। ফলে সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে জেঁকে বসেছিলো অসংখ্য ইলাহ। মানুষের প্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা, পরিবার ও গোত্রের রসম-রেওয়াজ, বর্ণ-বংশ ও জাতিগত ঐতিহ্য, জমিদার ও ধর্মযাজকদের আধিপত্য, রাজপরিবার ও পরিষদবর্গের অহমিকতা ইত্যাদি তাদের ইলাহ সেজে বসেছিলো। এসব ইলাহর দোহাই পেড়ে একশ্রেণী অপর শ্রেণীকে শাসন-শোষণ করতো, লুটেপুটে খেতো। 'লা ইলাহা ইল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই) কালেমাটি এই সমস্ত নকল খোদার খোদায়ীর উপর একই সাথে আঘাত হানলো। এই কালেমার উন্নয়নকারী প্রকারান্তরে এ কথাই ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব আমি মানিনা। কারো কর্তৃত্ব ও আধিপত্য মানিনা। কারো রচিত আইন কানুন আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারো সামনে মাথা নত করা হবে না। কারো সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করা হবে না। কারো রক্ত চক্ষুকে ভয় করা হবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল খোদার তখতে তাউস ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হবে। বস্তুত এই কালেমা ছিলো মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার ঘোষণায় আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার এক বিপ্লবী সূচনা।

এই কালেমার দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এই অংশে জানিয়ে দেয়া হলো যে, মানবজাতির হেদায়াত তথা মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র পথ হলো আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলদের প্রদর্শিত পথ। জীবনের জন্য খাঁটি ও নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো ওহী। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন রিসালাতের পুর্ণতা দানকারী সর্বশেষ নবী ও রাসূল। সুতরাং জীবনের সঠিক পথের সন্ধান তার কাছ থেকেই নিতে হবে এবং তার নেতৃত্বেই বিশ্ব-মানবতা শান্তি, কল্যাণ ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম।

www.pathagar.com

মূলত : কুরাইশ নেতারা এই বিপ্লবী কালেমার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিলো। তারা বুঝতে পারলো, এই কালেমার দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে তাদের কায়েমী স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত হানা। তাদের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বকে চিরতরে খতম করে দিয়ে সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে তুলে দেয়া। তাই আবুজেহেল, আবু লাহাবরা সত্যের এ দাওয়াত গ্রহণ করতে পারলোনা বরং চরম বিরোধিতার পথ বেছে নিলো। ফলে তারা জিহালাতের অন্ধকারেই থেকে গেলো। পক্ষান্তরে আবুবাকর, উমার, উসমান, আলী (রা) যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ আহ্বানে সাড়া দিলেন তাঁরা হয়ে গেলেন সোনার মানুষ। দুনিয়াতেই পেলেন জান্নাতের সুসংবাদ।

দুর্ভাগ্য মাক্কাবাসী নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রহণ করতে পারলোনা। এমন কি এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। ওদিকে মদীনাবাসী প্রস্তুতি নিচ্ছিলো আল্লাহর নবীকে সাদরে বরণ করে নিতে। এক সময় আল্লাহর নির্দেশে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদিনায় হিজরাত করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করলেন একটি ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র। যার রাষ্ট্রপতি ছিলেন স্বয়ং তিনি। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দিলেন : 'সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তাঁর।' এভাবে আল্লাহর আইন তথা আল্লাহর দীন কায়েমের মাধ্যমে বিশ্বের মানুষকে তিনি উপহার দিতে সক্ষম হন এক সোনালী সমাজ এবং এক ঝাঁক সোনার মানুষ।

লক্ষ্যণীয় :

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আর তা হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই সমাজে একজন ভাল মানুষ ছিলেন। আল-আমীন ও সত্যবাদী ছিলেন। এই ভালো মানুষটি ১৭ বছর বয়স থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত ২৩ বছর যাবত সমাজের পরিবর্তন সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও সফল হতে পারলেন না। কিন্তু সে একই মানুষটি ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভের পর থেকে ৬৩ বছর পর্যন্ত সেই একই মেয়াদে অর্থাৎ ২৩ বছরের প্রচেষ্টায় এক সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ বিশ্ব উপহার দিলেন এটা কি করে সম্ভব হলো। এর জবাব একটাই, আর তা হলো, প্রথম ২৩টি বছর তিনি নিজস্ব চিন্তা ও পরিকল্পনার দ্বারা সমাজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। অর পরবর্তী ২৩ বছর তিনি ওহীর জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মুতাবিক। এতে বুঝা গেলো সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার বিধানই একমাত্র উপযোগী।

বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে যদি শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে হয়, দিন মজুর ও খেটে খাওয়া মানুষের মুখে যদি হাসি ফোটাতে হয়, যদি সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে হয়, নৈতিক অবক্ষয় থেকে যদি জাতিকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে মানব রচিত বিধান নয়, বরং সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার বিধানকেই সমাজের সর্বস্তরে চালু করতে হবে এবং বিশ্বনবীর মহান আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। ■

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর জীবন ও আমাদের আদর্শ

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

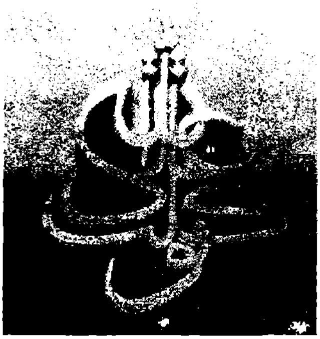

মহানবী [সা]

মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। যিনি বিশ্ব জগতের প্রতি দয়া বা রহমতস্বরূপ প্রেরিত। যিনি সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরিত যদিও অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে অসচেতন। যার প্রতি স্বয়ং আল্লাহপাক দরুদ পড়েন এবং ফিরিশতাগণও। আর যার প্রতি দরুদ পড়তে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সকল মু'মিনদের। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানকর আযাব [যারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তাদের অপমানকর পরিণতিই হয়েছে]।

আদর্শের বাহক

আলী ইবনে আবু তালিব যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু বলতেন, তাতে তার প্রকাশভঙ্গি ছিল এরকম : শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠতম সাহসী, অতুলনীয় সত্যবাদী, সবচেয়ে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সবচেয়ে অমায়িক ও মিশুক। ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

ও দলীয় বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক গুণাবলী বিশ্লেষণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। মানুষের Maker & Owner আল্লাহপাক বলছেন, "ইন্নাকা লা 'আলা খুলুক্বিন আযীম-নিঃসন্দেহে আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ..." "হে নবী আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।" জীবন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পেতেই মানুষের জীবনে আদর্শের প্রয়োজন হয়। আর একটি সুবিচারপূর্ণ সমাজ নির্মাণে আদর্শের কোন বিকল্প নেই। 'আলোকদীপ্ত প্রদীপ' বলতে মূলত যে আলোয় মানুষ জীবন চলার আলোকিত পথ খুঁজে পায় এমন প্রদীপই বুঝায়। আল্লাহ্ এমন একজন মানুষকে মানবজাতির জন্য মনোনীত করলেন যিনি আলোকদীপ্ত প্রদীপ তথা আলোকিত আদর্শের প্রতীক। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর দৃষ্টিতে মহানবী [সা]-এর জীবন ও কর্ম গোটা মানবজাতির সম্পদ, শুধু মুসলিমদের নয়। তাঁর ভাষায়, ``I have read sir Abdullah Suhrawardy's collections of the sayings of the Prophet with much interest and profit. They are among the treasures of mankind, not merely Muslims." কিন্তু এই আদর্শ বা আলোকদীপ্ত প্রদীপ হয়ে তিনি মানব সমাজে কি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন? মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন, সতর্ক করেছেন কেন?

আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন, সতর্ক করেছেন একটি আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে। আল্লাহ্ বলছেন, "তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা এখন তোমার নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি এবং যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম [তা হচ্ছে] দীন কায়েম কর এবং এতে [দীন কায়েম করার বিষয়ে] মতভেদ করোনা।"

আল্লাহ আরো বলেন, "তিনিই সে সত্তা [আল্লাহতা'য়ালা], যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য জীবনবিধানের দিশা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেনো অন্য সকল জীবনবিধানের ওপর একে বিজয়ী করা হয়। আর মুশরিকদের জন্যে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।"

আয়াত দুটো বিশ্লেষণ করলে যা দাড়ায় তা হল,

০১. আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও প্রতিষ্ঠার কাজ মনোনীত নবী-রাসূলদের একটি মৌলিক কাজ।

০২. দীন কায়েম বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও প্রতিষ্ঠার কাজে কোন মতভেদ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

০৩. শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। আর এজন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআনেই দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

০৪. ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজের বিরোধিতাকারী সুনিশ্চিতভাবেই থাকবে এবং তাদের মোকাবেলা করেই প্রতিষ্ঠার কাজ করে যেতে হবে। ইসলাম শ্রেষ্ঠ, তাই এর কোন বিরোধিতাকারী না থাকার কল্পনা করা এক ধরনের আহাম্মকী।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম তথাকথিত কোন ধর্মের নাম নয়, ইসলাম একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম। যে কোন রাষ্ট্রেরই রয়েছে একটি সার্বভৌমত্বের ধারণা। ইসলামে সকল ধরনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর সন্তোষকে ঘিরে আবর্তিত হয়। যে রাষ্ট্রের সরকার-প্রধান, মূলত তার ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরের সকল ধর্মের, সকল রঙের মানুষের অভিভাবকরূপে প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেন মাত্র। এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল কালের, সকল মানুষের কাংখিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, হাসিমুখে সকল নির্যাতনকে সয়ে নিয়ে, সচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠি তেমনি এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন সংগ্রাম-সাধনা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দু'টি শর্ত

আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দু'টো শর্ত আল্লাহই নির্ধারিণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অত:পর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'টি শর্ত পূরণ করতে হয়েছিল। আজকেও যারা সে কাংখিত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন তাদেরকে সে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্ত দু'টো : এক. প্রকৃত ঈমানদার হওয়া; দুই. সৎকর্ম করা। পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের প্রতিশ্রুতি পার্থিব জীবনের জন্যই, আর আখিরাতের জন্যেতো রয়েছে ফিরদাওসের উদ্যান।

ঈমানদার দাবি করা সত্ত্বেও যারা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় নেই, সংগত কারণেই বুঝতে হবে, সেই ঈমানের দাবিদার সমাজ শর্ত দুটো পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, " মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।" অর্থাৎ প্রকৃত ঈমান অর্জনের বিষয়টির সাথে পরীক্ষার শর্ত যুক্ত রয়েছে। পরীক্ষার এই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তাঁর সব সাহাবীদের জীবনে বার বার এসেছে এবং তাতে তারা উত্তীর্ণও হয়েছেন। প্রকৃত ঈমানদার তাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই হতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লামকে যেভাবে দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়েছিল; তেমনি আজকেও যারা কাংখিত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন তাদেরকেও সে দু'টি শর্ত পূরণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এ শর্ত পালন প্রায় উপেক্ষিত হয়েই পড়ে আছে। উপেক্ষার এ ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হলে কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্নবিলাস বাস্তব হয়েই ধরা দিবে। তা নাহলে মানুষের প্রকৃত মুক্তি হবে সুদূর পরাহত।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দুটি শর্ত : পর্যালোচনা

এক. প্রকৃত ঈমানদার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা [রা]-র পাল্টা প্রশ্ন ছিল, তোমরা কি কুরআন পড়নি? অর্থাৎ কুরআনে যে আদর্শিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের রূপ তুলে ধরা হয়েছে, তার পুরোটাই প্রতিফলন ঘটেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে। কুরআনের আলোকে একজন প্রকৃত ঈমানদারের ন্যূনতম কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, যা একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক - আমরা কি তা অর্জন করে ফেলেছি? কুরআনের আলোকেই তার একটি আত্ম-পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

০১. জিহাদান কাবীরা

আল্লাহ বলছেন, "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করোনা এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে কঠোর সংগ্রাম [জিহাদান কাবীরা] চালিয়ে যাও।" 'কাবীর' শব্দটির অর্থ 'বড়'। যেমন, গুনাহে কাবীরা বা বড় গুনাহ। অর্থাৎ কুরআনের সাহায্যে আল্লাহপাক সবচেয়ে বড় জিহাদ চালিয়ে যেতে নিদের্শ দিচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। উদ্ধৃত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হল যে, জিহাদের জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল কুরআনের জ্ঞান এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জ্ঞানের গভীরতা। যে ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান ও তার প্রয়োগ কৌশলের দীন রয়েছে তার মূলত জিহাদের যোগ্যতায় ঘাটতি রয়েছে। তার পক্ষে সঠিকভাবে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া দূরহ। বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কুরআনের জ্ঞানের কৌশলগত প্রয়োগ অনুল্লেখযোগ্য। এর তিনটে কারণ হতে পারে, এক. গতানুগতিক পরিবেশের প্রভাবে চারিত্রিক দৃঢ়তার বিপর্যয়। দুই. কৌশলগতভাবে কুরআনের জ্ঞান প্রয়োগে উদাসীনতা বা আন্তরিকতার অভাব। তিন. কুরআনের জ্ঞানের বিষয়ে আত্মতৃপ্তির ভাব যা মানুষকে জ্ঞানের সৃজনশীল প্রয়োগে অক্ষম করে দেয়। জিহাদ ব্যতীত প্রকৃত ঈমানের দাবি পূরণ হয় না, জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত সোনালী সমাজের স্বপ্ন বাস্তবে কখনই রূপ লাভ করবে না। আর কুরআনের জ্ঞান ও তার সৃজনশীল প্রয়োগ ছাড়া কখনই জিহাদান কাবীরা করা সম্ভব হবে না। কি দ্ব্যর্থহীনভাবেই না আল্লাহপাক বলছেন, " সুতরাং যারা তার [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রতি ঈমান আনে তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর [অর্থাৎ কুরআন] তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে [অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করে] তারাই সফলকাম।"

www.pathagar.com

০২. উম্মী ও প্রজ্ঞাময়তা

উম্মী শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'নিরক্ষর'। অক্ষর জ্ঞানহীন। প্রিয় পাঠক, নিরক্ষর হলেই একজন মানুষ প্রজ্ঞাহীন তা বুঝায় না। একইভাবে অক্ষরজ্ঞান থাকলেই একজন মানুষ প্রজ্ঞাময় হবেন তা যথার্থ নয়। একজন চিকিৎসকের কাছে যদি প্রকৌশলবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান জানতে চাওয়া হয় অথবা একজন প্রকৌশলীর কাছে যদি চিকিৎসাবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান জানতে চাওয়া হয় তবে উভয়ের অবস্থা যা হবে তাতে চিকিৎসককে প্রকৌশলবিদ্যার জন্য উম্মী বলা যায় এবং প্রকৌশলীকে চিকিৎসাবিদ্যার জন্য উম্মী বলা যায় অনায়াসে। এভাবে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে উম্মী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্ষরজ্ঞান বিষয়েই শুধু উম্মী ছিলেন, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা, মানবিকতা ও উদারতা, সুবিচার ও নিরপেক্ষতার বিচারে তিনি আজও অতুলনীয়। তার প্রতি নাযিলকৃত কুরআন বিজ্ঞানময়। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আপনাকে আল-কুরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।" [কুরআন যে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নাযিলকৃত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রচিত নয় তাঁর উম্মী হওয়াই এর প্রমাণ এবং তিনি নিজ উদ্যোগে মানবজাতির জন্য কোন বিধান রচনার প্রয়াস চালাননি।] তার প্রতি নাযিলকৃত জীবনবিধানের মুগ্ধতায় বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী নানা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। বহু নারী-পুরষ ইসলামকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছেন। আল্লাহ, তাঁর [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সর্ম্পকে বলছেন, "তিনিই [আল্লাহপাক] উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর [আল্লাহর] আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতোপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

আত্মপর্যালোচনার দর্পনে একজন প্রকৃত ঈমানদারের এ সচেতনতা থাকা অত্যাবশ্যক যে তিনি কোন্ বিষয়ে উম্মী এবং কোন্ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন। বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও ব্যক্তিগত SWOT Analysis [S=Strength. W=Weakness. O= Opportunities. T= Threat]-এর মাধ্যমে ব্যক্তির কোন্ কোন্ দিকে Weakness রয়েছে তা নির্ণয় করার পর কাজে নামা হয়। ফলে অনাকাংখিত ফলাফল এড়ানো সম্ভব হয়। যিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও বিজ্ঞ তিনি ব্যবসায়িক বিষয়েও বিজ্ঞ হবেন এমনটি ভাবার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। স্বত:সিদ্ধও নয়। ব্যবসা বিষয়ে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যিনি ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন তিনি কার্যত: উম্মী বা অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তি কর্তৃক প্রবন্ধ রচনার মত কাজে প্রবৃত্ত হন। এতে ব্যবসার নামে হয় জগাখিচুড়ি। নষ্ট হয় আমানতদারীতা। নিজেকে সবজান্তা ভাবার সমস্যা এখানেই। যে বিষয়ে যিনি উম্মী তিনি সে বিষয়ে উম্মীর সহজ স্বীকৃতি দেয়াই প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয়। আর যে ব্যক্তি আমানতদারীতা ও সুবিচার জ্ঞানে উম্মী অর্থাৎ যার আমানতদারীতা ও সুবিচার জ্ঞানের অভাব রয়েছে তার ব্যবসা - রাজনীতি যে কোন কাজে পরিচালকের ভূমিকা নেয়া মানে

www.pathagar.com

সে কাজে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। অক্ষর জ্ঞানে উম্মী হলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফলতার মূলে ছিল তার আমানতদারীতা ও সুবিচার জ্ঞানের বিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা বা Strength। ফলে সকল ধরণের ব্যবসা ও রাজনীতির কঠিন ময়দানে সফলতা ছিল তাঁর মাথার মুকুট। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে ঈমানের এ দাবী পূরণ করতে হবে যে কখনই যেন আমানতদারীতা ও সুবিচার জ্ঞানে উম্মী হওয়া বা অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কোন সুবিচার করার দাবী রাখে এমন ক্ষেত্রে দায়িত্বপালন, বিপর্যয়ের কারণ হয়ে না দাড়ায়। আর যখন কোথাও এ ধরণের বিপর্যয় হয়েই যায় তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উম্মী হবার প্রমাণই উদঘাটিত হয়। এতে সমাজে তাদের পরিচিতি লাভ হয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে; কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বন্ধু হিসেবে তাদের পরিচয় মুছে যেতে থাকে। তাই দায়িত্ব পালনের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের বিষয়টি আল্লাহপাক গভীর গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, " বল, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান?" আল্লাহ আরো বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং [ঈমানদারদের মধ্য হতে] যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।" কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রশ্রয় প্রকৃত ঈমানের দাবী পূরণের জন্যই প্রয়োজন।

দুই. সৎকর্ম করা ০১. সৎকর্মের গুরুত্ব

ইসলামে সৎকর্ম নিরপেক্ষ ঈমানের যেমন কোন অস্তিত্ব নেই; তেমনি ঈমানবিহীন সৎকর্মের গ্রহণযোগ্যতার উল্লেখও পাওয়া যায়নি। যেখানেই ঈমানের কথা আল্লাহপাক বলেছেন, সেখানেই কোন না কোনভাবে সৎকর্মের বিষয়টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।" আল্লাহ আরো বলেন,"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাওসের উদ্যান।" উদ্বৃত আয়াতগুলো হতে সৎকর্মের গুরুত্ব পরিস্ফুট হয়েছে । কর্মের ফলাফলে সফলতা বা ব্যর্থতা, কি আসবে তা আল্লাহই নির্ধারণ করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, যারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন।

০২. সৎকর্ম কি?

কিন্তু সৎকর্ম কি? আল্লাহপাক বলছেন, " ভালকাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভাল কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবসে, ফেরেশতাগণে, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে [আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে] সম্পদ প্রদান করে সম্পদের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দীমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়

www.pathagar.com

এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট ও দুর্দিনে ও যুদ্ধের সময়। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।" আল্লাহ আরো বলেন," অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে..... এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে...।"

আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, ভালকাজ হল :

ক. ঈমান আনা [আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাগণ,কিতাবও নবীগণের প্রতি।]

খ. দান করা [সম্পত্তির প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দান করা।]

গ. সালাত কায়েম করা। [সালাতভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল সালাত কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হবে।]

ঘ. যাকাত দেয়া [যাকাত গ্রহণের অর্থরিটিসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকলেই কেবল যাকাত দেয়ার সচেতনতা ও যাকাত আদায় সম্ভব।]

ঙ. প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা বা অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা। [সতর্কতার সাথে ওয়াদা করা এবং ওয়াদা নিশ্চিত করার পর তা যে কোন মূল্যে পূরণ করা।]

চ. ধৈর্য ধারণ করা। [কষ্ট, দুর্দিন ও যুদ্ধের সময় ঈমানের ওপর অটল থাকা।]

ছ. অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। [ফালতু কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে।]

জ. আমানত রক্ষা করে। [কথা, অর্থ-সম্পদ ও দায়িত্বপালন সব ধরনের আমানত রক্ষা করা। অর্থাৎ বাচালতায় গোপন কথা ফাস করেনা, লোভের বশে সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ করেনা এবং দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী হয়না।]

প্রিয় পাঠক, সোনার মানুষ বানানোর এমন অব্যর্থ ফর্মূলা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এর প্রয়োগ নিয়ে। বাস্তবায়ন নিয়ে। যারা সোনালী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন তাদেরকে সৎকর্মের এই ফর্মূলার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ক্ষতির আশংকায় যারা ধৈর্য ধারণের পরিবর্তে ওয়াদা ভংগ করেন, দায়িত্বপালনের নামে অন্যের অধিকার হরণকে আমানতের খেয়ানত মনে করেন না, আল্লাহ প্রেমে দান করার প্রবণতার চেয়ে দান গ্রহণে অত্যুৎসাহী; কখনো কখনো লোভী এবং যাকাতের খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক তৎপরতায় অক্ষম; এমন মানুষ দিয়েতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালী সমাজ গড়া সম্ভব হবে না। বরং হবেন আল্লাহর অসন্তোষের কারণ। আল্লাহ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা সে কথা কেন বল, যা তোমরা নিজেরা করনা? তোমরা যা করনা তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষের কারণ।" এসব চরিত্রের লোকদের সর্ম্পকে আল্লাহ কত সূক্ষ্মভাবেই না ওয়াকিবহাল! আল্লাহ বলেন, " কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে; আবার এমন লোকও রয়েছে যারা একটি দীনারও [বা একটি টাকাও] আমানত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দিবে না, ইহা এ কারণে যে, তারা বলে,'নিরক্ষরদের প্রতি [অর্থাৎ সাধারণদের প্রতি] আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই,'

www.pathagar.com

এবং তারা জেনে শুনে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে। হ্যাঁ, কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন; এখন আমাদের পালা। আল্লাহ্ বলেন, " বল, 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের 'আনুগত্য কর।' অত:পর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সেই দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া।"

উপসংহার

যুগ যুগ ধরে প্রচেষ্টা চালিয়েও যদি সে সোনালী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন করা সম্ভব না হয়, তখন বুঝতেই হবে শর্ত দুটো এখনও পূরণ হয়নি। আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অত:পর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।" আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। ঈমান ও সৎকর্মের শর্ত পূরণে আমাদের প্রচেষ্টাই ক্রটিপূর্ণ। "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ..." আল্লাহর এই নির্দেশনা এড়িয়ে যত প্রচেষ্টাই আমরা চালাই না কেন বৈচিত্র্যময় রঙের ব্যর্থতাই এর একমাত্র পরিণতি। রাসূলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উত্তম আদর্শকে অনুসরণ করা মানে, "To Believe Him and Believe in Him, To Obey Him, To Follow Him, To Love Him, To Respect Him, To Judge According to His Shari'ah, To Send Him Salaah and Salaam, To Avoid Innovations in Religion, Especially to Do with the Prophet." ■

www.pathagar.com

কালজয়ী মহামানব হযরত মুহাম্মাদ [সা]

সাঈদ আহমদ

মুহাম্মাদ মুস্তফা [সা] সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই আমাদের জানা আবশ্যক মুহাম্মাদ [সা] কে? যদিও এর জবাবে বলা হয়ে থাকে যে : আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে মক্কা নগরীতে যে মহামানব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনিই মুহাম্মাদ [সা]। তথাপি এটাই তাঁর যথার্থ পরিচয় নয়। তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় : তিনি নিখিল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মহামানব। অন্য কথায় : সৃষ্টি জগতের সর্বোচ্চ যার স্থান তিনিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। ব্যক্তি বিশেষকে আমরা ভালো বা মন্দ বলে থাকি তার গুণ বা দোষের জন্যই। মুহাম্মাদ [সা] কে যে আমরা ভালো কিংবা আদর্শ মানব বলে অভিহিত করলাম তা তাঁর গুণের কারণেই; ভাবাবেগের দরুন নয়। ভাবাবেগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বা ভালো হতে পারে। কিন্তু যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক মূল্যায়নে এটা আদৌ বাঞ্ছিত নয়।

আমরা যারা জীবন ও জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও বিশ্বব্যবস্থার মহাপরিচালক হিসাবে একমাত্র আল্লাহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তাদের জন্য আল্লাহর বাণী সকল প্রশ্নের উর্ধে। মুহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে তাই আল্লাহ কী বলেন তা প্রথমে দেখা দরকার। আল্লাহ

www.pathagar.com

বলেন : "হে মুহাম্মাদ! তুমি চরিত্রের সর্বোত্তম মাপকাঠির ওপর প্রতিষ্ঠিত"। অন্যত্র : "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ [সা] এর মাঝে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"। আদর্শ মানে হচ্ছে : যা অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। একজন মানুষের অনুকরণ মানে : তার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা এবং তার কাজ বা আচার আচরণের অনুকরণ। তাই মুহাম্মাদ [সা] কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ বা বর্জন করার মানে, তাঁর চিন্তাধারা, কথাবার্তা ও আচার আচরণকে গ্রহণ বা বর্জন করা। মুহাম্মাদ [সা] এর উম্মত হওয়ার দাবীদার যারা, তাদের এ তিনটি জিনিসই পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের অবকাশ এখানে নেই। শুধু এখানে কেন, কোনো কিছুর আংশিক গ্রহণ বা বর্জন সর্বত্রই অবৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত। বলা বাহুল্য, খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ জিনিসের কদর ও মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত।

ঈমানদারদের ব্যাপকতর অর্থে মুসলিম বলা হয়ে থাকে। ইসলাম কবুল করলেই তাকে মুসলিম বলা যায়। কিন্তু তার সাথে বলে দেয়া হয়েছে : তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ কর। অর্থাৎ কিছু প্রবেশ করে বাকিটুকু বাইরে থাকলে চলবেনা। আর যে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিও এ নীতিরই জোরদার সমর্থক। বলা বাহুল্য, মুহাম্মাদ [সা] কে পুরোপুরি গ্রহণ করার মাধ্যমেই ইসলামকে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়। মূলত : কুরআন, মুহাম্মাদ ও ইসলাম পরস্পর আলাদা ও বিচ্ছিন্ন তিনটি শব্দ। এগুলোর শাব্দিক অর্থও বিভিন্ন। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই ভাবগত ও কর্মগত দিক থেকে পরস্পর সমার্থক। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায় : এর যেকোনো একটির পরিপূর্ণ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সবগুলোরই গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নামান্তর। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

একদিন জনৈক সাহাবী হযরত আয়েশাকে [রা] রাসূলের [সা] এর আখলাক বা জীবনচরিত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আয়েশা [রা] অবাক হয়ে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন : তুমি কি কুরআন পড়োনি? অর্থাৎ তত্ত্বগত কুরআনের বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র হযরত মুহাম্মাদ [সা]। আর মুহাম্মাদ [সা] এর জীবন ইসলামের দ্বিতীয় সংস্করণ বৈ নয়।

আমরা বলছিলাম, মুহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেন–তার সংক্ষিপ্ত জবাবে আমরা মুহাম্মাদ [সা] এর পরিচয় পেলাম। এক্ষণে তিনি নিজে তাঁর সম্পর্কে কী বলেন তা আমরা দেখবো। তিনি বলেন : "উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে।" উত্তম চরিত্রের বিষয়টি উপরে একটি আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়ার সংগত কারণ আছে। মুহাম্মাদ [সা] কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "সবচেয়ে ভালো মুসলিম কে? তিনি বলেছিলেন যার চরিত্র সবচাইতে উত্তম। মানুষ যতো বড় এবং বেশী ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারে তম্মাধ্যে সবচাইতে মূল্যবান হলো এ চরিত্র শক্তি। মানুষের [বা জীবের] মৃত্যু আছে, এ জিনিসের মৃত্যু নেই। মুহাম্মাদ [সা] আজ নেই। কিন্তু তাঁর চরিত্র আজো চির উজ্জ্বল অম্লান। কোনোদিন এর উজ্জ্বলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।

একখানি হাদীসে মুহাম্মাদ [সা] নিজেকে সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট সাহাবী আবু মূসা আশয়ারী [রা] বর্ণিত উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন : "আমার এবং যে বিষয় নিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ– এক ব্যক্তি তার কওমের নিকট এসে বললো : হে আমার কওম, আমি আমার এই দুই চোখে শত্রু সৈন্য দেখে এসেছি এবং আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য একজন উলঙ্গ সতর্ককারী [আরবের প্রবাদ বিশেষ : অতর্কিতে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে আরবরা পরনের কাপড় খুলে মাথার ওপর ঘুরাত] শীঘ্র কর শীঘ্র কর [তাতে মুক্তি পাবে]। একথা শুনে তাঁর কওমের একদল লোক তাঁর কথা মানল এবং রাতারাতি চলে গেল। এতে তারা ধীরে সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর অপর দল তাকে মিথুক ঠাওরাল এবং ভোর পর্যন্ত নিজেদের স্থানেই রয়ে গেল। ভোরে হঠাৎ শত্রু সৈন্য তাদের ওপর আপতিত হলো এবং তাদের ধ্বংস ও সমূলে বিনষ্ট করে দিল। এ হচ্ছে সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে ও আমি যা এনেছি তাকে সে মিথ্যা ঠাওরিয়েছে।"

হাদীসটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও মুহাম্মাদের [সা] একটা সুন্দর ব্যাখ্যা এতে খুঁজে পাওয়া যাবে। নিজের সম্পর্কে এরূপ অনেক ব্যাখ্যাই দিয়েছেন মুহাম্মাদ [সা]। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আরো উদ্ধৃতি থেকে বিরত থাকলাম।

বিশিষ্ট সাহবী হযরতের খাদেম আনাস [রা] বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর হযরত [সা] এর খেদমতে ছিলাম। তিনি কোনোদিন আমাকে এরূপ কথা বলেননি যে, কেন একাজটি করলে অথবা কেন একাজটি করলেনা। বস্তুবাদের তথাকথিত প্রধান শাগরেদেরা ভাবজগতের এ মহান সম্রাটের চরিত্রগত এদিকটি সম্পর্কে ভেবে দেখার কষ্ট স্বীকার করবেন কি? মুহাম্মাদের [সা] সামগ্রিক চরিত্র সম্পর্কে এর দ্বারাই আন্দাজ করা চলে। এমনিভাবে ক্ষমা ও উদারতায়, দানে ও বদান্যতায়, সাম্য-মৈত্রী ও জ্ঞান সাধনায় সর্বোপরি আদর্শিক চেতনায় এবং আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তিনি এক পূর্ণ পরিণত কালজয়ী মহামানব।

হযরত যায়িদ [রা] ছিলেন রাসূলুল্লাহর [সা] খাদেম। দীর্ঘদিন পর যায়িদের পিতা তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য আসলে যায়িদ [রা] কোনোমতেই পিতার সাথে যেতে রাজি হননি। অথচ হযরত [সা] তাকে যাবার জন্য সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহর [সা] গোলাম থাকাকে তিনি গণিমত মনে করেছিলেন মুক্ত বিহঙ্গের মতো যথেচ্ছা বিচরণ করার স্পষ্ট অনুমতি লাভ করা সত্ত্বেও। এখানেই ভাববার বিষয়। কোন শরাবের জামে চুমুক দিয়েছিলেন হযরত যায়িদ [রা] এবং অপরাপর সাহাবীরাও তা আঁচ করা যায় এ ক্ষুদ্র ঘটনাটির দ্বারা।

সাহাবীদের উক্তির দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতে চাইনা। বিশেষত তাঁরা রাসূলুল্লাহর [সা] গুণগ্রাহী ছিলেন বলে ব্যাপারটাকে হালকা ভাবার মনোবৃত্তি কারুর মনে জাগতে পারে মনে করেই। এবারে রাসূলুল্লাহর [সা] শত্রুরা কী বলছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। রাসূলুল্লাহ [সা] এর আমলের কথাই ধরা যাক। আরবের পৌত্তলিক কাফির মুশরিকরা তওহীদের দাওয়াত শ্রবণে অগ্নিশর্মা হলো। এহেন 'অবাঞ্ছিত' কথা যেন ঘূর্ণাক্ষরেও উচ্চারিত না হয় তার জন্য প্রলোচন ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন ছাড়াও ঠাট্টা বিদ্রূপ ও

www.pathagar.com

অপমানের একশেষ করলো [সা] কে। তারাই আবার তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা ও অতুলনীয় মানবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভূষিত করলো আল আমীন খেতাবে। অর্থাৎ কিনা চোর যদি বা চুরি করে তথাপি সে জানে চৌর্যবৃত্তি জঘন্য ঘৃণিত কাজ।

টমাস কারলাইল হিরোজ এন্ড হিরো ওরাশিপ-এ লেখেন : আমি মুহাম্মাদ [সা]কে পছন্দ করি ভন্ডামী থেকে তাঁর সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য। নিজে যা নন তাই হওয়ার জন্য তিনি ভান করতেন না।

মি: গান্ধীর মন্তব্য : আমার বিশ্বাস জন্মালো যে, ওই সময় যার সাহায্যে ইসলামের আসন অর্জিত হয়েছিল তা তরবারি নয়, তা ছিল নবীর সরলতা, সম্পূর্ণ অহম-বিলোপ, চুক্তির প্রতি সম্মান, ভক্ত ও অনুসারীদের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তাঁর নির্ভীকতা।

অপর এক মনীষীর মতে : মসজিদে ধর্মীয় আরাধনার কথাই বলুন বা সাধারণ খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারই ধরুন, ইসলামে নিম্নতম মর্যাদার লোকটিও উচ্চতম মর্যাদার লোকটির সমান; ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ভিখারী নামাযে নেতৃত্ব দিচ্ছে আর সুলতান তাকে অনুসরণ করছেন। মুহাম্মাদের ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্মই ব্যবহারিক জীবনে এতটুকু উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

বস্তুত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এসব মনীষী নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহকে [সা] যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন ততটুকুই বলার প্রয়াস পেয়েছেন। তিল তিল করে সে পুণ্যময় আদর্শ মানবের পদাংক অনুসরণ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারলে এঁরা বুঝতে পারতেন মুহাম্মাদ [সা] কী আর তার জীবনাদর্শ কোন যাদুর পরশ!

ইংরেজ জর্জ বার্নার্ড শ বলেন : আমি সব সময়ই মুহাম্মাদের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য জীবনী শক্তির কারণে উচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছি। মুহাম্মাদের ধর্মমতে মুগ্ধ হতে আরম্ভ করেছে ইউরোপ। পরবর্তী শতাব্দীতে ইউরোপ তার সমস্যার সমাধানের জন্য এই ধর্ম মতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে আরো এগিয়ে যাবে–তখন আমরা চমৎকৃত বোধ করিনা। আমাদের নবীকে যারা চিনেছে সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্যকে তারা পদদলিত করতে এতোটুকু কুণ্ঠিত হয়নি। অবোধ শিশুর মতো হাসতে হাসতে জীবন বিলিয়ে দিতেও করেনি সামান্যতম দ্বিধা। নিখিল জাহান তাই পড়ে আজি–

বালগাল উলা বিকামালিহী
কাশাফাদ দুজা বিজামালিহী
হাসুনাত জামীউ খিসালিহী
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী।■

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর মানবতাবোধ

ইকবাল কবীর মোহন

গোটা বিশ্বে মানবাধিকার নিয়ে চলছে এখন নানা জল্পনা-কল্পনা। আধুনিক মানুষের কেউ কেউ দাবী করছেন, বর্তমান দুনিয়া শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাফল্যের চরম শীর্ষে অবস্থায় করছে। তবে এ কথা বলা হয়তো সঠিক যে, অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান দুনিয়া শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি ও সফলতা লাভ করেছে। সভ্য ও সুশীল বলে দাবীদার এ সভ্যতার মানুষের একাংশ আবার কতটা নীচ ও বর্বর হতে পারে তাও কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছি। সাম্প্রতিককালের ঘটনাপ্রবাহ একটু গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করলে আমরা ব্যথিত না হয়ে পারি না। একদিকে চলছে মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের অবিশ্রান্ত প্রয়াস, আর তার পাশাপাশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানবতা দলনের ভয়ানক চিত্র। মানবিক মূল্যবোধ ও মানবতাকে ধ্বংস করার পশ্চিমা পরিকল্পনা ও মারণাস্ত্রের ঝলকানি আমাদের সকল সুকোমল ভাবনা-চিন্তা ও সফলতাকে ম্লান করে দিচ্ছে। মানুষের মৌলিক অধিকারের নামে সারাক্ষণ যারা বক্তৃতার খই ফুটাচ্ছে সেই পশ্চিমা শক্তি যখন গায়ের জোরে অন্যের দেশ ও সম্পদ দখলের প্রয়াস চালাচ্ছে তখন প্রশ্ন জাগে আমরা এ কোন

www.pathagar.com

মানবতার কথা বলছি। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তির পতাকা উড়িয়ে পশ্চিমের দেশগুলো যখন আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, লেবানন, বসনিয়া, কাশ্মীর ও ইরাকসহ দুনিয়ার বিভিন্ন জনপদে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, লুণ্ঠন চালায়, চালায় ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ, তখন প্রশ্ন জাগে এরা কোন মানবতা ও গনতন্ত্রের কথা বলছে। সভ্যতার মুখোশধারী এই তথাকথিত দেশগুলো হচ্ছে আমেরিকা, ইসরাইল, ভারত ও ইউরোপভুক্ত দেশসমূহ। মানবতা ও সভ্যতার কথার আড়ালে তারা চালাচ্ছে অসভ্য আচরণ। বসনিয়ায় চার লাখ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, ফিলিস্তিনে ৫০ বছর ধরে অবিরামভাবে অগণিত মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়া, কাশ্মীর, চেচনিয়া, আলজেরিয়া ও অন্যান্য অনেক দেশে নিরপরাধ মুসলিম শিশু-মহিলা ও অসহায়-নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা ও শোষণ আধুনিক সভ্যতার এক দুর্ভাগ্যজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সর্বত্র আজ প্রশ্ন উঠেছে সভ্যতা ও মানবাধিকার নিয়ে। পশ্চিমাদের এই বক্তৃতা সর্বস্ব মানবাধিকারের নাটক ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চিন্তাশীল মানুষকে আজ ভাবিয়ে তুলছে। সত্যিকথা বলতে কি, প্রকৃত মানবাধিকার এখন কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই। ফলে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আজ হাফিয়ে উঠেছে। তারা বর্তমান সভ্যতার পশুত্ব ও বর্বরতা থেকে মুক্তি পেতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। কিন্তু শান্তির পথ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন ধর্মমত, আদর্শ কিংবা মতবাদ মানুষকে স্থিতি ও স্বস্থির পথ দেখাতে পারছে না।

অথচ ইসলামের নবী, মানবতার পরম বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ [সা] দুনিয়ার মানুষের জন্য পেশ করেছিলেন মানবতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর ঐশী পথ একটি বর্বর, অজ্ঞ, হানাহানিতে লিপ্ত সমাজকে কিভাবে আলোর পথে পরিচালিত করেছিল তা সবারই জানা। তিনি মানবতা ও সুস্থ মানসিকতার এমন এক সমাজ কায়েম করেছিলেন, যা দুনিয়ার কোন সময়ে মানুষ কখনও দেখেনি। মহানবী [সা]-এর মানবতাবোধ ছিল আল-াহর দেয়া উত্তম আদর্শসমৃদ্ধ। ইসলামপূর্ব আরবে মানুষত্ব ও মানবতা বলতে কিছুই ছিল না। মানুষে মানুষে মারামারি, হানাহানি ও যুদ্ধকলহ সেই সমাজের স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। মহানবী [সা] আনীত ইসলাম সেই সমাজের ঘৃণিত ও বর্বর মানুষকে মানবতার উৎকর্ষে আলোকিত করেছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] তাঁর বিরল মানবতাবোধ ও উদারতা দিয়ে একটি অসভ্য ও পশু সমাজকে সুখ-শান্তি, সাম্য ও ন্যায়পরায়নতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর মানবতাবোধ যে কত সুউচ্চ ছিল তা অবলোকন করে এখনও অবিশ্বাসীরা হতবাক হয়ে যায়। আমরা জানি, তিনি জীবনে বহু কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, অত্যাচারিত ও অপমানিত হয়েছেন। তবুও তিনি কাউকে কোনো কটু কথা বলেন নি। তাঁর চরম শত্রুকে হাতের কাছে পেয়েও তিনি তাকে হাসিমুখে ক্ষমা করে দিয়েছেন। মক্কার কুরাইশদের দ্বারা অত্যাচারিত ও অপমানিত হয়ে মহানবী [সা] এক সময় মদীনায় হিজরত করেন। অথচ তিনি যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন পলায়নরত শত্রুদের ওপর তিনি কোনো প্রতিশোধ নেন নি, বরং তাদের নি:শর্ত ক্ষমা করে দেন। মানবতার নবী সেদিন ঘোষণা করলেন, 'আজকের

www.pathagar.com

দিনে তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।' মানুষের মর্যাদাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মহানবী [সা] আরো বললেন, 'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে, যে মানুষের উপকার করে। আমাদের প্রিয় নবী [সা] মানুষ ও মানুষের কল্যাণ নিয়ে যে কতটা আন্তরিক ও পেরেশান ছিলেন তা তাঁর কিশোর বয়সেও লক্ষ্য করা যায়। আরবের রক্তাক্ত ও খুনঝরা সমাজের অধ:গতি মহানবী [সা]-এর মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। তাই মানুষের মধ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গঠন করেন হিলফুল ফুজল সংগঠন। ৫৯৫ সালে গঠিত এই সংগঠনের মূল কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ: ১. সবাই মিলে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। ২. অত্যাচারীর হাত থেকে নিরীহ ও মজলুম মানুষকে রক্ষা করা ও যালিমদের দমন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। ৩. দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে যথাসম্ভব সহায়তা করা। ৪. বিদেশী লোকদের জান-মাল ও মান-সম্মান রক্ষা চেষ্টা করা।

মহানবী [সা]-এর এই কর্মসূচী দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। আজকের সভ্য দুনিয়ায় মানবতার কল্যাণ ও মানবাধিকারের বিকাশের জন্য বহু সংস্থা, এমনকি জাতিসংঘের মত আর্ন্তজাতিক সংগঠনও নিরন্তর কাজ করছে। প্রায়শই আমরা এসব সংস্থা বা সংগঠনের পক্ষে পক্ষপাতমূলক এবং একপেশে আচরণের অভিযোগ লক্ষ্য করি। অভিযোগ রয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সবসময় শক্তির পক্ষে কাজ করে এবং বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষা ছাড়া মানবতাকে আর কিছুই এই সংস্থা বা ফোরাম দিতে পারেনি। অথচ আলাহর নবী মুহাম্মাদ [সা] যে মানবিক তৎপরতা প্রদর্শন করছেন তার সামান্যতম আজ কোথাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বর্তমানে মানুষরূপী হায়েনারা দুনিয়ার দেশে দেশে অকাতরে মানুষ খুন করছে। আধুনিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর জন্য মানুষকে তার শিকারে পরিণত করছে। বিভিন্ন দেশ দখলের সময় মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে এরা মানুষকে ধরে পশুর মত খুন করছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই এরা নিরপরাধ শিশু-মহিলা ও পুরুষ যুদ্ধবন্দীদের পর্যন্তনির্বিচারে হত্যা করছে। অথবা হাত-পা চোখ বেঁধে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখছে, কিংবা লোহার ছোট খাচায় বন্দী করে অনাহারে দিনের পর দিন ফেলে রাখা হচ্ছে। এ ধরনের আচরণ আমরা লক্ষ্য করেছি বসনিয়ায়, প্রতিদিন লক্ষ্য করছি ফিলিস্তিনে। আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও ইরাকেও আমরা একই চিত্র দেখতে পেয়েছি। মুসলিম দুনিয়ার যেখানেই খৃষ্টান-ইহুদি লবীর আগ্রাসন ও জবরদখল দেখা যায় সেখানেই মানবতা ও মানবিকতার চরম লংঘন লক্ষ্য করা যায়। এদের পশুশক্তি গোটা দুনিয়ার মানবিকতা ও সততাকে পিষে মারছে।

অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] সামরিক অভিযানকালে নারী ও শিশুসহ যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণের যে নজির স্থাপন করেছেন আজকের দুনিয়ায় তা সত্যিই বিরল। তিনি বলেছেন, 'বন্দীদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করো।' ইসলামের প্রথম জেহাদ বিজয়ের পর যেসব কাফের সেনা যুদ্ধবন্দী হয়েছিল তাদের প্রতি মহানবী [সা] ও তাঁর সাহাবীরা যে অসাধারণ আচরণ করেছিল তা দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায়নি। সাহাবারা যুদ্ধ শেষ করে যখন মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা পায়ে হেঁটে

www.pathagar.com

গেলেন আর বন্দীদের উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁরা বন্দীদের রুটি খেতে দিলেন আর নিজেরা খেলেন শুকনো খেজুর। মক্কা বিজয়ের পর মুসলিম শত্রু কাফেরদের জন্য মহানবী [সা] যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন তার কথা বলতে গিয়ে আধুনিক দুনিয়ার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন, In the long history of the world there is no instance of magnanimity and forgiveness which can approach those of Mohammad when all his enemies lay at his feet and he forgave them one and all 'অর্থাৎ মুহাম্মাদ [সা] তাঁর কাছে পদানত শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়ে যে ঔদার্য ও ক্ষমাশীলতার বিরল আদর্শ স্থাপন করেছিলেন জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার কোন নজির নেই।' মানবতা তথা মানুষের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মহানবী [সা]-এর আরো একটি পদক্ষেপ হলো ছোট-বড় ভেদাভেদ সৃষ্টির মতো অমানবিকতার সকল প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা এবং মানুষের মানুষে বিভেদ নয়, সমানাধিকারের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

তখনকার আরব সমাজে মানুষকে মানুষের দাস হয়ে থাকতে হতো। দাসদের না ছিল কোন অধিকার, না ছিল কোন স্বাধীনতা। মনিবের ইচ্ছের ওপরই তাকে বেঁচে থাকতে হতো। এই জঘন্য ও মানবতাবিরোধী প্রথাকে মুহাম্মাদ [সা] উচ্ছেদ করে দাসদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অমানবিক এই দাসপ্রথাকে বাতিল করার প্রক্রিয়া হিসাবে তিনি ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের ভাইয়েরাই তো তোমাদের দাস। আলাহ্ তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই যার অধীনে দাস হিসাবে তার একটি ভাই আছে তার উচিত সে যা খাবে, তাকেও তা খেতে দেবে এং সে যা পরিধান করবে, তাকেও তাই পরতে দেবে।'

শুধু কি তাই? মহানবী [সা] দাসদের মর্যাদাকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্টিত করার জন্য আরো বললেন, 'যোগ্যতার বলে কোন দাস যদি নেতৃত্ব পায় তবে তাকেই তোমরা মান্য করবে।' দাস বা অধীনস্তদের ওপর কোন প্রকার জুলুমকে মহানবী [সা] একটি ঘৃণিত কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কারা নিকৃষ্ট বলে দেবো? যারা একাকী খায়, দাসদের বেত মারে এবং কাউকেও কিছু দেয় না।' তা ছাড়া তিনি এক ঘোষণার মাধ্যমে দাসদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করাকে আখেরাতে ক্ষতির' কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। মহানবী [সা] বলেছেন, 'যে দাসদের সাথে দুর্ব্যবহার করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' আজকের দুনিয়ায় কোথায় আছে এই মানবতাবোধ, এই ভ্রাতৃত্ববোধ? মহানবী [সা]-এর কাছে সব মানুষই ছিল সমান। তাঁর কাছে আপন-পর বলে কেউ ছিল না। তাইতো তিনি বলেছেন, 'সকল মুসলিম একে অপরের ভাই।' আর এই ভাই ভাই সম্পর্কের কথা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাও মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সুন্দরভাবে ঘোষণা করেছেন এভাবে, 'অবশ্যই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, যাতে তোমরা রহমত পেতে পার।' মহানবী [সা] তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে সকল মানুষের সমান মর্যাদা ঘোষণা করে বৈষম্যের মূলোৎপাটন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'একমাত্র খোদাভীতি ছাড়া অনারবদের ওপর আরবদের আর আরবদের ওপর অনারবদের কোনো প্রাধান্য নেই।'

www.pathagar.com

শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সমতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলেই ইসলামের নবী ক্ষান্ত হননি। সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার অধিকারও সংরক্ষণ করেছেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'অমুসলিমদের জান ও মাল এবং আমাদের জান ও মাল এক ও অভিন্ন। তিনি আরো বলেছেন, 'যে মুসলমান অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সামান্য জুলুম করবে, তার বিরুদ্ধে আমি কিয়ামতের দিন আলাহ্‌র দরবারে অভিযোগ করব। যে নবী সাম্য ও মৈত্রীর এমন বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সেই নবীর উম্মত হিসাবে পরিচিত মুসলমানরা আজ অমুসলিম বিশ্বের সর্বত্র চরম বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার। অথচ মুসলমানদের মধ্যে যারা মহানবী [সা]-এর আদর্শের অনুসরণ করে চলছে তারা কোথাও অমুসলিম মানুষের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন করছে বলে নজীর নেই। এ কারণে মহানবী [সা]-এর সাম্য ও মৈত্রীর অনুপম আদর্শ অমুসলিম মনীষীদেরও ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। George Barnardshaw বলেছেন If a man like Mohammad were to assume the dictatorship of this modern world he could solve the problem in a way that would ultimately bring its much needed peace and happiness. অর্থাৎ মুহাম্মাদের মতো কোনো ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন তা হলে এমন এক উপায়ে তিনি এর সমস্যা সমাধানে সফল হতেন যা পৃথিবীতে নিয়ে আসত বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি।'

আজকের দুনিয়ায় অমানবিকতার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থে অসহায় মানুষ ও নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন পরিচালনা করা এবং দুর্বল জাতিগুলোর ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমেরিকাসহ পশ্চিমা জাতিগুলো তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হাজার হাজার অসহায় মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। তারা মানুষের অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও দুর্বলতার সুযোগকে পুঁজি করে অনেক দেশের সম্পদ ও মাটি পর্যন্ত দখল করে নিতে পিছপা হয় না। অতি সম্প্রতিককালে ইরাকের তেলসম্পদ কব্জা করার জন্য আমেরিকা সে দেশের নিরস্ত্র ও নিরপরাধ অসংখ্য মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এবং সকল রীতিনীতি ও আইনকে অমান্য করে দেশটি দখল করে নিয়েছে। এর আগে তারা দীর্ঘ অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে দেশটির প্রায় পনের লাখ নিরাপরাধ মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ক্ষমতাদর্পী হায়েনারা মানবতা, মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা মুখে উচ্চারণ করলেও মূলত নিজেদের স্বার্থে মানবতা লঙ্ঘনের যাবতীয় অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ মহানবী [সা] অসহায় দুর্বল ও পীড়িত মানুষের অধিকার ছাড়া অন্য কিছুই কল্পনা করতে পারেননি। তিনি তাদের প্রতি সর্বদা ছিলেন সদয় ও মহানুভব। তাইতো মহানবী [সা] এ বিষয়ে কি সুন্দর কথাই না বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি সদয় হও, তা হলে উর্ধলোকের প্রভুও তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।'

আজকের দুনিয়ায় আর্ত-পীড়িত ও অসহায় মানুষের প্রতি মানবতাবোধের যে অভাব তা

www.pathagar.com

সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। মানবতারোধের সাথে ন্যায়বিচার ও সাম্য-মৈত্রীর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ন্যায়নীতি না থাকলে সেখানে মানবতাবোধের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। এই ন্যায়বিচারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন মহানবী [সা]। তাঁর ন্যায়বোধ শত্রুদের কাছে আজও বিস্ময়ের ব্যাপার হিসাবে বিবেচিত হতো। মহানবী [সা] তাঁর জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও নীতিবোধকে নিশ্চিত করে গেছেন। ফলে তিনি এমন এক সুন্দর মানবসমাজ উপহার দিতে পেরেছিলেন, যা এর পর দুনিয়ার মানুষ আর প্রত্যক্ষ করতে পারেনি।

বর্তমান বিশ্বে অমানবিকতার আরেক শিকার আজকের মহিলারা। দুনিয়ার তথাকথিত সভ্য জাতির শাসকরা নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার নিয়ে খুব চিৎকার করে থাকেন। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, তারাই নারীদের ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদাকে এমনভাবে খাটো করছেন যে, এর ফলে নারীরা এখন সর্বত্র পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নারী স্বাধীনতার নামে নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে পশ্চিমাজগত। নারীরা না পাচ্ছে মায়ের মতো পবিত্র মর্যাদা না পাচ্ছে বোনের মতো ভালোবাসা। বিশেষ করে পাশ্চাত্যজগতে নারীরা চরম দুর্দশার শিকার। তখনকার আরব সমাজেও এমনই এক কঠিন অবস্থা বিরাজ করছিল। সেই সময় নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। তখন মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো। তাদেরকে দাসদাসীর চেয়েও ছোট করে দেখা হতো। মহানবী [সা] নারীদের এই দুর্গতি থেকে টেনে এনে অনেক বড় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পুরুষদের মতো তাদেরও অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারী-পুরুষের অধিকারের ব্যাপারে মহান আল্লহ তাআলা আল-কুরআনে সূরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, 'মুমিন নর ও নারী একে অপরের বন্ধু।' নারী ও পুরুষের সমানাধিকার সম্পর্কে কুরআনে সূরা তাওবার ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুমিন নর ও নারীকে জান্নাতের।' মহানবী [সা] তাঁর জীবনে সর্বদাই নারীদের অধিকার নিশ্চিত করে গেছেন এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মহানবী [সা] মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সংরক্ষণে যে সমতাপূর্ণ বিধান রেখে গেছেন তা আজও দুনিয়ার মানুষকে হতবাক করে। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের নবীর মানবতাবোধ ও ন্যায়পূর্ণ আচরণ অবিশ্বাসী মনিষীদেরকেও আকৃষ্ট না করে পারেনি। তারা ইসলামের বিরোধিতা করেছেন ঠিকই, কিন্তু মহানবীর [সা] আদর্শের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। অমুসলিম মনীষীরা অকপটে স্বীকার করেছেন মহানবী [সা] ও তাঁর আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। ফরাসি মনীষী আলফ্রেড দ্য লামার্টিন মহানবী [সা] সম্পর্কে বলেছেন, Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqurer of ideas, restorer or rational dogmas, of a cult without images, the founder of twenty terrestirial empires and of one spiritual empire that is Mohammad. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? অর্থাৎ দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইনপ্রণেতা, মতবাদ বিজয়ী,

www.pathagar.com

ধর্মমতের এবং প্রতিমাবিহীন ও উপাসনা পদ্ধতির পুনঃস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্ম-সাম্রাজ্যের সংস্থাপক কর্তা মুহাম্মদ।

যে সমস্ত মাপকাঠির আলোকে মানবীয় মহত্ত্ব পরিমাপ করা হয় সেগুলোর প্রত্যেকটির দ্বারা মহানবী [সা]-কে বিবেচনা করা হলে আমরা একথা সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোনো মানুষ কি তাঁর অপেক্ষা মহত্তর ছিল? আজকের জরাজীর্ণ পৃথিবীতে যে অশান্তি, অনাচার, অসাম্য, বিভেদ, হিংসা, হানাহানি, অরাজকতা ও খুনাখুনি চলছে তা থেকে মানবতাকে বাঁচাতে হলে এবং দুনিয়ার বুকে মানবিকতার বিজয় নিশান উড়াতে হলে নবী মুহাম্মাদ [সা] প্রবর্তিত আদর্শ অনুসরণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদসহ পশ্চিমী যাবতীয় মানবরচিত আদর্শ আজ মানুষকে পশুর পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে। ক্রমেই আমাদের এই জগত ও সভ্যতা মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। দুনিয়াব্যাপী মানবাধিকার লংঘনের যে হিড়িক শুরু হয়েছে তার মোকাবেলা করার মতো কোনো সমন্বিত আদর্শ কারো কাছেই যে নেই তা এখন সত্য ও বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। ফলে গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামের বাণী ও আদর্শ আকর্ষণীয় হয়ে ধরা দিয়েছে। পশ্চিমাজগত এবং খোদ আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষ ইসলাম ও কুরআনের সংস্পর্শে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। আর এই স্রোতধারাকে স্তব্ধ করার জন্যই শুরু হয়েছে দমন, পীড়ন, আগ্রাসন। ইসলাম ও মুসলমানদের নিঃশেষ করে ফেলার লক্ষ্যে চলছে ক্রুসেড। আর এ জন্য তারা বেছে নিয়েছে অনৈতিকতা ও অমানবিকতার হিংস্র পথ। যদিও তাদের এই অমানবিকতা ও অসত্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে গোটা বিশ্বের মানুষ। আশা করা যায়, নিকট ভবিষ্যতে এই অমানবিকতার পরাজয় ঘটবে এবং বিজয় হবে মানবিকতার। আর মানবিকতার জয় মানেই ইসলামের জয়। তবে এই বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে মুসলমানদের আরো বেশি সাহসিকতা ও সহিষ্ণুতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই মহানবী [সা] প্রদর্শিত সুমহান আদর্শকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। মহান আল্লাহ মুসলিম মিল্লাতকে এই সহজ বাস্তবতা বুঝার এবং সে অনুযায়ী পথ চলার তৌফিক দিন। ■

www.pathagar.com

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

আধুনিক প্রকাশনীর প্রকাশিত তাফহীমুল কুরআন (তাফসীর), হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও শিশু সাহিত্যসমূহ এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

আপনার প্রয়োজনীয় বইগুলো আজই সংগ্রহ করুন।

- কুরআন শরীফ
- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড) -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তাফহীমুল কুরআন বিষয় নির্দেশিকা -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তাফহীমুল কুরআন জেলদ (১-৬ খণ্ড) -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে) -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- আল কুরআনের সহজ অনুবাদ -অধ্যাপক গোলাম আযম
- তাফসীরে সাঈদী -মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড) -মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১০ খণ্ড) -মাওঃ হাবিবুর রহমান
- শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড) -মতিউর রহমান খান
- আল কুরআনের সারসংক্ষেপ -মাওঃ মোঃ তৈয়ব আলী
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)-আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)-আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- শরহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)- ইমাম আবুজাফর আহমাদ আত-তাহাবী
- রাহে আমল (১-২ খণ্ড) -আল্লামা জলিল আহসান নদভী
- এন্তেখাবে হাদীস (১ - ২) -আবদুল গাফফার নদভী
- মিশকাতুল মাসাবীহ (১-৫ খণ্ড) -আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
- ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলাম পরিচিতি -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম -মোঃ সিরাজুল ইসলাম
- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- আসমাউল হুসনা -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা -আমীন আহসান ইসলাহী
- ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা -সাইয়েদ কুতুব
- ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম -মুহাম্মদ কুতুব
- ঈমানের পরিচয় -মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম
- চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব -মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম
- ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি -আল্লামা আল বাহী আল খাওলী
- ইসলাম পরিচয় -ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ
- আলেমগণ নানা মতে যেতে হবে নবীর পথে - আবদুল গাফফার
- সংঘাতের মুখে ইসলাম -আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ
- ইসলামে মানবাধিকার -মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন
- যে যুবক যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায় -এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনীর বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ

- ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার
  ঢাকা-১১০০, ফোনঃ ৭১১৫১৯১
- ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
  বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১১০০
- ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার
  (ওয়ারলেস রেলগেট)
  ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৯৩৩৯৪৪২
- কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
  নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

www.pathagar.com

যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ [সা]

নাসির হেলাল

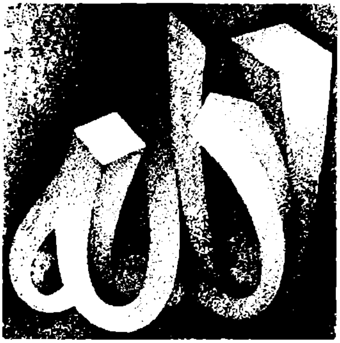

বিকল্প পথ নেই। শান্তির জন্য বিরামহীন প্রয়াসের অংশ হিসাবে কখনো বুদ্ধি-বৃত্তিক আবার কখনো সশস্ত্র পথে অগ্রসর হওয়াকে তাই ইসলাম শ্রেষ্ঠতম ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। এজন্যই রণক্ষেত্রে আদর্শ ও আলোর দিশারী হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]।

মহানবী [সা] নিছক একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। আশ্রমে নির্জন সাধনা তাঁর ব্রত নয়। ধূলির ধরায় মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও কর্মের নৈপুণ্যে তিনি একজন সাফল্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও সমর্থনে তিনি এক ও অতুলনীয় মহামানব, যার জীবন ও যৌবনে চিন্তা ও বিবেকে রয়েছে সকল নবী-রাসূলের গুণের সমাহার। শুধু তাই নয় মানব চরিত্রের বিকশিত সুমহান দক্ষতা শৈলীতে তিনি হলেন খাতামুন নাবীয়িঈন সাইয়েদুল মুরসালীন শফীউন মুজনিবীন রাহমাতুললীল আলামীন। এ কথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য ও কল্যাণের জন্য নূরের নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর মাটির পৃথিবীতে আগমন। আল্লাহ বলেন, "আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির ওপর করুণাস্বরূপ পাঠিয়েছি।" [সূরা আম্বিয়া] কিন্তু দয়ার সাগর প্রিয় নবীকেই হতে হয়েছে পর্বতের ন্যায় অটল অবিচল। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তস্নাত সশস্ত্র পথ

www.pathagar.com

চলাকে এজন্যই বলা হয় জিহাদ।' [হযরত মুহাম্মদ [সা] স্মারক-মাওলানা মুজিবুর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ৩৮২, ঢাকা ট্রাস্ট।]

পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা বা আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করা অথবা কোন সম্প্রদায় বা দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া রাসূল [সা] এর নীতিবিরোধী ছিল। তাঁর পরিচালিত প্রতিটি অভিযান বা যুদ্ধ ছিল প্রয়োজনীয় এবং আত্মরক্ষামূলক। গায়ের জোরে তিনি কখনই কোন কিছু করতেন না। 'জোর যার মুল্লুক তার' এ তস্করী নীতির তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। বরং তিনি ঘর হারা মানুষকে ঘরে ফেরানোর জন্য, দুঃখ মোচনের জন্য যুদ্ধ করেছেন।

এরশাদ হচ্ছে– 'যাদের অন্যায়ভাবে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, তারা বলে আল্লাহই আমাদের একমাত্র প্রভু নিশ্চয়ই আল্লাহ সে শক্তিকে সাহায্য করেন যে আল্লাহকে সাহায্য করে।' [সূরা হজ্ব : ৪০]

পৃথিবীর নানা স্থানে অনেক মানুষ রয়েছে যারা সেখানকার শাসক, প্রভাবশালী ব্যক্তি কতৃক বা অন্য কোন ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারছে না বা পারে না। তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা যুদ্ধ করছো না আল্লাহর পথে। অথচ অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুরা আর্তনাদ করছে। আল্লাহ অত্যাচারীর এদেশ হতে আমাদের অন্যত্র সরিয়ে নাও।' [সূরা নিসা : ৭৫]

যারা ধর্মদ্রোহী, ধর্মের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে 'আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং শুধু আল্লাহর জন্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।' [সূরা বাকারা : ১৯৩]

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবন পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো নবুয়তের প্রথম জীবনে অর্থাৎ মক্কা জীবনের ১৩ বছরে শত অত্যাচার নির্যাতনেও তিনি রা করেননি। অত্যাচারে অত্যাচারে তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে– শিবে আবী তালিবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমন কি বছরের পর বছর বন্দী করে রাখা হয়েছে। খাবারের অভাবে গাছের ছাল বাকল এমনকি শুকনো চামড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে খেয়েছেন। তবুও কোন যুদ্ধ করেননি। মক্কাতে তিষ্ঠতে না পেরে আল্লাহর হুকুমে মদীনায় হিজরত করেছেন। সেখানেও যখন কাফেরা হাত বাড়িয়েছে, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিকদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ [সা] তথা মদীনার মুসলমানদের সাথে করা চুক্তি বা সন্ধি ভঙ্গ করেছে তখনই যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। কবি গোলাম মোস্তফার ভাষায়, 'আঘাতে আঘাতে শাণিত মুসলমানেরা ঘুমন্ত শক্তিতে জেগে উঠলো। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হিজরী প্রথম সনেই সারিয়ায়ে হামযা, আবু উবাদা, সাদ আবু ওয়াক্কাস প্রভৃতিতে মুসলমানগণ কাফিরদের মুখোমুখি হয় এবং হিজরী ২য় সনে গাযওয়ায়ে আবুওয়াহ বা বেদান, বয়াত বদরে উলা, যুল উশায়রা প্রভৃতিতে বিরোধীদের সাথে বড় ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে পরিশেষে হিজরী ২য় সনের রমজান মাসে সংঘঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। যা ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র লড়াই হিসাবে চিহ্নিত।' [বিশ্বনবী]

www.pathagar.com

মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ [সা] কে বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার তাগিদে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলো যুদ্ধে তাঁর নিজের নেতৃত্বেই সংঘঠিত হয়েছে এবং বাকি গুলো তাঁর হুকুমে সাহাবীদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ [সা] সরাসরি যে সমস্ত যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলো 'গাযওয়াহ' নামে পরিচিত। এমন যুদ্ধের সংখ্যা ২৭টি মতান্তরে ২৯টি। আর যে সব যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ [সা] নির্দেশে সাহাবীদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছে সেগুলো 'সারিয়া' নামে পরিচিত। এমন যুদ্ধের সংখ্যা ৫৭টি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের নির্দেশ পেয়েই তবে রাসূলুল্লাহ [সা] কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। এরশাদ হচ্ছে– 'যাদের বিরুদ্ধে [কাফেরদের পক্ষ থেকে] যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল, তাদেরও [এখন যুদ্ধ করার] অনুমতি দেয়া গেল, কেননা তাদের ওপর সত্যিই যুলুম করা হচ্ছিল; নি:সন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এ [মাযলুম]-দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।' [সূরা হজ্ব : ৩৯]

আর ও এরশাদ হয়েছে–

'তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দীয়, সম্ভবত একটি বস্তু তোমাদের কাছে অপ্রিয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা [তোমাদের জন্য] কল্যাণকর।' [সূরা বাকারা : ২১৬]

রাসূলুল্লাহ [সা] এর নেতৃত্বে সংঘটিত গাযওয়াহ সমূহ–

গাযওয়ায়ে আবওয়াহ্ বা ওয়াদ্দান অভিযান : দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনের প্রথম অভিযান। মক্কা ও মদীনার মধ্যে অবস্থিত ওয়াদ্দান নামক স্থানে তিনি কোরাইশ ও বনু দামরা ইবন বাকরের খোঁজে পৌছেন। বনু দামরা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বশ্যতা স্বীকার করায় সহজে মিটমাট হয়ে যায়।

এ অভিযানে যুদ্ধ পতাকার রং ছিলো সাদা এবং হযরত হামযা [রা] তা বহন করেন।

সাদবিন ওবাদাকে রাসূলুল্লাহ [সা] এ সময় মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত হামযা [রা]-এর নেতৃত্বে অভিযান : ৩০ জন ঘোড়সওয়ার মুহাজির দলকে রাসূলুল্লাহ তাঁর চাচা হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব [রা] কে আমীর করে সমুদ্রোপকূলের দিকে পাঠান। লোহিত সাগরের উপকূলে ঈস নামক স্থানে হযরত হামযা [রা] আবু জেহেল বাহিনীর মুখোমুখি হয়। আবু জেহেলের বাহিনীতে ৩০০জন ঘোড়সওয়ার ছিল। দু'দল যুদ্ধের জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় মাজদী বিন আমার জুহানীর হস্তক্ষেপে যুদ্ধের বদলে সন্ধি হয়। মুসলিম বাহিনীতে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না।

উবাইদা ইবনে হারিসের নেতৃত্বে অভিযান : রাসূলুল্লাহ [সা] উবাইদা ইবনে হারিসকে আমীর নিযুক্ত করে রবিউস সানী মাসে ৬০ অথবা ৮০ জনের একটি অশ্বারোহীদল হেজাজের এক কূপের দিকে পাঠান। এ দলেরও সদস্যদের সবাই ছিলেন মুহাজির। সানিয়াতুল মুররার নিম্নভূমিতে অবস্থিতে এ কূপের কাছে পৌছলে মুসলিম বাহিনী কোরাইশদের এক বিরাট অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হন। তবে কোন যুদ্ধ হয়নি।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস একটি তীর- নিক্ষেপ করেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম তীর যা শত্রুদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

উল্লেখ্য যে কাফের বাহিনীর সেনাপতি ছিল আবু জাহল মতান্তরে মেকরায ইবনে হাফস। রাসূলুল্লাহ [সা] নিজে এই যুদ্ধের ঝাণ্ডা বেঁধেছিলেন।

বুয়াত অভিযান : রাসূলুল্লাহ [সা] রবিউল আউয়াল মাসে নিজেই কুরাইশদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েন এবং ইয়াম্বুর নিকটবর্তী জুহাইনা গোত্রের এলাকার একটি পর্বত বুয়াত-এর কাছে পৌছে যান। রিদওয়ার দিক দিয়ে তিনি এখানে পৌছান। এ অভিযানেও কোনও সংঘর্ষ হয়নি।

এ অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি সায়েব ইবনে উসমান ইবনে মাযউনকে [রা] মদীনার গভর্ণর নিয়োগ করে যান।

উশায়রা অভিযান : রাসূলুল্লাহ [সা] জামাদিউল উলা মাসে কোরাইশদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযানে বের হন। পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি পার হয়ে তিনি ইয়াম্বুর সমভূমি দিয়ে উশায়রাতে গিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে তিনি জামাদিউল উলা এবং জামাদিউস সানীর কয়েকটা দিন অতিবাহিত করেন। মাঝে তিনি ইবনে আযহার উপত্যকায় পৌছে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং নামাযও পড়েছিলেন। সেজন্য পরবর্তীতে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এখানেও কোনও যুদ্ধ হয়নি। মোদবেহ গোত্রের সাথে এ সময় তিনি সন্ধি চুক্তি করেন।

এ অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ [সা] আবু সালাম বিন আবদুল আসাদকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন।

সা'দ ইবনে আবিওয়াক্কাসের নেতৃত্বে অভিযান : রাসূলুল্লাহ [সা] সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ৮ জন মুহাজিরের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী অভিযানে পাঠান। বাহিনীটি হেজাযের খাযযার নামক স্থানে পৌছে। তবে কোন যুদ্ধ হয়নি। নিরাপদে এ বাহিনী মদীনায় পৌছে।

সাফাওয়ান অভিযান বা প্রথম বদর অভিযান : কুরয ইবনে জাবের ফেহরী উশায়রা অভিযানের দশদিনের মাথায় হঠাৎ করেই মদীনার আশেপাশে চরে বেড়ান উট ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু লুণ্ঠনের জন্যে হামলা চালায়। তাৎক্ষণিকভাবে রাসূলুল্লাহ [সা]-ও তার পিছু ধাওয়া করে বদর প্রান্তরের এক পাশে অবস্থিত সাফওয়ান নামক একটি উপত্যকায় পৌছেন। কিন্তু তিনি কুরয ইবনে জাবেরের নাগাল পাননি। ইতিহাসে এ অভিযানকে প্রথম বদর অভিযান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ অভিযানে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ [সা] যায়িদ ইবনে হারিসাকে [রা] মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে অভিযান : রজবমাসে রাসূলুল্লাহ [সা] আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে ৮ জনের একটি বাহিনী এক অভিযানে পাঠান। এ ৮ জন মোহাজির সাহাবী ছিলেন প্রথম বদর অভিযানে অংশগ্রহণকারী। এ দলে কোন আনসার

www.pathagar.com

সাহাবী ছিলেন না। এ বাহিনীর আমীরের হাতে রাসূলুল্লাহ [সা] একটি পত্র দিয়ে বলেন, দু'দিন পথ চলার পর তা পাঠ করবে এবং পত্রের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে। আর সঙ্গী-সাথীদের ওপর কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেবে না

দু'দিন পথ চলার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ পত্রটি খুলে দেখলেন তাতে লেখা আছে, 'আমার এই চিঠি যখন তুমি পড়বে, তখুনি রওনা হয়ে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করবে। সেখানে কোরাইশদের জন্য ওত পেতে থাকবে এবং কোন তথ্য পেলে আমাকে জানাবে।'

পত্র পড়েই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ বললেন, 'আমি মেনে নিলাম ও অনুগত রইলাম।' এরপর তিনি সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ [সা] আমাকে নাখলায় গিয়ে কোরাইশদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকতে বলেছেন এবং কোন খবর জানলে তা তাঁকে জানাতে বলেছেন। আর এ ব্যাপারে তোমাদের কারো ওপর বাধ্যতামূলক কোন দায়িত্ব চাপাতে নিষেধ করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শাহাদাত লাভে ইচ্ছুক থাকে তবে সে আমার সাথে যেতে পারে। আর যে তা চায় না, সে ফিরে যেতে পারে। তবে আমি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর আদেশ পালন করবো।'

একথা বলার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ নাখলার দিকে রওনা হলেন। তাঁর বাহিনীর সবাই তাঁর অনুসরণ করলেন– কেউই ফিরে গেলেন না। চলতে চলতে আবদুল্লাহর বাহিনী একসময় নাখলায় পৌছে গেলেন এবং যাত্রা বিরতী করলেন। কিন্তু নাখলায় পৌছানোর আগেই বাহরান নামক স্থানে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও উতাবা ইবনে গাযওয়ান তাঁদের উট হারিয়ে ফেলায় তাঁরা পেছনে থেকে গেলেন। এদিকে নাখলায় অবস্থানরত মুসলিম দলটির কাছ দিয়ে বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে অতিক্রম করছিল কোরাইশ কাফেলা। মুসলিম বাহিনী কোরাইশ বাহিনীর ওপর হামলা করবে কি করবে না এ নিয়ে প্রচণ্ড দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিল। কারণ মাসটি ছিল যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ মাস রজব। পরে তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্শা নিক্ষেপ করলো। কুরাইশ দলের আমার ইবনে হাদরাসীকে ওয়াকীদ ইবনে আবদুল্লাহ তামিজী বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন। আর দু'জনকে বন্দী করলেন। এরা হলো– উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ও হাকাম ইবনে কাইসান। পালিয়েগেল নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ তাঁর বাহিনী ও বন্দীদ্বয়কে নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন।

রাসূলুল্লাহ [সা] ঘটনা শুনে বললেন, 'আমি তো তোমাদেরকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি।' পরে সাথীদের থেকে পিছিয়ে পড়া সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও উতবা ইবনে গাযওয়ান ফিরে এলে বন্দী দু'জনকে মুক্তি দেয়া হয়।

এ ঘটনায় কোরাইশরা খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বলতে থাকে মুহাম্মাদ হারাম মাসসমূহকেও যুদ্ধের জন্য হালাল করে নিয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করেন।

'তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল: এ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অন্যায়। তবে আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় অন্যায় হলো

www.pathagar.com

আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা, কুফরী করা, মসজিদে হারামে যেতে বাধা দেয়া এবং মসজিদে হারামের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা। বস্তুত নির্যাতনের মাধ্যমে মানুষকে বিপথগামী করা হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ। তারা অবিরতভাবে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, যাতে করে সাধ্যে কুলালে তোমাদেরকে ধর্মান্তরিত করতে পারে।' [সূরা বাকারা : ২১৭]

উল্লেখ্য যে ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম হত্যা, প্রথম বন্দী, এবং প্রথম গণীমতের মাল।

গাযওয়ায়ে বদর বা বদরের যুদ্ধ : ইসলামের ইতিহাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, মোড় পরিবর্তনকারী যুদ্ধ বদর আল কুবরা বা প্রসিদ্ধ বদর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন, বিপরীতে কাফের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০ জন। মুসলমানদের মাত্র ২টি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং সেনাপতি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর হাতে ১টি মাত্র তীর ছিল। পক্ষান্তরে শত্রু বাহিনীতে ঘোড়া ছিল ১০০০টি। এ দলের সেনাপতি ছিল আবু জেহেল। তবে প্রধান সেনাপতি ছিল উতবা বিন রাবিয়া।

দ্বিতীয় হিজরী সনের ১৭ রমজান সংঘঠিত এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। যুদ্ধে মুসলমানয়েরা ১৪ জন শহীদ হন। অপর পক্ষে কাফেরদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়।

এ যুদ্ধে কাফের নেতা আবু জেহেল, রবিয়ার পুত্র ওতবা ও শায়বা, ওলীদ বিন ওতবা এবং উমাইয়া বিন খলফও নিহত হয়।

যুদ্ধ বন্দীদের থেকে জনপ্রতি মুক্তিপণ নেয়া হয় একহাজার দিরহাম থেকে চারহাজার দিরহাম। তবে যারা গরীব তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বিনা পণে মুক্তি দেয়া হয়। এরা হলেন– আবুল আস ইবনে রাবী, মুত্তালিব ইবনে হানতাব, আবু আযযা আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসমান এবং সাইফী ইবনে আবু রিফায়া।

অভিযানে রওনা হওয়ার আগে রাসূলল্লাহ [সা] আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম [রা] কে মদীনার গভর্ণর ও ইমাম নিযুক্ত করেন। পরে 'রাওহা' নামক স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ [সা] আবু লোবাবা ইবনুল মোনযেরকে [রেফায়া বিন আবদুল মোনযের] মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর প্রথমবারের মত– মুসলমানরা ঈদ উদযাপন করেন।

বনী সুলাইম অভিযান : রাসূলুল্লাহ [সা] বদরযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার মাত্র সাত দিন পর বনী সুলাইম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি নিজেই এ যুদ্ধের নেতৃত্বে দেন এবং আল কুদার নামক বনী সুলায়মের একটি জলাশয় দখল করে নেন। এখানে তিন দিন অপেক্ষা করার পর কোন যুদ্ধ ছাড়াই তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।

এ অভিযানে রওনা হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ [সা] সেবা গেফারী [রা] কে মদীনার গভর্ণর এবং ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন।

সাওয়ীক বা সাবিক অভিযান : বদর যুদ্ধের পরাজয় কোরাইশদেরকে উন্মাদ করে

www.pathagar.com

তোলে। তারা এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এতটাই মরিয়া হয়ে ওঠে যে, আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্যরা এ প্রতিজ্ঞা করে যে পবিত্রতা অর্জনের জন্যও তারা গোসল করবে না– যতক্ষণ না আর একটা যুদ্ধ করে মুসলমানদের পরাজিত করতে পারছে। আর এ প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য আবু সুফিয়ান দু'শো ঘোড়সওয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তারা মদীনার কাছা কাছি উরাইয নামক স্থানে পৌছা সেখানকার খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয় এবং এক আনসার ও তাঁর সহযোগীকে হত্যা করে দ্রুত সটকে পড়ে। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে পৌছে মাত্র তিনি তাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন এবং 'কারকারাতুল কাদর' নামক স্থান পর্যন্ত পৌছেও যখন আবু সুফিয়ান বাহিনীর কোন হদীস পেলেন না তখন ফিরে এলেন।

বদর যুদ্ধের দু'মাস পর হিজরী দ্বিতীয় সনের জিলহজ্ব মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

এ অভিযানে রওনা হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ [সা] আবু লুবাবা [রা] কে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করে যান।

যী আমার অভিযান : রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে গোপন সূত্রে খবর পৌছে যে, নজদের গাতফান এলাকার যী আমার নামক স্থানের গাতফান, সালাবা ও মোহারেবের গোত্র সমূহ একত্র হয়ে মদীনার আশে পাশে হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সংবাদের ভিত্তিতে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অভিযান পরিচালনা করেন এবং নজদে পৌছে যান। তিনি তৃতীয় হিজরীর সফর মাসের পুরো সময়টাই যী আমারে অতিবাহিত করে মদীনার ফেরেন।

এ অভিযানের প্রাক্কালে তিনি হযরত ওসমান [রা] কে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করে যান।

বাহারানের ফুরু অভিযান : তৃতীয় হিজরীর রবিউস সানী মাসে কোরাইশদের খোঁজে রাসূলুল্লাহ [সা] এক অভিযানে বের হন। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে হিযাজ অতিক্রম করেন এবং ফুরু অঞ্চল হয়ে বাহারান পৌছান। তিনি সেখানে রবিউস সানী ও জমাদিউল উলা কাটিয়ে তারপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কোন যুদ্ধ বা সংঘর্ষ হয়নি।

এ অভিযানের প্রাক্কালে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করে ছিলেন।

বনু কায়নুকার যুদ্ধ : বনু কায়নুকা নামের ইহুদী সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো। মুসলমানদের সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ছিলো। কিন্তু তারা সে চুক্তি ভঙ্গ করলে রাসূলুল্লাহ [সা]-তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদেরকে অবরোধ করেন। এটা ছিল দ্বিতীয় হিজরী সনের মধ্য শওয়াল। একাধারে ১৫ দিন এ অবরোধ অব্যাহত থাকে। এরপর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর সুপারিশক্রমে অবরোধ তুলে নেয়া হয়। তবে সিদ্ধান্ত হয় বনু কায়নুকা গোত্রের লোকজনকে মদীনা ত্যাগ করতে হবে। সে মোতাবেক তারা মদীনা ত্যাগ করে [নির্বাসিত হয়ে] আযরুয়াতের দিকে চলে যায়।

এ অভিযান শুরু করার মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ [সা] বশীর ইবনে আবদুল মুনযেরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।

www.pathagar.com

এ অভিযানকে কেন্দ্র করেই উবাদা ইবন ছাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কেই সূরা মায়িদায় নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতগুলো নাযিল হয়–

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের কখনো বন্ধু ও মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না। ওরা পরস্পরের মিত্র। তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তাদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবে সে তাদেরই দলভুক্ত গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদের সুপথ দেখান না। যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদেরকে তুমি দেখতে পাবে ইহুদী ও খৃস্টানদের ব্যাপার নিয়ে ছুটোছুটি করে আর বলে: আমাদের আশংকা হয়, আমাদের ওপর বিপদ মুসিবত এসে পড়ে কিনা। আল্লাহ তো বিজয় দিতে পারেন কিংবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোন ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারেন। তখন তারা মনের ভেতর লুকানো ব্যাপার নিয়ে অনুতপ্ত হবে। মুমিনরা বলে: এই নাকি কসম খেয়ে লম্বা লম্বা বুলি আড়ানো সেই লোকদের অবস্থা যারা বলে যে, তারা তোমাদের সাথেই রয়েছে। তাদের সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে গেছে। ফলে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য হতে যদি কেউ তার দীন ত্যাগ করে, তাহলে সেদিন বেশি দূরে না যখন আল্লাহ এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটাবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, যারা মুমিনদের প্রতি বিনয়ী এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কারো নিন্দা বা তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এরূপ দৃঢ় হতে পারাটা আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। যাকে তিনি দিতে চান, এ অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন। বস্তুত আল্লাহ বর্ব্যত্র বিরাজিত সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু ও মিত্র তো একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেই সব মুমিন যারা নামাযী, যাকাত দাতা এবং আল্লাহর অনুগত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবে সে আল্লাহর দলভুক্ত হবে এবং তার জেনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহর দলই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে থাকে।'

যায়িদ ইবনে হারিছার আল কারাদা অভিযান : নজদের একটি জলাশয়ের নাম আল কারাদা। বদরের ঘটনার পর কোরাইশরা সিরিয়ার যাওয়ার জন্য এত যাবৎকালের প্রচলিত পথ ত্যাগ করে ইরাকের পথে রওনা হয়। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত এ বাণিজ্য কাফেলায় অনেক মূল্যবান রসদ এমনকি প্রচুর পরিমাণে রূপা ছিল। তাদের এ নতুন পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বনু বকর ইবনে ওয়ায়িনের ফুরাত ইবনে হাইয়ান। তাকে কোরাইশরা ভাড়া করেছিল।

রাসূলুল্লাহ [সা] যায়িদ ইবনে হারিসা [রা] কে আমীর করে কোরাইশ কাফিলাকে আক্রমণ করার জন্য পাঠালেন। কারাদায় গিয়ে এ বাহিনী কোরাইশ কাফেলাকে ধরে ফেললে। মুসলিম বাহিনীকে দেখেই কোরাইশরা মাল সামান ফেলে পালিয়ে যায়। ফলে কোন সংঘর্ষ ছাড়াই পণ্য সম্ভার মুসলমানদের দখলে চলে আসে। সবকিছু নিয়ে যায়িদ [রা] রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে হাজির হন।

চিরাচরিত রাস্তা ছেড়ে ইরাক হয়ে সিরিয়ায় যাওয়ার পথ ধরায় কবি হাসান ইবনে ছাবিত [রা] কোরাইশদেরকে উপহাস করে নিম্নোক্ত কবিতা লিখেন–

দামাসকাসের নদীকে বিদায় জানাতে পারো হে, কারণ

www.pathagar.com

মাঝ খানে আছ তরবারি, আরাক বৃক্ষ খাদক গর্ববর্তী উটের মুখের মত,
আল্লাহ্ রাহে যাওয়া মানুষের হাতে,
তাঁর প্রকৃত সাহায্যকারী এবং ফেরেশতাদের হাতে।
মরু উপত্যকা থেকে নিচের দিকে গেলেই
তাদের বলো, এখানে কোন রাস্তা নেই।

কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা : কাব ইবনে আশরাফ নামে মদীনায় প্রসিদ্ধ একজন কবি ছিল। তার পিতা আশরাফ ছিল তায় গোত্রীয় আরব। আর তার মাতা ছিল বনী নযীর গোত্রের। য়াহুদীদের প্রধান নেতা আবূ রাফি ছিল কাব ইবনে আশরাফের নানা। অর্থাৎ কাব-এর পিতৃকুল ছিল আরব আর মাতৃকুল ছিল ইয়াহুদী। যে কারণে উভয় দলের সাথে কাব ইবনে আশরাফের ভালো সম্পর্ক ছিল। তা'ছাড়া সে ছিল নামকরা কবি, সাথে সাথে ধন্যাঢ্য একজন ব্যক্তি। ফলে সব মিলিয়ে সে ইয়াহুদীদের একচ্ছত্র নেতা হয়ে বসে। সে ছিল কট্টর ইসলাম বিরোধী। রাসূলুল্লাহ [সা] ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দিন রাত সে বিষোধগার করতো। এমনকি মুসলিম মহিলাদের চরিত্র হননমূলক কবিতা রচনা করে তা প্রচার করতো– সাথে সাথে সে প্রেম নিবেদন করেও কবিতা লিখতো। বিশেষ করে বদর যুদ্ধের পরে সে মক্কায় গিয়ে কোরাইমদেরকে রাসূলুল্লাহ [সা] ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে রাসূলুল্লাহ [সা] সহ সাহাবীরা তার প্রতি প্রচণ্ড রুষ্ট হয়। এ সময় আউশ বংশীয় আনসারী সাহাবী মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা [রা] রাসূলুল্লাহ [সা]-কে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ [সা]! এই শয়তানকে হত্যা করার অনুমতি দিন।' এই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁকে অনুমতি দেন।

এরপর মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা [রা] তাঁর সগোত্রীয় আরও চারজন সাহাবী– আবূ নায়িলা, হারিস ইবনে আওস, আবূ আবস্ ও আব্বাস ইবনে বিশারকে সাথে নিয়ে গভীর রাতে কাব ইবনে আশরাফের মহলে গমন করেন এবং কৌশলে তাকে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে এসে হত্যা করেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, 'চাঁদনী রাতের শেষ প্রহরে তারা কাবকে হত্যার উদ্দেশে গিয়েছিলেন। কাজ শেষ করে যখন তারা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁরা তাঁকে তাহাজ্জুদ নামাযে দণ্ডায়মান দেখেন। তিনি নামায শেষ করে তাঁদের জন্য দোয়া করেন। এমন কি হারেস বিন আওসের গায়ে তাঁর বন্ধুদের তলোয়ার লেগে যাওয়ায় সামান্য যখম হয়, রাসূল [সা] সেখানে থু-থু লাগিয়ে দিলে তিনি সাথে সাথে সুস্থ হয়ে যান। ভোরবেলা ইহুদীরা কাব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পরস্পরে আলোচনা করতে থাকে।' [সীরাতে ইবনে কাছীর, পৃ. ৫৫]

ওহুদ যুদ্ধ : তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে মদীনার উপকণ্ঠে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতেই কোরাইশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে 'আইনাইন' নামক স্থানে একত্রিত হয়। এ বাহিনীর মনোরঞ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক মহিলাও সাথে নেয়া হয়।

www.pathagar.com

কোরাইশদের তিনহাজার সৈন্যের মধ্যে ৭০০ জন ছিল বর্মধারী, ২০০ জন ছিল ঘোড়সওয়ার। অন্যদিকে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা প্রথমে এক হাজার থাকলেও পরবর্তীতে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ৩০০ জনকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ৭০০ জন ছিল মুসলিম সৈন্য। এর মধ্যে ৭০ জন ছিলেন বর্মধারী, ২ জন ঘোড়সওয়ার এবং ৫০ জন ছিলেন তীরন্দাজ।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মনের ইচ্ছে ছিল মদীনায় অবস্থান করেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও তেমনই মতামত দেয়। কিন্তু বেশীর ভাগ সাহাবী মদীনার বাইরে গিয়েই কোরাইশদের মুখোমুখি হওয়ার পক্ষে থাকাই শেষ পর্যন্ত মদীনার বাইরে যেতে হয়। সাহাবীরা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, শত্রুর মুকাবিলার জন্য আমাদেরকে মদীনার বাইরে নিয়ে চলুন। ওরা যেন মনে করতে না পারে যে, আমরা দুর্বল কিংবা কাপুরুষ হয়ে গেছি।'

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ [সা] মুসলমানদেরকে বলেছিলেন, 'আমি একটি ভাল স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, আমার একটি গরু জবাই করা হয়েছে। আর আমার তরবারীর ধারালো প্রান্তে যেন ফাটল ধরেছে। আরো দেখলাম, আমি একটা সুরক্ষিত বর্মের ভেতরে হাত ঢুকিয়েছি। এই বর্ম দ্বারা আমি মদীনাকে বুঝেছি। তোমরা যদি মনে কর, মদীনায় অবস্থান করবে এবং কোরাইশরা যেখানে অবস্থান নিয়েছে, সেখান থাকাকালেই তাদেরকে যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দেবে, তাহলে সেটা করতে পার। তারপরও যদি ওরা ওখানেই অবস্থান করে তাহলে তা তাদের জন্য খুবই খারাপ অবস্থান বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে মদীনায় বসেই আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।' [সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ১৭৫]

যাহোক ৬ শওয়াল তারিখে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। যুদ্ধে জয় পরাজয় স্পষ্ট নীর্নিত হয়নি। মুসলমানদের ৭০ জন শহীদ হন। এর মধ্যে হযরত হামজা [রা] ও মুসাব [রা] অন্যতম। রাসূলুল্লাহ [সা] মারাত্মকভাবে আহত হন এমনকি তাঁর দু'টি দাঁত ভেঙ্গে যায়। অপর পাশে কোরাইশদের ৩১ জন নিহত হয়।

মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ [সা]। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানদের পতাকা বহন করেন মুসাব বিন উমাইর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আলী ইবনে আবু তালিব।

যুদ্ধ যাত্রার সময়ে রাসূলুল্লাহ [সা] আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করে যান।

হামরাউল আসাদ অভিযান : রাসূলূল্লাহ [সা] ওহুদ যুদ্ধের পরের দিন ভোরে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে নিয়ে মদীনা থেকে মোশরেকদের পিছু ধাওয়া করেন এবং মক্কা শরীফের দিকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌছে যান। এখানে পৌছে এ বাহিনী মোয়াবিয়া ইবনে মুগীরা ইবনে আবিল আসকে ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন। এ ব্যক্তি ছিলো আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের মা আয়েশার পিতা।

হামরাউল আসাদ-এ নাযিল হয় সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত–

www.pathagar.com

'[ওহুদের এতো বড়] আঘাত আসার পরও যারা [আবার] আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরো যারা নেক কাজ করেছে, [সর্বোপরি] সর্বদা যারা আল্লাহ ভয় করে চলেছে, এদের সবার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। [আলে ইমরান : ১৭২]

রাজীর ঘটনা : ওহুদ যুদ্ধের পর হিজরী ৮২০ সনের সফর মাসে আজাল ও কারাহ গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ [সা] কাছে এসে বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কাজেই আপনার সহচরদের মধ্য থেকে একটি দলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে ইসলামের বিস্তারিত বিধান শিক্ষা দেবে ও কুরআন পড়াবে।'

রাসূলুল্লাহ [সা] সরল বিশ্বাসে তাদের সাথে ৬ জনের একটি দলকে মতান্তরে দশ জনের একটি দলকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য ৬ জনের নাম ইবনে হিশাম উল্লেখ করেছেন– মুরসাদ ইবনে আবু মুরসাদ, খালিদ ইবনে বুকাইর, আসিম ইবনে সাবিত, খুবাইব ইবনে আদী, যায়িদ ইবনুদ দাসিনা ও আবদুল্লাহ ইবনে তারিক। এদের মধ্যে আমীর মনোনীত হয়েছিলেন মুরসাদ ইবনে আবু মুরসাদ।

কিন্তু এ দলটি যখন 'রাজী' নামক স্থানে পৌছলে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে ইবনে কাছীর লিখেছেন–

'এটা হেজাযের দিকে হোযায়ল গোত্রের একটি কূপের নাম, একে 'হাদআহ' বলা হয়, এখানে পৌছে আযাল ও কাররা গোত্রের যেসব লোক সাহাবায়ে কেরামের এ দেলের সাথে ছিলো, তারা সাহাবায়ে কেরামের এ দলের ওপর হামলা চালাতে হোযায়ল গোত্রের লোকদের আহবান জানায়। তারা এসে সাহাবায়ে কেরামকে ঘিরে ফেলে এবং হযরত খোবায়ব বিন আদী ও যায়দ বিন দাসেনা [রা] ব্যতীত বাকী আট জনকে হত্যা করে ফেলে। জীবিত দু'জনকে কয়েদ করা হয়। তারা এ দু'জনকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে তথাকার মোশরেকদের কাছে বেচে দেয়।' [সীরাতে ইবনে কাছীর, পৃ. ৬৩]

পরবর্তীতে বাকী দু'জনকে ক্রেতারা নির্মমভাবে হত্যা করে।

হযরত খুবাইর [রা]-এর জন্য কবি হাস্সান ইবনে সাবিত শোক প্রকাশ করে কবিতা লিখেন–

'তোমার চোখের কি হলো যে, অশ্রু থাকছেই না
বুকের ওপর দিয়ে অবিরত ধারায় গড়িয়ে চলেছে মুক্তের মত
খুবাইরের শোকে– যিনি সেই যুবকদের অন্যতম যারা জেনেছে,
তাঁর [আল্লাহর] সাথে যখন তুমি মিলিত হবে তখন ব্যর্থতা কিংবা
অস্থিরতা থাকবে না।
অতএব, হে খুবাইর, তুমি চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিন।
তোমার সাথীদের সাথে হুরদের সাহচর্যে চিরন্তন জান্নাতে বসবাস কর।

www.pathagar.com

তোমরা কি জবাব দেবে যদি নবী তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন [হে কুরাইশ]
যখন পুণ্যবান ফেরেশতারা চক্রবালে সমবেত থাকবে,
কিসের বদলায় আল্লাহর সাক্ষীকে তোমরা হত্যা করলে?
একজন খোদাদ্রোহী সুবিধাবাদী ও দেশে উৎপাত সৃষ্টিকারী লোকেরা বদলায়?

[উল্লেখ্য যে, বদর যুদ্ধে হারেসকে খুবাইব [রা] হত্যা করেছিলেন]

বীরে মাউনার ঘটনা : ওহুদ যুদ্ধের চার মাস পর সফর মাসে বীরে মাউনার ঘটনা ঘটে। বর্শা খেলায় পারদর্শী [মলায়িবুল আসিন্নাহ] আবু বারা আমের ইবনে মালিক ইবনে জাফর মদীনায় আসে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাথে দেখা করতে। তাকে রাসূলুল্লাহ [সা] ইসলাম কবুলের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে হ্যাঁ না কিছুই না বলে বললো, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নাজদবাসীর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তারা তাদেরকে আপনার দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেন, আমার মনে হয়, তাহলে তারা আপনার দীন গ্রহণ করবে।' উত্তরে রাসূল [সা] বললেন, 'নাজদবাসী তাদের ক্ষতি করতে পারে বলে আমার আশংকা হয়।' এর প্রেক্ষিতে আবু বারা বললো, 'আমি তাদের নিরাপত্তার জিম্মাদার। আপনি তাদেরকে পাঠিয়ে দিন। তারা জনগণকে আপনার দীনের দিকে দাওয়াত দিক।' আবু বারার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে বনু সায়েদা গোত্রের বিশিষ্ট সাহাবী মোনযের ইবনে আমরের নেতৃত্বে ইবনে ইসহাকের মতে ৪০ জন, বোখারীর বর্ণনানুযায়ী ৭০ জন সাহাবীকে তার সাথে নজদে পাঠান। এদের মধ্যে বিশিষ্ট কারী, নেতৃত্বশীল বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন। এরা সবাই ছিলেন আসহাবে সুফফার সদস্য। এ দলটি রওনা হয়ে বনু সুলায়মের নিকটবর্তী জলাশয় বীরে মাউনাতে গিয়ে অবস্থান নেয়।

এ সময় 'ইসলামের কট্টর দুশমন আমের ইবনে তুফাইলের নিকট রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চিঠি নিয়ে গেলেন হারাম ইবনে মিলহান [রা]। তিনি যখন তার কাছে উপস্থিত হলেন, তখন সে চিঠির দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে হারাম ইবনে মিলহানকে হত্যা করলো। তারপর বাদবাকি সাহাবীদেরকেও খতম করার জন্য সে বনু আমেরের সাহায্য চাইল। কিন্তু বনু আমের তার অনুরোধ এই বলে প্রত্যাখ্যান করলো যে, 'আমরা বনু বারার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চাই না। আবু বারা তাদের নিরপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে।' আমের অগত্যা সুলাইমের কয়েকটি উপগোত্রের সাহায্য চাইল। তারা সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হলো এবং তাদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেললো। সাহাবাগণ তাদেরকে দেখে তরবারী হাতে নিলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হলেন। শুধু কা'ব ইবন যায়িদ রক্ষা পেলেন। কাফিররা তাঁকে মৃত মনে করে ফেলে রেখে যায়। অথচ তিনি বেঁচে ছিলেন। অনেক রক্তপাতের দরুন দুর্বল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিহতদের স্তূপের মধ্য থেকে প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে যান এবং পরে খন্দকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।' [সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ২০০]

'এছাড়া আরো দু'জন সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া যামরী এবং মোনযের ইবনে ওকবা ইবনে আমের [রা] ঘটনাস্থালের কাছেই উট চরাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে চড়ুই পাখির দল

www.pathagar.com

উড়তে দেখে তারা সোজা সেখানে গমন করেন। হযরত মোনযের [রা] সেখানে নিজের বন্ধুদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করে শহীদ এবং আমর ইবনে উমাইয়া যামরী বন্দী হন। যখন শত্রুদের জানানো হলো, আমরের সম্পর্ক মোযার গোত্রের সাথে, তখন আমের তার চেহারার কেশরাজি কেটে তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে মুক্ত করে দেয়। তার মায়ের একজনকে স্বাধীন করে দেয়ার মানত ছিলো।' [সীরাতে ইবনে কাছীর, পৃ. ৬৫]

ফিরে আসার সময় আমর ইবনে উমাইয়া [রা] ওয়াদিয়ে কানাতের শেষ মাথায় অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌঁছে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি সেখানে বনি কেলারের দু'জন লোককে বিশ্রাম নিতে দেখেন। এক পর্যায়ে লোক দু'জন ঘুমিয়ে পড়লে আমর তাদেরকে হত্যা করেন। অথচ এ দু'জনের কাছে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার অংগীকার পত্র ছিল, বিষয়টি আমর [রা] জানতেন না। মদীনায় ফিরে এ বিষয়টি তিনি যখন রাসূলুল্লাহ [সা] জানান তখন তিনি বললেন, 'তুমি এমন দু'ব্যক্তিকে হত্যা করলে যাদের রক্তমূল্য অবশ্যই আমাকে আদায় করতে হবে।'

বনু নযীর অভিযান : আমর [রা] বনু কেলাবের যে দু'জন লোককে হত্যা করেছিলেন তাদের রক্তপণ আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ [সা] স্বয়ং বনু নযীরের মহল্লায় হাজির হন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর [রা], ওমর [রা], আলী [রা] সহ আরও কয়েকজন। তাঁরা ইহুদীদের এক দেয়ালের নীচে বসে পড়েন। প্রথমে ইহুদীরা চুক্তির শর্তানুযায়ী বিষয়টির ফয়সালা করতে সম্মত হলেও পরবর্তীতে ষড়যন্ত্র করে রাসূলুল্লাহ [সা] কে হত্যা করার। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ [সা] বিষয়টি জানতে পেরে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে মদীনায় চলে আসেন।

ইহুদীরা সলাপরামর্শ করে বলে, 'কে আছ যে পাশের ঘরের ছাদে উঠে বড় একটা পাথর মুহাম্মদের ওপর গড়িয়ে দিতে পারবে এবং তার কবল থেকে আমাদেরকে রেহাই দেবে?'

এ প্রস্তবের প্রেক্ষিতে বনু নযীরের আমর ইবনে জাহাশ ইবনে কা'ব নামক এক ব্যক্তি প্রস্তুত হয়ে ওই ঘরের ছাদে উঠে পড়ে।

এরপর রাসূলুল্লাহ [সা] ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহবান জানান এবং আবদুল্লাহ উম্মে মাকতুমকে মদীনায় গভর্ণর নিযুক্ত করে নিজেও বেরিয়ে পড়েন। এ ঘটনা ঘটে রবিউল আউয়াল মাসে। বনু নযীরকে মুসলিম বাহিনী ছয় রাত অবরোধ করে রাখেন। পরে বনু নযিরের প্রস্তাব মত তাদের মদীনা থেকে বহিস্কার করা হয়। এদের মধ্যে কিছু খায়বরে কিছু সিরিয়া চলে যায়। যাওয়ার সময় তাবা উটের পিঠে যতটুকু সহায় সম্পদ নেয়া সম্ভব ততটুকু নেয়ার অনুমতি পেয়েছিল। এ সম্পদের মধ্যে কোন অস্ত্রপাতি ছিল না।

যাতুর রিকা অভিযান : চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ [সা] মোহারেব ও বনু সালাবা বিন সাদ গাতফান গোত্রসমূহ অভিমুখে গমন করেন এবং নাখলে পৌঁছে গাতফান গোত্রের একটি দলের কাছে এসে শিবির স্থাপন করেন। এ অভিযানই যাতুর রিকা অভিযান। এখানে কোনো লড়াইয়ের ঘটনা ঘটেনি। ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য

www.pathagar.com

সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে রাসূলুল্লাহ [সা] সালাতুল খাওফ বা ভীতিকালীন নামায আদায় করেন।

এ অভিযানে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ [সা] হযরত আবু যর গেফারী [রা] কে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

বদরে সোগরা অভিযান : ওহুদ যুদ্ধের আবু সুফিয়ান চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, 'আমাদের পরবর্তী মোকাবেলা আগামী বছর বদর প্রান্তরে হবে।' চতুর্থ হিজরীর শাবান মাসে সে মোতাবেক রাসূলুল্লাহ [সা] বদর অভিযানে বের হন এবং সেখানে গিয়ে শিবির স্থাপন করে আট দিন আট রাত শত্রুর জন্য অপেক্ষা করেন। সেখানে যুদ্ধ হয়নি। অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে মদীনার ফিরে আসেন।

আবু সুফিয়ান তার দলবল নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে 'মাজনা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করে। এরপর আর আগ্রসর না সে সাথীদেরকে বলে, 'হে কুরাইশগণ, তোমাদের জন্য যুদ্ধ করা কেবল ভালো ফসল ফলার বছরেই শোভা পায়, যখন তোমরা তোমাদের গাছপালার তত্ত্বাবধান করতে পারবে এবং দুধ পান করতে পারবে। কিন্তু এটা তো অজন্মার বছর। আমি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমারা ফিরে চলো।' কুরাইশরা তার কথায় ফিরে গেল। এজন্য মক্কাবাসী তাদেরকে উপহাস করে বলতো, 'তোমরা তো শুধু ছাতু খেতে খেতে লড়াইয়ে গিয়েছিলে।' এমনকি তারা এ বাহিনীর নাম দেয় 'ছাতুখোর বাহিনী।'

এ অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ [সা] মদীনার শাসনভার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাহওয়ার কাছে বুঝিয়ে দেন।

দুমাতুল জানদাল অভিযানঃ রাসূলুল্লাহ [সা] পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে 'দুমাতুল জানদাল' অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দুমাতুল জানদাল পৌঁছানোর আগেই তিনি পথ থেকে মদীনার ফিরে আসেন। এ অভিযানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

উল্লেখ যে এ অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ [সা] মদীনার শাসনভার হযরত সেবা ইবনে উরফুতা গেফারী [রা]-এর হাতে দিয়ে যান।

খন্দক যুদ্ধঃ পঞ্চম হিজরীর সাওয়াল মাসে খন্দকের বা পরিখার বা আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের নেতৃত্বে সমগ্র আরবের ইসলাম বিরোধী যৌথবাহিনী অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কাফের বাহিনীর প্রস্তুতি ও রওয়ানা হওয়ার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ [সা] বিশিষ্ট সাহাবী সালমান ফারসী [রা]-এর পরামর্শ মত মদীনার তিনদিকের উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিখা খনন করেন। প্রতি দশ জনের এক একটি ক্ষুদ্র দল ৪০ হাত দীর্ঘ একটি করে পরিখা খনন করেন। মোট ৩০০ টি ক্ষুদ্র দল বার হাজার হাত অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন মাইল পরীক্ষা দ্রুত খনন করে ফেলেন।

শত্রু বাহিনী দ্রুত মদীনায় প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে এসে পরিখার কাছে থমকে যায়। বিস্মিত কোরাইশ বাহিনী দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ধীর্ঘদিন এ অবরোধ বজায় রাখে। তারা আল্লাহর আযাবেরও মুখোমুখি হয়। 'মুশরিকদিগের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইল এবং

www.pathagar.com

তাহারা দ্বিধা বিভক্ত হইল। অপর দিকে শীতের স্বচ্ছ আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। শুরু হইল প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়। মরু ঝটিকা তাহাদের সমুদয় ছাউনি উড়াইয়া লাইয়া গেল। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে তাহারা কাবু হইয়া পড়িল। এমনিভাবে আল্লাহর সুস্পষ্ট শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইল।' [সীরাত বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৭৮]

এ বিষয়ে ইরশাদ হচ্ছে- 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখনি' [৩৩ : ৯]

দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কুরাইশরা রুমা নামক স্থানে জুরুফ ও মুগাবার মধ্যবর্তী মুজতামাউল আসইয়ালে অবস্থানে নেয়। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ [সা] তিন হাজার সৈন্য নিয়ে 'সালা' নামক পাহাড়কে পেছনে রেখে অবস্থান নেয়। দুই পক্ষের মাঝে ছিল পরিখা। তেমন কোন সংঘর্ষ হয়নি। বিক্ষিপ্ত ঘটনায় শত্রুদের তীর ও তলোয়ারের আঘাতে মুসলমানদের পক্ষে ৬ জন শাহাদত লাভ করেন। এরা হলেন- আওস গোত্রের দলপতি বিশিষ্ট সাহাবী সা'দ ইবনে মুয়ায [রা], আবদুল্লাহ ইবনে সাহল [রা], আনাস ইবন উরায়স [রা], কাব ইবনে যায়দ [রা], ছালাবা ইবনে গান্‌ম [রা], এবং তুফায়ল ইবনে নুমান [রা]। অপর পক্ষে কোরাইশদের তিনজন নিহত হয়। এরা হল- নাওফেল ইবনে আবদুল্লাহ, আমর ইবনে আবদে উদ্দ্ এবং মুনাবিহ্ ইবনে উবায়দ।

শত্রু বাহিনী শেষ পর্যন্ত রণেভঙ্গ দেয় এবং পাততাড়ি গুটিয়ে সট্‌কে পড়ে। মুসলিম বাহিনী পূর্ণ বিজয় লাভ করে।

অবরোধকালীন সময়ে নারী ও শিশুদেরকে মদীনার দুর্গে রাখা হয়েছিল। আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের ওপর ছিল গভর্ণরের দায়িত্ব। কাফের কোরাইশ বাহিনীর পক্ষে এটাই ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত আক্রমণ। এরপর তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

বনু কুরাইযা অভিযান : রাসূলুল্লাহ [সা] ৫ম হিজরীর জিলকদ মাসে বনু কুরায়জা অভিযানে বের হন। খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কেবলমাত্র রাসূলুল্লহ [সা] অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন। ঠিক এ সময়ে জিবরাঈল [আ] এসে রাসূলুল্লাহ [সা] কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। জিবরাঈল [আ] বললেন, আমরা ফেরেশতাগণ এখনও অস্ত্র পরিত্যাগ করিনি। আমরা তো মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে হামরাউল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম [আল-বিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৯-১২০]। একটা কওমের সন্ধানেই এখন আবার ফিরে আসলাম। আল্লাহ আপনাকে বানু কুরায়যা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি আমার সহযাত্রী ফেরেশতাদের নিয়ে আপনার আগেই সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছি যাতে তাদের ভেতর অস্থিরতা ও ভীতি সৃষ্টি করতে পারি। আপনি আপনার সহচরদের নিয়ে দ্রুত বের হয়ে পড়ুন' [ইবন হিশাম, ৩ খণ্ড, পৃ. ১৪৫]।

সুতরাং দেরি না করে রাসূলুল্লাহ [সা] বেলাল [রা] কে মুসলিম মুজাহিদদের খবর দিতে

www.pathagar.com

বলেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা দিতে এবং বানু কুরারযায় পৌঁছে আছরের সালাত আদায় করতে। রাসূলুল্লাহ [সা] ও প্রস্তুত হয়ে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং আন্না নামক কূপের কাছে এসে তাঁবু গাড়েন। মুসলমানরা দলে দলে এসে তাঁর সাথে মিলিত হতে লাগলেন। এ যুদ্ধে মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন হযরত আলী [রা]।

বনু কুরায়যা গোত্রকে ২৫ দিন একাধারে মুসলিম বাহিনী অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে তারা আত্মসমর্পণ করে এবং স্ব-গোত্রীয় সা'দ ইবন মু'আয [রা] কে বিচারক মানে। সা'দ [রা]র ফয়সালা মোতাবেক বনু কুরায়যার সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা হয়। আর মহিলাদের মধ্যে শুধু মাত্র 'বুনানা' নামক একজন মহিলাকে হত্যা করা হয়। কারণ ওই মহিলা চাকতি নিক্ষেপ করে খালিদ ইবনে সুওয়ায়দ [রা] নামক একজন সাহাবীকে শহীদ করে।

এ যুদ্ধের সময় মদীনার শাসক নিযুক্ত হন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম।

আবদুল্লাহ ইবনে আতিকের অভিযান : রাসূলুল্লাহ [সা] ও আল্লাহর দুশ্মন কাব ইবনে আশরাফকে আওস গোত্রের লোকেরা বদর যুদ্ধের পর হত্যা করে। খাযরাজ গোত্রের লোকেরা সওয়াবের দিক থেকে আওস গোত্রের সমপর্যায়ে ওঠার জন্য রাসূলুল্লাহ [সা]-এর অপর দুশমন আবু রাফে সাল্লামকে হত্যা করতে উৎসাহী হয়। মোট পাঁচ জন এ অভিযানে অংশ নেয়। এরা হলেন– আবদুল্লাহ ইবনে আতিক, মাসুদ ইবনে সিনান, আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স, আবু কাতাদা আল হারিছ ইবনে রিবি এবং খুজাই ইবনে আসওয়াদ। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আতিককে রাসূলুল্লাহ [সা] দলনেতা নির্বাচন করেন। তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ [সা] নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। এ বাহিনী সোজা খায়বার গিয়ে আবু রাফের দূর্গে প্রবেশ করে তাকে উপর্যুপরি তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে। উক্ত পাঁচ জনই আবু রাফের শরীরে তলোয়ারের আঘাত হানে। যে কারণে মদীনায় ফিরে তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে আবু রাফেকে হত্যার দাবী করছিলেন।

এ অবস্থায় সবার তরবারি পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ [সা] আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স [রা]-এর পক্ষে রায় দেন। কারণ তার তরবারির গায়ে খাদ্যের চিহ্ন ছিল।

কবি হাসান ইবনে [রা] কা'ব ও সাল্লাম হত্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন–

কি চমৎকার এক দলের সঙ্গে তোমাদের দেখা হলো
হে ইবনুল হুকায়ক, হে ইবনুল আশরাফ।
ধারাল তরবারি নিয়ে তোমার কাছে গেলো
ঘণ ঝোঁপে সিংহের মতো তাদের প্রতাপ,
এলো তারা তোমার ঘরে
তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে তোমাকে পান করালে মৃত্যু

www.pathagar.com

তাদের রসূলের ধর্মের বিজয়ের জন্য
আঘাতে ঝুঁকিকে ভ্রুক্ষেপ না করে।

বনু লিহ্ইয়ান অভিযান : ষষ্ঠ হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ [সা] রাজী যুদ্ধে শহীদ সাহাবীদের প্রতিশোধ নিতে লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। 'তিনি এমনভাবে বের হন যে, মনে হচ্ছিল তিনি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছেন। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজীবাসীর ওপর আক্রমণ চালানো। মদীনা থেকে বের হয়ে তিনি মদীনার পার্শ্ববর্তী পাহাড় গুরাব হয়ে সিরিয়া গামী রাস্তা ধরে প্রথমে মাখীদ, তারপর বাতরা গমন করেন। সেখান থেকে বাম দিকে মোড় নিয়ে মদীনার অদূরবর্তী সমভূমি 'বীনের ওপর দিয়ে ইয়ামাম পর্বতমালা অতিক্রম করে মক্কাগামী রাস্তা ধরে অগ্রসর হলেন। এরপর ক্ষিপ্রগতিতে বনু লিহ্ইয়ানের আবাসভূমি 'গুরান' পৌছেন। গুরান হলো আমাজ ও উসফানের মধ্যবর্তী সমভূমি যা 'সায়া' নামক অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। গুরান গিয়ে দেখলেন, তারা আগে ভাগেই সাবধান হয়ে নিরাপত্তার জন্য পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ [সা] গুরানে শিবির স্থাপন করলেন।' [সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ. ২৩১]

এত সতকর্তা সত্ত্বেও অতর্কিতে আক্রমণ বানচাল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, 'আমরা যদি উসফানে শিবির স্থাপন করি তাহলে মক্কাবাসী মনে করবে আমরা মক্কা যাচ্ছি।' সে মোতবেক তিনি দু'শ ঘোড় সওয়ার নিয়ে উসফানে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। এরপর কুরাউল গুমাইমে দু'জন অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে নিজে সমগ্র বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরলেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ [রা] বর্ণনা করেন, ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। আমি তওবাকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই সফরের দুঃখ কষ্ট থেকে এবং পরিবার-পরিজন ও ধন সম্পদের ক্ষতি থেকে।'

যী কারাদ অভিযান : ষষ্ঠ হিমরীর রবিউল আওয়াল মাসে একদল গাতফান অশ্বারোহী গাবা অঞ্চলের চারণভূমিতে বিচরণরত রাসূলুল্লাহ [সা]-এর উটপালের উপর অক্রমণ করে এবং সেগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা আবু যর গিফারী [রা]-এর পুত্রকে হত্যা করে এবং তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে য়ায়। গাতফানী অশ্বারোহী দলের নেতা ছিল উয়ায়না ইবনে হিস্‌ন আল-ফাযারী। এ সংবাদ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ [সা] ৫০০ সৈন্যের একবাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং যু কারদ পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যান। মুসলিম সৈন্যরা উট পাল ফিরিয়ে আনেন। এ যুদ্ধে সাহসিকতা ও যুদ্ধ কুশলতার সাক্ষর রাখেন সালাম ইবনুল আকওয়া [রা]। মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহি ছিলেন মিকদাদ ইবনে আমের [রা]।

বনু মসতালেক যুদ্ধ : রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে খবর পৌছে যে বনু মুসতালিকের সর্দার হারেস ইবনে আবু দিরারের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে। এ সংবাদের প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ [সা] ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে বনু মুসতালিকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। কোদায়দ নামক স্থানে 'মুরাইসী' নামক ঝর্ণার তীরে দু'দলে

www.pathagar.com

ভীষণ যুদ্ধ হয়। বনু মুস্তালিক পরাজিত হয় এবং তাদের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদ মুসলমানদের করতলগত হয়। শত্রু পক্ষের মনে করে উবাদা ইবনে সামিতের [রা] দলভুক্ত জনৈক আনসারী সাহাবী ভুলক্রমে বনু কালব ইবন আওফ গোত্রের হিশাব ইবনে সুবাবা [রা] কে হত্যা করেন।

এ যুদ্ধে বনু মুসতালিক গোত্রের সর্দার হারেসের কন্যা জুয়াইরিয়া বন্দী হন। পরবর্তীতে তিনি মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আর এ কারণে বনু মুসতালিক গোত্রের একশ বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এরা সবাই পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করেন।

এ অভিযানের সময় আবু যর গেফারী অথবা নোমায়লা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসী [রা] মদীনার গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন। এ অভিযান কালেই ইফকের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ হযরত আয়েশা [রা]-এর নামে অপবাদ রটানো হয়, যা পরবর্তীতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এমনকি আয়েশা [রা]-এর পক্ষে আয়াত নাযিল হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি : ওমরা করার উদ্দেশ্যে হিজরী ষষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ [সা] প্রায় দেড় হাজার সঙ্গীসহ মক্কার দিকে রওনা হন। মক্কার মোশরেকরা তাঁদের আগমন প্রতিরোধ করার জন্য মক্কা নগরীর বাইরে বের হয়ে আসে। তারা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী দল পাঠায়, যে দলটি কোরাউল গামীম পর্যন্ত পৌছে। অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ [সা] ভিন্ন পথে হুদায় বিয়ায় পৌছে যান। এরপর উভয় দলের মধ্যে পত্র বিনিময় হতে থাকে, এক পর্যায়ে কাফেরদের প্রতিনিধি হিসেবে সোহায়ল ইবনে আমর হুদায় রিয়ায় আসে এবং দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ [সা] হযরত ওসমান [রা] কে মক্কায় পাঠান– এ কথা বলার জন্য যে, 'আমরা যুদ্ধ করতে আসেনি; বরং শুধুমাত্র ওমরাহ করতে এসেছি।'

ওসমান [রা] ফিরে আসার আগেই মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটে যে তাঁকে কোরাইশ কাফেররা হত্যা করেছে। ফলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, 'কোরাইশদের সাথে লড়াই না করে স্থান ত্যাগ করবো না।' এমনকি তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে একটি বৃক্ষের নিচে বসে প্রতিজ্ঞা করালেন যুদ্ধের জন্য। এটাই ইতিহাসে বাইয়াতুর রেদওয়ান হিসেবে পরিচিত।

খাইবর বিজয় : বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত ইয়াহুদীগণ খাইবর-এ এসে আস্তানা গাড়ে এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইয়াহুদীদের স্বভাজাত বিদ্বেষ ও চক্রান্ত নির্মূল করা নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ জন্যেই হুদায়রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নিয়েই সপ্তম হিজরী সনের মহরম মাসের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ [সা] খায়বর অভিযানে বের হন এবং সেখানে পৌছে যান। মুসলিম বাহিনী ইয়াহুদীদের দুর্গগুলি একের পর এক দখল করে তাদের মাল-সম্পদ হস্তগত করেন। খায়বর পূর্ণ বিজয়ের পর গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বের করে

www.pathagar.com

অর্ধাংশ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করেন দেন। বাকি অর্ধাংশ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলে জমা রাখেন।

এ যুদ্ধের সময় নোমায়লা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসীকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

মুতার যুদ্ধ : রাসূলুল্লাহ [সা] ৮ম হিজরী সনের জমাদিউস সানী মাসে ৩০০০ সৈন্যের এক বাহিনী মুতার উদ্দেশ্যে পাঠান। সেখানকার মুসলমানদের হেফাজতের জন্যই এ যুদ্ধ যাত্রা ছিল। 'মুসলিম বাহিনী মায়ান নামক স্থান পৌছে জানতে পারেন, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এক লক্ষ সৈন্যসহ মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য এসেছে এবং তার সাথে মালেক ইবনে যাফেলা অতিরিক্ত আরো এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। আরবের খৃস্টান, লাখম, জুযাম এবং কোযায়ার বিভিন্ন গোত্র যেমন বাহরা, বাল্লা এবং বালকাইনের লোকজন তাদের সাথে রয়েছে।' [সীরাতে ইবনে কাছীর, পৃ. ৯৬]

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ [সা] যায়দ ইবনে হারেসাকে সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং বলেন, 'যদি তিনি শহীদ হয়ে যান তাহলে জাফর ইবনে আবী তালেবকে সেনাপতি নিয়োগ করা হবে, তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহকে।'

মুসলিম বাহিনী বলাকা সীমান্তের কাছে পৌছতেই হিরাক্লিয়াসের সম্মিলিত রোমক ও আরব বাহিনীর মুখোমুখি হয়। বলাকার এ জায়গাটির নাম মাসারিক। শত্রুরা আরো কাছাকাছি এলে মুসলিম বাহিনী একদিকে সরে গিয়ে মুতা নামক গ্রামে অবস্থান নেয়। এরপর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। একে একে যায়িদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ যুদ্ধ করতে করতে শহীন হন। পরবর্তীতে মুসলমানরা খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে সেনাপতি মনোনয়ন দেন, এক পর্যায়ে মুসলমানরা যুদ্ধে জয় লাভ করেন। সীরাতে ইবনে কাছীরে এ বর্ণনাটি এভাবে লেখা হইয়াছে, 'অতপর হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ [রা] পতাকা ধারণ করেন। পতাকা উঠিয়েই তিনি তুমুল লড়াই চালান। তিনি মুসলমানদের একত্রিত করেন এবং আজব এক যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করেন। অবশেষে মুসলমানরা শত্রুপক্ষ থেকে পরিত্রাণ পেলো। তাঁর নেতৃত্বে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বিজয় দান করেন। রাসূলুল্লাহ [সা] মিম্বরে দাঁড়িয়ে মসজিদে উপস্থিত লোকজনকে যুদ্ধক্ষেত্রের সামগ্রিক অবস্থা অবগত করেন। তিনি একে একে মুসলিম সেনাপতিদের শাহাদাতের সংবাদ দেন। তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরছিল।' [সীরাতে ইবনে কাছীর, পৃ. ৯৭]

এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে দশজন শহীদ হন।

মক্কা বিজয় : মাত্র এক বছর ৮ মাসের মাথায় হুদায়বিয়ায় করা সন্ধির শর্ত নানাভাবে মক্কার কাফেররা ভঙ্গ করে। যে কারণে ৮ হিজরী সনের ১০ রমজান রাসূলুল্লাহ [সা] দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিযানে রওনা হন। এ বাহিনীর মোকাবেলা করার সাহস হয়নি কাফের বাহিনীর। ফলে বিনা বাধায় ২০ রমজান মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করে এবং মক্কা জয় করেন। উজ্জা, লাত ও মানাতের তিনটি

www.pathagar.com

মন্দির যথাক্রমে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, উমর ইবনুল আস ও সাদ আশয়ারী ধ্বংস করে। ওমর [রা] কাবাকে শিরক মুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ [সা] সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন- ফলে কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানও রক্ষা পায়। তবে নয় জনের ব্যাপারে হুকুম জারি করা হয় এদেরকে কাবা শরীফের পর্দার নিচে পাওয়া গেলেও হত্যা করা হবে। তারা হলো- ১. আবদুল ওযযা ইবনে খাতাল; ২. আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবী সারাহ; ৩. ইকরামা ইবনে আবু জেহেল; ৪. হারেস ইবনে নোফায়েল ইবনে ওহাব; ৫. মেকইয়াস ইবনে সুবাবা;৬. হাব্বার ইবনে আসওয়াদ; ৭. ও ৮. ইবনে আখতালের দু'জন দাসী ও ৯. সারা।

বিচ্ছিন্ন ঘটনায় এ যুদ্ধে ৩ জন মুসলমান শহীদ হন। এরা হলেন- ১. কুরয ইবনে জাবের [রা], ২. হোবায়শ ইবনে খালেদ ইবনে রবিয়া ইবনে আসলাম আল-খোযাঈ এবং ৩. সালামা ইবনে আল মায়লাউল জুহানী [রা]। আর কাফেরদের ১৩ জন নিহত হয়।

রাসূলুল্লাহ [সা] যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি ইস্পাতের তৈরি শিরস্ত্রাণ পরে ছিলেন।

মক্কা অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ [সা] আবু রোহম কুলসুম ইবনে হোসাইনকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

হুনাইনের যুদ্ধ : মক্কা বিজয়ের সংবাদ হাওয়াযেন গোত্রের লোকদের কাছে পৌছলে মালেক ইবনে আওফ আন-নাসরী গোত্রের সবাইকে একত্রিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানায়। তাদের সাথে সাফীক, বনু জুশাম, বনু সাদ ইবনে বকর এবং বনু হেলাল ইবনে আমরের বেশ কিছু লোক যোগদান করে।

হাওয়াযিনের রণ প্রস্তুতির খবর শুনে রাসূলুল্লাহ [সা] মুশরিক নেতা সাফয়ান ইবনে উমায়রের কাছ থেকে ধার হিসেবে একশ বর্ম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্ত্র ধার নেন। এমনকি সাফয়ান ইবনে উমায়র মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন।

পরে রাসূলুল্লাহ [সা] মক্কা অভিযানে অংশগ্রহণকারী দশ হাজার সৈন্য ছাড়াও মক্কা থেকে আরও দু'হাজার নওমুসলিম সৈন্য নিয়ে মোট বার হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ৮ হিজরী সনের ১০ শাওয়াল তারিখে অভিযানে বের হন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ [রা] বলেন, 'আমরা হুনাইন প্রান্তরের কাছাকাছি এলাম এবং তিহামার একটি প্রশস্ত পার্বত্য উপত্যাকার মধ্য দিয়ে নেমে যেতে লাগলাম। তখনো ভোরের আলো দেখা দেয়নি। শত্রু সেনারা আমাদের আগেই ঐ উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং সংকীর্ণ দুর্গম গিরিগুহায় ও তার আশে পাশে লুকিয়ে আমাদের জন্য ওত পেতে ছিল। তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষমান ছিল। আমরা সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে গিরিপথ দিয়ে নেমে চলেছি- এই সময় হঠাৎ তারা একযোগে আমাদের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালালো। হামলার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে আমাদের লোকেরা যে যেদিকে পারলো উঠিপড়ি করে ছুটে পালাতে লাগলো এবং একজন আর একজনের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করলো না। কারো দিকে কারো বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করার যেন ফুরসত নেই।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা] ডান দিকে সরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'হে সৈনিকেরা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমার কাছে এসো। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। কিসের জন্য উটের ওপর উট হুমড়ি খেয়ে পড়ছো?'

যুদ্ধের প্রথমে এ অবস্থা থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধের গতি পাল্টে যায় এবং মুসলমানরা জয় লাভ করে। এ যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন সৈন্য নিহত হয় এবং ১০০০ জন বন্দী হয়। আর মুসলমানদের ৪ জন সৈন্য শহীদ হন।

এ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ [সা] আত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কার শাসক নিযুক্ত করেন।

তায়েফ যুদ্ধ : 'এ যুদ্ধ মূলত হোনায়ন যুদ্ধের পরিশিষ্ট। কেননা, হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রের বেশির ভাগ পরাজিত ব্যক্তি পালিয়ে তাদের কমাণ্ডার মালেক ইবনে আওফের সাথে তায়েফে এসে এখানেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এজন্য রাসূল [সা] হোনায়ন থেকে অবসর হয়ে এবং জেয়েররানায় গনীমতের মাল একত্রিত করে অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তায়েফের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তিনি বিশ দিনেরও অধিক সময় তায়েফ অবরুদ্ধ করে রাখেন।' [জাওয়ামেউস সীরাহ, পৃ. ৩৪৩]

এ যুদ্ধে বনু সকিফ গোত্রের লোকেরা অত্যাধুনিক অস্ত্রপাতি ব্যবহার করে। অপরদিকে রাসূল [সা] তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে কামান ব্যবহার করেন। এটাই মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধে ব্যবহার করা প্রথম কামান। তায়েফবাসীরা শহরের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে যে মুসলমানেরা তার ভেতর ঢুকতে পারেনি। উপরন্তু তায়েফবাসীদের নিক্ষিপ্ত তীরে ১২ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন।

এক পর্যায়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে রাসূল [সা] তায়েফ ত্যাগ করেন।

তাবুক যুদ্ধ : 'রজব মাসের প্রথম ভাগে মদীনায় সংবাদ পৌছিল যে, রোমরাজ কায়সার মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সিরিয়া হইতে সমাগত বণিকগণ এই সংবাদের সমর্থন করিলেন। তাঁহাদিগের মুখে আরো জানা গেল যে, লাখম, জোজান, গচ্ছান প্রভৃতি খ্রিস্টান আরবগণ, নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া রোমীয় বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছে। রোম সম্রাট এজন্য পূর্ণ এক বৎসরের রণসম্ভার ও রসদাদি সঙ্গে লইয়াছেন, সৈন্যদিগকে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। ইহার অল্পদিন পরেই মুসলমানগণ জানিতে পারিলেন যে, রোমের বিরাট বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিয়াছে, তাহাদিগের অগ্রবর্তী সৈন্যদল 'বলাকা' পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।' [মোস্তফা- চরিত, পৃ. ৫৪৭]

এছাড়া হাদীস থেকে জানা যায় যে, 'আরবের খ্রিস্টানগণ রোমরাজকে লিখিয়া পাঠায় যে, আরবের যে লোকটি নবী হওয়ার দাবী করিতেছিল, সে ধবংস হইয়া গিয়াছে- অজন্মা ও মন্বন্তরের ফলে তাহাদিগের সমস্ত সম্পদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।' এর মানে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য এখন নি:শেষিত প্রায়। এখনই আক্রমণে কালক্ষেপণ করা উচিত নয়। কাফেরদের 'এই পত্র পাওয়ার পর, সম্রাট কোজাদ নামক সেনাপতির

www.pathagar.com

অধীনের চল্লিশ হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করেন।' [তিরমিযী, হাকেম, তাবরানী]

এসব সংবাদ মুসলমানদের জানা ছিল। কিন্তু সত্যি সত্যিই তখন মদীনাসহ-জজিরাতুল আরব দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নিপতিত ছিল। অনাবৃষ্টির ফলে ফসল ছিল না মাঠে, অন্যদিকে মৌসুমটা ছিল ফল পাকার। গাছ গাছালিতে যে সামান্য ফল-ফসল হয়েছিল– তা তখন উঠানোর সময়। কাঠ ফাঁটা রোদ এবং গরমে মানুষ হাস ফাঁস করছিল। সব মিলায়ে সময়টা ছিল পুরোপুরিই কোনো সফরের বিশেষ করে যুদ্ধ অভিযানের জন্য অনুপযোগী। এরপর তাবুক ছিল ৪০০ মাইলের দূরের পথ। রাসূলুল্লাহ [সা] সাধারণত যুদ্ধ অভিযানের সময় কোথায় যাওয়া হচ্ছে তা গোপন রাখতেন যুদ্ধের কৌশল হিসেবে। কিন্তু তাবুক অভিযানের বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেই সবাইকে জানিয়ে দেন। কেননা তা ছিল অনেক দূরের এবং কষ্টের সফর। শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনী রণ সাজে সজ্জিত হলো। ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ [সা] তাবুকের উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং দীর্ঘ পথ পাড়ির দিয়ে গন্তব্যে পৌছান। দু'লক্ষ রোমান সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু শত শত মাইল পথ পেরিয়ে মুসলিম বাহিনী যখন তাবুক পৌছাল– তা দেখে রোমান বাহিনী এতটাই ভয় পেল যে তারা আর যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলো না। ফলে তাবুকের আশে পাশের বিভিন্ন ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান গোত্রগুলো সন্ধির চুক্তিতে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাথে আবদ্ধ হলো। অনেকেই ইসলাম কবুল করলেন।

এ অভিযানের সময় মুনাফিকদের মুখোশ পুরোপুরিই খুলে গেল।

সওয়ারী ও পাথেয় না থাকার কারণে ৭ জন সাহাবী যুদ্ধে তাবুক অংশ নিতে পারেননি। এরা হলেন– ১. সালেম ইবনে ওমায়র; ২. উলাইয়া ইবনে যায়দ; ৩. আবু লায়লা আবদুর রহমান ইবনে কাব; ৪. আমার ইবনুল হুমাম; ৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল মোযানী; ৬. হারামী ইবনে আবদুল্লাহ এবং ৭. ইরবায ইবনে সারিয়া আল ফাযারী [রা]।

গড়িমসির কারণে ৩ জন সাহাবী যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। এরা হলেন– ১. মোরারা ইবনে রবী, ২. কাব ইবনে মালেক, এবং ৩. হেলাল ইবনে উমাইয়া। যুদ্ধ থেকে ফেরার পঞ্চাশ রাত পরে এ তিন জনের তওবা কবুল হয়। ৮০ জন মোনাফেক কুফরী ও শত্রুতার কারণে এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

রাসূলুল্লাহ [সা] নবম হিজরীর রমজান মাসে তাবুক থেকে ফিরে এসে মুনাফেকদের তৈরি করা মসজিদ 'মসজিদে যেরার' ভূমিস্মাত করে দেন। এ মসজিদ ধ্বংসে সরাসরি অংশ নেন বদরী সাহাবী হযরত মালেক ইবনে দুখশুম সালেমী [রা] এবং মা'আন ইবনে আদী অথবা তাঁর ভাই আসেম ইবনে আদী [রা]।

তাবুক গমনকালে রাসূলুল্লাহ [সা] মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে, কারো কারো মতে সেবা ইবনে উরফুতাকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

হযরত আলী [রা] কে রাসূলুল্লাহ [সা] নিজের ও তাঁর পরিবারকে দেখাশুনা করার জন্য

www.pathagar.com

মদীনায় রেখে যান। আলী (রা)'র মদীনায় অবস্থান করা নিয়ে মোনাফিকরা প্রশ্ন তুললে আলী [রা] রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন তিনি বলেন, 'মোনাফিকরা মিথ্যা বলেছে; বরং আমি তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি। সুতরাং যাও, আমার এবং তোমার পরিবার পরিজনের দেখাশোনা করো। হে আলী, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সে মর্যাদা হাসিল হোক যা মূসা [আ]-এর পরে হারুন [আ]-এর হাসিল হয়েছিলো। শুধু এতোটুকু ব্যতিক্রম, আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। অতপর হযরত আলী [রা] মদীনায় ফিরে যান।' [বোখারী]

পরিমিত সৈন্য, নিরাপত্তা, গতির দ্রুততা, আকস্মিকতা, আত্মরক্ষামূলক কাজ, গতিশীলতা, সাফল্যের জন্য সাহসিকতা, অকৃতকার্যতায় অতিরিক্ত লোকবল বৃদ্ধি, আদেশের ঐক্য, নেতৃত্বের নৈতিক সমর্থন ও সেনাবাহিনীর গুণাবলী এসব কিছুই রণকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। একজন অনুসরণীয় অনুকরণীয় সেনা নায়ক হিসেবে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সময় পরিকল্পনায় এসবগুলো তো ছিলই উপরন্ত ছিল আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস। যে কারণে তিনি বদর প্রান্তরে দু'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি অনুগ্রহ ও সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করছি। যদি আজ এ বাহিনী পরাস্ত ও নির্মূল হয়ে যায় তবে আর কেউই থাকবে না, আপনার ইবাদতের জন্য।' [বোখারী]

'প্রজ্ঞাবান সৈনিকের সাহসী পদক্ষেপ আর দয়াময় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুগ্রহ ও সাহায্যের কারণে মহানবী [সা] প্রতিটি রণক্ষেত্রে ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে প্রতিপক্ষকে চরমভাবে পরাস্ত করেছেন এবং বিজয়ের রাজটীকা অর্জন করেছেন। কেননা তাঁর রণকৌশলে মানবতার স্থান ছিল সবার উর্ধ্বে সামরিক স্থাপনা, আবাদী ভূমি, ফলবান বৃক্ষ, ধর্মগুরুগণ সহ অসহায় শিশু, অবলা নারী তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। তিনি তাঁর প্রতিনিধিদেরকে সাবধান করে বলেন দিতেন, 'জিহাদে যাও কিন্তু গণিমতের মাল খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুকে বিকলাঙ্গ করো না এবং শিশুকে হত্যা করো না।' [মুসলিম] অন্যত্র রণক্ষেত্রের শিষ্টাচার সম্পর্কে ইবনু ওমর [রা] বলেন, 'রাসূল নারী ও শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' [বুখারী-মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ [সা] ছিলেন কোমলে-কঠোরে গড়া একজন রাসূল। তিনি একাধারে ছিলেন একজন মানুষ অপরদিকে রাসূল। মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ মানুষ, রাসূল হিসেবে সমস্ত নবী-রাসূলদের সর্দার। তিনি বুঝতেন কোথায় কি প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ীই পদক্ষেপ নিতেন। যেখানে উদারতা প্রয়োজন সেখানে দেখিয়েছেন সর্বোচ্চ উদারতা, আবার যেখানে তলোয়ার প্রয়োজন সেখানে তিনি তলোয়ার দিয়েই ফয়সালা করেছেন। তবে তিনি কখনো আগে ভাগে আক্রমণ করেননি। বিরোধীদের পক্ষ থেকে পদক্ষেপের পরই তাঁর পক্ষ থেকে পাল্টা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যারা বলেন তলোয়ারে নয় উদারতায়– তারা ঠিক বলেন না। আবার যারা প্রান্তিক অবস্থানে গিয়ে বলেন উদারতা দিয়ে কিচ্ছু হবে না তারাও ঠিক বলেন না। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেয়াই হচ্ছে– মানবতার জন্য কল্যাণকর। যা রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন।■

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. সীরাতে রসূলুল্লাহ [সা]- ইবনে ইসহাক- অনুবাদ : শহীদ আখন্দ, নবধারা প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, নভেম্বর ২০০৩।

২. সীরাতে ইবনে হিশাম- অনুবাদ : আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা। দশম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০২।

৩. সীরাতে ইবনে কাছীর- অনুবাদ ও সম্পাদনা : খাদিজা আখতার রেজায়ী, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা । প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৬।

৪. মোস্তফা চরিত- মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা। অষ্টম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৫।

৫. বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

৬. সেরা জীবনের শত বিষয় : বুবুবুল সরওয়ার, ঝিঙেফুল, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১০।

৭. সীরাত বিশ্বকোষ [৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড] সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৮. হযরত মুহাম্মাদ [সা] স্মারক-২০০০ মাওলানা মুজিবুর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা ট্রাস্ট। প্রকাশকাল-২০০০।

www.pathagar.com

"নিখিল ব্যথিত অন্তরে এর আসার খবর রটে"

শফি চাকলাদার

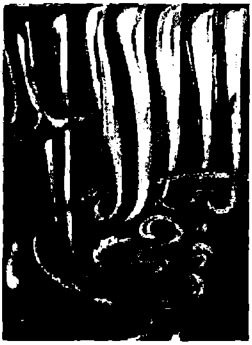

প্রিয় নবীকে [সা] নিয়ে লিখতে গিয়ে শুরুতে নজরুলের কটা লাইন উদ্ধৃত করছি–হয়্যা 'মরু ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থের 'স্বপ্ন' থেকে। কবিতাটি ৮০ লাইনের মধ্যে নজরুল তাঁর প্রিয় নবী [সা] যে ব্যথিত, উৎপীড়িতের ব্যথা-বেদনাকে দূর করতে এ বিশ্বে আগমন, মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে এ বিশ্বে আগমন–তারই একটি ছবি এ অংশে প্রকাশ করেছেন–

ব্যথিত জগৎ শুনেছে ব্যথায় যার চরণের ধ্বনি,
এতদিনে আজ বাজালরে তার বাঁশুরিয়া আগমনী!
নিখিল ব্যথিত অন্তরে এর আসার খবর রটে,
ইহারি স্বপ্ন জাগেরে নিখিল-চিত্ত-আকাশ পটে।
সারা বিশ্বের উৎপীড়িতের রোদনের ধ্বনি ধরি'
ধরনীর পথে অভিসার এর ছিল দিবা-শর্বরী।
সাগর শুকায়ে হল মরুভূমি এরি তপস্যা লাগি'
মরু-যোগী হল খর্জুর তরু ইহারি আশায় জাগি'।
লুকায়ে ছিল যে ফল্গুর ধারা মরু-বালুকার তলে
মরু-উদ্যানে বাহিরিয়ায় এর আজি ঝর্ণার ছলে।

www.pathagar.com

খর্জুর বনে এলাইয়া কেশ সিনানি সিন্ধু-জলে
রিক্তাভরণা আরব বিশ্ব-দুলালে ধরিল কোলে!

রাসূলের [সা] আগমনের পূর্বে বিশ্বে মানুষ ছিল কিন্তু মানবতা ছিল না। মানুষে মানুষে ভেদ বিভেদ অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন এ সকল অমানবিক আচরণগুলোই ছিল প্রধানতম লক্ষ্যণীয় বিষয়। ঝগড়া বিবাদ গোত্রে গোত্রে লেগেই থাকত। খুন-খারাবি ছিল নিত্যদিনের সাথী। ছিল নারী নিয়ে নানান ধরনের অত্যাচার, নির্যাতন। বৈষম্যতা ছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এসবের সকল কিছুই নবী করীম [সা] এর কারণে দূর হয়ে গেল। হয়ে উঠলেন ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি। কুরাইশরা গোত্রে গোত্রে যখন "হাজরে আফওয়াদ'-এর স্থাপন নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করছিল তখন প্রিয় নবী [সা] কৌশলে সুন্দর বিবেচনায় সেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি ঘটান। আমাদের প্রিয় নবী [সা] নিজে যেটা করতেন না অপরকে তা করতে নির্দেশ দিতেন না। একবার এক বৃদ্ধ তার সন্তানকে নিয়ে নবীজীর [সা] নিকট এলেন তার সন্তান মিষ্টি বেশি খায় এটা থেকে ছেলেকে কি করে নিবৃত্ত করবেন তার পথ নির্দেশের জন্য। নবীজী [সা] সব শুনে ভাবলেন তিনিওতো মিষ্টি বেশি খান-তা হলে? অনেক ভেবে নবীজী [সা] তাদেরকে কিছুদিন পর আসতে বললেন। এতদিনে নিজেকে [সা] নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ঠিক হলেন। অবশেষে পরে সে বৃদ্ধ তার সন্তানসহ এলে নবীজী [সা] তাদের সে ভাবেই উপদেশ দিলেন। আর এ শিক্ষা থেকে আজ আমাদের এই নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ-এর মুসলমান শাসকদের থেকে জনসাধারণ পায় উল্টো আচরণ। নামাজ-রোজা হজ-জাকাততো ঠিকই আদায় হয়। আড়াইলক্ষের বেশি আছে মসজিদ। সত্তরকোটি মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যায় দুই পার্সেন্ট। নামাজ পড়ে নিষ্ঠার সাথে। আট পার্সেন্ট পড়েন অনিয়মিত। প্রিয় নবীজী [সা]-এর বানী এরা আজ বহন করে না। নজরুল তাই এই বিষয়টিকে দুটো লাইনে প্রকাশ করেছেন–

নামাজ পড়েছ রোজাও রেখেছ কুরআন পড়েছ জানি
হায় তোতা পাখী শক্তি দিতে কি পেরেছ একটু খানি!

না পারেনি শক্তি দিতে। কারণ নবীজীর [সা] বাণী থেকে নির্দেশ থেকে আদর্শ থেকে আজ বিশ্ব মুসলমান অনেকটাই দূরে থাকছে। একটি ইসলামী দেশকে পরাভূত করতে অপর একটি ইসলামী দেশ হাত বাড়ায় ভিন জাতির কাছে? এই কি আদর্শ? একোন ধরনের রাজনৈতিকতা?

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহু তালা আনহুর কাছ থেকে নবীজীর [সা] আখলাক সম্পর্কে জানা যায়–"তাঁর [সা] আখলাক হলো আল-কুরআন। তাঁর [সা] সকল কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, আদব-অভ্যাস সবকিছুই কুরআন মোতাবেক হত।"

আজ বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সকল ইসলামী দেশ কি নবীজীর [সা] এই আচরণগুলোর সাথে পরিচিত? জাতিকে কি তারা এ আচরণ শিক্ষা দেয়ার জন্য মিডিয়ার সাধারণ অনুষ্ঠানে কোন স্থান রেখেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে–ভালো মন্দ মিশিয়ে। কিন্তু জাতি তার থেকে কিছুকি গ্রহণ করছে? প্রশাসন কি শুধু মাঝেমধ্যে বাণীর মধ্যে সীমিত থাকবে?

www.pathagar.com

একটি জাতিকে উর্দ্ধে ওঠার সোপান ধরতে গেলে ত্যাগ, কষ্ট, ধৈর্যধারণ করতে হয়- শুধু মুখের কথায় তা অর্জন করা সম্ভব নয়। নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হয়। এখানেও নজরুল থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

শুকনো রুটিতে সম্বল করে
যে ঈমান আর যে ত্যাগের বলে
ফিরেছে জগৎ মন্থন করে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ
বাঁধা যে রে তোর পাক কুরআন ॥

নবীজী [সা] এবং খিলাফত যুগের দিনগুলোতে নজরুল-বর্ণিত ছবি দেখতে পাই। সমস্ত বিশ্ব ঐ থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ কোথায় উঠে গেছে। বাংলাদেশ কি করছে? কেন আজ জাতি এমন অসংখ্য ভাগে দ্বিধা-বিভক্ত! জাতি-গঠনমূলক আদর্শকে কেন ঘুনে পোকার আক্রমণ। মুখ এবং কাজ-এর মধ্যে থাকছে শতশত মাইল ব্যবধান। কেন একজন ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে শত শত মাইল ব্যবধান? কেন একই দেশে এমন দ্বিধা-বিভক্ত? কেন জাকাত আজও ঠিকমত আদায় হয় না? কেন আজ দরিদ্র-অসহায়দের বিলানোর জন্য 'জাকাতের কাপড়' নাম নিয়ে নিম্নমানের কাপড় তৈরি এবং বিতরণ করে সওয়াব [?] হাসিল করা হয়? এমন ধরনের মানবতা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে?

এই বাংলাদেশেই আজও ডাস্টবিন থেকে ফেলে দেওয়া খাওয়া খুঁজে নিয়ে পাওয়ার দৃশ্য অহরহই পথিপার্শে দেখা যায়-যার পাশেই বিলাস বহুল রেস্টুরেন্ট-হোটেল থেকে ধণীরা পেট ভরছে বিলাসী খাওয়া খেয়ে। যতটা খায় তার চেয়ে বেশী হয় অপচয়। আমাদের প্রিয় নবী [সা] কি খেতেন! তার প্রতি এক নজর লক্ষ্য করা যাক-সিরকার সাথে রুটি খেতেন। মাঝে মধ্যে মোরগ বা হোবরা পাখির গোস্ত খেতে পছন্দ করতেন। বকরীর সম্মুখের পায়ের গোস্তও পছন্দ করতেন। তরকারির মধ্যে কচু খুবই পছন্দনীয় ছিল। এবং উপদেশ দিতেন যয়তুন-এর তেল খেতে এবং শরীরে মালিশ করতে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যবের রুটি এবং সুগন্ধ যুক্ত জলজ ফল খরবুজা, শসা, শুকনো খেজুর খেতেন। এই শুকনো খেজুর মাঝে মধ্যে মাখন দিয়েও খেতেন। মিষ্টি জাতীয় খাদ্য এবং শুধু মধু খুব পছন্দ করতেন। খেতেন তিন আঙ্গুল ব্যবহার করে। বুড়ো আঙ্গুল, তর্জনী ব্যবহারে খাওয়ার শেষে আঙ্গুলগুলোকে লেহন করে নিতেন। তালুতে কখনোই খাবার লাগতেন না। অপচয় করতেন না। কখনো কখনো একটি শুকনো খেজুর খেয়েই দিন অতিবাহিত করতেন। এমনি সহজ সরল ছিল তাঁর জীবন ধারা। কোথাও সফরে গেলে তাঁর সাথে থাকতো তেলের শিশি, সুরমাদানী, আয়না, চিরুণী, কাঁচি, মেছওয়াক, সুঁই ও সুতা। নবীজী [সা] সবুজ রং পছন্দ করতেন। জুতা পরতেন। সহজ সরল জীবন ধারা ছিল তাঁর [সা] পছন্দ। বর্তমানে মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। মানবতা বলতে এখন আর কিছুই নেই। কখনো সখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু একটি ঘটনা ছাড়া মানবতা শব্দটি শুধু ঠোঁটেই বিরাজ করে। সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে জাকাত নেবার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেতনা। খিলাফত আমলেও এই ধারা বজায় ছিল। সেই জাকাত আজ আদায় হয়না। স্বেচ্ছায় জাকাত দেবার মতো মানসিকতা হারিয়ে গেছে। নবীজীর [সা] ধর্মে সকলেই একে অন্যের ভাই-একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এখন এসব এড়িয়ে চলতে ভাই ভাইকে মিথ্যা কথা বলে। একই পিতার সন্তান কেউ ধনাঢ্য হয়ে যায় কেউবা দরিদ্র থেকে যায়। সালাতের সময় সালাত করছে-মাথায় টুপীও রেখেছে। কিন্তু দান-খয়রাত বিষয়ে নারাজ:

প্রিয় নবী [সা] নারীজাতির প্রতি যে সম্মান দিয়ে গেছেন আজ তক কোন ধর্মেই তা দিতে পারেনি। এখনো নয়। বরং কথার কৌশলে নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে পণ্য হিসাবে। পর্দা শুধু বোরকাকেই বুঝায় না-মনের পর্দাকেও বুঝায়। আকাশ মিডিয়া যোগে নোংরামো শেখানোতে কোন বাহবা নেই। জাতি আজ ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করতে শিখেছে-যে দিবসের ইতিহাস অবৈধ-অনৈতিক। আজ আকাশ মিডিয়া জাতিকে করে তুলেছে বেসামাল। প্রশাসনকে বুঝতে হবে। শ্লোগানতো অনেক হতে পারে যেমন রাষ্ট্র সকলের ধর্ম যার যার। কিন্তু আজ লা শরীক-এর ধর্ম কি তরুণ সমাজকে বুঝতে দেয়া হচ্ছে? গোজামিল হয়ে যাচ্ছে সবকিছুতে। আজ দেশে ফ্যাশন শো হচ্ছে। ব্যাটস হাঁটা রপ্ত করছে ছেলে মেয়েরা। কালচারের নামে সংস্কৃতির নামের আড়ালে বা প্রকাশ্যে নারীর ক্ষমতায়ন-এর আড়ালে নারীকে যেভাবে এগিয়ে দেয়া হচ্ছে মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় তার কি গ্রহণযোগ্যতা আছে? এটা মনে রাখতে হবে ধর্ম একজনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। পাপাশি হিন্দু এবং মুসলমান দুটি ধর্মাবলম্বী মানুষেরা থাকছে। লা'শরীক আল্লাহর সম্মানটুকু রাখার দায়িত্ব হারিয়ে ফেলা কখনোই কাম্য নয়। প্রতিবারই পবিত্র বারোই রবিউল আউয়াল আসছে এবং যাচ্ছে। দিনটিতে কেবল আনন্দ-উল্লাস হবে সেটাতো ঠিক নয় কারণ ঐ একই দিনে প্রিয় নবীজী [সা]-এর ওফাত দিবসও। দোয়া-দরুদ আলোচনাই তাই শ্রেয়। কেবল উৎসবই যেন উদ্দেশ্য না হয়। প্রিয় নবীজী [সা]-এর নির্দেশ আদর্শ স্থাপন করাটাই থাকবে মূল উদ্দেশ্য। গোঁড়ামি যেমন কাম্য নয় তেমনি প্রগতির আকারে অনৈতিকতা যেন সমাজে ঠাঁই না পায় সেদিকে দৃষ্টি প্রখরভাবে রাখতে হবে। নবীজী [সা]-এর একটি আদর্শকেও যদি সম্মান জানানো যায় তাও হবে নিজকে উত্তমরূপে এগিয়ে নেয়ার পদক্ষেপ। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাধ্যমে দেশে যাকাত ব্যবস্থার সঠিক প্রচলন করার তাগিদ অনুভব করতে হবে। মনে রাখতে হবে বিগত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশে যদি সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হত তবে বাংলাদেশ আজ গরীব থাকত না এবং দেশ আজ দরিদ্র সীমানার নিচে থাকত না। সুতরাং সঠিকভাবে যাকাত আদায় এবং এর বিতরণ ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। একটি শ্রেণীর ব্যংকে অজস্র লক্ষ কোটি টাকা অপর শ্রেণীর হাতে দিন আনা দিন খাওয়াতে যে বৈষম্যতার সৃষ্টি হয়ে চলেছে তা বন্ধ হওয়া একান্ত জরুরী। কোটি টাকা এ্যাকাউন্টে থাকলে আড়াই লক্ষ্য টাকা আসে যাকাত ফান্ডে-তাহলে ভাবুন যাকাত আদায় হলে দেশে আজ গরীব থাকত কি? প্রতিবারইতো পবিত্র বারোই রবিউল আউয়াল আসছে-তো এবারই নতুন করে শপথ হোক সঠিক উপায়ে যাকাত আদায় করা। নবীজীর [সা] জন্ম এবং ওফাত দিনে এমন শপথ নেয়া কি অবান্তর? তাই বলতে ইচ্ছে হয়, সেই নজরুলেই ফিরে যেতে হয়-এই উদ্ধৃতির সাথেই এ লেখার শেষ করছি-

"আল্লাতে যাঁর পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান"!■

www.pathagar.com

এখন বৈশ্বিক এই প্রেক্ষাপটে ॥ আবদুল মুকীত চৌধুরী

১.

স্বৈরাচারী উৎখাতে এ বিপ্লব, গণ-অভ্যুত্থান,
আপাতদৃষ্টিতে চলে গণতন্ত্রী মাহাত্ম্য কীর্তন,
স্থূল মূল্যায়ন-পর্বে ভিন্ন কোন বার্তা এর নেই :
মুক্ত জীবনের হাওয়া, যে জন্য উন্মুখ জনগণ।

যদিও মুক্তির প্রশ্নে কবিকণ্ঠ চির সোচ্চার,
এ জন্য নির্ঘুম রাত অতিক্রান্তি ক্লান্তি নেই তার,
বিপ্লব ছিনতাইকারী অপশক্তি তীব্র জিজ্ঞাসার,
অতএব সাবধান! পরিণতি শৃঙ্খল, বন্ধন?

জন-বানে ভেসে যায় জগদ্দল স্বৈরশাসকেরা;
কিন্তু এই ডামাডোলে হাননিক অস্ত্রসম্ভার!
তেলের সাগরতুল্য দেশে দেশে এ সুযোগে ডেরা,
ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধ তুঙ্গে নেয়, -স্বার্থটা কার?

উম্মাহ্ গোঙায় শোনো, লুটায় দেশের পরে দেশ;
জনগণ অভ্যুত্থান কী কৌশলে শৃঙ্খলিত হয়!
সার্বভৌম অস্তিত্বে হুমকি এ-কোন বিপর্যয়?
দূর আস্ত বোধোদয়! কবে হয় লাঞ্ছনার শেষ?

নির্জলা সত্য এই : সর্বস্বত্ব পরজীবীদের?
জলে কুমিরের গ্রাস ও ডাঙায় বাঘের হুঙ্কার!
করুণ এ ধাওয়া খাওয়া নিরন্তর জলে ও ডাঙায়,
আগ্রাসীর ভোজসভা ফেনায়িত পানীয় সম্ভার!

ফুটন্ত কড়াই থেকে নিক্ষিপ্ত গনগনে চুলায়,
কড়ায় গণ্ডায় এই গুণে চলা ভুলের মাশুল;
মধ্যপন্থী জনগণ স্ব-হনন মরণ খেলায়;
স্ট্র্যাটেজী নির্ধারণে ব্যর্থ আর কী নির্ঘাত ভুল!

www.pathagar.com

২.

তবুও স্বাপ্নিক চোখে নেই দৃষ্টি কোন উদভ্রান্তির
কবির আশ্রয় সেই সর্বজয়ী নবী ইলাহীর।
সাবধান বন্দুরা, খাল কেটে আনো না কুমির,
ইরাক, আফগান ধ্বংস, এ মুহূর্ত গোটা আরবীর?

স্বাপ্নিক কবির কাছে এঁড়ে তর্ক কক্ষে পাবে না,
পৈশাচিক প্রেক্ষিতে দৃষ্টি তার দিগন্ত রেখায়,
নৈরাশ্যের ঘোলা জলে কখ্‌খনো সাঁতারে যাবে না,
দুর্যোগের রাত জুড়ে স্বপ্ন তার জাগে প্রত্যাশায়।

এ আরবে এসেছেন নবী শ্রেষ্ঠ রাসূল আল্লার,
তাঁর মুক্তি-বার্তা রেখে কী চিত্র গোটা এ উম্মার!
আগ্রাসী অক্টোপাস ছিন্ন করা বোধোদয় চাই
এখন বৈশ্বিক এই প্রেক্ষাপটে বিকল্প নাই।

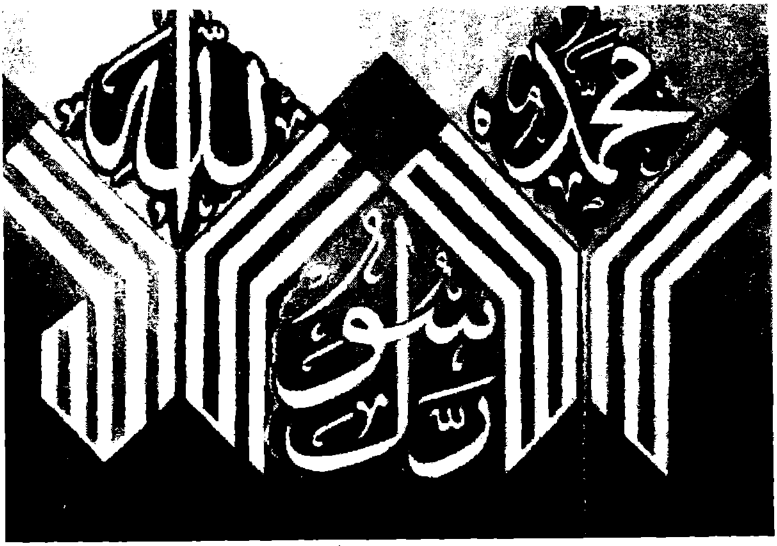

www.pathagar.com

আলোর অধিক ॥ জয়নুল আবেদীন আজাদ

তোমার প্রতিটি শব্দ আলোর অধিক
আচরণ সৌরভে মণ্ডিত–
তাইতো এত দরুদ এবং ভালোবাসা
শুধু তোমারই জন্য হে রাসূল।

জীবনের অন্তিম আহবানে কী করে বললে
এতসব নিগূঢ় কথা আরাফাত ময়দানে–
ভাবতে গিয়ে অবাক হইনি তেমন,
তোমারতো অলৌকিক সম্পর্ক স্বয়ং স্রষ্টার সাথে
ওহিতো কেবল আসতো কেবল তোমারই কাছে
দিনে-রাতে যে কোন প্রহরে।
অবাক হয়েছি তবে মুযদালিফার নিশিপ্রান্তরে–
কেন যে বলেছিলে এভাবে উম্মতকে
খোলা আকাশের নিচে বালি আর
কাঁকরের মাঠে রাত কাটাতে–
সারারাত!
মুযদালিফার আসমান একেবারেই অন্যরকম
চারপাশে নানা বর্ণ ও ভাষার হাজারো মানুষ
তবুও তারকাখচিত আকাশ কাছে টানে–
অনেক কাছে।
অপলক তাকাতেই মৌন সে আকাশ
মেলে ধরে অপার রহস্যের মেঘমালা–
দৃষ্টি চলে যায় উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে
জানি না কোথায় কত উচ্চতায় আল্লাহর আরশ!
তবে কি স্রষ্টার সন্ধানেই মুযদালিফায় রাত্রিযাপন?
বল হে মুহাম্মদ প্রিয় রাসূল আমার।

www.pathagar.com

কবিতার কষ্ট কবির লজ্জা ॥ আ শ রা ফ আ ল্ দী ন

কবিতা যে মানুষকে সীমাহীন কষ্ট দেয়, হৃদয়কে রক্তাক্ত করে
একথা আর কে বুঝেছিল আল্লাহর রাসূল [সা] ছাড়া!
আর বুঝেছিল খোদার আবু সুফিয়ান বিন হারিস নিজে,
যে লিখেছিল খোদার রাসূলের নিন্দাসূচক মিথ্যা কবিতা।
শুনে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন পূত:হৃদয় রাসূল আমার;
দীর্ঘ দিন পরও একথা ভুলতে পারেননি তিনি,
অন্তরের ব্যথায় কাতর হয়ে ছিলেন মানবশ্রেষ্ঠ রাসূল;
যিনি কাউকে কখনো আঘাত করেননি কি কথায় কি হাতে,
সমগ্র মানবতা ছিল তাঁর কাছে পবিত্র আমানত; পরম নিষ্ঠায়
যা তিনি রক্ষা করেছিলেন নবী হওয়ার বহু আগে থেকেই;
কারো উপর প্রতিশোধ নেননি তিনি, হিংসা করেননি কখনো,
নিন্দা করেননি, কষ্ট দেননি, রক্তপাত ঘটাননি কারো;
উদারতার প্রতীক ছিলেন, বিশাল বক্ষ ছিল তাঁর প্রশস্ত হৃদয়
সেই হৃদয়েই নির্মম আঘাত করেছিল আবু সুফিয়ানের কবিতা!
ওখানে তো বর্তমান ছিল কবিতার মহা-সমঝদার এক সমাজ;
যেখানে দেহাতি রমণীরাও অবলীলায় আওড়ে যেতো সুঠাম কবিতা,
সমাজপতিরা কবিতায় বলে যেতো ইতিকথা আর বংশ গৌরব
এমন কি উটগুলোও উদ্দীপনায় ছুটে চলতো সওয়ারের কবিতা শুনে,
সেইখানে সে কবিতার ছুরি দিয়ে রক্তাক্ত করেছিল রাসূলের হৃদয়!
আর তাই মক্কা বিজয়ে যাওয়ার পথে তার মুখোমুখি হতেই
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন নবী, পিতৃব্য-পুত্রের দিক থেকে;
হায়! কতটা কষ্ট পেয়েছিলেন রাসূল আমার, কবিতার কষ্ট!
বুঝেছিল আবু সুফিয়ান নিজেও, দগ্ধ হয়েছিল অনুশোচনায়
আর রাসূলের সমীপে তিলাওয়াত করেছিল ক্ষমার আয়াত,
য়ূসুফ নবীর ভাইয়েরা যা বলেছিল নিজেদের দোষ স্বীকার করে
মুহূর্তেই ক্ষমা করে দিলেন রাসূল আমার, তবু আর কোনদিন
লজ্জায় রাসূলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি হারিস-পুত্র।
হায় রে! কবিতার যন্ত্রণা ও কবির লজ্জা!

www.pathagar.com

নূরনবী ॥ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী

রূপালী চাঁদের মতো রূপময় তোমার জীবন,
কস্তুরী সুরভি যেনো পুষ্পরেণু পাপড়ি কোমল,
রূপবতী প্রজাপতি শবনম তারা ঝলমল
নীলাভ আকাশে যেনো কুমকুম ঊষার কিরণ।

আকাশের মতো তুমি সীমাহীন অসীম বিশাল,
তোমার চলার পথ-ছায়াপথ আলোর সরণী,
বহতা নদীতে তুমি বেয়ে চলো পারের তরণী
নিখিল বিশ্বের তুমি অনুপম জানে মহাকাল।

দিবস-রজনী শুধু তোমাকেই ভাবি নূরনবী,
রাতের আঁধারে তুমি দীপশিখা, তুমি ধ্রুবতারা
ঊষার আকাশে তুমি আলোকিত অত্যুজ্জ্বল রবি,
আলোর প্রভাত হাসে, দিকে দিকে পড়ে যায় সাড়া।

তোমার কাছেই আমি বারবার ফিরে ফিরে আসি,
ভালো করে জানি আমি তোমাকে যে কতো ভালোবাসি।

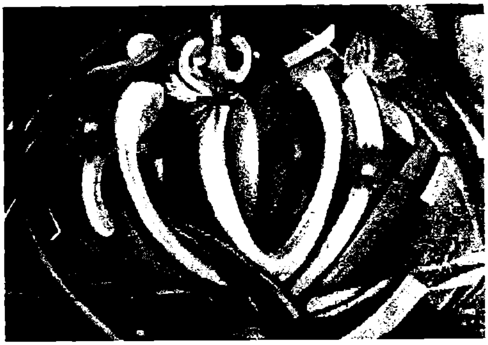

www.pathagar.com

নবী যায় কার বাড়ি ॥ মা ন সু র মু জা ম্মি ল

নবী যায় কার বাড়ি
কার সাথে খায়
দেখো দেখো প্রিয় নবী
কার বাড়ি যায়।

নবী বসে কার ঘরে
বসে কার চেয়ারে
কার সাথে কথা বলে
বুক খোলা পেয়ারে

নবী হাসে কার সাথে
কাকে দেখে রাগে
নবীজীর কথা শুনে
কারা দ্রুত জাগে।

নবীজীর হাত থেকে
কারা নেয় গিফট
কারা দ্রুত খুঁজে নেয়
নবীজীর লিফট।

তুমি আজ কোন দিকে
    কোন দিকে চাও?
নবীজীকে ঘরে নিতে
    সহসা দাঁড়াও।

www.pathagar.com

একটি নতুন কাফেলা ॥ মোঃ ইয়াকুব বিশ্বাস

পৃথিবীর স্বচ্ছ নীল আকাশ
জোসনায় ভেসে যাচ্ছে দ্বাদশীর চাঁদ
গ্রহ-উপগ্রহ ছায়াপথ নীহারিকার
অবিরাম ছুটে চলা গভীর শৃংখলায়।
যুগ-যুগান্তর কাল-কালান্তরের অন্বেষায়,
চাঁদ দিখণ্ডিত-অঙ্গুলী ইশারায়
হঠাৎ ছেয়ে যায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নামে ভয়াল আঁধার-
সোনালী আঙিনা কেঁপে ওঠে থরথর
জনপদগুলিতে হিংস্র দানবের নখর।
মিশর, আরব, কাশ্মির নয় শুধু
পৃথিবীর সকল প্রান্তর।
অসহায় আর্তের গোংগানী
আর-চাপা হাহাকার-
কোথায় আরও একটি বিপ্লবের সিপাহসালার?
পাঠাও সাহায্যকারী, পাঠাও আবরার।
অসহ্য প্রসব বেদনায় দুনিয়া কাঁপছে বারবার,
বিপ্লবের বজ্রনিনাদে স্ফুরিত আলোর চিৎকার
মুক্তির মিছিলে জনতা একাকার
শেষ হবে অধীর অপেক্ষার।
ডাক এসেছে আবার-, উসওয়াতুন হাসনার
আদর্শবাহী একটি নতুন কাফেলার ॥

www.pathagar.com

জান্নাতের সিরাত ॥ আ লী আ ব দু ল মু ন্ তা কি ম

বিদীর্ণ আসমান
ধরা চেয়ে রয়,
গাছ-পালা, মরু-পাহাড়
জগৎ জোৎস্নাময়,
আমেনার ঘর
উচ্ছল-উজ্জ্বলতর,
এল নবী মুহাম্মাদ
স্বাগতম-হে রাসূল,
সিদরাতুল-মুনতাহার
সুবাসিত ফুল
লক্ষ কোটির শ্রদ্ধাস্পদ।

অনন্তে শুরু নূর
আলোকিত জাবাল,
তামাম দুনিয়ার
একটি পাহাড়
সৌভাগ্যের কপাল
নূরে-জাবাল।

আল্লাহর রবের
মহান বানী ইকরা
রাসূলে নাযিল
গর্বিত-নূরায়ীত হেরা।

www.pathagar.com

সত্যের আলোয় আলোকিত দু'টি হৃদয়

হারুন ইবনে শাহাদাত

২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬। আর মাত্র দুদিন পর খ্রীস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। খ্রীস্টান ধর্মালম্বী নারীপুরুষ আবাল বৃদ্ধ শিশুকিশোর সবাই ব্যস্ত এইদিনকে উদয়াপনের আয়োজনে। এমনই এক গুরত্বপূর্ণ সময় তানজানিয়ার একটি গির্জার প্রধানযাজক [Arch Bishop Martin John Mwaipopo] মার্টিন জন মোওয়াইপোপো ঘোষণা করলেন তিনি, সত্যিকারের আলোর সন্ধান পেয়েছেন। তার অন্তর আত্মা আজ বেহেস্তী সুগন্ধে ভরে উঠেছে। তিনি গির্জার অন্য সকল যাজকদের ডেকে ঘোষণা করলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার মুখে এ কথা শুনে পাদ্রীদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। তারা সবাই মিলে তাকে নিয়ে গেলেন গির্জার অন্য একটি কক্ষে। দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বুঝাতে লাগালেন, তিনি ঠিক কাজ করছেন না। তার এমন করা ঠিক নয়। কিন্তু না। তারা মার্টিন জনকে বুঝাতে ব্যর্থ হলেন। পুলিশ স্টেশনে ফোন করেন পুলিশ এলো। পাদ্রীরা সবাই মিলে পুলিশকে জানালেন, মার্টিন জন পাগল হয়েছেন। তিনি আবোলতাবোল বকছেন। দ্রুত তার চিকিৎসা প্রয়োজন। পুলিশ তাকে পাগলাগারদে ভর্তি করলো। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলাম কবুল করার

www.pathagar.com

কারণে তার ওপর চললো সীমাহীন নির্যাতন। শাইয়েখ আহমদ শাইয়েখ নামের একজন ব্যবসায়ী তাকে পাগলাগারদ থেকে মুক্ত করলেন। মুক্ত হওয়ার পর তিনি ইসলামী সেন্টারে গিয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণাদেন।

ইসলাম গ্রহণের পর মার্টিন জন মোওয়াইপোপো হলেন, আবু বকর। মার্টিন জন মোওয়াইপোপো কোন সাধারণ খ্রীস্টান ছিলেন না। তিনি ছিলেন ওয়াল্ড খ্রীস্টান কাউন্সিল পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের জেনারেল সেক্রেটারি। তিনি তানজানিয়া, কেনিয়া, বুরুন্ডি এবং ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার এককাংশের চার্চগুলো তত্ত্বাবধান করতেন। গির্জায় যাজক হওযার জন্য তিনি ইংল্যান্ড থেকে চার্চ ব্যবস্থা বিষয়ে ডিপ্লোমা করেন। তিনি খ্রীস্টান ধর্ম তত্ত্বের ওপর মাস্টার্স করেন; এরপর ডক্টরেট করার সময় তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের ওপর তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন।

তার ইসলাম কবুলের কাহিনী খুবই আকর্ষণীয়। ডক্টরের জন্য তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করছেন। একদিন পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করতে বসলেন। পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে সূরা এখলাসে এসে থামলেন। তারপর পড়া শুরু করলেন,' বল; আল্লাহ এক অদ্বিতীয়; তিনি চিরন্তন ও অভাবমুক্ত ; তিনি কাউকে জন্ম দেন না , কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং কেউ তাঁর মত নয়।' ইসলামের পবিত্র জ্যোতিতে ভরে গেল তার অন্তর। তিনি আলোড়িত হলেন, আলোকিত হলেন। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। তিনি আজ যে, সত্যের সন্ধান পেলেন, এ বিষয়ে কার সাথে পরামর্শ করা যায়। প্রথমে তিনি চলে গেলেন লাইব্রেরীতে, পাশ্চাত্যের বাঘা বাঘা অধ্যাপকদের লেখা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন। পবিত্র ইঞ্জিল বাইবেল, তাওরাত, যাবুরের মতো কোরআনও মহান আল্লাহর প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ। ধর্মগুরুদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ইঞ্জিল, যাবুর, তাওরাত আদি ও আসল রূপে নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআনে কোন পরিবর্তন আসেনি। এটাই একমাত্র আসমানী কিতাব যা আজো আদি।

মার্টিন জন তার প্রিয় অধ্যাপক ভ্যান বারজারের কামরায় গিয়ে জানতে চাইলেন, দুনিয়ার সব ধর্মের মধ্যে সত্য ধর্ম কোনটি?

অধ্যাপক ভ্যান বারজার উত্তর দিলেন, ইসলাম'।

মার্টিন জন বললেন, তাহলে আপনি মুসলমান নন কেন ?

অধ্যাপক বললেন, কারণ, আমি আরবদের ঘৃণা করি। তাছাড়া দেখছো তো আমি এখানে কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছি। তুমি কি মনে করো ইসলামের জন্য আমি এই সুখ-সম্পদ সব ত্যাগ করবো ?

মার্টিনও ভাবলেন, তাই তো! তার নিজের অবস্থাও তো এমনই হবে যদি তিনি ইসলাম কবুল করেন। এরপর এক বছর তিনি চুপচাপ থাকলেন; কিন্তু একটি স্বপ্ন তাকে তাড়া করে ফিরছিল। বিশেষ করে প্রতি জুমার রাতে তিনি স্বপ্নে দেখতেন কুরআনের আয়াত এবং সাদা পোশাক পরা মানুষ তার কাছে আসতো।

www.pathagar.com

তিনি মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করলেন, এটা কি শুধুই স্বপ্ন, নাকি এর অন্য কোন অর্থ আছে? অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন, না এটা কোন অলীক স্বপ্ন নয়, সত্যের আহবান। তিনি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম বাঁধা আসলো ঘর থেকে। তার স্ত্রী সন্তানরা তাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। স্বামীর মুসলমান হওয়া তার স্ত্রী মেনে নিতে পারলেন না। তারপরও সত্যের পথে তিনি অটল থাকলেন।

মার্টিন জনকে শান্তির পথ থেকে ফিরাতে তার কাছে আসলেন একজন নান [খ্রীস্ট ধর্মযাজিকা]। তার নাম গারট্রুড কিবউইয়া [Sister Gertrude Kibweya]। তিনি তাকে বুঝাতে চাইলেন তার মতো বড় একজন খ্রীস্ট ধর্মগুরু ধর্ম ত্যাগ করায় তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনেক কথার এক ফাঁকে মার্টিন তাকে প্রশ্ন করলেন, সে গলায় ক্রুশ পরে আছে কেন? মার্টিন তাকে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে বললেন। নান বললেন, যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হয়েছিল তাই। মার্টিন বললেন, মনে কর, কেউ তোমার বাবাকে গুলি করে মেরে ফেললো, তখন কি তুমি সবসময় গলায় বন্দুক ঝুলিয়ে রাখবে ?

নানের চিন্তার জগতে আলোড়ন শুরু হলো। তিনি তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মার্টিন জন ইসলাম সম্পর্কে তার মনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সিস্টার গারট্রুড কিবউইয়া ইসলামের আলোয় নিজেকে আলোকিত করলেন। ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হলেন সিস্টার জয়নাব গ্রহণ পরে তারা দু'জন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

তাদের খ্রীস্ট ধর্মত্যাগ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় উভয় পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও তানজানিয়ার সাধারণ খ্রীস্টানরা ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। সকল বিপদের ঝুকি নিয়ে তারা ইসলামের পথে অটল থাকেন। ১৯৮৮ সালে মার্টিন যখন হজ করতে যান, তখন তার বাসায় উগ্র খ্রীস্টানরা বোমা হামলা করে। হামলায় তার তিন যমজ শিশু মারা যায়। আবু বকর ও সিস্টার জয়নব দম্পতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরিত দ্বীন ইসলাম মহানবী হযরত মুহাম্মদ [সা] এর প্রর্দশিত পন্থা প্রচার করছেন। প্রকৃত সত্যের আলোয় আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অন্তর আলোকিত করে তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করাই এখন তাদের একমাত্র কর্তব্য।■

www.pathagar.com

আমাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ

■ **নিয়মিত সাহিত্য সভা**

পরিচালনায় : কবি হাসান আলীম

প্রতি মাসের ১৫ তারিখ সন্ধ্যায়

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র অফিস

■ **বড়দের গান লেখা ও সুরের ক্লাশ**

পাক্ষিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়

পরিচালনায় : গীতিকার সুরকার

তফাজ্জল হোসাইন খান

■ **ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ**

প্রতি শুক্রবার সকাল ১১টায়

স্থান : কেন্দ্রের অফিস

পরিচালনায় শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল

মোবাইল : ০১৫৫২৫৪২৫৫৪

■ **শিশুদের গান আবৃত্তি প্রশিক্ষণ ক্লাশ**

প্রতি শুক্রবার সকাল ৯ :৩০ মি:

স্থান : কেন্দ্রের অফিস

পরিচালনায় : শিল্পী মশিউর রহমান

মোবাইল : ০১৭১১১১৮৫৪৩

০১৬৭৩৯৯৫৫৪৮

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩৩৩৩২০, মোবাইল : ০১৯১৪০৫৮৫৭৬

www.pathagar.com

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আমানতদার নবী মুহাম্মাদ [সা]

জাফর আহ্‌মাদ

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সমস্ত উপাদানকে বারবার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যার পদচারণা ঐতিহাসিকের কলমকে নাড়া দিয়ে যায়, তিনি মুহাম্মাদ [সা] ছাড়া আর কে হতে পারেন? He is a great Hero of the world History. কারণ তিনিই তো পৃথিবীর বহু কাঙ্ক্ষিত প্রশংসিত 'আহমাদ'। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর চরিত্রের পরিপূর্ণতা দিয়েই তাঁর নাম 'আহমাদ' রেখেছেন। আল্লাহতা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" আল্লাহতা'আলা তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন মানব জীবনের পূর্ণতা দানের জন্য। রাসূল [সা] বলেছেন, 'সব নবী একটি ঘরের অসংখ্য ইটের মতো যে ঘরের একটি ইট বাকি ছিল। তিনি এসেছেন সে ঘরের পূর্ণতা দানকারী ইট হিসেবে।' মানব জীবনের এমন কোন বাঁক নেই যেখানে তাঁর অবদানের ছোঁয়া লাগেনি। যার স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহতা'আলা বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে [জীবনব্যবস্থা] পূর্ণতা দান করলাম।" একজন মানুষ জীবনের কোন একটি বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করে। ব্যক্তিজীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিভাগে পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। কিন্তু রাসূল [সা] জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে

www.pathagar.com

তিনি বিশেষজ্ঞ বলেই প্রতিটি বিষয়ে তিনি অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। তাই জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিটি বাঁকে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে অন্যথায় তা হবে অসম্পূর্ণ জীবনের অসম্পূর্ণ সমাধান।

আমানত একটি ব্যাপক পরিভাষাগত শব্দ। সাধারণ অর্থে এটি হলো 'একজন অপরজনের কাছে কিছু মালামাল গচ্ছিত রাখল, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে আমানতদার ব্যক্তিকে যথাযথভাবে মালামাল ফিরিয়ে দিলো' কিন্তু ব্যাপকার্থে আল্লাহর খলিফা হিসেবে খেলাফতের দায়িত্ব আদায় বা পালন করার নাম আমানতদারিতা। যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন তিনি একজন সত্যিকারের আমানতদার। অর্থাৎ প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দেয়া প্রতিটি হুকুম তাঁর জমিনে বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও কর্তব্যই হলো আমানতদারিতা। আল্লাহতা'আলা বলেন, 'আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এ আমানত [আল-কুরআন তথা খেলাফতের দায়িত্ব] পেশ করলাম। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না, তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তার স্কন্ধে তুলে নিল।" [সূরা আহজাব : ৭২] আল্লাহতা'আলা আরো বলেন, 'অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী কিছু রাখতে যাচ্ছি।" [সূরা মুয্যাম্মিল : ৫]

সাধারণ এবং ব্যাপক উভয় অর্থে রাসূল [সা] ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আমানতদার। নবুওয়তের আগে যেই সময় আমানতদারিতার কল্পনাই করা যেত না সে সময়ও তিনি আমানতদারিতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষগুলোও তাঁকে আল-আমিন [বিশ্বস্ত] খেতাব দিতে কৃপণতা করেনি। নবুওয়তের পরও হিজরতের প্রাক্কালে জনগণের আমানত ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি হযরত আলীকে [রা] দায়িত্ব দিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। ব্যাপকার্থে তিনি পরিপূর্ণ ও সঠিকভাবে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আমানতদারিতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। পৃথিবী সাক্ষী, কালের সাক্ষী হয়ে আজো মজুদ আছে সুবিস্তৃত আরাফাতের ময়দান, যেখানটায় দাঁড়িয়ে পূর্ণাঙ্গ মহামানব বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে প্রশ্নাকারে বলেছিলেন, "আল্লাহর দরবারে আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কী বলবে? সাহাবীগণ বলেন, আমরা বলবো, আপনি আমাদের কাছে পয়গাম পৌছে দিয়েছেন এবং আপন কর্তব্য পালন করেছেন। তিনি আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি তুলে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।" এ সময় কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয় : "আজকে আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম আর দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।" এরপর তিনি সব মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলেন : "উপস্থিত ব্যক্তিগণ [এসব কথা] অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌছে দিও। হয়তো বা কিছু উপস্থিত লোকের চেয়ে কিছু অনুপস্থিত লোক এ কথাগুলো অধিকতর ভালোভাবে মনে রাখতে পারবে এবং সংরক্ষণ করবে।"

রাসূল [সা] এর উল্লিখিত ভাষণটির মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেটি বাদ দিলে রাসূলের [সা] পুরো ভাষণটিই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে

www.pathagar.com

তা হলো, "উপস্থিত ব্যক্তিগণ [এসব কথা] অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দিও। হয়তো বা কিছু উপস্থিত লোকের চেয়ে কিছু অনুপস্থিত লোক এ কথাগুলো অধিকতর ভালোভাবে মনে রাখতে পারবে এবং সংরক্ষণ করবে।" এ বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূল [সা] বিশ্ব-মুসলিমের ওপর এক বিশেষ আমানত তথা গুরুভার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। এ কাজ ও দায়িত্ব থেকে কেউ মুক্তি পেতে পারেন না। অর্থাৎ দুনিয়ার শান্তি ও কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তির জন্য ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াতি কাজের কোনো বিকল্প নেই। এ বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর রাসূল [সা] আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তথা আল-কুরআন।" আল্লাহতা'আলা বলেন: "তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" [সূরা আলে ইমরান : ১১০]

যারা আমানত রক্ষা করে না তাদেরকে খিয়ানতকারী বলা হয়। খেয়ানত করা কবিরাহ্ গুনাহ। খেয়ানতকারী একজন পূর্ণাঙ্গ মোনাফিকও বটে। মহান আল্লাহতা'আলা এবং নবী [সা] কুরআন তথা মানবজীবন সুপথে পরিচালিত করার উত্তম গাইড হিসেবে আমাদের কাছে আমানত রেখেছেন সেটি যদি আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করার আবশ্যিক দায়িত্ব পালন না করি তবে আমানতের খিয়ানতকারী হিসেবে আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় প্রত্যেককে দাঁড়াতে হবে। আমানতের খিয়ানতকারীর মতো একটি মারাত্মক অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে কুরআনের সমাজব্যবস্থা কায়েমের দাওয়াত প্রদান করতে হবে। সূরা আল ইমরানের উল্লিখিত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে নীরব ভূমিকা পালন করা সঙ্গত হবে না। যদি এমনটি করা হয় তবে কুরআনের সাথে জুলুম করা হবে। এবং আল কুরআনের আদেশ নিষেধকে গোপন করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হবেন। এধরনের ভুল পন্থা অবলম্বনের মারাত্মক শাস্তি সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণাই শুনুন এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করুন। আল-কুরআন বলছে : "যারা আমার নাজিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্ তাদের ওপর লানত করছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীও তাদের ওপর অভিশাপ নিক্ষেপ করছে।" [আল-বাকারা : ১৫৯] আল কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে, "বস্তুত যারা আল্লাহর দেয়া কিতাবের আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলত নিজেদের পেট আগুন দ্বারা ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। [আল-বাকারা : ১৭৪] 'আবার যারা কুরআনের কিছু অংশ পালন করে কিছু অংশের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "তবে তোমরা কি কিতাবের একটি অংশ বিশ্বাস কর এবং অন্য অংশ

www.pathagar.com

অবিশ্বাস কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কী শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন।" [সূরা বাকারা : ৮৫] এ আয়াতের আলোকে বিবেকের কান আর চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করুন আমাদের খেয়ানতের কারণে কিভাবে অনিশেষ এক ঘোর অমানিশা বিশ্ব মুসলিমকে গ্রাস করার নিমিত্তে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বিবেককে একটু বলুন পৃথিবীটা এক চক্কর দেখে আসতে। কিভাবে সমঅধিকারের এ পৃথিবীটা মুসলমানদের জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। অথচ আল্লাহ তাঁর হাবিবকে বলছেন, "ত্বা-হা। হে নবী আমি এ কুরআন এ জন্য নাজিল করিনি যে, তুমি এর দ্বারা কষ্ট পাবে।" [সূরা ত্বাহা : ১-২] এ আয়াতের আলোকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে তাহলে পৃথিবীজুড়ে এ কুরআন ওয়ালা মুসলমানরাই আজ কষ্ট পাচ্ছে কেন, গোটা পৃথিবী তাদের জন্য কেন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। তাহলো আল কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া ও কুরআনের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ ছেড়ে দেয়ার কারণে। সূরা ত্বা-হাতেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কারণ বলে দিয়েছেন, "আর যে ব্যক্তি আমার জিকির [কুরআন] থেকে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ার জীবন হবে সঙ্কীর্ণ, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম। তবে কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, এমনিভাবে যখন আমার আয়াতগুলো তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন তা ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে। এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং যে তার রবের আয়াতের ওপর ঈমান আনে না তাদের শাস্তি দিয়ে থাকি আর পরকালের আজাবই হচ্ছে খুব কঠিন এবং অধিক স্থায়ী।" [সূরা ত্বা-হা : ১২৪-১২৭]

এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং সুন্দর এক পৃথিবী অবলোকনের জন্য রাসূলের আদর্শে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ রাসূল [সা] আল্লাহর দেয়া আমানত তথা দায়িত্ব পালন করে পৃথিবীর সামনে মদিনা নামক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আমানতদারিতার মডেল কায়েম করে গেছেন, আমাদেরকেও সেই মডেলের অনুসরণ করে আমানতের হক আদায় করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সা] দেয়া আমানত বা দায়িত্ব রাসূলের [সা] দেখানো পথ অনুযায়ী পালন করতে হবে। আল্লাহতা'আলা বলেন, "সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে সর্বোত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎ কাজ করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমান।" [সূরা হা-মীম আস সেজদা : ৩৩] এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে একজন প্রখ্যাত তাফসিরকারক লিখেছেন "প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন এটি সেই সময়কার আয়াত যখন কোন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো সে হঠাৎ করেই অনুভব করতো যেন হিংস্র শ্বাপদ ভরা কোন এক অরণ্যের গভীরে জেনে শুনে প্রবেশ করেছে যেখানে সবাই তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং তার দিকে প্রাণপণে ছুটে আসছে।

www.pathagar.com

রূহ : কুরআন, হাদীস ও দার্শনিকদের দৃষ্টিকোণ

ইব্রাহীম মন্ডল

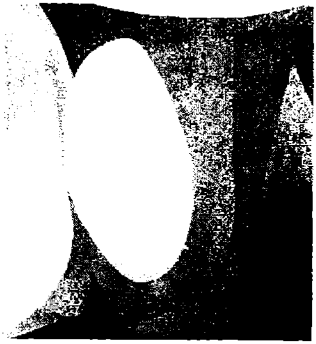

আবদুব বহমান মারা গেলো। কিন্তু কি গেলো? তার পুরো শরীরটাতো চোখের সামনে শোয়া আছে। সেই নাক, মুখ, শরীর, চুল, সব কিছু ঠিক অবিকল। তবে গেল জিনিসটা কি? যে জিনিস চলে যাওয়ার পর দেহ খাঁচাটা সাথে সাথেই অচল হয়ে গেল এবং পচন ধরে গেল। তাতে এটাই প্রমাণ হয়, যে জিনিস চলে গেল তার জন্যেই দেহ নামের এই খাঁচা তৈরি করা হয়েছিল এবং তা চলে যাওয়ার সাথে সাথে খাঁচা অচল। তাই পচে গেল। তার মানে দেহটা কিছুই নয়, আসল হল চলে যাওয়া বস্তুটি। দেহটা হল তার আইডেনটিটির জন্যে একটা পরিচয় বা বাহন মাত্র। দেহ এই বাহন বৈ আর কিছু নয়। দেহটা দেখে চেনা যায়, পরিচয় পাওয়া যায় এ লোক আবদুর রহমান, আব্দুল কুদ্দুস ইত্যাদি। আর এই শক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটিই হল আত্মা বা রূহ।

রূহ মূলত কি এর উত্তর পাওয়া বড়ই কঠিন। সহজভাবে বলা যায়, আত্মা হল জীবনী শক্তি, যা নিরাকার, দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। তার রং রূপ গঠন কিছুই ধরার মতো নয়। রাসূল [সা]কে কাফেররা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে বললেন, "বলুন রূহ আমার নির্দেশ। আর লোকে আপনাকে আত্মা সম্পর্কে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন, আত্মা আমার প্রভুর হুকুম।" [সূরা বনী ইসরাইল, রুকু-১০, আয়াত-৮৫]

এখানে সাধারণভাবেই মনে করা যায় রূহ অর্থ প্রাণ। অর্থাৎ লোকেরা রাসূল [সা] কে রূহ সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তার প্রকৃত অবস্থা কি? তাঁর উত্তর দেয়া হয়েছে "রূহ আল্লাহর নির্দেশে আসে"। মহান আল্লাহ্ সমস্ত রূহগুলোকে এক সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং এই রূহগুলো গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় আল্লাহর নিদের্শের অপেক্ষায় আছে। নির্দেশ পেলেই আত্মা বা রূহ অর্থাৎ রূহানী জগৎ বা আলমে আরোয়ার জগৎ ছেড়ে আলমে খালেকের জগত তথা বস্তুর জগতে এসে প্রবেশ করে এবং আত্মা ও জড়দেহ দুই জগতের দুই সত্তা দুনিয়া নামক গ্রহ রাজ্যে মিলিত হয়েছে। আর এই রূহ চলে গেলেই জড় দেহের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। দুনিয়ার সকল লোভ লালসা ছেড়ে মাটির দেহ মাটির সাথেই মিশে যায়। কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই; অবিনশ্বর। এর মৃত্যু নেই, আল্লাহর নির্দেশে স্থানান্তর হয় মাত্র।

আলমে খালক বস্তু জগতের উপাদান দিয়ে গঠিত। তাই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আছে। একে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু আলমে আরোয়ার সত্তাকে ভাগ করা যায় না। এর আকার নেই। বিনাশ নেই। ধ্বংস নেই। মানুষের রয়েছে দু'ধরনের আত্মা। একটি জীবাত্মা, অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা পশুদেরও আছে। এ ধরনের আত্মার স্রষ্টাকে চেনার মত শক্তি নেই। কেবল দুনিয়ার ভোগ বিলাস, খাওয়া-দাওয়া, আরাম আয়েশ নিয়ে মত্ত থাকতে চায়। আর পরমাত্মা স্রষ্টাকে তালাশ করে এবং তার আনুগত্যশীল হয়। অনেক সময় পরমাত্মা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে জীবাত্মা প্রাধান্য লাভ করে, দেহ তার কর্তৃত্বে চলে যায়। তখন পরমাত্মা নির্জীব হয়ে যায়, জীবাত্মার সাথে আর সে কুলিয়ে উঠতে পারে না। পরমাত্মা তখন জীবাত্মার ইচ্ছা মতো পরিচালিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে নিজের প্রতিনিধির দায়িত্বের কথাও ভুলে যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তা নয় বরং নিজ কর্মের দোষে তাদের আত্মার ওপর মরিচা পড়ে।"

আমাদের দেশে কিছু স্বঘোষিত পীরকে দেখা যায় চোখ বন্ধ করে জিকির করে "আল্লাহু... ইল্লাল্লাহ" বলে এবং আত্মার অবস্থান 'কলবে' চাপ দেয়। তাদের ধারণা, আল্লাহু বলার সাথে চাপ দিয়ে আত্মার মরিচা দূর হবে। গবেষক মাওলানা আবদুর রহীম বলেন, ইসলামের দৃষ্টান্ত এই বস্তুগত দুনিয়া কিছুমাত্র উপেক্ষণীয়, বর্জনীয় বা পরিতাজ্য নয় বরং সৌভাগ্য লাভের চূড়ান্ত মনজিলে পৌঁছার পথ এই বস্তুজগতের মধ্য দিয়েই চলে গেছে। ম্যাটার এবং স্পিরিট এ দুয়ের সমন্বয়েই মানব জীবন তথা মানব দেহ গঠিত। দুটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের দৃষ্টিতেই অপরিহার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মার জন্যে দেহ উপায় ও হাতিয়ার মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। বস্তু নশ্বর উপাদান। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য।

সূরা যুমারের ৪২ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "তিনিই তো আল্লাহ, যিনি মৃত্যুর সময় রূহগুলোকে কবজ করেন। আর যারা মরেনি নিদ্রা তাদের রূহ কবজ করে নেয়। পরে মৃত্যুর ফয়সালা কার্যকর করেন। তাকে তিনি আটক করে অন্য রূহদের একটা নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

সময়ের জন্য ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে চিন্তাশীলদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" রূহ অবিনশ্বর, চিরঞ্জীব। শেষ বিচারের ফায়সালা- ভাল কাজের ভাল ফল, মন্দ কাজের মন্দ ফল তাদেরই ভোগ করতে হবে। দুই বন্ধু এক সাথে একই বিছানায় ঘুমালো। একজন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে তাকে একটি বিষধর সাপ তাড়াচ্ছে। সাপের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সে যারপরনাই দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু হায়, কোন আড়াল না থাকায় পালাতেও পারছে না। বিষধর সাপের দংশন থেকে বাঁচার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। তার শরীর থেকে ঘাম ঝরে বিছানাপত্র ভিজে গেছে। সে এমন কষ্ট করছে অথচ তার নিকটতম বন্ধু একই সাথে থেকেও জানতেও পারলো না, বন্ধুটি কি দু:সহ কষ্টের মধ্যে আছে। সে এটাও বুঝতে পারছে না যে, এটা তো বাস্তব নয়, স্বপ্ন। গাজ্জালীর মতে আত্মার শাস্তিটা এমনিভাবেই হবে। অথচ অনেক মূর্খ আছেন যারা কবরে আগুন দেখতে চান, সাপ, বিচ্ছু দেখতে চান।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফজরের ২৭-৩০ আয়াতে বলা হয়েছে, "হে প্রশান্ত আত্মা তোমাদের খোদার দিকে চল। এইরূপ অবস্থায় যে, তুমি তোমার ভাল পরিণতির জন্যে সন্তুষ্ট এবং তোমার খোদার নিকট প্রিয়পাত্র। আমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।" এখানে প্রশান্ত আত্মা বলে সেই লোকদের বুঝানো হয়েছে, যে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়া পূর্ণ প্রশান্তি ও চিত্তের স্থিরতা সহকারে লা শরীক একমাত্র আল্লাহকে নিজের রব ও নবী রাসূলগণের আনিত সত্য দীনকে জীবন ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করেছেন।

বিশ্ব বিখ্যাত মরমি সাধক কবি মওলানা রূমীর বয়াত উদ্ধৃত হয়েছে-

"ক্রুশ ও খ্রিষ্টান জগৎ তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম

তিনি ক্রুশের নন।

পূজার মন্ডপ প্রাচীন বৌদ্ধ মঠে গমন করলাম

সেখানেও তার সাক্ষাৎ মিলল না।

হিরাত ও কান্দাহারের পর্বত অনুসন্ধান করলাম

তিনি সেই পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে নেই।

আমি আমার কলবের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম

তাঁকে সেখানে দেখতে পেলাম- তিনি অন্য কোনখানে নেই ॥"

মানব হৃদয় আল্লাহর সিংহাসন [আরশিল আজীম] সুতরাং কুচিন্তা, কু মনন, থেকে মানুষের আত্মাকে পবিত্র রাখতে হবে। এই যোগাযোগের পথে আল্লাহর আলোকে আলোকিত করেন। আল্লাহই একমাত্র পরম সত্তা, আল্লাহ্ একমাত্র সত্তা। এই জগৎ এক পরম সুন্দরের প্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং এই সৃষ্টি এক ঐচ্ছিক প্রক্রিয়ায় কুন ফাইয়াকুন [হও এবং সব হয়ে গেল]। হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে, "আমি গুপ্ত সম্পদ এবং আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি। কাজেই আমি জগৎ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছিলাম যাতে আমি ব্যক্ত হতে পারি।" পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আমি আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব"।

সুফীদের মতে মানুষ সৃষ্টির চরম কারণ নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে পরম সত্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা।

আল কুরআনে বলা হয়েছে, "ফাজকুরুনি আজকুরুকুম" আমাকে স্মরণ করো তবে আমি তোমাকে স্মরণ করবো। তেমনি অন্যত্র বলা হয়েছে, "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকে জেনেছে।

আত্মা আল্লাহর শক্তি। "হে রাসূল বলুন, আত্মা আমার প্রতিপালকের আদেশ।" আত্মা অন্ধকারময় দেহকে আলোকিত করে। রূহ ব্যতীত আর একটি শক্তি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান তা হল নফস। রূহের আকর্ষণ আল্লাহর দিকে আর নফসের আকর্ষণ পার্থিব জগতের দিকে। মানুষ এই দ্বি বিধ শক্তির সমন্বয়ের কেন্দ্র। রূহ ঐশী শক্তি খোদার আদেশ এর কোন পরিবর্তন নেই।

নফস কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে।

নফস তিন প্রকার। নফসে আম্মারা, নফসে লাওয়ামা, নফসে মুতমায়িন্না। চতুর্থ স্তরের নফস ও রূহের মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

কুরআনে বলা হয়েছে, "হে পরিতুষ্ট আত্মা তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষ প্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করো। অত:পর আমার সেবকদের মধ্যে প্রবেশ করো এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করো" [৮৯-২৭-৩০] আয়াত। এই স্তরকে বলা হয় ফানা বা বিনাশ। নফসের এই স্তরে উন্নীত হলে মানুষ বাক্কা [চিরন্তন] স্তরে চয়ে যায়। তখন মানুষ বেহেস্তের আনন্দ অনুভব করে। পরম সত্তার প্রভাবে প্রভাবিত হাল্লাজ বলেছেন, "আমি সত্য [আনাল হক]" এই স্তরের মানুষ স্রষ্টার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। বাক্কা বিল্লাহ অবস্থায় সবাই খোদার গুণে গুণান্বিত হয় এবং তার সমুদয় ইচ্ছা খোদার ইচ্ছায় লয়প্রাপ্ত হয়।

আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিন আত্মার আধ্যাত্মিকতায় এবং অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে, আত্মা মূলত স্রষ্টার সত্তা। স্রষ্টার আলোক আত্মার বেশকিছু অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি হচ্ছে সরাসরি সেই ঐশি আলোক যা আত্মার মধ্যে বর্তমান। আত্মা আধ্যাত্মিক বিষয়। তার ধ্বংস কল্পনা করা চলে না। আত্মা অমর। স্রষ্টা আত্মাকে কোন এক বিশেষ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। আত্মা অমর হলেও শাশ্বত নয়। অর্থাৎ স্রষ্টার সাথেই চিরকাল ছিল এমন নয়। তবে সকল আত্মাই সরাসরিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন না কি পিতা মাতার আত্মার মাধ্যমে সন্তান সন্ততির আত্মা সৃষ্টি হয় এ নিয়ে অগাস্টিন কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন।

যাই হোক আত্মসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, মানবদেহে তার সাময়িক অবস্থান এবং এ কারণে ব্যক্তির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্বের অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে অগাস্টিনের কোন সংশয় ছিল না। তিনি দেখান যে, প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে আত্মাকে খুঁজে পায়। এমন কি আত্মাকে

www.pathagar.com

সন্দেহ করতে গেলেও তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আধুনিক দর্শনের জনক রেনে দেকার্ত চিন্তন ক্রিয়া থেকে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়াস নিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল। দেকার্তের অনেক পূর্বে সেই মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন ঘোষণা করেন, কোন প্রকার আজগুবি কল্পনা ছাড়াই আমি জানতে পারি যে, আমি 'আমি' হিসেবেই বর্তমান, আমি জানি এবং আমি ভালোবাসি। কেউ কেউ পুঁথিগত যুক্তির ভিত্তিতে প্রায়ই প্রশ্ন উত্থাপন করেন "তুমি যদি ভুল করো তাহলে?" এসব যুক্তিকে আমি পরোয়া করি না। কেননা আমি জানি, আমি যদি ভুল করি তথাপিও আমি 'আমি'ই থেকে যাই। কারণ যার অস্তিত্বই নেই, সে ভুল করতে পারে না। অতএব আমার ভুল আমার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে।

আত্মার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় টমাস একইনাস অনেকটা এ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করেন। এ্যারিস্টটলের মতো তিনিও আত্মাকে তিনটি অংশে ভাগ করেন, এই তিন অংশ হলো পুষ্টিবর্ধক আত্মা, সংবেদনশীল আত্মা এবং বুদ্ধিময় আত্মা। উদ্ভিদের মধ্যে কেবল পুষ্টিবর্ধক আত্মা বিরাজমান। ইতর প্রাণির মধ্যে সংবেদনশীল আত্মা পর্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু একমাত্র মানবাত্মায়ই আত্মার তিনটি অংশই বিরাজমান। অর্থাৎ মানবাত্মার মধ্যেই পুষ্টিবর্ধক অংশ এবং সংবেদনশীল অংশের সাথে বুদ্ধিময় অংশও বিদ্যমান। একমাত্র মানবাত্মাই তাই জড় জগতের ওপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার চেষ্টা করতে পারে।

মানবাত্মা একটি অজড় এবং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সত্তা। তাই এর কোন বিনাশ নেই। মানবদেহে অবস্থান করার সময় এটা দেহের সাহায্যে বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে, কিন্তু দেহের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও এটা তার স্বাতন্ত্রও অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়। একুইনাস দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন। তার মতে, মৃত্যুর পর মানবাত্মা অমর থাকে। মানব দেহ পচে গলে যায়। কিন্তু শেষ বিচারের দিনে অর্থাৎ পরকালীন জীবনে আত্মা স্রষ্টা কর্তৃক পুনরায় দেহের মধ্যে সংযুক্ত হবে। অর্থাৎ যে দেহ থেকে আত্মা চলে গিয়েছিল সেই দেহের সাথেই পুনরায় ঐ আত্মা মিলিত হবে। এভাবেই পরকালীন জীবনে মানুষের পুনরুত্থান ঘটবে।

আত্মহত্যা

সেন্ট টমাস একুইনাস আত্মহত্যাকে সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, আত্মহত্যা একটি জঘণ্যতম অন্যায়। এর কোন নৈতিক সমর্থন নেই। এটা সাহস ও ধৈর্য্যের পরিপন্থী কাজ। মানবজীবনে দু:খ দুর্দশা আসতে পারে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে এই সকল দু:খ দুর্দশা মুকাবেলা করে ধৈর্যও ও সাহসের সাথে জীবন যাপন করাই হচ্ছে মানবজীবনের স্বার্থকতা। আত্মহত্যার মাধ্যমে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব করে,মানবসত্তাকে অপমানিত করে।

আত্মহত্যা করা সৃষ্টিকর্তাকে অমান্য করা, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নামান্তর। জন্ম মৃত্যু সবই আল্লাহর হাতে। আত্মহত্যার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। অগাস্টিনের মতে,যারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আত্মহত্যা করতে চান তারা নিতান্তই নির্বোধ। কেননা আত্মহত্যাই একটি জঘন্য পাপ। পাপ বা অশুভ থেকে বাঁচার

www.pathagar.com

জন্য আত্মহত্যা কাম্য হতে পারে না। এমনকি কোন নারীর ক্ষেত্রে তার সতিত্ব রক্ষার জন্যও আত্মহত্যা উচিত নয়।

অস্তিত্ববাদের জনক সোরেন কিয়ার্কেগার্ড ছিলেন ডেনমার্কের দার্শনিক। তিনি ১৮১৩ সালের ১৫ই মে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন যে আল্লাহই মানবাত্মার স্রষ্টা। তাই মানবাত্মা আল্লাহর সাথে মিলিত হতে সমর্থ হবে। এবং এই মিলনেই জীবনের চরম স্বার্থকতা নিহিত। মানুষের অস্তিত্বের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় ধাপে মানুষ হতাশা বা দু:খ এড়াতে পারে না। এমনকি কল্যাণকর জীবনের সন্ধানও পায় না। ধর্মীয় স্তরে উন্নীত হলে মানুষ লাভ করে পরম কল্যাণ। মানুষের জীবন হয়ে ওঠে সংশয়হীন। সংশয়হীন বিশ্বাসী জীবনে মানুষ খুঁজে পায় নিজের প্রকৃতি, জগতে তার অবস্থান এবং তার জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য।

ডেভিড হিউম তাঁর A Treatise of Human nature নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আত্মা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন। এই আলোচনার শুরুতেই তিনি সেই সকল দার্শনিকদের আত্মাতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন যারা স্থায়ী দ্রব্য বা স্থায়ী সত্তারূপী আত্মার ধারণায় বিশ্বাসী। এ ধরনের মতবাদগুলোর বিভিন্ন দিককে হিউম নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করেন :

এক. কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে, আমরা যাকে আত্মা বলে মনে করি, প্রতিমুহূর্তেই সে সর্ম্পকে আমরা সচেতন।

দুই. আত্মসত্তার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করে থাকি।

তিন. আমরা এর স্থায়ীত্বকেও উপলব্ধি করতে পারি। অর্থাৎ আত্মা যে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান তাও আমরা বুঝতে সক্ষম।

চার. আত্মার অভিন্নতা ও সরলতা সর্ম্পকে আমাদের যে ধারণা রয়েছে, তা প্রতিপাদন বা প্রদর্শনমূলক থেকে প্রাপ্ত নিশ্চয়তার চাইতেও অধিক।

পাঁচ. অত্যন্ত শক্তিশালী কোন সংবেদন কিংবা প্রচণ্ড রকমের অতিরাগ আত্মার অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বকে খণ্ডন করতে পারে না; বরং তার দ্বারা এটা আরও প্রমাণিত হয়।

ছয়. উপর্যুক্ত ধারণা বা মতের সপক্ষে অন্য কোন যুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কেননা আমরা আত্মার সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, আর কোন প্রমাণ বরং এই প্রমাণকে দুর্বল করে দেবে।

সাত. আত্মা সম্পর্কে আমরা যদি সন্দেহ পোষণ করি, তবে অন্য কোন কিছু সম্পর্কেই আমরা আর সুনিশ্চিত হতে পারবো না।

হিউম আত্মা সম্পর্কে উপর্যুক্ত মতের ব্যাপারে দু:খ করে বলেছেন; এখানে আত্মার ধারণাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অমন আত্মার ধারণা আমাদের নেই।

আল কিন্দির মতে, আত্মাই সমস্ত ক্রিয়ার উৎস এবং জড়ের কাজ হলো আত্মার ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পিত করা। খোদা ও জড় জগতের মধ্যবর্তী স্তর বা সংযোগসূত্র হলো বিশ্ব আত্মা, বিশ্ব আত্মা থেকে নির্গত হয় মানবাত্মা। মানুষের আত্মা অযৌক্তিক, অবিনশ্বর,

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিময় দ্রব্য। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার জগৎ থেকে তা ইন্দ্রিয়ের জগতে অবতরণ করে। মানুষের আত্মার দ্বিবিধ রূপ আছে: জৈবিক আত্মা এবং বুদ্ধিময় আত্মা। জৈবিক আত্মার স্তরে মানুষ সৃষ্টির নিম্নতর স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু বুদ্ধিময় আত্মা আসে আল্লাহ থেকে এবং এই কারণে এটা মৃত্যুহীন।

অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আত্মাও খোদার সৃষ্টি। কুরআনে বলা হয়েছে যে, খোদা মানুষের মধ্যে তাঁর শক্তি প্রবিষ্ট করিয়েছেন। [সূরা-১৫, আয়াত-২১২], এতে অন্তত এই বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন শক্তি দেওয়া হয়েছে যার বলে সে খোদার খেলাফত কায়েম করতে সমর্থ।

আল্লাহপ্রেম ইসলামের সারসত্তা। আল গাযালি একেই এই জগতে মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেছেন। কিছু কিছু ধর্মতত্ত্ববিদ আল্লাহর প্রতি মানুষের প্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কেননা তাদের যুক্তি হলো একই জাতীয় প্রজাতির মধ্যেই প্রেম হতে পারে, যেহেতু আল্লাহ এবং মানুষ একই জাতীয় নয় কাজেই তাদের মধ্যে প্রেম থাকতে পারে না। এখানে ভালোবাসা শুধু আল্লাহর আনুগত্যকে ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝায় না। আল গাযালি এর জবাবে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার প্রেম ব্যাখ্যা করেছেন এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে তা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। কুরআনের উক্ত হয়েছ, "মানুষের মধ্যে যারা ঈমানদার তারা তো আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে।" [সূরা-২, আ: ১৬৫]" "তোমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তার রাসূলই। আর যারা ঈমান এনেছে, জামায়াতের সঙ্গে নামাজ কায়েম রাখে, যাকাত আদায় করে ও আল্লাহর সামনে মস্তিষ্ক অবনত করে দেয়। যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সঙ্গেও তারাই তো আল্লাহর দল। [সূরা: ৫, আয়াত: ৫৫-৫৬]

অতএব আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে, কুরআন হাদীস ও রাসূলের প্রদর্শিত পথেই সম্ভব। বিকল্প পথেই কোনভাবেই সম্ভব নয়। তালাশ করাও সঠিক নয়। "ইন্নাস সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া ইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"। শুধুমাত্র এই আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব।■

তথ্য সূত্র:

১. পবিত্র কুরআন

২. হাদীস শরীফ

৩. কিমিয়ায়ে সাআদাত / ইমাম গাযালী

৪. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা / ড. রশীদুল আলম

৫. পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস / শওকত হোসেন

৬. শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি / মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম

www.pathagar.com

Invite Group

কাজ করে দেশের তরে...

ইনভাইট গ্রুপ

Head Office : House # 14, 2nd Floor, Road # 12
Sector # 6, Uttara, Dhaka-1230. Bangladesh
Phone : 896 4034, 895 9441, 896 3969, 891 9081
Fax : 88-02-8959714, E-mail : invitebd@yahoo.com
www.invitegroupbd.com

www.pathagar.com

মনিব, দাস ও দাসত্ব

হেলাল আনওয়ার

মানুষ সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠজীব। শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের দান করেছেন মানুষের আকৃতি প্রকৃতির দিক থেকে ও অন্যান্যের থেকে যেমন শ্রেষ্ট তেমনি কাজ কর্ম আচার আচরণগত দিক থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা। এজন্য জগতের সব কিছুই মানুষের বশিভূত।

এধারার সব যেমন মুনষের বশিভূত তেমনি মানুষও কারোর না কারোর অধিনস্ত। আর মানুষ যার নিয়ন্ত্রণে তিনি হলেন সর্ব শক্তিমান মহান রাব্বুল আলামীন। আর মানুষ হলো তার অনুগত দান বা বান্দাহ্। আমরা এখন মনিব, দাস এবং মনিবের দাসত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবো।

দাস শব্দটি বাংলা। এর আরবী প্রতিশব্দ হলো আবদ। যাকে বলা যায় ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত কোনো মানুষ। যার নিজস্বতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিজস্ব চিন্তা-চেতনা বলতে কিছুই থাকেনা। তাকেই দাস হিসাবে গণ্য করা যায়।

প্রাচীনকালে আরব জাতী বাজারের পণ্যের মতো মুনষ প্রায় বিক্রয় করতো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুযষকে হাটে বাজারে উঠানো হতো। এবং পশুর মতো বেচা কেনা হতো। আর যাদের কেনা বেচা হতো তাদেরকে দাস হিসাবে ব্যবহার করা হতো।

www.pathagar.com

আখেরী পয়গাম্বর নবী মুহাম্মাদ [সা] এর আগমনের সময়ও এই দাস প্রথার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। যেমন উমাইয়া বিন খালাফর দাস ছিলো ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল [রা]। দাম তার মনিবের মর্জি মুতাবেক চলতে বাধ্য। যদি কখনো এর ব্যক্রিম হয় তাহলে মনিবের পক্ষ থেকে তার উপর বলতো অমানুষিক নির্যাতন। হযরত বেলাল যখন তার মনিবকে অমান্য করে ইসলামের সুমহান দাওয়াত কবুল করেছিলেন তখনই তার উপর ধর ও নিষ্ঠুর নির্দয় আচরণ করা হয়েছিলো।

এতক্ষণে আমরা দাসের অর্থ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমরা দাসের দাসত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

দাসত্ব হলো মনিবের দেওয়া নির্দেশগুলো মাথা পেতে মেনে নেওয়া এবং সে মুতাবেক তার হুকুম তামিল করা। অর্থাৎ মনিব তার দাসকে যেভাবে চলতে বলতে সে ঠিক সেইভাবে বলবে। যদি কেউ তার মনিবের হুকুম যথাযথভাবে পালন করে তাহলে সে তার মনিবের ভালোবাসায় সিক্ত হবে। আর যদি তা থেকে ব্যর্থ-হয় তাহলে সে মনিবের রোষানল থেকে মুক্ত হতে পারে না। ধরা যাক, একজন কৃষক তার হাল চাষের জন্যে বলদ ক্রয় করলো। দেখা গেল সেই বলদ চাষের অনুপযুক্ত। অর্থাৎ কাজে তেমন ভাল না। এক্ষেত্রে কৃষক সেই বলদকে আদরের পরশ কোলাতে পারেনা। বরং বলদকে যত দ্রুত সম্ভব বিদায় করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আর যদি ভাল হয় তাহলে বলদকে আরো যত্ন করবে। ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। তাদের গায়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে আপন অনুভূতি ব্যক্ত করার চেষ্টা করবে। আর তার মনও আত্ম গৌরবে ভরে উঠবে।

সুতরাং দাসত্ব হলো মনিবের হুকুম যথাযথভাবে পালন করা। যেখানে কোনো প্রকার অবহেলা বা অলসতার লেশ মাত্র পাকবে না। এতো গেল দাস ও দাসত্বের কথা। এখন আমরা মানব নিয়ে আলোচনা করবো।

মনিব বলা হয় বাংলা ভাষায়। আর আরবীতে বলা হয় রব, মালিক যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো মাস্টার বা প্রভু। মনিব বলা হয় যিনি তার অধিনস্ত দাসের সকল প্রকার চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। তাদের ভালো-মন্দ, মুখ-দুখ, সুবিধা-অসুবিধা সকল বিষয় দেখা শোনা করে থাকেন। যদি কোনো মনিব অহেতুক তার দাসের উপর যুলুম করে তাহেল সে তার জন্য অন্যায় করেছে বলে বিবেচিত হবে। এজন্য দাসের উচিৎ তার মনিবকে মান্য করা। আর মনিবের জন্যে দাসের প্রতি মানবিক দিকটা বিবেচনা করা। যার কথা হলো–দাস তার মনিবের জন্যে সম্পূর্ণ উৎসর্গিত। যদি দাস সম্পূর্ণ রূপে তার মনিবের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে তাহেল তার দাসত্ব করা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। যার দাসদের সকল বিষয় বিবেচনা প্রসূত দায়িত্বের সাথে পরিকল্পনা করার নাম হলো মনিব।

দুই.

আমরা আগেই বলেছি মনিব, দাস ও দাসত্বের কথা। এখন এগুলো নিয়ে কুরআন ভিত্তিক আলোচনা করা যাক। মনিবকে আরবীতে রব বলা হয়। আরবী অভিধান

www.pathagar.com

বক্তাদের নিকট রব শব্দের অর্থ হলো প্রতিপালক। যেমন, হযরত ইবরাহীম [আ] বলেছিলেন আসলামতু লি রাব্বিল আলামীন। অর্থাৎ আমি আনুগত্য প্রকাশ করলাম সেই বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি। মাবূদ শব্দের অর্থ হলো যাকে দাসত্ব করা হয়। রব এবং মাবুদ শব্দ দুটির আক্ষরিক ভিন্নতা থাকলেও অর্থের দিক থেকে এক ও অভিন্ন। আল্লাহ বলেন–হে মানুষ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব কর। যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।

দাসত্ব কর বলে এখানে নির্দেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দাসত্ব করতে হবে তা কিন্তু বলা হয়নি। তাই শব্দটি সাধারণ অর্থে [যাকে আস বলা হয়] ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মনিব যে যে বিষয়ে তার আনুগত্য করার জন্য বলেন কেবল ততটুকুই দাসত্ব করতে হবে।

সৃষ্ট জগতের সব কিছুর মাঝে মানুষ এবং জীবকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দাসত্ব করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কাকে কিভাবে দাসত্ব করতে হবে। দাসত্ব করার মাধ্যম কোনটি সে বিষয়ে মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন–"রাসূল [সা] তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা তোমরা করো না। অর্থাৎ আল্লার রাসূল এর কথামতো চলতে পারলেই কেবল মনিবের দাসত্ব করা হবে। অন্যথায় মনিবের দাসত্ব করা হবে না। এমনকি দাসত্ব না হলে মনিবের সন্তুষ্টি অর্জনও সম্ভব হবে না। তাই মনিবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য–মহান রাব্বুল আলামীন যে পথ দেখিয়েছেন তাহলো-তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা চাও তাহলে আমি রাসূল আমাকে আগে ভালবাস। অর্থাৎ আল্লাহ বা মনিবের নৈকট্য লাভের জন্য নবী মুহাম্মাদ [সা] কে সর্ব প্রথম তাঁকে অনুসরণ বা অনুকরণ করতে হবে।

আল্লাহ আমাদের মনিব। আর আমরা মনিবের দাস। এজন্য মনিবের দাসত্ব করা দাসের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। যদি দাস এক্ষেত্রে তার নিজ ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটাতে চাই তাহলে মনিবের দাসত্ব করা হবে না। মনিবের দাসত্ব করার অর্থ হচ্ছে তাঁর ইবাদত করা। আর যদি তাঁর ইবাদত করা না হয় তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনও সম্ভব নয়। তখন ব্যর্থ দাসের জন্যে ভয়াবহ পরিণাম অপেক্ষা করবে।

দাসত্বে জন্যে যে নির্দেশনা দাস করেছে তা কেবল গতানুগতিক নয়। বরং তা দাসের ব্যক্তি স্বার্থ থেকে শুরু করে সার্বিক কল্যাণে ব্যবহার্য্য। এজন্যে মনিবের মাঝে বিভাজন করে দেখা প্রয়োজন। মনিবকে যদি আমরা বিভাজন করি তাহলে বলা যাবে মনিব দুই রকম।

ক. মানুষ মনিব :

দুনিয়ার মানুষ যে প্রভুত্ব অন্যের ওপর করে থাকে। আমরা জানি এই পৃথিবীর সব কিছুই মানুষের অধিন। মানুষ তাদের ইচ্ছে মত এদের ব্যবহার করে থাকে। পশুপাখি এমনকি সব কিছুই।

www.pathagar.com

খ. মহা মনিব :

যিনি দুনিয়ার সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। মানুষসহ আঠারো হাজার মাখলুকাত যার আদেশে পরিচালিত হয়ে থাকে তিনি হলেন মহা মনিব। তিনিই কেবল মানুষের রব, মালিক ও ইলাহ। যেমন কালাম পাকে ইরশাদ হচ্ছেঃ "হে রাসূল! আপনি বলে দিন আমি মানুষের রবের নিকট পানাহ চাই, মানুষের মালিক এর নিকট পানাহ চাই, মানুষের ইলাহ এর নিকট পানাহ চাই।" এখানে মহা মনিবের তিনটি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত রব। শব্দটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব সত্যিকার রব কাকে বলে। রব শব্দের অর্থ হলো-প্রতিপালক। অর্থাৎ যিনি তার অধিনস্ত কে সব কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রতিপালন করে থাকেন।

একটি শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার যাবতীয় দেখা শুনা করে লালন-পালন করাকে প্রতিপালন বলে। তেমনি শুধু মানুষ নয় বিশ্বের সব কিছুকে যিনি যাবতীয় চাহিদা পূরণ করে প্রতিপালন করে থাকেন তিনিই হলেন রব বা মহা মনিব।

দুনিয়ার কোনো মানুষ মানুষের মনিব হতে পারে কিন্তু মহা মনিব হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। মহা মনিব বলেন–আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আমার জন্যে। তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা তিনি সর্ব শক্তিমান তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীতার বান্দাহ বা দাসের ওপর তিনি দাসের বা বান্দার মনের খবর জানেন। তিনি বান্দার গোপন প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। দাস বাঁকা চোখে কি দেখে মহা মনিব তাও জানেন। এভাবে তিনি পাক কালামের বহুস্থানে নিজস্ব ক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

মহা মনিবের অসীম শক্তির কাছে মানুষ মনিবের শক্তি অতি নগন্য অতি তুচ্ছ। মানুষ নিজের ভালমন্দ কিংবা অপরের ভাল মন্দ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। এমনকি সে নিজের ওপর স্থাপন নিয়ন্ত্রণটুকু রাখতে পারে না। সুতরাং দাস হিসাবে যিনি মানুষকে এই দুনিয়ায় পাঠান তাকেই কেবল মহা মনিব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আর যিনিই মহা মনিবের দাসত্বের প্রতি যত্নবান তিনিই পারেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে।

মহা মনিবের শক্তির কাছে মানুষ রূপী মনিবের শক্তি অতি তুচ্ছ। যা আগেই বলা হয়েছে। মানুষ মানুষের জীবন কিংবা মৃত্যু দিতে পারেনা। মানুষ মূলত অতি দুর্বল। পাক কুরআনে দুনিয়ার মানুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন–মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তো তিনিই যিনি মানুষকে অতি দুর্বল করে সৃষ্টি করেন। অত:পর দুর্বলের পর সবল করেন, অত:পর সবলতার পর আবার দুর্বল করেন। অত:পর তিনি তার বান্দাহকে [দাসকে] তার দিকেই ফিরিয়ে নেন। প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তোমরা যে যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের আলিঙ্গন করবেই। যদিও তোমরা কঠিন মর্মে সুরক্ষিত থাক না কেন। প্রত্যেক উম্মাতের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নিদ্ধারণ করা আছে। অত:পর যখন সেই সময়টি চলে আসে তখন কিছু আগে বা পরে মৃত্যু সংঘটিত না হয়ে নির্দিষ্ট সময়ই হয়ে থাকে।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে মহা মনিবের নিকট আমরা বড় দুর্বল। সুতরাং কেউ

www.pathagar.com

যদি দুনিয়ার মানুষকে মহা মনিবের মর্যাদা দেয় তাহলে মহা মনিবের পক্ষ থেকে তার দাস বা মানুষকে শাস্তি দেবার কথা বলেছেন।

তিন.

পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লার দাস। আর মহা মনিব হলেন বিশ্ব স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীন। দাস হয়ে যদি মনিবের মনকে তুষ্ট করতে হয় তাহলে মহা মনিবের নির্দেশ ও আদেশের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাহলে তার নৈকট্য বান্দাহ বা দাসের জন্যে সহজ হবে। আর বান্দাহ যদি তার মহা মনিবের দাসত্ব না করে অন্য কাউকে নেতা বা শক্তির আধার হিসাবে গণ্য করে তাহেল মহা মনিবের পক্ষ থেকে তার শক্তির বিধান ঘোষণা করেছেন। অধুনা বিশ্ব নবতর সভ্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দিনে দিনে মানুষের মেধা ও মননের পরিমার্জিত রূপ লক্ষণীয়। আর এর পেছনে বিজ্ঞান সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখে চলেছে। বিজ্ঞান মানুষকে জাগতিক বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আশ্চর্য থেকে অত্যাশ্চর্য জিনিস মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে পেয়েছে। অনেক অজানা খবর মানুষ বিজ্ঞানের কল্যাণে জাগতে পারছে। মহা শূন্য থেকে শুরু করে সাগর বা মহা সাগরের তলদেশ পর্যন্ত মানুষ প্রতি মুহূর্তে খবর জেনে গেছ। এসব দেখে মানুষ ও যেন পংকপালের মতো প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদেরকে মাথার মনিরূপ মনে করে। আর এজন্য মহা মনিবের দাসত্ব থেকে মানুষ পিছুটান দিচ্ছে। যার ফলে পৃথিবী দিনে দিনে সভ্যতার মরা খোলসে আবদ্ধ হয়ে অস্থির হচ্ছে। শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে সর্বত্রই। পৃথিবীতে ক্রমশ অশান্তি প্রসার লাভ করছে। এক পর্যায়ে মানুষ মানুষের উপর আপন প্রভুত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে।

এজন্যে মহা মনিব খুব স্পষ্টভাবেই ঘোষণা দিলেন–"আমার দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। অত:পর আমার কাছেই তোমাদের যাবতীয় হিসাব পেশ করতে হবে।" সেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে। তাদের আমল নামা তাদের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। সেদিন কারোর মুখ উজ্জ্বল হবে আবার কারোর চেহারা হবে কালো। সেদিন কোনো কোনো চেহারা থাকবে ভীত ও সন্ত্রস্ত। সেদিন কারোর প্রতি জুলুম করা হবে না। যার ওজনের পাল্লা ভারী হবে সে থাকবে মহা মনিবের সন্তুষ্টির মাঝে। আর যার ওজনের পাল্লা হালকা হবে [অর্থাৎ পাপের মাত্রা বেশি হবে, তার ঠিকানা হবে হারিয়া দোযখ। যার সরিষার দানা পরিমাণ ভাল কাজ থাকবে তার প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে। এবং যার সরিষার দানা পরিমান মন্দ আমল থাকার তার প্রতিদানও সেদিন দিয়ে দেয়া হবে।

এসব ঘোষণা থেকে বোঝা যায় মহা মনিব আল্লাহই আমাদের রব বা প্রতিপালক। আর মানুষ মনিব আঠারো হাজার মাখলুকাতের একটি মাত্র। দুনিয়ার মানুষকে তিনি যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন-মানুষ কেবল মাত্র ততটুকুই জ্ঞানী। এর বাইরে মানুষের জানার কোনো সুযোগ নেই। আর আল্লাহই হলেন মহা জ্ঞানী।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান তো আর কিছুই নয় কেবল মাত্র আল্লাহর দেয়া সামান্য জ্ঞানের পাহারাদার মাত্র। তিনি মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা তার জ্ঞানের ধারে কাছেও যেতে পারে না। মহা মহিম আল্লাহ ঘোষণা করেন আমি তোমাদের যে জ্ঞান দান করেছি তা নেহায়েতই কম। আর তিনিই হলেন মহাজ্ঞানী। তার জ্ঞান অনন্ত অসীম।

সুতরাং মানুষ নিজেই অন্যের দাস। আর এক দাস অন্যদাসকে মনিব হিসাবে বা মহা মনিব হিসাবে মান্য করা উচিত নয়। যে যত বড়ই শক্তিশালী হোক না কেন, যত ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, যত সম্পদের মালিক হোক না কেন তা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। আর তাও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

পৃথিবীর বহু মানুষ ইতিপূর্বে মহামনিব হওয়ার স্বপ্ন দেলেছিল কিন্তু কেউ মহা মনিব হতে পারেনি। বরং তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং আমরা দাস। আর দাস হয়ে মনিবের দাসত্ব করাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।■

বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

প্রবন্ধ

১.	বাঙ্গালা সাহিত্যের নুতন ইতিহাস	নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান	৩০০/-
২.	উত্তর আধুনিকতা	ডা. ফাহমিদ-উর-রহমান	২০০/-
৩.	অন্য আলোয় দেখা	ডা. ফাহমিদ-উর-রহমান	৬০/-
৪.	উত্তর আধুনিক মুসলিম মন	ডা. ফাহমিদ-উর-রহমান	৬০/-
৫.	দরোজার পর দরোজা	আবদুল মান্নান সৈয়দ	৬০/-
৬.	কবি ফররুখ ঃ তাঁর মানস ও মনীষা	শাহাবুদ্দীন আহমদ	৫৫/-
৭.	ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান	আবদুল মান্নান তলিব	৫০/-
৮.	ছোটদের হযরত ওমর	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন	৬০/-
৯.	কবি গোলাম মোহাম্মদ রচনা সমগ্র (১)	আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত	৩০০/-

উপন্যাস

১.	কাবিলের বোন (মুক্তি যুদ্ধের উপন্যাস)	আল মাহমুদ	১৫০/-
২.	মুনীরা (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	জামেদ আলী	১০০/-
৩.	মুজাহিদের তলোয়ার (ঐতিহ্যিক উপন্যাস)	নসীম হিজাযী	১৫০/-
৪.	ঈমানদার (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরকার	১৪০/-
৫.	ঝড়মুখী ঘর (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরকার	১৪০/-
৬.	রোহিনী নদীর তীরে (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরকার	৮০/-
৭.	মন মনান্তর (সামাজিক উপন্যাস)	সুফিয়া হাফিজ মুক্তা	৬০/-
৮.	দুই সুলতান (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	জামান সাদী	৪০/-
৯.	আষাঢ়ের আগুন (কিশোর উপন্যাস)	মোহাম্মদ আলী আজম	৬০/-

কবিতা

১.	বখতিয়ারের ঘোড়া	আল মাহমুদ	৫০/-
২.	বিশ্বাসের দিওয়ান	আফজাল চৌধুরী	৬০/-
৩.	তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা	মতিউর রহমান মল্লিক	৫০/-
৪.	শূন্য ও শূন্যতায়	সোলায়মান আহসান	৬০/-

এছাড়াও আবুল আসাদ রচিত সাইমুম সিরিজ ১ থেকে ৫১ নং পর্যন্ত এবং কাশ্মীর সিরিজ ১ থেকে ৯ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

১/বি গ্রীনওয়ে, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ মোবাইল : ০১৭১১৫৮১২৫৫

www.pathagar.com

মানবতাবাদী মহাপুরুষ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

উচ্ছ্বাস

প্রেমের আত্মায় মানবতার বসবাস। সত্যিকার প্রেমের পঙক্তি রচনায় তোমার উপমা তুমিই হে প্রিয় রাসূল [স]। মানবতার পরতে পরতে যে অসংগতি তার সুচিকিৎসায় তোমার প্রেয়ময় ক্ষমা ও সৌন্দর্যবোধ পরিপূরক নেয়ামত। মানব শিশুর ভ্রুণ তৈরির পূর্ব থেকেই তোমার যে প্রেমপরশ তা মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শৈশব-কৈশর-যৌবন ও পৌঢ়কাল পেরিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মানবতাবাদী শ্লোগানের খোলসে যে নারকীয়তা, তার জ্বালাময়ী উদর দেখেছি আইয়্যামে জাহেলিয়াত থেকে একাবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানময় বিশ্বের আধুনিকতা পর্যন্ত। প্রেমের মোড়কে বিকানো সব আদর্শেই বিষধর সাপ, আগুনের লেলিহান শিখা। ফলে শুধু টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এবং রুপসা থেকে পাথুরিয়া নয়, বিশ্বের প্রত্যেক জনপদেই হাহাকার, ফিরে আসে শান্তির মুখোশ। তাই এ প্রেক্ষাপটে শুধু তোমাকেই মনে পড়ে। এ মনেপড়া শুধু বিশ্বাসী হৃদয়েই নয়-অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীরাও তোমায় স্মরণ করে টমাস কারলাইলের মতো। তোমার বিপ্লব ছিল এক প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিংগ, যা দিল্লী থেকে গ্রানাডা এবং দুনিয়া থেকে আসমান পর্যন্ত যে

www.pathagar.com

অমানবিকতা ও অসত্যের আবর্জনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তা চোখের নিমিষে পুড়ে ছাড়খার করে দিল। তাইতো তোমাকে আবার চায় এ পৃথিবী।

ফিরে দেখা

মনুষত্বের ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন পতাকা হাতে মানবতার কাণ্ডারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ [সা]। অজ্ঞতা, বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারীতার দাপটে মানবতা যখন ভুলুণ্ঠিত তখনই তাঁর আগমন। ভাইয়ে-ভাইয়ে, বোনে-বোনে, পিতা-পুত্রে, ঘরে-বাইরে, সমাজে-অর্থনীতিতে এমনকি ধর্ম বিশ্বাসেও শুধু দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের খবর। 'জোর যার মুল্‌ক তার' এ নীতি যেমন সর্বত্র বিরাজমান তেমনি 'নারী, মদ ও যুদ্ধ' নেতৃত্বের শীর্ষতম গুণাবলী। সমাজের অর্ধেক নারী হলেও তারা ছিলেন ভোগের সামগ্রী মাত্র। যখন যাকে যেভাবে ইচ্ছে ভোগ করত ক্ষমতাবান পুরুষরা। নিজেরা যথেচ্ছা নারী ভোগে লোলুপ থাকলেও নিজের বংশের মান বাঁচাতে স্বীয় কন্যাকে স্বহস্তে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। শত্রুর সাথে গলাগলি তো দূরের কথা, দাস-দাসী থেকে শুরু করে পরিবারের প্রিয়জন পর্যন্ত নিষ্ঠুরতার স্বীকার হতো। মূলত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের জ্ঞান না থাকার কারণে মানবতাবোধের এত অবক্ষয়। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ এসময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়া নামে অভিহিত করেছেন।

মানবতা ও প্রেম

রাতের পরে দিনের আলো যেমন প্রত্যাশিত বাস্তবতা, সেই বাস্তবতার নিরিখে মহানবী [সা] এলেন অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির আবাদ করতে। এলেন তিনি ওহীর বারতা এবং প্রেমের অথৈই সাগর বুকে ধারণ করে মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে। স্বস্তি ফিরে আসে আকাশে-বাতাসে, সৃষ্টির পরতে পরতে নেমে আসে প্রশান্তির ছোঁয়া। প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে আশাহত শিশু কিশোর, সুখের স্বপ্ন দেখে ঘর পোড়া দম্পতি, আলোয় বেরিয়ে আসে অন্ধকারে থাকা নারী সমাজ; বাঁচার স্বপ্ন দেখে দাস-দাসী এবং সমাজের অস্পৃশ্য মানবমণ্ডলী।

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'। এ বাস্তবসত্যকে সামাজিকভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য বর্তমানে শিশু অধিকার নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা শ্লোগান। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত, তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শিশু অধিকার দিবস ঘোষণা করা হলেও দিন যত গড়াচ্ছে শিশু অধিকার ততই ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। অথচ অনেক আগেই শিশু অধিকার নিশ্চিতকল্পে মহানবী [সা] নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। মহানবী [সা] যখন কোন সওয়ারীতে আরোহন করতেন তখন আগে-পিছে শিশুদেরকে তুলে নিতেন এবং পথিমধ্যে খেলাধুলারত শিশুদের আদর সোহাগ করাকে তাহাদের অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং পুত্র-কন্যা উভয় শিশুকেই সমভাবে স্নেহ মমতা করার আদেশ দিয়েছেন। শিশুদের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধ হিসেবে না দেখে মমতা মাখা আদরে তা সুধরে দিতেন। তিনি শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়াকে বিশেষভাবে

www.pathagar.com

গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উত্তম সদকা বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা সঠিক শিক্ষা না পেলেই শিশু-কিশোরেরা বিভ্রান্ত হবার সুযোগ পায়, বিশেষত কিশোর বয়সন্ধিক্ষণে অপরাধ জগত তাদেরকে রঙিন স্বপ্নে হাতছানি দেয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন শিশু-কিশোর অধিকারের উজ্জ্বল প্রতীক।

একবিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানের যৌবনামুহূর্তে প্রেম, মানবতাবোধ, মানবাধিকার, প্রগতিশীলতা প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যপক আকর্ষনীয় রঙে উপস্থাপিত হচ্ছে। আধুনিকতার প্যাকেজ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন তৈরীতে ভীষণভাবে ব্যস্ত বিজ্ঞানের স্বপ্নময়ী নির্মাতাগণ। এ স্বপ্নের দোলায় দুলতে দুলতে আমরাও জীবনের বাস্তবতার উপভোগ্যতা হারিয়ে সর্বক্ষণ স্বপ্নের মতো দৌড়াচ্ছি। নতুন নতুন যন্ত্রের সাথে আমরাও হয়ে যাচ্ছি জীবন্ত রোবট। হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসে হযরত আজরাঈল [আ] এর ডাকে। কিন্তু কিছুই করার নেই। শুধু টিকিট সংগ্রহই নয়, ওপারের বাহনে উঠে যাত্রা শুরু। পরপারের বাস্তবতায় নয় পৃথিবীবাসির বিশ্লেষনেই আমার প্রেম প্রমাণিত হলো স্বার্থবাদী হিসেবে, মানবতাবোধ চিহ্নিত হলো নিজের সুখ-শান্তি ধরার ফাঁদ হিসেবে। মানবাধিকার উপস্থাপিত হলো অন্যের অধিকারের নাম করে নিজের আয়েশী জীবন পাবার মুখোশ হিসেবে এবং দুর্গতি ও দুর্দশাগ্রস্ত-দুর্গতিময় সামাজিক অবকাঠামো গড়ার বাহন হিসেবে। প্রমাণিত হলো প্রগতিশীলতা। তাহলে কি পেলাম এ রঙিন শ্লোগানে নিজেকে উচ্চকিত করে? 'ভালবাসার শেষ ফল, বুকে ব্যথা চোখে জল' সে জলটুকুও মিলবে কি? তাই মানবতাবাদী মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ [স] এর আদর্শের কাছে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

এ কথা নির্মম সত্য যে, একবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানের যুগে এসেও আমরা ঘুরে ফিরে আবার সেই জাহেলিয়া যুগেই ফিরে যাচ্ছি। আধুনিকতার মোড়কে নারীদের পণ্য বানানো হচ্ছে। মিডিয়া ও বিনোদনে নারীকে সাজানো হচ্ছে ভোগের সামগ্রী হিসেবে। নারী অধিকারের ভোকাল শ্লোগানিষ্টরাই কন্যা সন্তান রোধে কন্যা ভ্রুণ হত্যায় চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করছে। ভারতের মতো মানবতাবাদী ও নারী অধিকারের প্রবক্তা বলে পরিচয়দানকারী রাষ্ট্রে দৈনিক প্রায় ৩ হাজারের অধিক কন্যা ভ্রুণ হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি তামিলনারু ও রাজস্থানের মতো বিভিন্ন রাষ্ট্রে বড় বড় পোষ্টার ও প্রচারপত্রে শ্লোগান তোলা হয়েছে ৫০০ রুপি খরচ করুন, ৫ লাখ রুপি বাঁচান। অর্থাৎ ৫০০ রুপি খরচ করে আলট্রাস্নোগ্রাফী করে নিশ্চিত হোন পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে। মেয়ে হলে তাকে হত্যা করে তার ভরণ-পোষণ ও যৌতুকের ৫ লাখ টাকা বাঁচান। জাহেলিয়াযুগের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরদানের আধুনিকরূপ নয়কি এটা? অথচ মহানবী [সা] এরশাদ করেছেন, যে পিতা একটি অথবা দু'টি অথবা তিনটি কন্যা সন্তান সন্তোষ্ট চিত্তে লালন-পালন করে সুশিক্ষা দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে সে পিতা-মাতা এবং আমি জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করবো। তিনি আরো বলেছেন, কন্যা সন্তান তোমার জান্নাতের উছিলা এবং জাহান্নামের বাধা। পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে, স্ত্রীরা তোমাদের পোষাক পুরুষরাও তাদের পোশাক।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র সমাজের সাধারণ নারীই নয় বরং বিধবা নারীরা ছিল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। তাদেরকে সমাজের এতটাই বোঝা মনে করা হয়েছিল যে, তারা বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই বেশি সহজ ও কল্যাণকর মনে করত। মহানবী [সা] বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদেরকে সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত আয়েশা [রা] ছাড়া তাঁর সমস্ত স্ত্রীগণই বিধবা ছিলেন। তিনি বিধবা ও ইয়াতিমদের সম্পর্কে ঘোষণা করেন, যে কেউ কোন বিধবা ও ইয়াতিম [মিসকিনের] এর কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকে সে আল্লাহর পথে জিহাদেরত কিংবা ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে দিনে রোজা রাখে এবং সারারাত ইবাদতে কাটায়, [তিরমিজী]। অথচ আধুনিক বিশ্বেও বিধবা নারীগণ সামাজিকভাবে বঞ্চনার শিকার। মাত্র একশত বছর পূর্বেও দাস-দাসীগণ ছিলেন সমাজের সবচেয়ে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠি। মনে করা হতো যে, দাস-দাসীদেরকে মনিবের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারাও যে মানুষ এ ধারণাই করা হতো না । মহানবী [সা] প্রথম শ্রেণী বিভেদ দূর করলেন এবং দাস-দাসীগণকে মানব সমাজের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দাসদেরকে আযাদ করে তার পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "দাস-দাসীগণও তোমাদের মতই মানুষ এবং তোমাদেরই ভ্রাতা, ভগ্নি বা তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তোমরা নিজেরা যা খাও তাদিগকে তাই খাওয়াও, নিজেরা যা পরিধান কর তাদিগকে তাই পরিধান করাও এবং তাদিগকে সাধ্যের অধিক কাজ দিবেনা, যদি দিতেই হয় তবে নিজেরাও সহায়তা করবে"। অথচ বর্তমান বিজ্ঞানময় আধুনিক সমাজে দাস-দাসী না থাকলেও বাড়ির কাজের বুয়া, গেন্দু কিংবা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বাসাবাড়ির কাজে নিয়োগ করে তাদের প্রতি কেমন আচরণই বা করা হয়? যারা বেশি প্রগতিশীলতার ধারক-বাহক, শিশু অধিকার সম্পর্কে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে ব্যস্ত থাকেন তাদের ঘরের কাজের শিশুটিই বেশি অধিকার বঞ্চিত। এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিদের ঘরেই কাজের বুয়া কিংবা কাজের শিশুরা বেশি নিগৃহীত হয়-নির্যাতিত হয়, এমনকি জীবননাশের মত ঘটনাও ঘটে।

ঘোষণাপর্ব

এ প্রেক্ষাপটে উচ্চস্বরে ঘোষণা করা যায়, কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতাদর্শ নয়, কেবল মহানবীর [সা] আদর্শই পারে মানুষকে মানবতাবোধে উজ্জীবিত করতে। তিনি নন আরবে কিংবা অনারবের, শুধু আমিরের, নন শুধু ফকিরের। তিনি একক কারো নন, তিনি সকলের; সকল মানুষের। মানতাবাদের যে ফসিল আমাদের সামনে ঝুলানো হচ্ছে এগুলো আলেয়া কিংবা রঙিন ফানুস বৈ কিছু নয়। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে বলতেই পারি, হে মুহাম্মাদ [স] তুমিই মানবতাবাদী প্রেমিক মহাপুরুষ; তোমার পরশেই এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির মশাল জ্বলে উঠতে পারে। তোমার আর্দশের ছোঁয়ায় এ সবুজ জমিনে বয়ে যাক সুখ-শান্তির বহতা নদী; প্রেম ও মানবতাবাদের স্রোতে প্লাবিত হোক মানবজমিন।■

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] কর্মকৌশল প্রেক্ষিত দারিদ্র্য বিমোচন

এ কে আজাদ

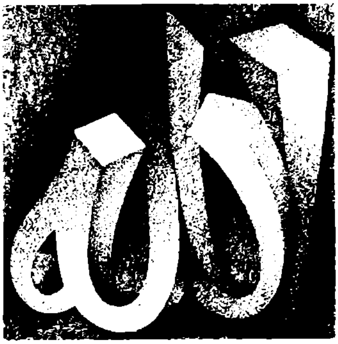

"আজ এই দিনে তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর ইসলামকে দ্বীন [পরিপূর্ণ জীবন বিধান] হিসাবে মনোনীত করলাম।" [আল কুরআন, সূরা: মায়েদা-০৩]

Islam is the complete code of life. ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সমাধান যেমন ইসলামে আছে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের গাইড লাইনও তেমন ইসলামে আছে। আর রাসূল [সা] তো সেই ইসলামেরই বার্তাবাহক। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা [রা]কে জিজ্ঞাসা করা হলো রাসূলের জীবন সম্বন্ধে। তিনি উত্তর দিলেন– তোমরা কি কুরআন পড়নি! কুরআন শরীফে বর্ণিত জীবন চরিতই রাসূলের [সা] জীবন। জীবনের অন্যান্য সমস্যাবলীর সমাধান যেমন রাসূল [সা] দিয়েছেন মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধেও তেমনি তিনি সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাস্তব জীবনেও সেই নির্দেশনা প্রয়োগ করে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দারিদ্র্য বিমোচনে রাসূল [সা] এর ভূমিকা আলোচনা করার পূর্বে রাসূলের মুখ নি:সৃত একটা হাদীস বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিরমিজি

www.pathagar.com

শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটিতে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুলাহ্ ইবনে মাসউদ [রা] বর্ণনা করেন - রাসূল [সা] বলেছেন- কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানের কেউই এক কদমও অগ্রসর হতে পারবে না। পাঁচটি প্রশ্ন হলো– ১. তার জীবন সে কিভাবে কাটিয়েছে ২. তার যৌবন সে কিভাবে নিঃশেষ করেছে, ৩. তার ধন সম্পদ সে কিভাবে অর্জন করেছে, ৪. তার অর্জিত ধন সম্পদ সে কিভাবে ব্যয় করেছে। এবং ৫. তার জ্ঞান সে কিভাবে ব্যবহার করেছে। [তিরমিজি]

উপরোক্ত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টি প্রশ্নই অর্থ উপার্জন এবং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত। আর মানুষের দারিদ্র্য তো অর্থের মাধ্যমেই পরিমাপিত হয়। জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় ও ব্যয় করার সামর্থ যাদের নেই অর্থাৎ যারা নিজেদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারেনা প্রচলিত অর্থে তাদেরকেই দরিদ্র বলা হয়। তবে দারিদ্রের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছে ইসলাম। ইসলামী আইনে "দরিদ্র" ও "স্বচ্ছল" বলতে দু'টো শ্রেণীকে বুঝানো হয়। দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বচ্ছল করে দেয়াই ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। আর সে কারণেই ইসলামী আইন বিশারদগণ দারিদ্র্য, স্বচ্ছলতা, দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায়-পন্থা ইত্যাকার বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করেছেন। সেক্ষেত্রে স্বয়ং মহান আলাহ্ রাব্বুল আলামীনই শিখিয়েছেন মূলসূত্র :

"হে প্রভু আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দান কর এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান কর এবং কিয়ামতের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি দান কর।" [আল্ কুরআন, সূরা বাকারাঃ ২০১]

দুনিয়া ও আখিরাতের যে মঙ্গল মানুষের বাসনা তা অর্জনের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টার যে পন্থা তা বাতলে দেয়ার জন্যই যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন আল-াহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ [সা] হলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল যিনি মানুষের আত্নিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যেমন কাজ করেছেন, মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্যও তেমন কাজ করেছেন। দেখিয়েছেন দারিদ্র ও শোষন মুক্ত সমাজের নমুনা। দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিস্পেশিত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি স্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। ইতিহাস সাক্ষী- যে আরবরা একদিন এত দরিদ্র ছিল যে অভাবের তাড়নায় তারা দেবতাদের পর্যন্ত চেটে খেয়ে ফেলত, রক্ত, চামড়া কিছুই বাদ পড়ত না তাদের খাদ্যতালিকা থেকে এবং অনটনই ছিল যাদের নিত্য সঙ্গী; মহানবী [সা] এর মাত্র কয়েক বছরের আদল ও ইহসানপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে সেই আরবদের আর্থসামাজিক অবস্থার এমনই উন্নতি হলো যে যাকাতের অর্থ নেয়ার মত লোক সমাজে পাওয়া গেল না। কী কারিশমা দেখালেন মহানবী [সা] যার বদৌলতে অর্থনৈতিক এমন আমূল পরিবর্তন, এমন বিপব সাধিত হলো সমগ্র আরব জাহানে! কোন্ পন্থা অবলম্বন করলেন তিনি যার কারণে দারিদ্র্য হলো দূরীভূত ও নির্বাসিত এবং স্বচ্ছলতা এসে আরবদের ঘরে উঁকি দিলো প্রতিদিনের সূর্যদয়ের মতো! মহানবী [সা] এর সেই কর্মকৌশল এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তা কতটুকু অবদান রাখতে পারে- তা-ই বহমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী [সা] এর ভূমিকা আলোচনার পূর্বে দারিদ্র্য সম্পর্কে সংক্ষপে

www.pathagar.com

দু'চারটি কথা বলে রাখা ভাল। যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি বিশারদ জে. এল হ্যানসন তার "এ ডিকশনারী অব ইকোনোমিক্স এ্যান্ড কমার্স" গ্রন্থে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "দারিদ্র্যভুক্ত বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে যা দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা বা প্রয়োজন মেটাতে সে ব্যর্থ হয়"। আর দারিদ্র্যকে দুভাগে ভাগ করে তাদের প্রত্যেকের সংজ্ঞা দিয়েছেন মানবতার মুক্তির দূত মানব ইতিহাসের সফল রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মাদ [সা]। কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে চরম দারিদ্র্য সীমাকে দু'টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন– ১. ফকীর ও ২. মিসকিন। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় উপকরণ নেই, যারা সর্বোতভাবেই নিঃস্ব, পথের ভিখারী তারাই মূলতঃ ফকীর। অর্থাৎ চরম অভাবগ্রস্ত। আর মিসকিন বলতে তাদেরকে বুঝানো হয় যাদের অবস্থা এখনো শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেনি। কিন্তু আশু ব্যবস্থা নিতে না পারলে তাদের হয়তো রাস্তায় দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন উপায়ও থাকবে না। তবে আত্মমর্যাদার কারণে তারা মানুষের কাছে হাত পাততে পারে না। সহীহ মুসলীম শরীফের এক হাদীসে মিসকিনের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল [সা] বলেছেন– ১. যার ধনী হবার সামর্থ নেই ২. দারিদ্র্য প্রকাশ পায় না বলে ভিক্ষাও জোটে না এবং ৩. হাত পেতে কারও কাছে কিছু চায় না। মিসকিনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা বাকারা এর ২৭৩ নং আয়াতে মহান আলাহ পাক বলেন- খয়রাত ঐ সমস্ত গরীব লোকদের জন্য যারা আলাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী বলে গণ্য করে। আপনি তাদের চেহারা দেখেই [ভেতরের অবস্থা] আঁচ করতে পারেন। তারা মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা চায় না।" [সূরা বাকারা -২৭৩] । এছাড়া, সাধারণ দরিদ্র বলতে ইসলামের বিধান মুতাবেক যাকাত প্রদান করার মত নিসাব পরিমাণ সম্পদ যার নেই কিন্তু ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম ।

দারিদ্র্য কী, কারা কোন প্রকারের দরিদ্র এবং কার জন্য কোন্ প্রকারে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করা যায় তা পরিষ্কারভাবেই জানতেন মহানবী [সা]। আর এক্ষেত্রে তাঁকে সর্বোতভাবে জ্ঞান দান করেছেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আসমান জমীনের স্রষ্টা মহান আলাহ রাব্বুল আলামীন। কেননা ইসলামী অর্থনীতিতে সকল সম্পদের মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং মানুষ কেবল এর রক্ষক এবং ভক্ষক মাত্র। কোন্ কর্ম কোন্ পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হবে তাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি সর্ব বিষয়েই দিয়েছেন বিধান। ইরশাদ হচ্ছে– "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনের মধ্যে যে বিধান [শরীয়ত] দিয়েছেন"। আর সেই শরীয়ত এর উদ্দেশ্য হলো মানব কল্যাণ। অর্থাৎ সকল সম্পদ মানব কল্যাণেই ব্যয় হবে এটিই মূল কথা। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম বা অন্য কোন মতবাদ মানব কল্যাণের কথা এত সর্বোতভাবে কল্পনায় আনেনি। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল [Bertrand Russell] তাঁর "Unarmed Victory" বইতে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন "I dislike Communism because it is undermorcratic and Capitalism because it favours exploitations" [আমি সমাজতন্ত্র অপছন্দ করি কারণ

www.pathagar.com

তা গণতান্ত্রিক নয়; আমি ধনতন্ত্রকে অপছন্দ করি কারণ তা শোষণের পক্ষপাতিত্ব করে]। আর ইসলাম সে তো চির শাশ্বত। ইসলামী অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্যই হলো আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। পানি যেমন উঁচু স্থান থেকে সর্বদা নিচু স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়, ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদও তেমন ধনীদের হাত থেকে গরীবের হাতে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ গরীবকে স্বচ্ছলতা দান করে। মহানবী [সা] সেই কাজটিই দেখিয়েছেন প্রাকটিক্যালী এবং করেছেন দারিদ্র্য বিমোচনে।

দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী [সা] এর স্ট্র্যাটিজি বা কর্মকৌশলগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলেই তাঁর দারিদ্র্য বিমোচনের স্বরূপ আমাদেও কাছে পরিস্কার হয়ে যায়।

ভোগবাদী সমাজে সম্পদের পিছনে ছুটাই মানুষের কাজ । সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক হওয়া এবং সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখাই ধনতান্ত্রিক প্রথার মূলনীতি, যা মানুষের ভেতর স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতারই জন্ম দেয় মাত্র। মহানবী [সা] সম্পদের ওপর মানুষের নিরঙ্কুশ মালিকানার ধারণা রহিত করে শুরুতেই শোষণবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটন করে ঘোষণা করেন আল্লাহর বাণী :

"আসমান যমীনে যা কিছু আছে তার সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।" [সূরা বাকারা ২৮৪]

সেই সাথে আল্লাহ পাকের আরও ঘোষণা হলো মানুষ তার খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। আল্লাহ পাকের আরও ঘোষণা হলো–

"তোমাদের কল্যাণে তিনি নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাঁর নিজ অনুগ্রহে এবং চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।" [সূরা জাসিয়া : ১৩]

সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রচলনের ফলে সম্পদ অর্জনের উন্মত্ত ও অবৈধ প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে লাগামহীনতাকে যেমন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, তেমনি যারা দরিদ্র তাদেরকে উৎসাহিতও করা হয়েছে কর্মে ব্যপ্ত হয়ে সম্পদ অর্জনের জন্য , রিযিক সন্ধানের জন্য। ফলে সমাজে ধনী গরীবের ব্যবধান কমতে থাকে। যেহেতু অভাবী মানুষের অভাবকে দূরীভূত করা এবং সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য, সেহেতু সমাজ থেকে অভাব অনটন দূর করার জন্য ইসলাম দিয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি। আর সেই কর্মকৌশল মহানবী [সা] তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে সৃষ্টি করেছেন মহান আদর্শ; যে আদর্শ বর্তমান সময়ে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করে আমরাও বিমোচন করতে পারি দারিদ্র্য। মহানবীর [সা] সেই কর্মকৌশলে পর্যায়ক্রমে এবার মনোনিবেশ করা যাক।

কর্মোদ্দীপনা

সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত করার প্রথম এবং প্রধান কৌশল হলো কর্মোদ্দীপনা বা কর্মে ব্যপ্ত থাকা। পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

www.pathagar.com

"নামাজ শেষ হলে পরে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আলাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও"। [সূরা জুমআ-১০]

পবিত্র কুরআন শরীফের এই আয়াতই আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ বহন করে যে নামাজ বা বন্দেগী হলে ব্যবসা-বাণিজ্য, রিযিকের সন্ধান ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবে ঐ সমস্ত কাজে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হালাল পন্থায় এবং হালাল কাজের মাধ্যমেই রিযিকের সন্ধান করতে হবে। আর এর মধ্যেই রয়েছে সফলতা।

মহানবী [সা] নিজেও সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং সাহাবীদেরকে কাজের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। কাজ করতে গিয়ে কখনো কখনো তাঁর হাতে ফোসকা পড়ত, আর তিনি সেই হাত দেখিয়ে বলতেন "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল [সা] এরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন এবং ভালবাসেন"।

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত আছে– "মহানবী [সা]কে সাহাবীগণ একদিন জিজ্ঞাসা করলেন–কোন্ প্রকারের উপার্জন উত্তম? মহানবী [সা] বললেন নিজ হাতের কাজের বিনিময়ে করা উপার্জন বা সুষ্ঠু ব্যবসায়লব্ধ মুনাফা।" [মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং -৪৩৭৫]

মহানবী [সা] নিজেও ব্যবসা করতেন, বকরী চরাতেন এবং নিজ হাতে কাজ করতেন এবং তাঁর সাহাবীবর্গও পরিশ্রমের মাধ্যমে ও ব্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। এমনিভাবে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে মহানবী [সা] তাঁর সমাজের দারিদ্র্য বিমোচনে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

ব্যবসা

"আল্লাহ ব্যবসা [কেনাবেচা] কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" [সূরা বাকারা : ২৫৭]

দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম পন্থা হল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসাকে ইসলামী অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। বিশেষ করে শুধু দারিদ্র বিমোচন নয়, নিজের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্যও ব্যবসাকেই ইসলাম অন্যতম প্রধান মাধ্যম বলে মনে করে। মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সূরা আন্ নিসার ২৯ নং আয়াতে বর্ণনা করেন:

"হে মুমিনগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না। তবে পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করা তোমাদের জন্য বৈধ।" [সূরা-নিসা-২৯]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যবসার ব্যাপারে যেমন উৎসাহ প্রদান করেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] তেমনি ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছেন। শুধু তাই নয় মহানবী [সা] নিজেও ব্যবসা করেছেন। সেই সাথে ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতারও প্রমাণ মিলে। একবার তিনি হযরত খাদিজা [রা] এর ব্যবসার পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া গমন করেন

www.pathagar.com

এবং দক্ষতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করে তিনি ফিরে আসেন। তিরমিজি শরীফের ১১৩০ নং হাদীসে রাসূল [সা] বলেন–

"সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সত্যবাদী ও শহীদদের মত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন।"

সুনানু ইবনে মাজাহ এর কিতাবুল আহকাম অধ্যায়ে রাসূল [সা] বর্ণনা করেন– "তোমরা ব্যবসা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দেবেন।"

এমনিভাবে মহানবী [সা] দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যবসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বেকারত্ব দূরীকরণ

বেকারত্ব একটি দেশের জন্য মৌলিক একটি সমস্যা। বেকারত্ব ও দারিদ্র্য একই সুত্রে গাঁথা। বেকারত্ব থাকলে দারিদ্র্য থাকবেই। বেকারত্ব বলতে মূলত অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাকেই বুঝায়। প্রফেসর মুহাম্মদ মঞ্জুর আলী খান, আ.স.ম. সালাউদ্দিন ও মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম রচিত "বাংলাশের অর্থনীতি" শীর্ষক গ্রন্থে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Everyman's Dictionary of Economics এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সে মতে বেকারত্ব হলো–

"Unemployment is involuntary idleness of a person willing to work at prevailing rate of pay but unable to find it."

অর্থাৎ "বেকারত্ব হলো একজন ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত অবসর যিনি প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে চান, কিন্তু কাজ পান না।"

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক মতাদর্শ সেহেতু বেকার সমস্যা সমাধানেও ইসলামী অর্থনীতির একটি দিক নির্দেশনা অবশ্যই আছে।

ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দিন তার "ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ" বইতে উল্লেখ করেন যে "তার [রাসূলের] কার্যধারা দেখে এটাও বুঝা যায় যে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও ছিল তাঁর নবুওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য"। কর্মহীন মানুষকে কাজ প্রদান বা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে রাসূল [সা] ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদাই কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

একবার একজন আনসারী মহানবী [সা] কাছে এসে সাহায্য চাইল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন- "তোমার কি কি সম্পদ আছে? সে উত্তর দিল একটি কম্বল ও একটি পেয়ালা। রাসূল [সা] তাকে তার কম্বল ও পেয়ালা আনতে বললেন এবং এগুলো নিলামে বিক্রি করে ২ দিরহাম সংগ্রহ করলেন। ১ দিরহাম দিয়ে ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে একটি কুঠার আনালেন এবং সেই কুঠারে তিনি নিজ হাতে হাতল লাগালেন। তারপর সেই কুঠারটি তার হাতে দিয়ে তিনি বললেন যাও জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটো এবং পনের দিন যেন আমি তোমাকে আর না দেখি। আনসারী তাই করলেন। পনের দিন পর সে রাসূলের দরবারে এলে রাসূল [সা] তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার কি সংবাদ? সে জানালো কয়েকদিনে আমার দশ দিরহাম আমদানী হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েক দিরহাম দিয়ে কাপড় কিনেছি, আর কয়েক দিরহাম দিয়ে তরিতরকারী। রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন এটা

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ তা থেকে যে তুমি সাওয়াল করে বেড়াও এবং কিয়ামতের দিন অপমানিত হও। [সুনানু আবু দাউদ, কিতাবুযযাকাত, হাদীস নং -১৩৯৮]

এছাড়াও মুহাজিররা প্রথম যখন মদীনায় আসেন তখন আনসাররা রাসূল [সা] কে বললেন- "হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাদের খেজুরের বাগানগুলো আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিন। কিন্তু রাসূল [সা] এতে রাজি হলেন না। অত:পর আনসাররা নিবেদন করলো তাহলো তারা আমাদের ক্ষেতের কাজে অংশগ্রহণ করুক, আমরা তাদেরকে ফসলের অংশীদার করে নেব। মুহাজিররা আনসারদের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে"। এভাবে রাসূল [সা] মুহাজিরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলেন।

"একবার রাসূল [সা]কে জিজ্ঞাসা করা হলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ [সা] কোন্ ধরনের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর ? রাসূল [সা] বললেন নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন।" [ইবনে মাজাহ্র কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং-২১২৯]

শুধু তাই নয়, সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুল বুয়ূ অধ্যায়ের ১৯৬০ নং হাদীসে বর্ণিত আছে- "রাসূল [সা] বলেছেন- যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রেখো আল্লাহর নবী দাউদ [আ] নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ্ করতেন।"

এমনিভাবে রাসূল [সা] এবং তাঁর পরবর্তীতে তাঁর সাহাবায়ে আজমাইন অভাবগ্রস্ত মানুষদেরকে কর্মের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং বেকার সমস্যা সমাধানে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছেন।

ভিক্ষাবৃত্তির মূলোৎপাটন

ইসলাম স্বনির্ভরতায় বিশ্বাসী। আর আলাহর রাসূল [সা] তো সেই দীক্ষারই প্রতিভূ। কর্মচঞ্চলতাই যেন রাসূল [সা] এর কর্মনীতি। তাই তো তিনি কাজে বিশ্বাসী। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল [সা] বলেছেন- "[যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে] তারা জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর চিবাবে।" তিনি আরও বলেছেন- "তোমাদের মাঝে যে ভিক্ষা করে সে যখন আল্লাহর সামনে যাবে তখন তার চেহারায় একটুকরো গোশতও থাকবে না" [মুত্তাফাকুন আলাইহে]।

বুখারী ও মসলিম শরীফে উদ্ধৃত অপর এক হাদীসে রাসূল [সা] বলেছেন, "উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। উপরের হাত দাতার এবং নিচের হাত গ্রহীতার।"

এমনিভাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে মানুষকে কর্মোদ্দীপনা প্রদান করেছেন কর্মের দিশারী মহানবী [সা]। ফলে তাঁর সময়ে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সমগ্র আরব জাহান থেকে ভিক্ষাবৃত্তি চিরতরে মূলোৎপাটিত হয়। অর্থাৎ দারিদ্র্যতার কালোছায়া থেকে মুক্ত হয় আরব বিশ্ব।

শ্রমিকের সঠিক মূল্য প্রদান

শ্রমের প্রতি যেমন লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন মহানবী [সা], শ্রমিকের সঠিক মজুরী প্রদানের ব্যাপারেও মহানবী [সা] রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ ব্যাপারে রাসূল [সা]

www.pathagar.com

এর নির্দেশ হচ্ছে "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার প্রাপ্য মিটিয়ে দাও" [সুনানু ইবনু মাজাহ, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং-২৪৩৪] শ্রমিকদেরকে মালিকের ভাই হিসাবে অভিহিত করে মহানবী [সা] বলেছেন– "তোমরা যা খাবে তোমাদের অধীনস্থদেরকেও তাই খেতে দেবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরতে দেবে।" [সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং -২৯]

এমনিভাবে মহানবী [সা] শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অনবদ্য এক ভূমিকা পালন করেছেন।

নারীদের কর্মসংস্থান

পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রতিও ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন শরীফের বক্তব্য হলো "পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ আর নারী যা উপার্জন করে সেটা তার অংশ।" [সূরা আন নিসা, আয়াত নং ৩২]। "আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী।" [সূরা আল ইমরান-১৯৫]। এ ব্যাপারে সহীহ মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবা অধ্যায়ের ৪৯০ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "আয়শা ছিদ্দিকা [রা] বলেন–আমাদের মধ্যে যয়নব ছিলেন সবচেয়ে বেশী দয়ালু। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন এবং দান করতেন।" মহিলাদের প্রয়োজন মেটাতে ঘরের বাইরে যাওয়া প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী শরীফে উদ্ধৃত কিতাবু তাফসিরিল কুরআন অধ্যায়ে ৪৪২১ নং হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল [সা] বলেছেন "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে [মহিলা] তোমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। "

মিরাসী আইন

এমনিভাবে সমাজের সকল স্তরের মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের উপর মহানবী [সা] যেমন গুরুত্বারোপ করেছেন, পূর্বসূরীদের সম্পদের ওপর উত্তরসূরীদের অধিকারও তেমনি নিশ্চিত করেছেন তিনি; যাতে করে সম্পদ নিদিষ্ট কারও কাছে পুঞ্জিভূত হয়ে না থাকে। এমনিভাবে সম্পদের হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণেও তিনি রেখেছেন অত্যন্ত বিবেচনাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন পাকে সূরা আন্ নিসার ৭ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা হলো– "পিতা মাতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে যায়, পুরুষ [অংশীদারগণ] তা থেকে অংশ পাবে। আর মহিলাও [অংশীদারগণ] তা থেকে অংশ পাবে। সে উত্তরাধিকার কম হোক আর বেশী হোক, এ হলো নির্ধারিত অংশ।"

ইসলামী মিরাসী এই আইন বাস্তবায়িত হলে নারী পুরুষ উভয়েই তাদের পূর্বসূরীদের নিকট থেকে সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হয় এবং সম্পদের মালিক হয়। ফলে সমাজে কেউ আর সম্পদহীন থাকে না এবং দারিদ্র্য দূরীভূত হয়। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে বা অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টনের এমন সুস্পষ্ট এবং সুবিবেচ্য বন্টন নীতিমালা নেই। আধুনিক আইন বিশারদগণ এ কারণে ইসলামী মিরাসী আইনের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন।

www.pathagar.com

আইনবিদ উইলিয়াম জোনস বলেন- "উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যে কোন প্রশ্নই উঠুক না কেন, ত্বরিত এবং শুদ্ধভাবে এর জবাব দেবে ইসলামী [মিরাসী] আইন"। [ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা এপ্রিল জুন-১৯৯৬ সংখ্যা, মুহাম্মদ মোফাজ্জল হুসাইন খানের প্রবন্ধ "দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত"।]

এমনিভাবে মিরাসী আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহানবী [সা] আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মিরাসী আইন বা উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন করে সম্পদের নিম্নমুখী বন্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছেন, যার সুফল বর্তমান আধুনিক মুসলিম সমাজেও দৃশ্যমান। তবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মিরাসী আইনের বিপরীতে গিয়ে মেয়েদেরকে পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়ত বিরোধী এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারী। সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল [সা] প্রদর্শিত ইসলামী মিরাসী আইন অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক।

সম্পদের সুষম বন্টন

পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনই একমাত্র প্রধান উপায় হতে পারে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্ষম হতে পারি বলেই বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতি মনে করে। এর পরে ইসলামী অর্থনীতির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও মানবিক দিক হলো - ইসলামী অর্থনীতি চায় যে অর্থ সম্পদ নির্দিষ্ট দু'একজন ব্যক্তির নিকট সীমাবদ্ধ যেন না থাকে। সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমেই কেবল সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা আনয়ন করা সম্ভব। আর সে কারণেই ইসলাম সম্পদ হস্তান্তর তথা সম্পদ বন্টনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির নিকট সম্পদ বন্টনের প্রক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. বাধ্যতামূলক হস্তান্তর [ফরজ]

২. অত্যাবশ্যকীয় হস্তান্তর [ওয়াজিব]

৩. ঐচ্ছিক হস্তান্তর [নফল]।

বাধ্যতামূলক সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমগুলো হলঃ [১] যাকাত [২] ওশর [৩] কাফফারা [৪] ফিদিয়া এবং [৫] মোহর।

যাকাত

যাকাত ইসলামী আক্বিদার পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে পঞ্চম স্তম্ভ । যাকাতের মূল উদ্দেশ্যই হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ। যাদের সম্পদ উর্জনের কোন যোগ্যতা বা সমার্থ বা সুযোগ নেই কিংবা পূর্বসূরীদের নিকট থেকে জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন তা পাবার সুযোগ নেই তাদের অধিকার আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন ধনীদের সম্পদে।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলতে–আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন

www.pathagar.com

ব্যক্তি কর্তৃক কোন নিদিষ্ট ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বা সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণ অংশের স্বত্ব হস্তান্তর করাকেই বুঝানো হয়। পবিত্র কুরআন শরীফে ৮২ বার যাকাত আদায়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে। যাকাতের মাধ্যমে মূলত সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। মহান আল্লাহ পাক বলেন "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত প্রদান কর প্রকৃতপক্ষে সেই যাকাত দাতারাই তাদের সম্পদকে বৃদ্ধি করে"। [সূরা রূম : ৩৯]

আরও বলা হয়েছে-"তাদের ধন সম্পদে ভিক্ষুক, প্রার্থী ও বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত অধিকার রয়েছে।" [আল্ কুরআন, সূরা যারিয়াত: ১৯]

আর মহানবী [সা] যাকাত আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন, "যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় যাকাত দেবে সে ব্যক্তি অবশ্যই তার সওয়াব পাবে । আর যে ব্যক্তি তা পরিশোধ করতে নারাজ হবে তা আমরা অবশ্যই আদায় করবো। এবং তার মালের অর্ধেক [জরিমানা স্বরূপ] বাজেয়াপ্ত করব।" [ড. ইউসুফ আল কারযাবীর "ইসলামের যাকাত বিধান" অনুবাদ : মাওলানা আবদুর রহিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

তবে কি পরিমাণ সম্পদের মালিকের নিকট থেকে এই যাকাত আদায় করা হবে, কত পরিমাণ আদায় করা হবে, কাদেরকে এই যাকাত দেয়া হবে ইত্যাদি বিষয়ে পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীস শরীফে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মোট কথা, সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী অর্থনীতি তথা মহানবী [সা] যাকাতের মাধ্যমে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

নব্বই দশকের শেষদিকে বাংলাদেশে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশে যে পরিমাণ সম্পদ যাকাত আদায় করা যাবে সেই পরিমান সম্পদের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা সম্ভব।

এমনিভাবে ওশর ও কাফফারার মাধ্যমে ধনীদের সম্পদে গরীবের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে মহানবী [সা] বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

মোহর

মোহর বিশেষ করে পুরুষের নিকট থেকে মহিলার নিকট সম্পদ হস্তান্তরের আরেকটি পদ্ধতি। মোহর হলো ইসলামী শরীয়ত মুতাবেক বিবাহ করার সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ। এর মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামীর জীবদ্দশাতেই তার সম্পদের অংশ পেতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী উত্তরাধিকার হিসাবে সম্পদের অংশ তো পায়ই। ফলে বিশেষভাবে সমাজে লাঞ্ছিত বঞ্চিত মহিলারাও ইসলামী অর্থনীতির মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে উঠতে পারে।

সদাকাহ্, ওয়াকফ, ওয়াসিয়াত ইত্যাদি

এছাড়া সদকাতুল ফিতর, দান-সদকাহ ,হিবা ওয়াকফ, ওয়াসিয়াত, জারাইর ও মিনাহ ইত্যাদির মাধ্যমেও মহানবী [সা] দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করার মাধ্য মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন; যা আমাদের জীবনে পালনের মাধ্যমে আমাদের সমাজকেও আমরা দারিদ্র্য মুক্ত করতে পারি।

www.pathagar.com

সুদ রহিতকরণ

শুধুমাত্র সম্পদ বণ্টন বা সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র্য বিমোচনে শতভাগ সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। সম্পদ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রচলিত কুপ্রথার মূলোৎপাটনও জরুরী। যেমন সুদ প্রথা। সুদ ধনীকে আরও বেশী ধনী, এবং গরীবকে আরও বেশী গরীব করে তোলে। তাই প্রয়োজন সুদ রহিতকরণ।

সমাজকে শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো সুদ। সুদের সংজ্ঞায় বলা যায়- অর্থ ঋণদানের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে সময়ের ব্যবধানে বেশী পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করাই হলো সুদ। এখানে অর্থের পরিবর্তে অন্য কোন দ্রব্য সামগ্রীও হতে পারে। সুদকে রহিতকরণ বিষয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন– "আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন।" [সূরা বাকারা :২৫৭]

সহীহ মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত কিতাবুল বুয়ু অধ্যায়ে ১১২৭ নং হাদীসে রাসূল [সা] বলেন ," সুদখোর , সুদ দাতা, এবং এর লেখক ও এর সাক্ষী সকলেই অভিশপ্ত।" শুধু ইসলামীই সুদকে রহিত করেনি, দুনিয়ার সকল বিবেকবান মানুষের কাছেই সুদ একটি জঘন্যতম প্রথা। মনীষী এরিস্টটল সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেন,–"একটা টাকা আর একটা টাকাকে জন্ম দান করতে পারে না"। [Aristotles politics, London:1987, Page No-23]

যা হোক, সুদ হলো ভোগবাদী সমাজের দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে ধ্বংসকারী একটি রীতি। বোধ করি, এজন্যই মহানবী [সা] সুদপ্রথা রহিত করে দারিদ্র্য প্রসারের পথকে রুদ্ধ করে দেন।

অপর পক্ষে, সুদের পরিবর্তে তিনি চালু করেন ব্যবসা। আল্লাহ্র রাসূল যে নিজেও ব্যবসা করতেন এবং ব্যবসাকে উৎসাহিত করতেন তা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গরীব ব্যবসায়ীকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার জন্য তিনি তৈরী করে গেছেন বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক মূলনীতি। যেমন–বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই ইস্তিসনা, বাই মুরাবাহা, মুশারকা, মুদারাবাহসহ কয়েকটি বিশেষ ব্যবসা পদ্ধতি।

উক্ত পদ্ধতি সমূহের মধ্যে কোনটিতে যোগানদাতা ব্যবসায়ীর নিকট মাল বাঁকিতে বিক্রি করেন, কোনটিতে মালামাল বিক্রয়কারীকে পূর্ণ হস্তানন্তর না করে শুধু মাত্র বিক্রয়কারী এজেন্ট হিসাবে বিনিয়োগকর্তা মালামাল সরবরাহ করেন। আবার কোনটিতে বিনিয়োগকারী বা ক্রেতা মাল পাবার আগেই ব্যবসায়ী বা প্রস্তুতকারককে মূল্য পরিশোধ করে থাকেন। কোন কোন ব্যবসায় বিনিয়োগকারী ব্যবসায় যাবতীয় অর্থ সরবরাহ করেন কিন্তু ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন না; ব্যবসা করেন ব্যবসায়ী। কখনো আবার একজন বিনিয়োগকারী এবং এক বা একাধিক ব্যবসায়ী অথবা এক বা একাধিক ব্যবসায়ী মিলেও অংশীদারী ব্যবসা বা কারবার করতে পারেন। এমনিভাবে সুদের পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতি ব্যবসায়ে মূলধন বিনয়োগ করার ব্যপারে উৎসাহিত করেছে; যাতে অপেক্ষাকৃত গরীব লোকেরা অপেক্ষাকৃত ধনীক শ্রেণীর লোক কিংবা প্রতিষ্ঠান থেকে হালাল পন্থায়

www.pathagar.com

বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারে এবং ব্যবসা করতে পারেন এবং উৎপাদনশীল এবং আয়বর্ধক খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে স্বাবলম্বী হতে পারে।

করযে হাসানাহ্

বিনিয়োগ ছাড়াও বিনা লাভে বা বিনা সুদে অভাবগ্রস্তকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ ধার দেয়ার ব্যাপারেও মহানবী [সা] উৎসাহিত করেছেন। ইসলামী শরীয়তের ভাষায় একে বলা হয় করযে হাসানাহ্ বা উত্তম ঋণ। মহানবী [সা] এর যামানায়ও তিনি ধনী লোকদের দ্বারা অভাবী লোকদের প্রয়োজন মেটাতে বা অভাব পূরণ করতে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য বিনা লাভে অর্থ ধার বা করযে হাসানাহ্ প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। করযে হাসানাহ্ এর ব্যাপরে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন– "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আল্লাহ্কে করযে হাসানাহ্ দিতে প্রস্তুত; তাহলে আল্লাহ্ তাকে কয়েকগুণ বেশী ফিরিয়ে দেবেন। হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহ্র হাতেই নিহিত। আর তারই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে" [সূরা বাকারা: ২৪৫]।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশকে কাজে পরিণত করাই ছিল মহানবী [সা] এর মূল মিশন এবং তিনি তাই করেছেন। ফলে তাঁর সময়ে সম্পদশালী লোকেরা সব সময়ই অভাবীদের পাশে দাঁড়ানোর সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং এমনি করে দারিদ্র্যের করালগ্রাস থেকে মুক্ত হয় সমাজ।

আত্মীয় স্বজনের হক

আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে মৃত্যুর পরে যেমন মিরাসী আইন আছে, জীবিত থাকতেও তেমন কিছু কর্তব্য রয়েছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– "এহ্সান করো পিতা মাতার প্রতি, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন, নিকট ও দূর পড়শী, সাথী, মুসাফির, এবং তোমাদের দাস দাসীর প্রতি"। [আল কুরআন, সূরা আন নিসা : ৩৬] এভাবে সমগ্র সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী অর্থনীতি তথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এক যুগান্তকারী ভূমিকা পাসন করেছেন।

প্রতিবেশীর হক

প্রতিবেশীদের অধিকারের ব্যাপারেও মহানবী [সা] অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। মেশকাত শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "রাসূল [সা] বলেছেন– সে মুমিন নয় যে পেট ভরে খায় আর তার পড়শী উপবাস করে।" আর প্রতিবেশী বলতে হাদীস শরীফে বাড়ির চারপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত বসবাসকারী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একজন লোক যদি তার চার পাশে বসবাসরত চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রত্যেকের খবর রাখে তাহলে তো ঐ মহল্লা থেকে অভাব পালানেসার পথও পাবে না। এমনিভাবে মহানবী [সা] দারিদ্র্য বিমোচনে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন।

বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা

ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন ছাড়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজন পূরণে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠা করেছেন বায়তুল মাল বা আর্থিক

www.pathagar.com

কোষাগার। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে বের করেছেন অনবদ্য এক প্রশংসিত পথ। মানুষের দারিদ্র্য মোচনে নিয়েছেন সফল ব্যবস্থা। রাসূল [সা]-এর বায়তুল মাল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জনকল্যাণ ও মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে পালন করেছে এক নন্দিত ভূমিকা। তাঁর সেই বায়তুল মালের উৎস ছিল- যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, ওয়াকফ, দান, গণিমতের মাল, মুক্তিপণ, উপহার, কর্জ, যিজিয়া, খারাজ ইত্যাদি।

দানশীলতা

দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী [সা] এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ হলো মুসলমানদের মাঝে দানশীলতার বিকাশ। দানশীলতাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছেন তিনি। কৃপণতার কুঞ্চনে সঙ্কুচিত সমাজের মানুষদেরকে করেছেন উদার হস্ত। ইমাম মুসলিম [রহ] সহীহ মুসলিম শরীফের কিতাবুল ইলম অধ্যায়ের ৪৮৩০ নং হাদীসে উল্লেখ করেন- "রাসূল [সা] একবার তাঁর সাহাবীদের নিকট এক নও মুসলিম পরিবারের জন্য সাহায্য চাইলেন। কেউ খাবার নিয়ে আসলেন, কেউ কাপড় নিয়ে আসলেন, আর একজন আনসারী তো বেশ বড় পরিমাণ অর্থ দান করেন।" আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেন-"যারা জাহান্নামে যাবে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে কোন্ সে জিনিস তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেল। তারা বলবে- আমরা মিসকিনকে খাবার দিতাম না আর নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" এমনিভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে রাসূল [সা] এবং তাঁর সাহাবীগণ দানশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ্র উপর ভরসা

আল্লাহর উপর ভরসা করা হলো মহানবী [সা] এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বিষয়। মহানবী [সা] মনে করতেন যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শুধু স্রষ্টাই নন, তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর রিজিকদাতাও। পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আত ত্বালাক এর ২ ও ৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন- "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, তাকে প্রতিকূল অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্ই তার ব্যবস্থাবলম্বন করেন। আর এমন উৎস থেকে তার রিজিকের সংস্থান করেন যে সে তা [ঐ উৎস] সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখে না।" অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য পরিশ্রম করা যেমন অপরিহার্য, আল্লাহর ওপর ভরসা করাও তেমন জরুরী; কেননা "যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তাকে অফুরন্ত রিজিক দান করেন" [আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান]।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে দারিদ্র্য বিমোচনে রাসূল [সা] তাঁর জীবনে এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন যার ফলে তাঁর সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়েছিল চিরতরে। চাষাবাদ, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানামুখী কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন পরিশ্রম করার ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তেমন গ্রহণ করেছেন নানামুখী কর্মকৌশল। সেই সাথে মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর

www.pathagar.com

জন্যেও মানবিকভাবে করেছেন উৎসাহিত। সেই সাথে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রাব্বুল আলামীনের ওপর অসীম আস্থা রাখার ব্যাপারেও দিয়েছেন পরামর্শ। যার কারণে তাঁর শাসনামলে সমগ্র আরব জাহানের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল জীবন যপনের সুবাতাস পেতে সক্ষম হয়। এমনিভাবে বর্তমান সময়েও যদি আদল এবং ইহসান পূর্ণ রাসূল [সা] প্রদর্শিত অর্থব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজ থেকেও দারিদ্র বিদায় নিতে পারে চিরতরে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে মহানবী [সা] এর মত আর কোন নেতা বা রাষ্ট্রনায়ক এমন ব্যাপকতর কর্মপন্থা অবলম্বন করেননি। আর যেখানেই এমন চতুর্মুখী পদক্ষেপ নেয়া হবে সেখান থেকে দারিদ্র না পালিয়ে টিকে থাকতে পারে না কোনদিনই। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, দারিদ্র্য দূরীকরণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এবং থাকবে চিরদিন। আর আমরাও যদি তাঁর পথ অনুসরণ করতে পারি, তবে তা হবে নিশ্চিতরূপে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং আমাদের দারিদ্র্য মুক্তির সোনালী পাথেয়।■

গ্রন্থ সহায়িকা

১. ইসলামের যাকাত বিধান, ড. ইউসুফ আল কারযাবী, অনুবাদ- মাওলানা আবদুর রহিম

২. ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দিন

৩. ইসলামী অর্থনীতি, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)

৪. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)

৫. সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)

৬. ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

৭. আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে আলহাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, সম্পাদনায়- ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন

৮. দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, সম্পাদনায়- নূরুল ইসলাম মানিক

৯. ইসলামে সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও বন্টন, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

১০. ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কৌশল, শাহ্ আবদুল হান্নান

১১. ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, অধ্যাপক শরীফ হুসাইন

১২. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

১৩. ইসলামী অর্থনীতি, অধ্যাপক আবদুল খালেক, আরাফাত পাবলিকেশন্স , ঢাকা ১৯৯৫ইং।

www.pathagar.com

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সীরাতুন্নবী [সা]

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ

আরবী বিশ্বের একটি প্রাচীন ও কালজয়ী ভাষা। কালের প্রবাহ কখনো এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করতে বা অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেনি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ায় এ ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্য হিসেবে আরবী বিশ্বসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যে কোন সাহিত্যের সাথে আরবী সাহিত্যের তুলনা করলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের সমৃদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম। আরবী সাহিত্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও অনুপম কথামালা এত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা অন্যান্য সাহিত্য এর কাছে চিরঋণী। কেননা আরবী সাহিত্যের মূল উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী [সা]-এর সুন্নাহ। তাই রাসূল [সা] একটি হাদীসে বলেছেন : 'পৃথিবীতে আল-কুরআনই হলো শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সমাবেশ স্থল। কাজেই এর থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো'। [ইবনুল আসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আদাব অধ্যায়, পৃ. ২৭] রাসূল [সা] যখন কথা বলতেন তার কথায় সাহিত্যের গুণাগুণ তথা তার শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস ছিল সাহিত্যের বিচারে অনন্য। তাই রাসূল [সা]-এর বক্তব্য শ্রবণের পর উপস্থিত সাহাবীগণ

www.pathagar.com

প্রায়শ: জিজ্ঞাসা করতেন, হে রাসূল [সা]! এসব ভাষা ও সাহিত্যকভাব আপনি কোত্থেকে লাভ করেন? তখন রাসূল [সা] উত্তরে বলতেন : 'আমার রব আমাকে আদাব-সাহিত্য শিখিয়েছেন'। [আহমদ শায়িব, উসূল আন-নাকদুল আদাবী, পৃ. ৪] আমরা দেখতে পাই আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ইসলাম-পূর্বযুগের কবি সাহিত্যিকগণ এর চর্চা ও প্রচার-প্রসারে খুবই নিবিষ্ট ছিলেন। সে সময় আরবের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে 'উকায মেলা' নামে বার্ষিক সাহিত্যমেলা বসতো। তখন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কিংবা ক্রোধের বশে রক্তপাত করা ছিল নিষিদ্ধ। বলা যায় এ সময়ে এক ধরনের ঐশী যুদ্ধবিরতি চলতো। এ মেলা কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিভা প্রদর্শন ও আরবের 'Academic Franchise' হিসেবে কাজ করতো।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী সাহিত্যেও প্রথমে পদ্য সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে। তৎকালীন আরবে লিখে রাখার ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়শ স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করতে হতো। আর গদ্যের চেয়ে পদ্যে মুখস্থ করা সহজ ছিল। ইসলাম-পূর্বযুগে গদ্য সাহিত্যের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা প্রধানত প্রবাদ-প্রবচন, বক্তৃতা-বাগ্মিতা ও অসিয়াত-অন্তিম উপদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া জ্যোতির্বিদের ভবিষ্যদ্বাণী, কিছু লোক কাহিনী, পুরোহিত ও যাদুকরদের ব্যবহৃত ছন্দোবদ্ধ ভাষাকেও গদ্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো। এ সময় রাসূলের [সা] সীরাত সাহিত্য গতানুগতিক ধারায় সংরক্ষণের তেমন সুযোগ-সুবিধা গড়ে ওঠেনি। সীরাতে রাসূলের [সা] সর্বাপেক্ষা বিশাল ভাণ্ডার হচ্ছে আল-কুরআন। তাই এ সময়ে পবিত্র কুরআনকে অবলম্বন করে রাসূলের [সা] সীরাতচর্চার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। মহানবী [সা]-এর প্রাণপ্রিয় সাহাবীগণ একাজে সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন। তবে সীরাত সাহিত্যের চর্চায় মহানবী [সা]-এর অনেক সাহাবী অংশগ্রহণ করলেও সর্বোচ্চ বর্ণনা রয়েছে মাত্র সাতজন সাহাবীর। অবশ্য তাবি'ঈগণ সীরাতচর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন। এ সম্পর্কে সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী বলেন : 'সাহাবায়ে কিরামের জীবদ্দশায়ই তাবি'ঈগণ দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ প্রত্যেকের কাছ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে রাসূল [সা]-এর প্রত্যেকটি বাণী, কাজ-কর্ম এবং তার সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন'। [সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী, পয়গামে মুহাম্মদী, পৃ. ৪৯]

আরবী ভাষা ও সাহিত্য সীরাত বিষয়ক রচনাকে কেন্দ্র করে নবতর ধারার সৃষ্টি হয়। সে কারণে এ সময়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যেমন উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধিত হয় তেমনি সীরাত সাহিত্যও বিকাশ লাভ করে। আরবী সীরাতকারদের আন্তরিকতা ও গভীর নিষ্ঠার কারণে সীরাত সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। এ সময়ে আরবী সীরাতকারদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন ইসহাক 'সীরাতু রাসূলিল্লাহ' নামে সার্থক সীরাত সাহিত্য রচনা করেন। ঐতিহাসিক বিবেচনায় তার সীরাত সাহিত্যকেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সূচনাকর্ম মনে করা হয়। এ বিষয়ে কে.এ ফারিক বলেন : The sira was the first attempt is Arabic to a Connected account of the Public life of the Prophet Ibn Ishaq as a maula or non Arab Muslim. was careful not to record anything that might arouse the displeasure of the vain and touchy Arabs or compromise his devotion Islam or its founder.

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাকের অনবদ্য সীরাত সাহিত্যটির প্রয়োজনীয় অংশের সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেন আরেক বিখ্যাত আরবী সীরাতকার ইবনে হিশাম [মৃ. ৮৩৪ খ্রি.]। তাঁর এই অনুপম সীরাত কর্মটি সীরাতে ইবনে হিশাম নামে সমধিক পরিচিত। ইবনে হিশামের এই 'আস-সীরাতুন নববীয়াহ' গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন নামে এটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে বের হয়। তার সীরাত গ্রন্থটির কাব্যানুবাদও করেছেন কেউ কেউ। এদের মধ্যে মাগরিবী, আনসারী ও আদ দাইরানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'তাবাকাতুন কুবরা' সীরাতের ওপর লিখিত আরো একটি বিশাল সীরাতগ্রন্থ। ১২ খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থের রচয়িতা ইবনে সা'দ আয-যুহরী। প্রফেসর সাকহাব সম্পাদিত এ বিশাল সীরাত কর্মটি লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয় জার্মান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায়। এতে সীরাতে রাসূল [সা]-সহ সাহাবীদের জীবন ও তৎপরবর্তীদের জীবনেতিহাস স্থান পেয়েছে। নবী জীবনের অনেক ঘটনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াকেদীও রাসূলের [সা] সীরাত বিষয়ে লেখালেখি করেন। 'কিতাবুল মাগাজী' নামক গ্রন্থে তিনি রাসূলের [সা] জীবনের নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। রাসূল [সা]-এর সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ 'তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলূক' রচনা করে আলস্নামা ইবনে জারীর তাবারী আরেকটি বিস্ময়ের জন্ম দেন। তিনি ২২৪ হিজরীতে অষ্টম আব্বাসীয় খলিফা মু'তাসিম বিলস্নাহর শাসনামলে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলের বিস্তৃত পার্বত্য প্রদেশ তাবারিস্থানের 'আমূল' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর [র] মতে : 'তারিখুর রাসূল ওয়াল মুলূক' গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাস সম্পর্কে দু'টি মূল চিন্তাধারা তাতে বিশ্লেষিত হয়েছে। হযরত আদম [আ] থেকে রাসূল [সা]-এর সৃষ্টি পর্যন্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্দেশনা মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন'। [শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ [উর্দু অনুবাদ], ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২] তাবারী এই গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে রাসূল [সা]-এর বংশ পরম্পরা, রাসূল [সা] ও হযরত খাদিজা [রা]-এর পরিণয়, সমকালীন অবস্থা, রাসূলের [সা] বাল্যকাল এবং তার প্রতিশ্রুত নবী হওয়ার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এককথায় রাসূলের [সা] পূর্ণাঙ্গ সীরাতের বিবরণ তুলে ধরার একটি চেষ্টা চোখে পড়ে এই গ্রন্থে। সীরাতকার মাদায়েনীও রাসূলের [সা] সীরাত নিয়ে 'সিফাতুন্নবী, আযওয়াজুন্নবী ও খাতামুন্নবী' শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন। হাফেজ ইবনুল কাইয়েম রচনা করেন 'যাদুল মাআদ'। যাতে রাসূলের ইবাদত-বন্দেগীর আলোচনা, জিহাদের বর্ণনা এবং রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ সবিস্তার আলোচিত হয়েছে। ইবনে হাইয়্যান আল-ইস্পাহানী 'আখলাকুন্নবী' সীরাত গ্রন্থ রচনা করে সীরাত সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। হাদীসের আলোকে নবী জীবনের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। 'ইকদুল ফরিদ' রচনা করেন ইবনে আবদে রাব্বিহী। তিনি মহানবী [সা]-এর কর্মবহুল জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন এ গ্রন্থে। 'মুরুয যাহাব' রচনা করেন মাসুদী। এ গ্রন্থেও সীরাত বিষয়ক রচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়া ইবনে খালদুন রাসূলের [সা] জীবনাদর্শ ও তাঁর জীবনের নানা খণ্ডিত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা সীরাতচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছেন। হাফেজ ইবনে কাসীরও সীরাতের ওপর 'আল বিদায়া

www.pathagar.com

ওয়ান নিহায়া' নামে প্রামাণ্যগ্রন্থ রচনা করেন। কুস্তালানীর মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, দিমাশকীর সুবুলুল হুদা, সুয়ূতীর তারিখুল খুলাফা ও খাসায়েসুল কুবরা সীরাতচর্চার অনন্য সাহিত্যভাণ্ডার হিসেবে বিবেচ্য।

আধুনিক আরবী সাহিত্যেও মহানবী [সা]-এর জীবনচরিত নান্দনিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেসব সাহিত্যিকদের লেখায় সীরাত সাহিত্য স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে বাতরুস আল-বোস্তানী, ড. তহা হুসাইন, তাওফিক আল-হাকিম, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, রশিদ রেজা ও ড. হুসাইন হায়কাল অন্যতম মনীষা। এসব সাহিত্যিকদের অধিকাংশ লেখায় মহানবী [সা]-এর সুন্দর জীবন ও চরিত্র স্থান পেয়েছে। ড. তহা হুসাইনের ঐতিহাসিক উপন্যাস আল ওয়াদুল হক [দীপ্ত প্রত্যয়] গ্রন্থে মহানবী [সা]-এর সংগ্রামী জীবনের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তার এই উপন্যাস এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এভাবে মিশরের আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রদূতখ্যাত আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদের রচনায়ও সীরাতচর্চা লক্ষ্যণীয়। তার আলোচনায় মহানবী [সা], গৌতমবুদ্ধ ও যীশুখৃস্টের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। তার 'আবকাবিয়াতু মুহাম্মাদ' ও 'আল-ফালাসিফাতুল কুরআনিয়া' সীরাতচর্চার অনন্য তথ্য ভাণ্ডাররূপে আরবী সাহিত্য স্থান পেয়েছে। এভাবে মহানবী [সা]-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস নিয়ে তাওফিক আল-হাকিমের বিখ্যাত নাটক 'মুহম্মদ' মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশ্ব মুসলিমের জোর আপত্তির কারণে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়নি।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিপদগামী যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সীরাত সাহিত্য 'হায়াতু মুহাম্মদ'। এটি রচনা করেন বিংশ শতাব্দীর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত সাংবাদিক ড. হুসাইন হায়কাল [১৮৮৮-১৯৫৬ খ্রি.]। আরবী সীরাত সাহিত্যে তার রচনা সুধীমহলে দারুণভাবে সমাদৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও সীরাতে রাসূলের [সা] প্রতি অতি আবেগমূলক রচনার আতিশয্য দূর করতে ড. হুসাইন হায়কালের এই রচনা নি:সন্দেহে অনবদ্য ও অনুপম। তবে মু'জিজা ও মি'রাজ সম্পর্কে তার বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি মুসলিম বিশ্বের দার্শনিকগণ। 'আর রিসালাতুল খালিদা' নামে আল্লামা আয্যামের লেখা সীরাতের অনন্য গ্রন্থটিতে মহানবীর [সা] জীবনবৃত্তান্ত ও বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। মহানবী [সা]-এর শাশ্বত পয়গামের আলো বিশ্ব মুসলিমের কাছে ছড়িয়ে দিতে এ গ্রন্থটি একটি মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করছে। ড. জিয়াউদ্দীন আল-ওমরী সীরাত সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক। তিনি সীরাতে রাসূলের [সা] উপর প্রায় ২০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থসমূহে সীরাত সাহিত্যে অধ্যয়নের সুন্নাহর সঠিক প্রেক্ষাপট ও মহানবী [সা]-এর চিন্তা ও দর্শন নব ধারায় উপস্থাপিত হয়েছে। আরবী কথা সাহিত্য ও ছোটগল্পেও রাসূলের [সা] সীরাত স্থান পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে কথাশিল্পী নাজিব কিলানী ও মিসরের ইয়াহইয়া তাহিরের নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে। এদের গল্প ও উপন্যাসে মহানবী [সা]-এর জীবনী চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এভাবে আরো অনেক প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মহানবী [সা]-এর সীরাতচর্চা করেছেন।

www.pathagar.com

আরবীয়গণ সাহিত্যালংকার বিশেষত কাব্য-ঝংকার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। সমকালীন যুগে অনেক প্রজ্ঞাবান কাব্য বোদ্ধাও ছিল যাদের কাব্যচর্চায় রাসূল [সা]-এর ব্যক্তিজীবন চমৎকারভাবে ফুটে উঠতো। ইসলাম-পূর্বযুগে তাদের সাহিত্যচর্চা অনেকটা কাব্যচর্চার মধ্যে সীমিত ছিল বলা যায়। কেননা কাব্যই ছিল তাদের প্রধান সাহিত্য কীর্তি। অনেক কবি মহানবী [সা]-এর গৌরবদীপ্ত জীবনের মহান আদর্শ ও গুণাবলী প্রাঞ্জল ভাষায় কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। রাসূল [সা]-এর জীবনের নন্দিত বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপনে অনেক কবির শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এমনই কয়েকজন কবির সীরাত বিষয়ক কিছু কাব্যের উপমা উপস্থাপন করা হলো–

রাসূলের [সা] সভাকবি অভিধায় অভিসিক্ত কবি হাস্সান বিন সাবিত [রা] তার কাব্যের মাধ্যমে রাসূলের [সা] নন্দিত গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। রাসূলের [সা] সাহসিকতা ও বীরত্বের কথা তিনি এভাবে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন: 'তিনি এমন নবী যিনি নিরাশা ও রাসূল প্রেরণের বিরতির পর আমাদের কাছে এসেছেন/তখন বিশ্বে মূর্তির পূজা করা হতো তারপর তিনি আলোকোজ্জ্বল সূর্য ও পথপ্রদর্শনকারীরূপে প্রতিভাত হলেন/ তিনি ঝলমল করে উঠলেন যেমন ভারতীয় তরবারী ঝলমল করে'। কবি কা'ব বিন যুহাইর ইসলামের বিরম্নদ্ধে কাব্য রচনা করলে রাসূলের [সা] বিরাগভাজন হন। রাসূল [সা] তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের ফরমান জারি করেন। এরপর তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মহানবী [সা]-এর সীরাতের প্রশংসায় রচনা করেন: 'রাসূল তো নূরের জ্যোতি/ দিকে দিকে ছড়ায় আলোর দ্যুতি/ তিনি যেন দীপ্ত পথের মুক্ত ছবি'। [ড. ওমর ফারুক, তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ৫৩] রাসূল [সা] এ কবিতা শুনে তার বিরুদ্ধে জারিকৃত মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নেন এবং ক্ষমার মহিমায় আনন্দের আতিশয্যে প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে নিজের চাদরটি সৃষ্টির প্রতিদানস্বরূপ তাকে উপহার দেন। এজন্য তার কবিতার নাম হয়ে যায় কাসিদাতুল বুরদা বা চাদরের কবিতা। [বি.দ্র : ইবনু কুতাইবা, আশশির ওয়াস শুআরা, পৃ. ৫৩]

জাহেলী যুগের কবি নাবিগা [মৃ. ৬৭৭] মহানবী [সা]-এর জীবন চরিত্রের প্রশংসায় গেয়ে বলেন : 'আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে আগমন করেছি, যিনি হিদায়াত সহকারে এসেছেন/ আর তিনি এমন কিতাব তিলাওয়াত করেন, যা ছায়াপথের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল'। [আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৪৯] প্রাচীন আরবের কবি আসআদ ইবনে কারব হিমায়রী যিনি রাসূলের [সা] আগমন সম্পর্কে পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। কাব্যের ভাষায় তিনি তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে : 'যে আসেনি আজও আমি জেনে গেছি তার নাম/ সে যে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এভাবে রাসূল [সা]-এর চাচা আবু তালিব তার সম্পর্কে রচনা করেন মূল্যবান কাব্য: 'হে পুত্র! তুমি আমাকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে ডেকেছো, আমি জানি, তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী/ আর তুমি যে দীনের পথে ডাকছো, সেটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দীন'। হযরত ওমর ফারুক [রা] ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে মহান আল্লাহ তাআলা ও তদীয় রাসূলের [সা] সীরাত নিয়ে প্রশংসা করে বলেন: 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অনুগ্রহকারী তারই

www.pathagar.com

প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য অন্য কারো নয়/ তিনি একজন সত্যনবী পূর্ণ আশ্বাসে পূর্ণ ভরসায় তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন/ তিনি পূর্ণরূপে আমানতদার, তার পথে কোন যুলুম নেই'। [সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ.৩২৫] রাসূল নন্দিনী হযরত ফাতেমা [রা] মহানবী [সা]-এর ইন্তিকালে শোকগাথা রচনা করে সীরাত সাহিত্যে অবদান রাখেন তিনি বলেনঃ 'আকাশের প্রান্ত ধুলিময় মলিন হয়ে গেছে, দিবসের সূর্য নিভে গেছে, আর দিবারাত্রি সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে'। [শি'র আল জাওয়াহ আল ইসলামিয়া, পৃ ৩৯০] মিশরের মরমী কবি বুসিরীর ঐতিহাসিক কাব্য কাসিদাতুল বুরদায় রাসূলের [সা] সীরাত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি রাসূলের [সা] সুমহান চরিত্র মাধুর্যের অনুপম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেনঃ 'মুহাম্মদ [সা] ইহকাল ও পরকালের মুখ্য ব্যক্তি এবং মানুষের ও জ্বিনের এবং আরব ও অনারবের উভয়ের নেতা/আমাদের নবী উত্তম কাজ করতে আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, অতএব হ্যাঁ বা না বলতে তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই'। [কাসিদাতুল বুরদা, পৃ. ৫৪] এভাবে আব্বাসীয় যুগের আরেক দার্শনিক কবি আবুল আলা আল-মাআররী সীরাতে রাসূলের [সা] বর্ণনায় বলেনঃ 'মুহাম্মদ [সা] তোমাদেরকে সর্বোত্তম কার্যাবলীর দিকে আহ্বান করেছেন, আর বর্শার উপরিভাগ নিম্নভাগের ন্যায় নয়। তিনি তোমাদেরকে ঐ সত্তার সম্মান প্রদর্শনের দিকে পরিচালিত করেছেন, যিনি উদীয়মান ও অন্তর্যামী প্রভাব এবং অন্ধকারে আলো সৃষ্টি করেছেন'। [আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী, পৃ. ৭৫]

আধুনিক যুগের কবিদের কাব্যেও মহানবীর [সা] সীরাতচর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সামী আল-বারুদী, আল-হামাভী, আহমদ শওকী বেক ও ইবনু নুবাতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কবি সম্রাট আহমদ শওকী বেক রাসূলের [সা] সীরাত সম্পর্কে বলেনঃ 'মুহাম্মদ [সা] স্রষ্টার মনোনীত পবিত্রতম ব্যক্তি তার করুণা এবং তিনি সৃষ্টিজগতের ও মানবজাতির মধ্যে থেকে আলল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য ব্যক্তি'। [আশ-শাওকিয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬]

অতএব বলা যায়, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে মহানবী [সা]-এর সীরাতচর্চা হয়েছে নান্দনিকভাবে। অনেক কবি সাহিত্যিক তাদের সাহিত্য ও কাব্য রচনার মাধ্যমে রাসূল [সা]-এর জীবন চরিত্রের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা মহানবী [সা] সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তার মহিমা বা গুণবৈশিষ্ট্য শুধু আরবী ভাষায় চর্চা হয়নি বিশ্বসাহিত্যেও তার সীরাতচর্চার প্রামাণিকতা বিদ্যমান।■

তথ্যসূত্র

১. ইবনুল আসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আদাব অধ্যায়, পৃ.
২. আহমদ শায়িব, উসূল আন-নাকদুল আদাবী, পৃ. ৪
৩. সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী, পয়গামে মুহাম্মদী, পৃ. ৪৯
৪. এ কে ফারিক, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৯৭
৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, [উর্দু অনুবাদ], পৃ. ৪৪২

www.pathagar.com

নাজ্জাসীর দরবার

নাজমুস সায়াদাত

১.

কাবার পাদদেশ। কুরাইশরা আলাপ করছে।

শায়বা	:	কোত্থেকে এত শক্তি সে পেলো? কিভাবে একজন সামান্য এতিম এতবড় পাহাড় সমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গেলো?
আবু সুফিয়ান	:	আমাদের জানা নেই।
আবু লাহাব	:	কিভাবে এটা সম্ভব? তার কথাগুলো নাকি চমৎকার কবিতা?
আবু সুফিয়ান	:	এটা কবিতা নয়, ওরা বলে খোদার বাণী। আর এই বাণীই আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমরা আমাদের কর্তৃত্ব, পদমর্যাদা এবং সম্মান সব হারাতে বসেছি।
শায়বা	:	আমরা যোদ্ধা, এটা বরদাশত করতে পারিনা।
আবু লাহাব	:	লোকেরা যেন তার কাছে না যায়, তার ব্যবস্থা করা এখনই দরকার।

www.pathagar.com

আবু জেহেল : আমি আগেই বলেছি, সংখ্যায় কম থাকতেই ওদের প্রতিহত কর। অত্যাচার চালাও। নির্যাতন করে বাধ্য কর মুহাম্মদের সঙ্গ ত্যাগ করবার। সবচেয়ে দূর্বলগুলোকে আগে ধর।

আবু লাহাব : আবুল হাকাম! তাহলে তোমার কৃতদাসী সুমাইয়া, তার স্বামী ইয়াসির এবং তাদের পুত্র আম্মারকে আগে ধরো। ওদের এতবড় স্পর্ধা, তোমার খেয়ে পড়ে মুহাম্মদের খোদার গুনগান গায়।

আবু জেহেল : তোমার কথা যদি সত্যি হয় আবু লাহাব তবে লাত উজ্জার কসম ওদের আমি আস্ত রাখবো না। ওদের হাড় মাংসকে আলাদা করে ফেলবো। কে আছো, যাও ওদের ধরে নিয়ে এসে বেধে ফেলো।

আম্মার এবং ইয়াসিরকে চাবুক মারতে মারতে দুজন কুরাইশ ধরে নিয়ে আসে।

আবু জেহেল : চাবুকটা আমার হাতে দাও।

চাবুক নিয়ে ইয়াসিরকে মারতে থাকে।

ইয়াসির : না, না, আল্লাহ এক। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

আবু জেহেল : আবারও ওই কথা। তোর এত বড় সাহস। তোর বউ এবং ছেলেসহ জীবন্ত কবর দেবো।

ইয়াসির : তবুও বলবো আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসুল।

আবু জেহেল : এবার? বল, আবার বল।

আবু জেহেল হাতের লাঠি দিয়ে গালের পাশে ঠেসে ধরে। যন্ত্রণার দরুন ইয়াসির তার মুখে থুথু মারে। রাগে থরথর করে কাপতে কাপতে আবু জেহেল দৌড়ে গিয়ে বর্শা তুলে নেয়। জোরে বর্শাটা নিক্ষেপ করে। আ আর্তচিৎকার। দূরাগত কিছু কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে।

২.

কাপড়ে ঢাকা দুটো লাশ। আম্মারসহ নির্যাতিত মুসলমানরা কাতরাচ্ছে। নওমুসলিমরা দৌড়ে এসে নির্যাতিতদের বাঁধন খুলে দিচ্ছে এবং পানি পান করাচ্ছে। আম্মারকে তুলে এনে সামনে ধরেছে জাফর, জায়িদ এবং বেলালরা।

জায়িদ : আম্মার, তোমার বাবা ইয়াসির এবং তোমার মা সুমাইয়া দু'জনে ইসলামের প্রথম শহীদ। এজন্য তুমি গর্বিত আম্মার!

হামজা এগিয়ে আসে।

হামজা : আর কত অত্যাচার সহ্য করার জন্য তোমরা প্রস্তুত?

জাফর : রাসুলুল্লাহ বলেছেন, আমাদের মক্কা ত্যাগ করতে হবে।

www.pathagar.com

হামজা : ঠিক, যদি তোমরা এখানে থাকো তবে ওরা একে একে সবাইকে হত্যা করবে।

জাফর : আমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করবো। ওখানে এক খৃষ্টান শাসক আছে। তার নাম বাদশাহ নাজ্জাশী। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তিনি নাকি ন্যায়পরায়ণ এবং বিচক্ষণ।

হামজা : আমরা আজই রওনা দেবো এবং এক্ষুণিই।

৩.

ইকো : একে একে নির্যাতিত নও মুসলিমরা হিজরত করতে আরম্ভ করলো। আবিসিনিয়ার তৎকালীন শাসনকর্তা বাদশাহ নাজ্জাশী ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ এবং প্রভাবশালী খৃষ্টান শাসক। জাফর বিন আবু তালিবের নেতৃত্বে একটা কাফেলা মক্কা থেকে গোপনে হাবশার উদ্দেশে রওনা হলো। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাদের এই গোপন হিজরতকে বরদাশত করতে পারলোনা। সঙ্গে সঙ্গেই তারা মুসলমানদেরকে ধরার জন্য লোক নিযুক্ত করলো।

কয়েকজন মুসলমানের চেহারা ও পোশাকে হিজরতের ছাপ স্পষ্ট। জাফর বিন আবু তালিব একে একে মশক থেকে পানি ঢেলে ঢেলে প্রত্যেককে খাওয়াতে আরম্ভ করবে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

জাফর : তাড়াতাড়ি করো। কুরাইশরা আমাদের পিছু নিয়েছে। সামনে দরিয়া পাড়ি দিতে হবে। তাড়াতাড়ি। ওরা আমাদেরকে ধরতে আসছে।

আম্মার : আল্লাহ না করুন ধরা পারলে পুনরায় আমরা অত্যাচারিত হবো। ঘোড়ার খুরের শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। এ স্থান নিরাপদ মনে হচ্ছে না। চলো এ স্থান ত্যাগ করে এখনই আমরা ওই সামনের গীরিখাদে আশ্রয় গ্রহণ করি।

আবু জাফর : ঠিক তাই! চলো।

দ্রুত বেগে সকলে চলে যায়। শায়বার নেতৃত্ব কয়েকজন কাফের দুর্বৃত্তের আগমন ঘটে। প্রত্যেকের হাতে তলোয়ার এবং বর্শা।

শায়বা : ভালো করে দেখো । খুঁজতে থাকো। ওদেরকে পেতে হবে। চলো ওপাশটায় দেখি।

জনৈক কাফের : কি আশ্চার্য চোখের সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেলো। চলো ওপাশটা দেখি।

www.pathagar.com

শায়বা : তার আর দরকার নেই। অনেক হয়েছে। এবার ফিরি।

কাফের : ঠিক আছে তাই হবে। অনেক হয়েছে চলো।

৪.

কাবার পাদদেশ। বড় মূর্তিটার গোড়ায় কুরাইশরা গোল হয়ে বসে কথা বলছে।

আবু সুফিয়ান : তারা সেখানে মরুভূমিতেই ছিলো। তোমরা তাকে ভালো করে খুঁজে দেখোনি। অথবা ওদেরকে পালাতে দিয়েছো।

শায়বা : পালাতে দিয়েছি!

আবু লাহাব : ওরা আমাদের নাম ডুবানোর কারণ হবে। ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভীষণ চিন্তিত।

ওতবা : আমাদের নেতৃত্বে এটা একটা বড় ধরণের দূর্বলতা বৈ কি! মুহাম্মদ ভাববে আমরা ক্রমশঃ দূর্বলতা দেখাচিছ।

আবু সুফিয়ান : আমার সৎ ব্যবসায়ী। আস্থার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করি। বাদশা নাজ্জাশীর দরবারে আমার দূত প্রেরণ করবো। ওরা নজরকাড়া উপঢৌকনসহ বাদশাহর দরবারে যাবে। মক্কার পলাতক লোকদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করবে।

আবু জেহেল : উত্তম প্রস্তাব। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমর বিন আস এবং আবদুল্লাহ বিন রবিয়াকে প্রেরণ কর।

৫.

বাদশাহ নাজ্জাসীর সুসজ্জিত দরবার।

দরবারী : আবিসিনিয়ার মহান অধিপতি, খোদাবন্দ যিশুর আনিত ধর্মের প্রতি পরমতম আজ্ঞা প্রদর্শনকারী, হাবশার জনগণের হৃদয়ের মনি, ঈশ্বরের একনিষ্ঠ বন্দনাকারী, ন্যায়পরায়ণ সুশাসক, শাহী বাদশাহ আসহামা নাজ্জাশী তাঁর দরবারে তাশরীফ আনছেন।

পারিষদবর্গসহ বাদশাহ নাজ্জাসীর প্রবেশ। সকলের কুর্ণিশ। বাদশাহর সিংহাসনে আসীন।

বাদশাহ নাজ্জাশী : মক্কা হতে আগত দুইজন প্রতিনিধিকে আসতে বলো।

দরবারী : মক্কা হতে আগত প্রতিনিধিগণকে শাহী দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে।

আমর বিন আস এবং আবদুল্লাহ বিন রাবিয়ার প্রবেশ, উপঢৌকন প্রদান এবং বাদশাহকে কুর্ণিশ।

বাদশাহ : তোমাদের বক্তব্য পেশ করো।

www.pathagar.com

আমর বিন আস : হে বাদশাহ, আপনার দেশে আমাদের কিছু নির্বোধ যুবক পালিয়ে এসেছে। তারা স্বজাতির ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনি যে ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করেন সেই ধর্ম বিশ্বাসও তারা গ্রহণ করেনি। বরং তারা এক নব আবিস্কৃত ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করেছে। এ ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে আমরাও কিছু জানি না, আপনিও কিছু জানেন না। ওদের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন আমাদেরকে ওদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন। তারা চান যে, আপনারা তাদের নির্বোধ লোকদের আমাদের সাথে ফিরিয়ে দেবেন। তারা নিজেদের লোকদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝেন।

বাদশাহ : আশ্রয়প্রার্থীদের তলব করো।

ইকো : আবিসিনিয়ার মহান অধিপতির নিকটে আশ্রয় প্রার্থনাকারী সকল আরবগণকে দরবারে প্রবেশের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

জাফরের নেতৃত্বে মুসলমানদের দরবারে প্রবেশ। বাদশাহ উঠে দাড়ায় । মুসলমানেরা বাদে সকলেই কুর্ণিশ করবে।

বাদশাহ : তোমাদের নবীকে ছাড়া তোমরা আর কারো নিকট মাথা নত কর না?

জাফর : আমাদের নবী একজন মানুষ। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথানত করি না।

আমর : মুহাম্মদ কি অলৌকিক কোন কিছু, জাফর। সে যদি নবী হয় তবে তার কাছে অবশ্যই অলৌকিক কিছু থাকবে।

বাদশাহ : আমর বিন আস যা বলছে তা সত্য। ঈশ্বর যদি কোন নবী বা রাসূল প্রেরণ করেন তবে তাকে অবশ্যই কিছু না কিছু অলৌকিক নিদর্শন দেন।

জাফর : নবীজির সেই অলৌকিক মুজেজা হচ্ছে আল কোরআন।

আমর : একটি বই! একটি বই! যা সাহিত্যিকরা হরহামেশা অনায়সে লিখতে পারে। আমার মত আমরই এই রকম লিখতে যথেষ্ট!

বাদশাহ : কিন্তু এতে অলৌকিকতার কি আছে? আমি শুনেছি তোমরা বিদ্রোহী, সমাজদ্রোহী এবং ধর্মাদ্রোহী। এদেরকে গ্রেফতার করো।

বাদশাহর নির্দেশে কয়েকজন মুসলমানদেরকে বেধে ফেলার জন্য উদ্যত হয়।

জাফর : যখন আমরা মক্কাতে চরমতম নির্যাতন ভোগ করছিলাম এবং নির্যাতনের দরুন আমরা বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছিলাম কিংবা চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাচিছলাম আর আমাদের ব্যাপারে

১৯—

www.pathagar.com

আমাদের স্বজাতিরা দিনে দিনে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির আর নির্যাতনের ব্যবস্থা করছিলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা আবিনিসিয়া হিজরত করো। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে এটা একটা নীতিবান এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর রাজ্য।

বাদশাহ : কেন মুহাম্মদ তোমাদেরকে আমার কাছে পাঠালো?

জাফর : কারণ আপনি বিশ্বাস করেন একটি ধর্মগ্রন্থ এবং এক ঈশ্বরে। যেমনটি আমরাও করি।

বাদশাহ : ঠিক আছে এদেরকে মুক্ত করো।

বেঁধে ফেলার জন্য উদ্যোতরা সরে গেলো।

বাদশাহ : কি বলছিলে বলতে থাকো।

জাফর : আমরা ছিলাম মূর্তি পূজারী আমরা প্রতিমা তৈরী করতাম কাঠ, পাথর অথবা মাটি দিয়ে। আমরা উদ্ভট দেবতাদের সাথে বাস করতাম কিন্তু কোন পবিত্র স্রষ্টার সত্ত্বার অস্তিত্ব ছিলো না।

বাদশাহ : অনেক বলে ফেলেছো! আমি নিশ্চিত যে, এসব তুমি নিজের থেকে বলছো।

জাফর : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের কথা বলছি। যিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এক আল্লাহর দাসত্ব করতে, সত্য বলতে, আমাদের প্রতিবেশিদেরকে ভালোবাসতে, অন্যের কল্যাণ কামনা করতে। এমনকি তিনি বলেছেন, আমার একটু মিষ্টি হাসিও অন্যের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, নারী জাতিকে মর্যাদা দিতে, এতিমদের হেফাজত করতে এবং পাথর ও কাঠের দেবতা থেকে দূরে সরে যেতে।

আমর : মহামান্য বাদশাহ! আমি আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারছিনা। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে সম্মান করি যাকে আমরা বলি দেবতাদের ধর্ম অথচ এরা সেই দেবতাদের ব্যাপারে উদ্ভট সব কথা বার্তা বলে বেড়াচ্ছে। আর পাগলে কিনা বলে...

বাদশাহ : আমি স্বীকার করছি সময় অনেক কথার জন্ম দেয়। আইন তার নিজের গতি ভঙ্গ করে এবং নিয়ম সব সময় একতালে প্রবাহিত হয়না।

আমর : ধন্যবাদ মহামান্য বাদশাহ! এখন ওদের নিকট থেকে শুনুন যে নারীদের ব্যাপারে ওরা কি মত পোষণ করে?

জাফর : আল্লাহ তায়ালা নারীদের সৃষ্টি করেছেন পুরুষদের সঙ্গী হিসাবে। তারা পৃথক, তবে অধিকারের দিক দিয়ে সমান।

www.pathagar.com

আমর : শুনুন মহারাজ! ওদের উদ্ভট কথাগুলো শুনুন। নারীরা নাকি আমাদের সমান? আমরা ওদেরকে ক্রয় করি, লালন-পালন করি, প্রয়োজনে ব্যবহার করি, প্রয়োজন শেষে বর্জন করি। ওরা আমাদের সমান হয় কি করে?

সকলে হো হো করে কোরাস স্বরে হেসে উঠলো।

জাফর : আল্লাহ্ তায়ালা একজন পুরুষ এবং একজন নারী সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ তুমি অবশ্যই সকল মহিলাদের সম্মান করবে আমর! কারণ তাদের গর্ভেই তো তোমার জন্ম নাকি?

আমর : ঠিক আছে পূর্ববর্তী নবী মুসা এবং যিশু সম্পর্কে ওদের ধারণাটা শুনুন মহামান্য।

জাফর : মুসা এবং ঈসা প্রত্যেকেই আল্লাহ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই একই কথায় বলছেন। এতে তো নতুনত্বের কিছুই নেই।

বাদশাহ : এই নামগুলো তোমাদেরকে কে শিখিয়েছে?

জাফর : এই নামগুলো কুরআনে আছে আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নামগুলো আমাদের শিখিয়েছেন।

আমর : মুহাম্মদ ছিলো একজন এতিম মেষপালক। যিশু এবং তার মা সম্পর্কে মুহাম্মদ অন্য কথা বলেছে।

বাদশাহ : ঠিক আছে কি বলেছে তা শুনি।

জাফর : মরিয়ামের কথা স্মরণ কর। সে যখন পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একাকী অবস্থান করছিলো, যখন সে তার পর্দা টানিয়ে নিলো। অত:পর ফেরেশতা তার সামনে মানুষের আকৃতিতে হাজির হলো। সে বলল: আল্লাহকে ভয় কর। আমি তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ফেরেশতা বলল: আমি আল্লাহর দূত। আমি তোমার গর্ভে এক শিশুসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। মরিয়াম বলল: নিশ্চয় আমি সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। ফেরেশতা বলল: তোমার পালন কর্তার জন্য এটা খুবই সহজ এবং মানব জাতির নিদর্শন স্বরূপ। অত:পর সে গর্ভধারণ করলো... [সূরা মরিয়মের ১৬ হতে ২২ আয়াত।]

বাদশাহ : খোদার কসম তোমরা যা বলেছো খোদাবন্দ ইসাহ মসীহ্ এই কাঠের টুকরার চাইতে বেশি কিছু না। তোমাদের যতদিন ইচ্ছা এই শহরে নিরাপদে বসবাস করতে পারো।

মুসলমানরা খুশিতে পরস্পর কোলাকুলি করে।■

www.pathagar.com

সরকার অনুমোদিত ◘ জাতীয়বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ◘ কলেজ কোড:৩০১৫,৫৪১৮

ন্যাশনাল কলেজ
অব এডুকেশন,নরসিংদী

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবু তাহের বেলাল (সহকারী রেজিস্ট্রার,জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

অনুমোদিত কোর্সসমূহ:

- চার বছর মেয়াদী বিবিএ অনার্স কোর্স
- কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনার্স কোর্স
- এক বছর মেয়াদী বি.এড ডিপ্লোমা কোর্স
- এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স কোর্স
- দুই বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স
- উচ্চমাধ্যমিক : বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ।

অধ্যাপক আবু তাহের বেলাল
(প্রতিষ্ঠাতা)

কলেজ ক্যাম্পাস:১৩৩/১পূর্ব ব্রাহ্মন্দী (ব্রাহ্মন্দী মোড়),নরসিংদী সদর,নরসিংদী

ফোন:০৬২৮-৫১৬৬১,০১৭১১ ১৬১৩৭০,০১৯১২ ৯১২২৩৮,ই-মেইল: nc_edu2007@yahoo.com

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর জীবনাদর্শ

এ বি এম মুহিউদ্দীন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা এবং সফল মানুষ। তাঁর জীবনে রয়েছে গোটা মানবমণ্ডলীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। জীবনের প্রতিটি বিভাগে অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু মহানবীই [সা] কেবল মানবেতিহাসের একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাঁর জীবনে সকল প্রকার উত্তম গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন ঘটেছে। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আদর্শের এমন অভূতপূর্ব সমাবেশ আর কোন ব্যক্তির মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। মানবিক সদগুণাবলীর পরিপূর্ণ পরিস্ফুটন ঘটেছিল মহানবী [সা]-এর পবিত্র জীবনে। বস্তুত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে-প্রতিটি স্তরে মহানবী [সা] যে সুমহান আদর্শের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা চির ভাস্বর ও অনুসরণীয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূল [সা]-এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' [আহজাব : ২১]

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়, মহানবী [সা]-এর জীবনে সেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য এককভাবে বিদ্যমান ছিল। [আর রাহীকুল মাখতুম] তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

ওহী প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই উত্তম ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। সকল নবী এবং রাসূলদের আদর্শ একীভূত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর জীবন। তাই তিনি সকল নবীদেরও নবী।

মহানবী [সা]-এর শৈশব জীবনেই যে সুন্দরতম আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়; তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের আলোকচ্ছটা হিসাবে ধরা দেয়। রমজান মাসে দিনের বেলায় দুধ পান করা থেকে বিরত থাকা এবং দুধ ভাইয়ের জন্য মায়ের অপর একটি স্তন রেখে দিয়ে মহানবী [সা] শৈশবেই তাঁর যে অতুলনীয় নীতিবোধের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা মানবেতিহাসে বিরল। [ইবনে হিশাম] তৎকালীন অসভ্য ও অমার্জিত আরব সমাজে বালকদের মধ্যে এতিম মুহাম্মাদ [সা] তাঁর প্রতিবেশীদের সাথে চলা-ফেরায়, বন্ধুদের সাথে মাঠে-ময়দানে, রাখাল বালকদের সাথে মেষ-চারণায় এবং অপরাপর লোকদের সাথে আচার-ব্যবহারে শিষ্টচারিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার এমন ব্যতিক্রমী আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হন যে, সর্বমহলে তিনি আল-আমিন ও আস-সাদিক নামে সুখ্যাতি লাভ করেন। [ইবনে হিশাম]

জন্মের পর থেকেই মহানবী [সা] সর্বপ্রকার অশ্লীলতা এবং পাপাচার থেকে নিজেকে পূত-পবিত্র রেখেছেন। আরবদের ঘৃণ্য রীতি-নীতি এবং জীবনধারা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। তিনি কখনো মদ স্পর্শ করেননি, আস্তানায় জবাই করা পশুর গোশত খাননি, মূর্তির জন্য আয়োজিত উৎসব-মেলা ইত্যাদিতে কখনোই অংশগ্রহণ করেননি। [আর রাহীকুল মাখতুম] অত:পর যৌবনে পদার্পণ করে তিনি হেরা গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন হন। এসময় তিনি পথহারা গোটা মানবজাতির সুপথ এবং মুক্তি লাভের চিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ করেন। স্বভাবতই সততা তাঁকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে রেখেছিল। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি সুপথ থেকে বিচ্যুত হননি।

যুবক বয়সে মহানবী [সা] খাদিজা [রা]-এর বিরাট ব্যবসায়ের কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। সেখানে তিনি আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার যে উন্নত আদর্শ স্থাপন করেন তা গোটা আরব উপদ্বীপে তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করে। ৩৫ বছর বয়সে মহানবী [সা] তাঁর সমবয়সী সমমনা যুবকদেরকে নিয়ে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত সেবাসংঘ হিলফুল ফুজুল-এ যোগ দেন। [ইবনে হিশাম] এর ম্যধদিয়ে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং সমাজের মজলুম ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন। পবিত্র কাবা ঘর মেরামতকালে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে আরব নেতাদের মাঝে উদ্ভূত সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘাত নিরসনের মাধ্যমে তিনি শান্তি প্রতিষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মহানবী [সা] ছিলেন সত্যপ্রিয়তা এবং চিন্তাশীলতার সুউচ্চ মিনার। সকলের চেয়ে অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সম্মানিত প্রতিবেশী, সর্বাধিক দূরদর্শী, সকলের চেয়ে কোমলপ্রাণ এবং সর্বাধিক পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী। ভালো কাজে, ভালো কথায় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে সর্বাধিক পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী। ভালো কাজে, ভালো কথায় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রসর এবং

www.pathagar.com

প্রশংসিত। অঙ্গীকার পালনে তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রণী। হযরত খাদিজা [রা] সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি বিপদগ্রস্তদের বোঝা বহণ করতেন, দু:খী-দরিদ্র লোকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতেন, মেহমানদারী করতেন এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতেন। [সহিহ বুখারী : ১ম খণ্ড] মূলত মহানবী [সা] থেকে যা কিছুই প্রকাশ পেয়েছে তা হোক আচরণগত, অভ্যাসগত কিংবা বাচনিক তার সবই আল্লাহতায়ালা কর্তৃক অনুমোদিত এবং মানবতার জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তিনি নিজের প্রবৃত্তি হতে কোন কথা বলেন না। যা বলেন তা ওহী ব্যতীত অন্য কিছু নয়। [আন-নাজম : ৩]

মহানবী [সা] সংঘবদ্ধ পরিবার গঠনে জোর দিয়েছেন এবং তিনি নিজেই এই অঙ্গনে অনুসরণীয় আদর্শের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি নারীর যথাযথ মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মহানবী [সা] পরিবার ব্যবস্থাপনায় রেখেছেন অতুলনীয় অবদান। নিজের অধিনস্থ কর্মচারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের যে উত্তম আদর্শ তিনি উপস্থাপন করেছেন; তাতে মানবতার জন্য রয়েছে মহান শিক্ষা।

প্রতিবেশী হিসাবে মহানবী [সা] ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। যে বৃদ্ধা মহানবী [সা]-এর পথে নিয়মিত কাঁটা বিছিয়ে রাখতো সে বৃদ্ধারই অসুস্থতায় পাশে গিয়ে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে সেবা করেছেন। ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীকে খাবারের থালা বাড়িয়ে দিয়েছেন নিজে অনাহারে থেকে। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে অনাহারে রেখে নিজে পেট পুরে খায়, সে মুমিন নয়। [সহিহ বুখারী] তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহর শপথ ঐ ব্যক্তি কখনো মুমিন নয় যার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। [মিশকাত] মক্কায় মহানবী [সা] নবুওয়াতপরবর্তী জীবনে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর আনুগত্যের ঘোষণা প্রদান করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন একাধিকার। পরিশেষে সিমাহীন নির্যাতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে মহানবী [সা] আল্লাহর নির্দেশে নিজ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন। তথাপি তিনি কখনোই হতাশ হননি কিংবা কাউকে মন্দ বলেননি। সহ্য এবং সবরই ছিল তাঁর জীবনের উত্তম আদর্শ।

হিজরতের পর মদীনার রাষ্ট্রপতি হিসাবে মহানবী [সা] পূর্ণ ইনসাফ এবং দায়িত্বশীলতার সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা থেকে মুক্ত করেন। রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে তিনি এক আল্লাহর বান্দা হিসাবে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সব নাগরিকের নিরাপত্তা এবং সমসুযোগ নিশ্চিত করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র উপহার দেন। আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন এবং কার্যকর করে দেখিয়েছেন। তাঁর নিকট রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ছিলো দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে আমানততুল্য।

মহানবী [সা] জ্ঞান এবং জ্ঞানীদেরকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দান করেছেন। তিনি সর্বত্র জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে মানুষকে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি ঘোষণা

www.pathagar.com

করেন, সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ। [সহিহ্ মুসলিম] জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকল্পে তিনি আরো ঘোষণা করেন, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে এক ঘন্টা চিন্তা করা ষাট বছর নফল ইবাদাতের চেয়ে উত্তম। [বায়হাকী] আল্লাহর কুরআন, তাঁর হাদীস এবং নিজের বাস্তব জীবন থেকে দুনিয়াবাসীর জন্য তিনি যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেছেন তা মানবজাতিকে যুগে যুগে তাঁর আদর্শ গ্রহণে অনুপ্রাণীত করবে।

মহানবী [সা] সমাজে হারাম বস্তুর উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে সকল অপবিত্রতার মূলোৎপাটন করেছেন। রাষ্ট্র থেকে সুদকে নির্মূল করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে মহানবী [সা] যে শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্টা করেছেন তা সবার জন্য অনুকরণীয়। অন্যদিকে অধিক মুনাফা লাভের আশাস খাদ্যদ্রব্য মজুদ রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করাকে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর আদর্শ ছিলো অপচয় রোধ করা এবং ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে তা মানুষের উপকারে ব্যয় করা। অপচয়কারীকে তিনি অভিসম্পাত করেছেন এবং অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

সন্ধি ও যুদ্ধনীতিতে মহানবী [সা]-এর আদর্শ কালজয়ী এবং অতুলনীয়। বদরের ৭০ জন কাফির যুদ্ধবন্দীকে তিনি কেভল পণসাপেক্ষ মুক্তিই প্রদান করেননি বরং যে মুহূর্তে মহানবী [সা] যুদ্ধজয়ী হয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন, সেই সময় মুসলিম যোদ্ধাদেরকে তিনি দু'টি নির্দেশ প্রদান করেন। এক. রাতের খাবার তোমরা গ্রহণ করো না, বন্দীদেরকে উটের উপর আরোহণ করতে দাও। সাহাবায়ে কিরামগণ তাই করেছিলেন। প্রাণঘাতী শত্রুর সাথে উন্নত আচরণের এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এমনিভাবে জিহাদের ময়দানে মহানবী [সা]-এর আদর্শ ছিল বিপক্ষের আক্রমণকারী সৈন্য ছাড়া অন্য কাউকে আক্রমণ না করা। সাধারণ নাগরিক, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ফসলের জমি, উপাসনালয়, ফলবান বৃক্ষ এবং জীব-জন্তু ইত্যাদির প্রতি হামলা করার ব্যাপারে মহানবী [সা]-এর কঠোর নিষেধ ছিল। অপরপক্ষ কর্তৃক সন্ধির শর্ত ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তিনি কখনো সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেননি। শান্তিপ্রিয়, মানবতাবাদী, আদর্শ, সৈনিক, আদর্শ বিজেতা এবং মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যই তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন।

মহানবী [সা]-এর জীবন চরিত্র চরিত্র এবং কর্মের সকল কিছুই সুপ্রকাশিত এবং সুস্পষ্ট। কোথাও এতটুকু গোপনীয়তা নেই। স্বয়ং মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর উত্তম চরিত্রের প্রশংসাকারী। আল্লাহ বলেন, নিশ্চই আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। [কলম : ৪]।

সর্বোপরি মানবজীবনের এমন কোন দিক বা বিভাগ বাদ যায়নি যেখানে মহানবী [সা] কর্তৃক সর্বোত্তম আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদ সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভীর নিম্নোক্ত বক্তব্য এখানে প্রনিধানযোগ্য। 'যদি তুমি বিত্তবান

www.pathagar.com

হও তাহলে তোমার জন্য জীবনাদর্শ হলেন মক্কার সওদাগর ও বাহরাইন ধনাগারের অধিপতি মুহাম্মাদ [সা]। যদি তুমি রাষ্টনায়ক হও তাহলে তোমার অনুসরণীয় জীবনাদর্শ হল সুলতানে আরবের অনাড়ম্বর জীবন। যদি তুমি একজন নাগরিক হও তাহলে কুরাইশদের অনুকরণের আদর্শ তোমাকে প্রেরণা যোগাবে। যদি তুমি যুদ্ধজয়ী সেনাপতি হও তবে বদর-হুনাইনের সফল সেনাপতি তোমার আদর্শ। তুমি যদি রনক্লান্ত হও, তাহলে ওহুদের ময়দানে রক্তাক্ত মুহাম্মাদ [সা] তোমার আদর্শ। যদি তুমি শিক্ষক হও, তাহলে সুফফার শ্রেণীকক্ষের সার্থক মুয়াল্লিম থেকে খুঁজে নাও তোমার আদর্শ। তুমি যদি একজন শিক্ষার্থী হও, তাহলে হেরা গুহায় ওহী প্রত্যাশী ব্যক্তিটির অবস্থা থেকে আদর্শ খুঁজে নাও। যদি তুমি বাধ্য হও নিঃসঙ্গ-অসহায়ভাবে হকের বাণী প্রচার করতে, তাহলে মক্কার অনাহারক্লিষ্ট, সম্বলহীন দাঈ নবী মুহাম্মাদ [সা] তোমার আদর্শ। তুমি যদি শত্রুকে পরাভূত করে বিজয়ী বেশে বিজিতাঞ্চলে প্রবেশকারী হও, তাহলে মক্কা বিজয়ের অপূর্ব দৃশ্যই হবে তোমার আদর্শ। তুমি যদি পিতৃহীন এতিম হও, তাহলে আমিনার নয়নমণি বালক মুহাম্মাদ [সা]-এর সীরাত তোমাকে পথ দেখাবে। যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু হও, তাহলে হালিমা সাদিয়ার কোলে আদরের দুলালকে দেখে নাও। মোটকথা নবী জীবনের প্রতিটি বাঁকে তুমি পাবে মানবতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।' ■

www.pathagar.com

শিল্পী, সুরকার
মশিউর রহমান
সত্ত্বাধিকারী

নামাজ রোজার মতই পর্দা করা ফরজ।

ফাতেমা হিজাব এন্ড ফ্যাশন

(আধুনিক ও রুচিশীল মহিলাদের পছন্দ)

ইরান, পাকিস্তান, সৌদী আরব, দুবাই সহ দেশী-বিদেশী বৈচিত্রময় বোরকার পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় প্রতিষ্ঠান।

প্রধান শাখা

৪৩৫/ এ-২ চাষী কল্যাণ ভবন (নীচ তলা)
ওয়ারলেছ রেল গেইট (দৈনিক সংগ্রাম সংলগ্ন)
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৯৩৩৫৬৫৮, ০১৯১৪-৮৭০৮৯২

পরিচালক

টুনটুনিদের আসর
(শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান)
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১১৮৫৪৩, ০১৬৭৩-৯৯৫৫৪৮

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] আপোসহীনতা

এস.এম. জহির উদ্দীন

আরবের সামাজিক অবস্থা তখন কলুষতায় পূর্ণ। বিত্তবানদের আধিপত্য সুদৃঢ়। বিত্তবান অর্থই ছিল অত্যাচার, যুলম, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন, অন্যের অধিকার হরণ, নারী লিপ্সা, বিলাসিতা, অপচয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

পশুর ন্যায় হাট-বাজারে বিক্রি হতো অসহায় নারী-পুরুষ। তাদের ছিল না কোন মত প্রকাশের অধিকার, ছিল না নিজের ইচ্ছা মত কিছু করার। স্বাধীনতা বলতে যা ছিল তা মনিবের অনুকম্পা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল। নারীর অন্যতম কাজই ছিল গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি বিত্তবান পুরুষদের দৈহিক চাহিদা মেটানো। পূর্ব-পুরুষদের রীতির অন্ধ অনুকরণে জীবন চালিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করাই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এসব লোক যখন কোন লজ্জাকর কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এসব করতে দেখেছি এবং আল্লাহই আমাদের এসব করার হুকুম করেছে। [হে রাসূল!] তাদেরকে বলুন, আল্লাহ কখনও ফাহিশা কাজের হুকুম দেন না। তোমরা কি আল্লাহর নাম নিয়ে এমন কথা বল যা [আল্লাহর কথা কিনা] তোমরা জান না?" –সূরা আল আ'রাফ ঃ ২৮

www.pathagar.com

কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তারা লজ্জায় মুখ লুকাতো। তাদের মনোভাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুখবর দেওয়া হয় তখন তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং কষ্টে রাগ দমন করে নেয়। মানুষ থেকে তারা লুকিয়ে বেড়ায় কারণ এমন খারাপ খবরের পর কেমন করে মুখ দেখাবে! ভাবতে থাকে যে, অপমান সহ্য করে কন্যাকে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে?" –সূরা আন নাহল ঃ ৫৮-৫৯

আল্লাহ ক্রোধ প্রকাশ করে আরো বলেন, "আল্লাহ কি তার সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন, আর তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন?" –সূরা আয্ যুখরুফ ঃ ১৬

ধর্মীয় অবস্থা ছিলো চারদিকে দেব-দেবীর জয়-জয়কার, ঘরে ঘরে নানা আকৃতির মূর্তি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেব-দেবীর হাতেই যাবতীয় সাফল্য ও ব্যর্থতার চাবিকাঠি। যারা বিত্তবান বা ক্ষমতাশালি দেব-দেবী সন্তুষ্ট হয়েই তাদের এ অবস্থানে নিয়ে এসেছে আর নির্যাতিত, নিপীড়িতদের প্রতি দেব-দেবী নাখোশ বিধায় তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই ছিল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস। কতিপয় লোক পূর্ববর্তী নবীদের অনুসৃত দীনের কিয়দংশ ব্যক্তিগতভাবে পালন করতেন। তাতেও ছিল বিকৃতি। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধার অন্তরায় এমন রীতি এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল কিছু রীতি আঁকড়ে ধরে অনেকে ধর্মীয় জীবন পার করতেন।

সমাজের এমনই এক সময়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] আগমন। যুগে যুগে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন সকলের দাওয়াত ছিল এক। তাঁদের সকলের দীন ছিল ইসলাম। অর্থাৎ এক ও অভিন্ন দাওয়াত দেওয়ার জন্যই মহান রাব্বুল 'আলামীন যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষ যখন অধঃপতনের নিম্ন সীমায় পৌছে গেছে তেমন সময়ই আল্লাহ তায়ালা অধিকাংশ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকলের দাওয়াত দানের পদ্ধতিও ছিল এক। প্রথমে একান্ত আপনজনদের মাঝে চুপে চুপে তারপর কিছু লোক তৈরি হলে প্রকাশ্যে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] পদ্ধতিও ছিল তাই। ওহী প্রাপ্তির খবর প্রথমেই জানালেন স্ত্রী খাদিজাকে। খাজিদা [রা] বিবাহের পূর্ব থেকেই মহানবীকে [সা] জানতেন। সানন্দে মেনে নেন তাঁর দাওয়াত।

চাচা আবু তালিবের ছেলে আলী [রা]। বয়স মাত্র ১০। রাসূলের তত্ত্বাবধানেই তিনি প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। অর্থাৎ রাসূলের [সা] চরিত্র ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত। তাই রাসূলের [সা] দাওয়াত তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন। পালক পুত্র যায়িদও ছিলেন রাসূলের [সা] যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই প্রশান্তচিত্তে ইসলামী আলোয় উদ্ভাসিত হন। আবু বকর ইবনু কুহাফা [রা] ছিলেন সমাজের সর্বজন সমাদৃত, সম্মানিত, জনপ্রিয় ও বন্ধু বৎসল ব্যক্তি। সমাজের অনেকেই ধর্না দিত তাঁর নিকট। কেউ সাহায্যের জন্য, কেই পরামর্শ, কেউ সখ্যতা বা বন্ধুত্বের জন্য। মুহাম্মাদুর

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা] যান আবু বকরের নিকট। দাওয়াত দেন ইসলামের। মহান আল্লাহ অমায়িক এ পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে কবুল করে নেন। ইনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি শুধু নিজে গ্রহণ করেননি, সাথে সাথে অন্যের কাছেও এ দাওয়াত পৌছাতে থাকেন। একে একে ইসলামী আঙিনায় প্রবেশ করাতে থাকেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের।

কেটে যায় তিন বছর। বেশ কিছু সত্য সন্ধানী ব্যক্তি ইসলামী আলোয় উদ্ভাসিত হন। ধীরে ধীরে এ দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের জন্য। রাসূল [সা] তাই করেন। শুরু হয় বিপত্তি। বাধার প্রাচীর সামনে রেখে প্রচণ্ডভাবে গর্জে ওঠে প্রতাপশালীরা। তারা অনুধাবন করে রাসূলের [সা] দাওয়াত সাধারণ কোন কথা নয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মূল কথা হলো- প্রতাপশালীদের যাবতীয় ক্ষমতা, বিলাসী জীবন, শোষণ-নিপীড়ন ইত্যাদির অবসান হওয়া। কোমর বেঁধে লেগে যায় রাসূলের [সা] কিছু নিকটাত্মীয়সহ বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা। শুরু হয় নতুন দীন গ্রহণকারী লোকদের উপর অমানবিক অত্যাচার। চাচা আবু তালিবের প্রতাপশালিতার কারণে রাসূলকে [সা] প্রথম দিকে ক্ষতি করতে না পারলেও তারা নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। প্রবীণ চাচা আবু তালিবকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে মুহাম্মাদকে [সা] তাঁর মিশন থেকে নিবৃত করার লক্ষ্যে। অতিষ্ঠ হয়ে চাচা আবু তালিব বিনয়ের সাথে মুহাম্মাদের [সা] নিকট কুরাইশদের অভিপ্রায় বর্ণনা করেন। কিন্তু দীনের প্রতি আপোষহীন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] স্পষ্ট জানিয়ে দেন- "আল্লাহর কসম, তারা যদি আমার এক হাতে সূর্য ও আরেক হাতে চন্দ্র এনে দেয় তার বিনিময়েও আমি এ দাওয়াত ত্যাগ করতে পারবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ এই দীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই।"

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা নানা দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এমনকি বখাটে, মূর্খ লোকদের লেলিয়ে দিয়েও রাসূলকে [সা] কষ্ট দিতে থাকে। রাসূলকে [সা] দেখা মাত্র তারা কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী, পাগল ইত্যাদি গালাগাল দিতে থাকে। চারদিকে রাসূলের [সা] সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। হাজরে আসওয়াদের পাশে কুরাইশ সরদারদের এমনই এক সমালোচনার মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ [সা] সেখানে হাজির হন। ক্ষিপ্ত কুরাইশগণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। রাসূলও নীরবে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন শেষে কাবা তাওয়াফ শুরু করেন। তাদের পাশ দিয়ে ঘোরার সময় কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করে। রাসূল [সা] নীরবে দ্বিতীয় বার ঘুরে আসেন। তারা আবারও তদ্রূপ মন্তব্য করে। এবারও রাসূল [সা] নীরবে সহ্য করেন। তৃতীয় বার ঘোরার সময় তারা অনুরূপ মন্তব্য করলে রাসূল [সা] দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যান এবং স্পষ্ট ঘোষণা করেন- "হে কুরাইশগণ, যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ, [যদি তোমরা ঈমান না আন] আমি তোমাদের জন্য সর্বনাশ বয়ে এনেছি।" এ বলিষ্ঠ ঘোষণায় কুরাইশ সরদারগণ হতবাক হয়ে যায়।

www.pathagar.com

নানা অপ-কৌশল মুকাবিলা করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। কুরাইশ সরদারগণ সলাপরামর্শের মাধ্যমে এবার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়– হে মুহাম্মাদ, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, পূর্ব পুরুষদের ভর্ৎসনা করেছ, দেব-দেবীকে গাল-মন্দ করছ, জাতির ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছ। তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় অর্থ-সম্পদ লাভ, আমরা তোমাকে বিত্তশালী বানিয়ে দেব। আর যদি পদমর্যাদার প্রত্যাশী হও তাহলে আমাদের সরদার বানিয়ে নেব। যদি বিপুল ক্ষমতাধর হতে চাও, আমরা তোমাকে বাদশা বানিয়ে দেব। কুরাইশগণ এসব লোভনীয় প্রস্তাবের মাধ্যমে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে [সা] তাঁর মিশন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে। এমনকি তারা সবচেয়ে সুন্দরী নারীর লোভ দেখাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু আল্লাহর রাসূল [সা] আবারও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "সম্পদ পদমর্যাদা বা রাজা-বাদশা হওয়া কোনটিই আমার লক্ষ্য নয়। আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, তোমাদের জন্য সাবধানকারী ও সুসংবাদদানকারী হতে আমাকে আদেশ করেছেন, তাঁর আদেশ অনুসারে আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দিয়েছি। এখন তোমরা যদি আমার এ দাওয়াত গ্রহণ করে নাও তাহলে সেটা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমাদের ও আমার ব্যাপারে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করবো।"

কুরাইশগণ বার বার ব্যর্থ হলেও তখনো নিরাশ হয়নি। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তারা তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আবারও তারা এক অভিনব এক প্রস্তাব নিয়ে আসে। আর তা ছিল এক বছর রাসূল [সা] তাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন [নাউযুবিল্লাহ] পক্ষান্তরে তারাও এক বছর রাসূলের [সা] উপাস্যের ইবাদাত করবে। এর প্রতিউত্তরে রাসূল [সা] আল্লাহর বাণী ঘোষণা করেন– "হে কাফিররা! আমি তাদের ইবাদাত করি না তোমরা যাদের ইবাদাত করো। আর তোমরা তার ইবাদাতকারী নও আমি যার ইবাদাত করি। আমি তাদের ইবাদাত করবো না যাদের ইবাদাত তোমরা কর।" –সূরা আল কাফিরুন ঃ ১-৪

রাসূল [সা] দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দেন আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদাত তো করিই না বরং কখনই করবো না।

একদিকে সত্য সন্ধানী নারী-পুরুষের সত্য দীনে দাখিল অন্যদিকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামী, বিলাসিতায় মগ্ন ব্যক্তিদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি, দুটো গতিই চলতে থাকে প্রবল বেগে। অসহনীয় শারীরিক, মানসিক, আর্থিক নির্যাতনেও মহানবীর [সা] দীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা এক পর্যায়ে প্রথম গতিকে আরো বেগবান করে। আর অপর গতির শিথিলতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সময় আসে সত্য প্রতিষ্ঠার। সময় আসে নতুন সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের। ■

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] প্রিয় লোক

আবদুর রহমান

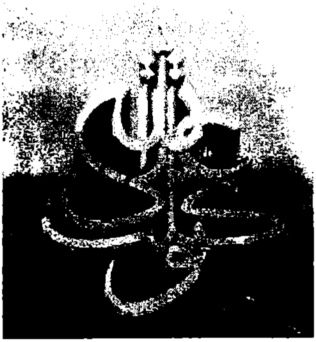

চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে একটি পবিত্র ও উন্নত মানবজীবন এবং সৎকর্মশীল মানবসমাজ গড়ে উঠতে পারে। নৈতিক চরিত্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ একটি সমাজ পরিস্ফুটিত করে থাকেন।

নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধান নবী [সা] এর নবুওয়তের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সমাজে অবশ্যই ন্যায়, ইনসাফ ও সদাচরণের মাধ্যমে চরিত্রকে বিকশিত করতে হবে। নবী করিম [সা] যে আদর্শ শিক্ষা উপস্থাপিত করেছেন তাতে ঈমানের পর মানুষের নৈতিক চরিত্রকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং একে সার্বিক কল্যাণের উৎস বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

উত্তম ও উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলি গ্রহণ করাই হল মানুষের বৈশিষ্ট্য। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে লোক সর্বোত্তম ইসলামের, দৃষ্টিতে সেই হচ্ছে উত্তম ব্যক্তি, যার মধ্যে উন্নত মনুষ্যত্ব রয়েছে সেই উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। পক্ষান্তরে যার উৎকৃষ্ট চরিত্র রয়েছে সেই প্রকৃত মানুষ। নীতি-দর্শন গ্রহণ করলেই নৈতিক চরিত্র গ্রহণ করা যায় না। নীতি-দর্শন এক জিনিস আর প্রকৃত নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নতর। নৈতিক চরিত্র হলো ব্যক্তির সবচাইতে উন্নত গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তির আমল ওজন করার সময় তার উত্তম চরিত্রই অত্যন্ত ভারী জিনিস রূপে প্রমাণিত হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রা] হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন নবী করিম [সা] ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক হচ্ছে তারা যাদের চরিত্র তোমাদের সকলের অপেক্ষা উত্তম।'

নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ

* আত্মসংযম, ক্ষমা ও সহনশীলতা * উদারতা, লজ্জাশীলতা * গাম্ভীর্য * বিনয় নম্রতা * অল্পে তুষ্টি * সহজ সরল জীবন যাপন * বদান্যতা * সততা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি।

চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি হচ্ছে– আত্মম্ভরিতা * অহঙ্কার * মনের সঙ্কীর্ণতা * নিকৃষ্ট আচরণ * স্বার্থপরতা * কৃপণতা * লোভ-লালসা * কৃত্রিমতা * মিথ্যাচার * বাহ্যিক লৌকিকতা * অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া * অপচয় ও অপব্যবহার * ভোগবিলাস * কাপুরুষতা, সন্দেহ প্রবণতা ইত্যাদি।

উত্তম চরিত্রের বর্ণনা কুরআন হাদিসের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। উপলব্ধির উদ্দেশ্যে দু-একটি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। রহমানের খাঁটি বান্দা তারাই যারা মাটির এ পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। রহমানের বান্দার আরো পরিচয়– তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। কোন বেহুদা ব্যাপার সামনে এলে তারা ভদ্রোচিতভাবে তা এড়িয়ে যায়। সূরা লোকমানের ১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না। এ পৃথিবীতে গর্ব অহঙ্কারের প্রকাশ ঘটিয়ে চলাফেরা করো না। আল্লাহ আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারী ব্যক্তিদের পছন্দ করেন না। সুতরাং এগুলো সৎ চরিত্রবান নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের খেয়াল রাখতে হবে।

আর উত্তম চরিত্র তো সার্বক্ষণিক ইবাদতের জন্য জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে দীন মেনে চলার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যই।

চরিত্র গঠনের জন্য মুহাম্মাদ [সা]কে একমাত্র আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে একমাত্র সত্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে সেই মাপকাঠি অনুযায়ী নিজেদের জীবন-জিন্দেগি গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই প্রতিষ্ঠিত হয় আশরাফুল মাখলুকাতের সম্মানজনক আসন। অন্যথায় স্বীয় কৃতকর্মের কারণে নিক্ষিপ্ত হয় ধ্বংসের অতল তলে, সৃষ্টির সেরা মানুষ নেমে যায় পশুত্বের কাতারে। এখানেই শেষ নয়, সে নেমে যায় পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সফল জীবন দান করুন।■

www.pathagar.com

শিশুদের প্রতি রাসূল [সা]-এর ভালবাসা

মনির হোসেন হেলালী

ছোট-বড় সবার জন্যেই রাসূল [স] হচ্ছেন একমাত্র আদর্শ। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সকল স্থানেই রয়েছে রাসূলের [স] উত্তম আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি জগৎবাসীর জন্যে এসেছেন শিক্ষক হিসেবে। তার ভালবাসা আর সুন্দর আচরণ দিয়ে যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে তিনি দিয়েছেন দ্বীনের দাওয়াত, শিখিয়েছেন প্রয়োজনীয় সব বিষয়। উপনীত হয়েছেন তিনি সকল ক্ষেত্রে মানবতার পূর্ণ শিখরে; এই মহৎগুণের মধ্যে রয়েছে শিশুদের প্রতি তার সুন্দর আচার-ব্যবহার, যাতে রয়েছে সকলের জন্য আদর্শ। এ পর্যায়ে সাধারণত কেউ উপনীত হতে পারে না। মনোবিজ্ঞানীরাও না, তবে এ সত্ত্বেও মুসলমানের উচিত যতটুকু সম্ভব তার আদর্শের অনুকরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে শিশুদের সাথে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহাগ ও কৌতুক করা। সংক্ষিপ্ত আকারে এগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো :

শিশুদের সাথে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ

জাবের বিন সামুরাহ [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলের **সাথে ফযরের** নামায পড়লাম অত:পর তিনি বাড়ির দিকে বের হলেন আমিও তার সাথে বের হলাম। পথিমধ্যে তার সাথে কিছু

www.pathagar.com

বাচ্চাদের সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদের এক এক করে প্রত্যেকের উভয় গালে হাত বুলাতে লাগলেন।' মাহমুদ [রা] বলেন, 'তিনি আমার উভয় গালে হাত বুলালেন আমি তার হাতের হিম শীতল সুগন্ধি উপলব্ধি করলাম। যেন তার হাতের সাথে সুগন্ধি ব্যবসায়ীর সামগ্রীর ছোঁয়া লেগেছে।' [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩২৯]

উসামার প্রতি তাঁর ভালোবাসা

উসামা বিন যায়েদ [রা] বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধরে তার এক রানে বসাতেন আর হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। অত:পর তাদের একত্র করতেন এবং বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করো, কেননা আমি তাদের প্রতি দয়া করি।' [সহীহ আলবুখারী, হাদীস নং ৬০০৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'হে আল্লাহ! আমি তাদের ভালোবাসি সুতরাং আপনিও তাদের ভালো বাসুন।'

মাহমুদ বিন রুবাই এর সাথে তাঁর কৌতুক

মাহমুদ [রা] বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এক বারের পানি ছিটানোর কথা; 'তিনি আমার চেহারায় বালতি থেকে পানি ছিটিয়েছেন তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর যা আমার এখনো মনে আছে।' [সহীহ আল বুখারী ৭৭, সহীহ মুসলিম ৪৫৬/১]

তিনি এটা করেছেন কৌতুকরত বা বরকত স্বরূপ, যেমনটি তিনি সাহাবীদের সন্তানদের সাথে করতেন। শেখ বিন বায বলেন, 'এটা কৌতুক ও উত্তম চরিত্রের অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।'

হাসান-হুসাইন এর সাথে তাঁর আদরপূর্ণ ব্যবহারের নমুনা

১. আবু হুরাইরাহ রা. বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান বিন আলীকে চুম্বন করেন তখন তার নিকট আকরাহ বিন হাবেস তামীমী বসা ছিলো। আকরাহ বলল, 'আমার দশটি সন্তান রয়েছে তাদের কাউকে আমি চুম্বন করি না।' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।' [সহীহ আলবুখারী ৫৯৯৭]

২. আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক গ্রাম্য লোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসল এবং বলল, তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের চুমো খাও আমরা তাদের চুমো খাই না।' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, 'তোমার অন্তরে দয়া উদ্রেক করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি আলাহ তায়ালা তা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন।' [সহীহ আলবুখারি ৫৯৯৮, সহীহ মুসলিম ২৩১৭]

৩. হাসান ও হুসাইন [রা] রাসূলের সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। এ ব্যাপারে ইবনে উমার [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি, 'তারা আমার পৃথিবীর সুগন্ধিময় দুটি ফুল।' [সহীহ আলবুখারী ৫৯৯৪]

www.pathagar.com

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাদের দান করেছেন এবং তাদের দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সন্তানদেরকে চুম্বন করা হয় এবং সুঘ্রাণ নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সুগন্ধময় ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৪. আবু বকরাহ [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বারে আরোহণ অবস্থায় তার খুতবা শুনেছি, আর হাসান তার পাশে ছিল। তিনি একবার মানুষের দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার তার দিকে তাকাচ্ছেন এবং বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমার এ সন্তান হল নেতা। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়ে মুসলমানদের বিশাল দু'দলের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন।' [সহীহ আলবুখারী ৩৭৪৬]

পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়ে মুয়াবিয়া ও তার সাথীদের এবং আলী বিন আবু তালিব [রা] এর অনুসারীদের ও তার সাথীদের মাঝে মীমাংসা করেন। অতএব তিনি খেলাফত মুআবিয়ার জন্য ছেড়ে দেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার দ্বারা মুসলমানদের রক্ত হেফাযত করেন।

৫. বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি হাসান বিন আলীকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধে দেখেছি এবং বলতে দেখেছি, 'হে আল্লাহ আমি তাকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসবেন।' [সহীহ আলবুখারি ৩৭৪৯]

সেজদা অবস্থায় রাসূল [স] এর পিঠে বাচ্চার আরোহণ

শাদ্দাদ [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন মাগরিব বা এশার নামায পড়ানোর জন্য। হাসান বা হুসাইনকে তিনি বহন করছিলেন। অত:পর তিনি সামনে গেলেন এবং তাকে রাখলেন। এরপর তিনি নামাযের মধ্যে একটি দীর্ঘ সেজদা করলেন। আমার পিতা বলেন যে, 'আমি আমার মাথা উত্তোলন করলাম আর দেখতে পেলাম সেজদাহরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর কাঁধে একটি শিশু। আমি আমার সেজদায় ফিরে আসলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সলালাহু আলাইহি ওয়া সালাম নামায সম্পন্ন করলেন তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি নামাজের মধ্যে একটা দীর্ঘ সেজদা করেছেন, যে কারণে আমরা মনে করলাম হয়তো কোন কিছু হয়েছে অথবা আপনার কাছে ওহী আসছে।' তিনি বললেন, 'এগুলোর কোনটাই হয়নি। তবে আমার একটি সন্তান আমার পিঠে আরোহণ করেছিলো, তাই আমি তার প্রয়োজন পূরণ না করে তাড়াহুড়ো করতে অপছন্দ করলাম।' [নাসায়ী ১১৪২, আহমাদ ৪৯৩/৩]

নামাযরত অবস্থায় যয়নব [রা] এর মেয়েকে কোলে তুলে নেয়া

আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়া অবস্থায় উমামা বিনতে যয়নবকে বহন করছিলেন, যখন তিনি সেজদা করতেন তখন তাকে রেখে দিতেন। আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কোলে তুলে নিতেন।' [সহীহ আলবুখারী ৫১৬]

www.pathagar.com

শিশু বাচ্চারা কাঁদার সময় তাঁর নামায পড়া সংক্ষিপ্ত করা

তিনি কোন শিশু বাচ্চার কাঁদার আওয়াজ শুনলে নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। এ ব্যাপারে আবু কাতাদাহ্ তার পিতা হতে ও তার পিতা নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন আমি নামাযে দাঁড়াই ইচ্ছা থাকে নামায দীর্ঘ করব। কিন্তু যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি, তখন তার মায়ের কষ্ট হবে ভেবে আমি নামায সংক্ষেপ করি।' [সহীহ আলবুখারী ৭০৭]

উম্মে খালেদের সাথে হাবশী ভাষায় কৌতুক

এ ব্যাপারে উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বাবার সাথে রাসূলের নিকট আসলাম, তখন আমার গায়ে হলুদ বর্ণের জামা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ছানাহ! ছানাহ!" এটি হাবশী ভাষার শব্দ যার অর্থ:চমৎকার! চমৎকার!

তিনি বলেন– 'অত:পর আমি নবুওয়তের মোহর নিয়ে খেলা করতে গেলাম। আমাকে আমার পিতা ধমক দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাকে ধমক দিও না।' অত:পর বলেন, 'ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর, অত:পর ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর, অত:পর আবার ক্ষয় কর এবং জীর্ণ কর।' আবদুল্লাহ্ বলেন অত:পর সে যতদিন জীবিত ছিল ততদিন বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। [সহীহ আলবুখারি ৩০৭১] অর্থাৎ বর্ণনাকারী তার দীর্ঘ জীবনের কথা বুঝিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, উম্মে খালেদের মত আর কেহ এত দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি।

আবু উমায়ের সাথে তার কৌতুক

আনাস [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রিয় ছিল আমার এক ভাই, তার নাম আবু উমায়ের। আমার মনে আছে, সে যখন এমন শিশু যে মায়ের বুকের দুধ ছেড়েছে মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আসতেন এবং বলতেন, 'হে আবু উমায়ের! কি করেছে তোমার নুগায়ের?' নুগায়ের হল এমন একটি ছোট পাখি যার সাথে আবু উমায়ের খেলা করত। নুগায়ের মারা গিয়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নুগায়েরের জন্য চিন্তিত দেখলেন এবং তার সাথে খেলা করলেন। [সহীহ আলবুখারী ৬২০৩]

শিশু বাচ্চাদের সালাম দেয়া

আনাস বিন মালিক [রা] থেকে বর্ণিত যে, তিনি শিশু বাচ্চাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম দিতেন। এবং বলতেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করতেন।' [সহীহ আলবুখারী ৬২৪৭, সহীহ মুসলিম ১৭০৮/৪]

রাসূলের কোলে শিশুদের প্রস্রাব

উম্মে কায়স বিনতে মিহসান থেকে বর্ণিত, তিনি তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার কোলে রাখলেন,

www.pathagar.com

সে তার কোলে প্রস্রাব করে দিল। তারপর তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধৌত করেননি। [সহীহ্ আলবুখারী ২২৩]

এ ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যা দ্বারা শিশুদের সাথে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম আচরণ, সুন্দর ব্যবহারের বিষয়গুলোর বর্ণনা রয়েছে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও শিশুদের ওপর শারীরিক যে নির্যাতন করা হয় তা থেকে সরে এসে রাসূলের শেখান পদ্ধতিই অনুসরণ করা উচিত।

বড়দের ওপর শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া

তার ডান পাশের শিশু ছেলেকে বড়দের আগে শরবত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সাহল বিন সায়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক পেয়ালা শরবত আনা হল। তার থেকে তিনি শরবত পান করলেন এবং তার ডান পাশে ছিল দলের সবচেয়ে ছোট একটি ছেলে, আর বড়রা ছিল তার বাম পার্শ্বে। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে ছেলে তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি তা বড়দের আগে দেব?'

ছেলেটি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে আমার উপর প্রাধান্য দেব না।' অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে এদের দেয়ার।' ছেলেটি বলল, 'না। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে কিছু লাভ করার ব্যাপারে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেব না। বর্ণনাকারী বলেন অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ভরে দিলেন।' [সহীহ্ আলবুখারী ২৩৫১] ■

www.pathagar.com

সুরের সানাই ॥ মা হ ফু জ পা র ভে জ

অবশেষে ফিরে আসার সড়ক একটিই...
বিভ্রান্তির মায়াজাল থেকে দূরে
সরল পথটি সবুজে সাজানো
চলে গেছে আত্মার নিমগ্ন শান্তির আশ্রয়ে...

অবশেষে ফিরে আসার সড়ক একটিই...
ভুলের নদী ও স্রোতের বাইরে
অনাবিল জল ছলছল বেগে
চলে গেছে সৃষ্টির উল্লাসে সৃজনের তীরে...

অবশেষে ফিরে আসার সড়ক একটিই...
কুহকের মরীচিকা ভেদী দ্রোহে
সোনালি সত্যের আকুল আবেগে
চলে গেছে নূরের গম্বুজ-মিনারের শিরে...

অবশেষে ফিরে আসার সড়ক একটিই
অবশেষে সেই পথেই আসুন ফিরে যাই
মুক্তির আলোয় রাঙা ভোরের শিউরে পাই
জীবনের ব্রত জাগানিয়া সুরের সানাই...

www.pathagar.com

রূপকল্পের উদ্ভাবক ॥ আ বু তা হে র বে লা ল

শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দরতম চির রূপকল্পের একমাত্র উদ্ভাবক ছিলে তুমি
তোমার মননে কল্পনার নৈ:শব্দে ছিলো অনাবিল নিকষ ভালোবাসা
তুমি এনেছিলে ঐ শিল্পীত শব্দের কারুকাজ অনিন্দ্য ফুলেল মৌসুমী
এনেছিলে মানুষে মানুষে প্রেমের উৎসব জাগিয়ে নতুন স্বপ্ন আশা।

অসম্ভব দ্যুতিময় ছিলো তোমার শাশ্বত কবিতার যত পংক্তিমালা
তোমার পরশে হিরন্ময় হয়েছিলো শত বিমূঢ় ধূসর ক্যানভাস
তিমিরাচ্ছন্ন নগরীর প্রতি অলিন্দে জেগেছিলো নূরের চেরাগ লা লা
বসন্তের দখিনা মলয় পেয়েছিলো নব দুরন্ত গতির পূর্বাভাস।

বর্বরতার পাষাণ স্তূপে ফুটিয়েছিলে সুরভিত অজস্র কুসুম
মল্লিকা মালতীর আবির মাখা সকাল যে এসেছিলো তোমারই টানে
পথভোলা পথিকের চোখে আচানক নেমেছিলো চির প্রশান্তির ঘুম
পৃথিবীটা দুলেছিলো নতুন দোলায় দোয়েল কোয়েল পাপিয়ার গানে।

এই সব বর্বর বন্ধাত্ত্বের কালে ভুলতে পারিনা তোমার প্রিয় নাম-
শকুনী ছোবল আক্রান্ত ভূখণ্ড থেকে তোমাকে জানাই হাজার ছালাম।

www.pathagar.com

খোদাভীরুদের জন্য ॥ রফিকুল ইসলাম ফারুকী

নেই তো সন্দেহ এই কিতাবের; খোদাভীরুদের
ইহা; আছে স্পৃহা-সাহারা বিশ্বাস করে গায়েবকে
কায়েম করে যে নামাযকে নিয়ত; পাঁচ ওয়াক্তের
দান করে ধন যাহা প্রয়োজন ভুলে আয়েবকে।
যাহারা বিশ্বাস করে আসমানী কিতাব তোমার-
প্রতি যা নাযিল করেছি আর যা তোমার আগেও
আরো যারা করে বিশ্বাস সতত; আখেরাতকেও
তাহাদের জন্য রয়েছে ওয়াদা জান্নাত পাবার।

তারাই সফল; কাফের বিফল দোযখের খড়ি
পাপ আনে দুঃখ পুণ্যে আসে তো চিরায়ত সুখ-
ভরে দেয় বুক, রুখে দেয় যাহার দোযখের মুখ-
সৃষ্টির সেরা মানুষ হয়েও পাপে ডুবে মরি।

খোদাভীরুদের রেসিপি কুরআন-পুণ্য করো আজ,
পাবে কাওছার, চির জান্নাত-বিজয়ের তাজ ॥

[মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা বাক্বারার ১ম রুকু অবলম্বনে]

www.pathagar.com

মানুষ ॥ রেদওয়ানুল হক

মানুষ মানুষ কোথায় মানুষ
দুনিয়াটা ফক্‌কা
মানুষ ছিলো একজনই সে
জন্ম তাহার মক্‌কা।

মানুষ হয়ে মানুষ হবার
শিক্ষা তিনি দিলেন
আঁধার থেকে আলোয় ফেরার
দীক্ষা তিনি দিলেন।–
শুধু কেবল কাফির যারা
তারাই পেলো অক্‌কা।

মানুষ মানুষ কোথায় মানুষ
দুনিয়াটা ফক্‌কা
এখন মানুষ মানুষ নিয়ে
খেলছে পাঞ্জা-ছক্‌কা।

www.pathagar.com

সব কিছু সেই আগের মতই ॥ র ফি ক র ই চ

তোমাকে তখনো সহজে বোঝেনি কেউ
বোঝেনি তোমার রাজনীতি অর্থনীতি সমরনীতি,
অনেকে বুঝেও পাথরের মত থেকেছে অনড় অবিচল
আবার সেই তখনো তোমার জন্য কেউ কেউ
বুকে ধারন করেছে মুশরিক তিরন্দাযদের বিষাক্ত তীর
তোমার জন্য চোখের কোটর থেকে ছিটকে পড়েছে-
কাতাদা'র মুক্তোর মত জ্বলজ্বলে চোখ।

সময়ের বিবর্তনে বিবর্তিত মানুষ ও মানুষের পৃথিবী
শুধু হয়ে ওঠেনি মানুষের মগজের প্রত্যাশিত বিবর্তন।
সব কিছু সেই আগের মতই-
মানুষের সহজাত ও অর্জিত আচরণের বৈচিত্র্যতা
শূন্যের কোঠায় খেলে যায় অর্থহীন গোল্লাছুট।
অবিশ্বাসের ক্ষেতে-খামারে অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ লাঙ্গল ফলায়
অবিশ্বাসের বিষাক্ত ফসল।
আজকাল অবিশ্বাসীদের দাপটে দাবানলে পুড়ে যায় ক্রমাগত বিশ্বাসীদের
মন, মগজ, হৃদয় ও ইস্পাত ঈমান।

এখনো কাতাদা'র মত আছে কেউ কেউ
মুশরিকদের মত আছে অনেকেই।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] ॥ শ হী দ সি রা জী

তিনি ছিলেন সবার আপন, আপন ছিলেন খোদার কাছে
সাথীরা তাঁর থাকতো পাশে বাসতো ভাল নিজের চেয়ে
শুনতো কথা নির্দ্বিধাতে ভাবতো তাঁকে আপন স্বজন
হাসলে তিনি হাসতো সবাই কাঁদতো সবাই তাঁরই দুখে
খোদার ভয়ে ভীত তারা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতেন
পায়ে পায়ে চলতো সবাই পথে পথে তাঁরই সাথে।

পরশ পাথর ছিলেন তিনি সাথীরা তাই সোনা হলো
খোলাফায়ে রাশেদাতে ফললো সোনা পৃথিবীতে
রমণীরা নির্ভাবনায় চললো হেঁটে নগরপথে
সাথীরা তাঁর শাসক হয়ে আটার বোঝা মাথায় নিয়ে
নিরন্নদের খাবার দিলেন দুখির দ্বারে ঘুরে ঘুরে
শহর নগর জনপদে খোদার শাসন হলো কায়েম।

আল আমিন আস সাদিক তিনি সব রাসূলের সেরা ছিলেন
সারা জীবন অবিকলই কুরআন পাকের মত ছিলেন।

www.pathagar.com

কাব্য-সমালোচনা : রাসূল [সা]-এর নীতি ও নির্দেশনা

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ

। ১ ।

আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন নবী। তিনি কবি নন, তিনি নবী। নবী কবি হতে পারেন না, এ-কথা স্বয়ংপ্রকাশ, স্বত:সিদ্ধ। নবী প্রত্যাদেশবাহক, জীবনব্যবস্থাপক ও মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। নবী ও কবির মাঝে ঘোরতর বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। সে-কথা আমরা কুরআন থেকেও পাচ্ছি। কুরআন বলছে, 'আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষা দেই নি এবং তাঁর জন্য তা শোভনীয়ও নয়।' নবী [সা] জাগতিক কোনো পাঠ গ্রহণ করেন নি– না বিদ্বান থেকে; না বিদ্যালয় থেকে। নবুওয়তপ্রাপ্তির আগে তাঁর শিক্ষক ছিল প্রকৃতি। তাঁর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, ঔদার্য ও বিবেচনাবোধ সমকালীন সমাজে তাঁকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। ভাষার বিশুদ্ধতা, সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতা ও মানবিক মূল্যবোধে তিনি ছিলেন মহিমান্বিত মহামানব। তিনি গর্ব করে বলতেন, 'আমি শুদ্ধতম আরব। কারণ, কুরাইশদের ভেতর আমার জন্ম। কিন্তু আমি আমার শৈশব যাপন করেছি সা'আদ বিন বকর গোত্রে।' যে-সমাজ-পরিবেশে তাঁর আবির্ভাব, সেটি ছিল কবিতার শব্দ-ছন্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, বাণী ও রূপকল্পে প্লাবিত। আরবদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বপ্ন-বাস্তবতা ও দু:খ-বেদনার বাহন ছিল কবিতা।

www.pathagar.com

নবীত্বের দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহাবী-কবিদের কবিতার খোঁজ-খবর রাখতেন। ভালো ও সৎ কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল প্রসন্ন। প্রয়োজনে নিজে কবিতা আবৃত্তি করা, অন্যদের কবিতা শোনা, কবিতা আবৃত্তির নির্দেশ দেওয়া, কবিদের প্রশংসা করা, তাদের জন্য দোয়া করা, পুরস্কৃত করা, কবিতার চরণ পাল্টে দেওয়া, কবিতার প্রভাব ও আবেদনের স্বীকৃতি, সর্বোপরি কবিতার গঠনমূলক সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ের তাঁর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত তৎপরতা।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এমন একটি যুগে, যখন সমালোচনাসাহিতের শিল্পরূপ গড়ে ওঠে নি, সমালোচনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের রূপ-রীতি প্রণিত হয় নি, তখনই নবী স. সমালোচনার কিছু নীতি নির্ধারণ করে দিলেন। যে সমালোচনাসাহিত্যের কুঁড়ি এখনো মেলেনি, তাকেই তিনি এক অসাধারণ ফুটন্ত ফুলের রঙ-রূপ দান করলেন। এবং রচনার উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড নির্ধারণ করলেন শৈলীর জাদুময়তা ও চিন্তার ধর্মমুখিতা। রাসূলের বাণী, রচনা ও কবিতাকে নতুন করে যাচাই-পরখ করার সুযোগ করে দিলেন এবং নতুন আঙ্গিকে সমালোচনার পথ দেখালেন। সেই জাহেলি যুগেই তিনি সমালোচনাসাহিত্যের পরিধি প্রশস্ত করলেন। কাব্যসমালোচনায় যুগ করলেন আধুনিকতা ও নতুন মাত্রা। শুধু তাই নয়, বরং আমরা তাঁর সমালোচনায় কিছু নতুন পরিভাষাও পাচ্ছি, যেগুলো তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যের অঙ্গনে ব্যবহার করেছেন। যাতে সমালোচনাসাহিত্য সঠিক পথে চলতে পারে। তিনিই সর্বপ্রথম প্রচলন করলেন, 'আল-বয়ান' শব্দটি, যা পরবর্তী যুগে আরবি ভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রের নাম হয়ে গেছে। এছাড়াও, তিনি সমালোচনার অঙ্গনে ব্যবহার করেছেন 'বালীগ'–আলঙ্কারিক, 'আল-উমূম, আল-ঈজায'– অর্থসম্প্রসারণ ও অর্থসংকোচন। এছাড়াও শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার নির্দেশকারী বিভিন্ন পরিভাষা।

বিষয়টি অতলস্পর্শী গবেষণার দাবি রাখে। আমার 'ক্ষুদ্র' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার চেষ্টা করব।

। ২ ।

প্রাকপ্লেটো যুগে কাব্যধারা যখন ছিল, বোধহয়, কাব্যতত্ত্বও ছিল নিশ্চয়। তবে তার লিখিত বিবরণ আমরা পাই না। প্লেটো ও এ্যারিস্টটল হয়ে জাহেলি যুগের আরবদের পর্যন্ত কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যসমালোচনার শিল্প ও জ্ঞানভিত্তিক রীতি-পদ্ধতি পৌঁছেছে, কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য দেওয়া যায় না। তবু এ-কথা মানতে হবে যে, সে-যুগে কবিতা যখন ছিল, তা হলে কবিতার সমালোচনাও ছিল কোনো না কোনোভাবে। যুগপারম্পর্যে কবি-সাহিত্যিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উন্মেষপর্বে সমালোচনার মূলভিত্তি ছিল স্বভাবরুচি। ফলে জাহেলি যুগের একজন দক্ষ ভাষাবিদ ও কবি নিজের অসাধারণ প্রতিভাগুণেই বিচার করতেন কবিতার ভালো-মন্দ, সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য, সাবল্য-দৌর্বল্য। এবং সেই বিচারক্রিয়া তারা তুলে ধরতেন কোনো প্রকার অন্যায়-গোঁড়ামি ছাড়াই। তাই দেখা যাচ্ছে, জাহেলি যুগের অগ্রজ পণ্ডিত কবিগণ অন্যদের ভুল-ত্রুটি ধরে দিয়েছেন, এবং তাদেরকে কবিতার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আরো বেশি সজাগ করেছেন। প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে এ-বিষয়ে বহু তথ্য আমরা পাই। দীর্ঘ

www.pathagar.com

ইতিহাস বর্ণনার দিকে না গিয়েও বলা যায়, জাহেলি যুগে ওকায বাজার ছিল কবি-সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র, আসর ও আড্ডার তীর্থস্থান। সেই যুগের প্রখ্যাত শক্তিমান কবি নাবিগা জা'দীর [মৃ. ৮০ হি] জন্য চামড়ার একটি লাল তাঁবু স্থাপন করা হত। সেখানে এসে অন্যান্য কবিরা তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি তাদের কবিতার সমালোচনা করতেন। সে-আসরে সর্বপ্রথম কবিতা পাঠ করেন আল-আ'শা মাইমূন বিন কাইস আবূ বাসীর [মৃ. ৬২৯ খ্রি], অতঃপর হাস্সান বিন ছাবিত আন-আনছারী [মৃ. ৫৪ হি]। তাঁর কয়েকটি পঙক্তি এরকম :

সুদর্শন পাত্র রয়েছে আমাদের,/ঝলসে ওঠে দুপুরের রৌদ্রে/তরবারিরা আমাদের/বীরত্বের রক্ত ঝরায় অঝোর ধারে।/জন্ম দিয়েছি আমরা সাহসী বীর সন্তান।

হাস্সান বিন ছাবিতের আবৃত্তিশেষে নাবিগা বললেন, বাহ্! আপনি তো দেখি, বড় শক্তিমান কবি। তবে আপনি এখানে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কারণ, আপনি নিজের পাত্র ও তরবারিকে ছোট করে দেখলেন। নাবিগার এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, হাস্সান পাত্রের বিশেষণ ব্যবহার করেছেন 'আল-গুরুর'–সুদর্শন, অথচ সে-যুগে 'আল-বীদু'–শ্বেত বলতে পারাটাই ছিল বড় বাহাদুরি। নাবিগা আরো বললেন, আপনি সন্তানদের নিয়ে অহঙ্কার করলেন, কিন্তু পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করতে পারলেন না।

বোঝা গেল, নাবিগা এখানে প্রথমে বহিরঙ্গের সমালোচনা করলেন– বিশেষণব্যবহারের যাথার্থ্য নিয়ে। পরে সমালোচনা করলেন অন্তরঙ্গের– কবিতার মূলার্থের ঔচিত্য নিয়ে। রূপতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের এই সমালোচনাকে বলা হয় বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা [Analytical Criticism]। [যাই হোক, উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। থাক। সেটা এ-লেখার বিষয় নয়।]

। ৩ ।

ইসলামের আবির্ভাবকালে আরব সমাজের অধিকাংশ মানুষ ছিল গন্ডমূর্খ, অশিক্ষিত, বর্বর। সুতরাং তৎকালীন আরবি সাহিত্য ছিল লোকজ সাহিত্য। আর সেই লোকজ সাহিত্যকথা এতোই উন্নত ছিল যে, আরবি কাসীদাগুলো হোমারের ইলিয়ড সফোক্লিসের ওডেসীকে হার মানাবার উপযোগী। ওকায মেলায় কবিতার লড়াই ছিল আশ্চর্যজনকভাবে বীরত্বপূর্ণ, যা আজ ভাবতেই অবাক লাগে। কবিতার সাহিত্যমান, বাগ্মী-গুণ, স্মৃতিশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কবিকে সমাজে উচ্চ মর্যাদা পেতে সাহায্য করত। তবে তখন কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল প্রেমলীলা, মদ্যপান, জুয়া খেলা, বংশগৌরবগাথা, যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি উসকানির মতো এমন কিছু বিষয়, যা একটি সভ্য সমাজের জন্য কোনোমতেই শোভনীয় নয়। ইমরউল কায়েসের মতো কবির কবিতার বিষয়বস্তু ছিল নারী ও ঘোড়া। কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠানের রণগীতি, প্রেমগীতি, রঙ্গব্যঙ্গ কবিতা বহু কুখ্যাত ও বিখ্যাত কবিগণ যশ কামাত, যা তৎকালীন সকল কাব্যকলাকে ছেড়ে গিয়েছিল। যদিও তা বল্গাহীন জৈবানুভূতির যৌনরসে উৎসারিত আদিম ও পাশবিক উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল।

রাসূলের সামনেই ছিল জাহেলি যুগের কাব্যসাহিত্যের চিন্তা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও জীবনের চিত্র। রাসূল স. অবশ্যই ঐশী নির্দেশ ও ফর্মুলার অনুযায়ী জীবনের চিত্র ও মানচিত্র পাল্টে দিয়েছিলেন, কিন্তু কবিতায় জীবনের প্রবাহ ও পরিবেশ বজায় রাখার পরামর্শ

www.pathagar.com

দিয়েছেন। যেহেতু জীবনের প্রকৃত নিদর্শন একজন বিশ্বাসী মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু তিনি বিশ্বাসী ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধিকে কবিতার প্রাণসত্তা আখ্যায়িত করেছেন। আর যেহেতু যেকোনো শুদ্ধ শিল্পের জন্য বুদ্ধির সুস্থতা ও চিন্তার সততা অপরিহার্য বিষয়, তাই তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় কিছু কিছু কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ'। এ-মন্তব্য মানবজাতির শিল্প-জীবনের জন্য এক অনন্য আলোকবর্তিকা হয়ে আছে এখনো, এবং থাকবেও যতদিন শিল্পচর্চা থাকবে পৃথিবীর বুকে।

রাসূল স. কবিতার বিচার ও মূল্যায়ন করেছেন দু'টি ভিত্তি ও মানদণ্ডের ওপর। এক. ধর্মীয় মানদণ্ড, দুই. ভাষাগত [বা অলঙ্কারশাস্ত্রিক] মানদণ্ড। রাসূল [সা]-এর সমালোচনা নিয়ে, যা তিনি কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে করেছিলেন, আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম যা আমাদের নজরে আসে, সেটা হলো, ধর্মীয় দিকটি তাঁর সমালোচনার অন্যতম মূলভিত্তি ছিল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সমালোচনার কয়েকটি উদাহরণ হলো :

ইসলামের আবির্ভাবপূর্বকালীন কবি লাবীদ বিন রবীয়ার [মৃ. ৪১ হি., ৬৬১ খ্রি] কয়েকটি পঙক্তির সমালোচনা করে রাসূল [সা] বলেছেন, কবিরা যা বলেছেন, তার মধ্যে লাবীদের কথাটি সর্বাধিক সত্য। পঙক্তিগুলোর অর্থ এই, ধ্বংসশীল যা কিছু আছে পৃথিবীতে, আল্লাহ ছাড়া,/সুখ-ঐশ্বর্য-নেয়ামত ক্ষণস্থায়ী, সবকিছু হবে হাতছাড়া।

নাবিঘা জা'দীর কিছু পঙক্তি শুনে রাসূল স. মুগ্ধ হলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন, 'আল্লাহ তোমার মুখ বিনষ্ট না করুন'। [এ দোয়ার বরকতে, তিনি ১৩০ জীবিত ছিলেন, অথচ তাঁর সম্মুখভাগের দাঁত মজবুত ছিল।] পঙক্তিগুলো ছিল এই : নেই কল্যাণ সে-সহনশীলতায়, /যা দমাতে পারে না প্রিয়তমের রাগ,/কল্যাণ নেই সে-মূর্খতায়,/যদি না থাকে কোনো সহনশীল ব্যক্তি/যে ছাড়ে না কোনো কাজ, যা শুরু করে একবার।

কা'আব বিন যুহাইর [মৃ. ২৪ হি., ৬৪৪ খ্রি.] রাসূলের প্রশস্তিমূলক এক কবিতায় বললেন, নিশ্চয় রাসূল আলোক রশ্মি/আলো গ্রহণ করা হয় যার থেকে/তিনি তো তরবারি ভারতের /কোষমুক্ত, ধারালো, ঝকঝকে।

এ পর্যন্ত শুনে রাসূল [সা] বললেন, 'ভারতে তরবারি' বল না, বরং বল, 'আল্লাহর তরবারি'।

এখানে লক্ষ করতে পারি, রাসূল [সা] কবিকথিত ঐতিহাসিক সত্য থেকে আরো নিগূঢ় সত্যতম বাস্তবতার দিকে তাকে নিয়ে গেছেন। কারণ, ক্ষণস্থায়ী জীবের তৈরী তরবারি থেকে চিরস্থায়ী সত্তার সৃষ্ট তরবারি যে, সর্বদিক দিয়ে সফল ও উপযোগী, সে কথা তো বলার অপেক্ষার রাখে না। কা'আব বিন মালিক যখন রাসূলের সামনে এই পঙক্তিদ্বয় উচ্চারণ করলেন, প্রতিরোধ করে আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে/এমন সব বীরপুরুষ,/যাদের চকচকে ধনুকগুলো নিক্ষেপ করে তীর/যেন প্রতিপক্ষ কাপুরুষ।

চরণদ্বয় শুনে রাসূল [সা] বলে ওঠলেন, 'আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে' না বলে 'আমাদের ধর্মের পক্ষ থেকে' কি বলা যায় না? কবি উত্তর দিলেন, অবশ্যই পড়া যায়। সেই থেকে তিনি এভাবেই পড়তেন। এবং আমরা প্রাচীন উৎসগ্রন্থগুলোতে ওরকমই পাই।

সে যাই হোক, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলের [সা] সমালোচনার উদাহরণ অনেক

www.pathagar.com

আছে। ধর্মের বাণীবাহক নবী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করবেন, তাতে তেমন বিস্ময়ের ও কৃতিত্বের কী আছে?–এমনও কেউ মনে করতে পারেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা সমালোচনা-সাহিত্যের প্রধান দু'টি ধারা পাই : প্রাচ্যরীতি, পাশ্চাত্যরীতি। পাশ্চাত্যরীতির উন্মেষের মূলে ছিল রাজনৈতিক-দার্শনিক অভিব্যক্তি–সেটা প্রমাণিত সত্য। তা হলে, সম্পূর্ণ একটি নতুন আন্দোলন, নতুন ধর্মের আবির্ভাবলগ্নে বিশেষ প্রকারের একটি সমালোচনাপদ্ধতির প্রচলন হলে, তাতে দোষের কী আছে? আমরা বলতে পারি, রাসূলের [সা] উপরিউক্ত পর্যায়ের সমালোচনা ছিল জীবনধর্মী, জীবনবাদী ও আদর্শবাদী। তাছাড়াও সাহিত্যিক ও কাব্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি সমালোচনা করেছেন। ভাষাগত ও অলঙ্কারশাস্ত্রীয় সমালোচনার উদাহরণও আছে কম-বেশি। সেগুলো খুব স্বল্প-সংক্ষিপ্ত হলেও, 'বিন্দুতে সিন্ধু'র মতো সেগুলো খুবই ব্যাপক, মৌলিক ও নীতিনির্ধারক।

যেসব গুণ থাকলে একটি কবিতা বা কথাকে যথেষ্ট সুন্দর ও উত্তীর্ণ বলা হয়, তার মধ্যে রয়েছে : বক্তব্য ও বর্ণনার বিশুদ্ধতা, সত্যের পক্ষসমর্থন, কৃত্রিম অলঙ্কার বর্জন, উপযুক্ত শব্দচয় ও সুঠাম বাক্যবুনন ইত্যাদি। আর এইসব গুণের আলোকে রাসূল [সা] সময়-সময় কিছু কথা ও কবিতার সমালোচনা করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে, এসব গুণসমৃদ্ধ কিছু কথা শুনেই তিনি উপর্যুক্ত দুই নীতিনির্ধারক বক্তব্য পেশ করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'কিছু কিছু কবিতা প্রজ্ঞার আধার' এবং 'নিশ্চয় কিছু বর্ণনা জাদুময়'।

কবিতা সম্পর্কে রাসূলের [সা] সমালোচনা-পর্যালোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে সন্তোষজনক ও সর্বদিকপ্লাবী। যেন 'পেয়ালায় পৃথিবী' বা ' গোষ্পদে সাগর'। তাঁর সমূহ সমালোচনামূলক বক্তব্য নিয়ে পর্যালোচনা করলে সমালোচনা-সাহিত্যের একটি বিশাল গ্রন্থ প্রণিত হতে পারে। কবিতা সম্পর্কে তিনি যেসব প্রজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য পেশ করেছেন, তার একটি হলো, 'কিছু কিছু কবিতা প্রজ্ঞার আধার'।

এটি খুবই ছোট একটি বাক্য –সহজ, সরলও। কিন্তু, এতে, কবিতা-বিষয়ে, সমালোচনার সাগর-বিস্তৃতি রয়েছে। রয়েছে পহাড়া প্রমাণ প্রত্যয়ী প্রজ্ঞা। শিল্পদৃষ্টিকোণ থেকে কবিতায় দু'টি মৌলিক উপাদানা থাকে : শব্দ ও অর্থ। কিংবা, বলা যায়, অর্থ ও শৈলী। কবিতাকে, শরীর ও আত্মা উভয় দিক থেকে, প্রকৃত কবিতা হয়ে ওঠতে হয়। রাসূলের [সা] উপরিউক্ত বাক্যে কবিতার আত্মিক নিদর্শন ও অন্তর্গুণের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

মনে রাখতে হবে, অন্তরাবস্থার সম্পর্ক মানুষের জীবনের সঙ্গে। আর মানুষের জীবনের সাফল্য-বৈফল্য, আনন্দ-বেদনার সম্পর্ক মানুষের বৌদ্ধিক ও চৈত্তিক ফলাফলের সঙ্গে। আরবের প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের অন্তর্বস্তুও জীবনের চিত্রে চিত্রায়িত, এবং নান্দনিক সুষমায় মণ্ডিত। প্রাচীন আরবি কাব্যে বেদুঈন-জীবনের এমন চমৎকার চিত্র ফুটে ওঠেছে, যা প্রাকৃতিক ও স্বভাবানুকূল হওয়ার কারণে আরবদের কাছে খুবই প্রিয় ও সমাদৃত ছিল। প্রাচীন সেই কাব্যসম্ভারে ইমরুল কাইসের আত্ম-ঐশ্চর্যহীন, দেহলাবণ্যসর্বস্ব কবিতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল যুহাইর বিন আবি সালমার কবিতা, যা বুদ্ধি-প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ

www.pathagar.com

এবং জীবনময়তায় ঋদ্ধ। সঙ্গত কারণেই, এই আকর্ষণীয় কাব্যশিল্প তাঁর কাছে এত প্রিয় ও চিত্তাকর্ষক ছিল যে, কিছুতেই তিনি এ-শিল্পকে বর্জন বা নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি স্বত:স্ফূর্তভাবে বলেছেন, 'আরবরা কবিতাতে ছাড়তে পারে না, যতক্ষণ না উট তার গর্ভস্থ বাচ্চাকে ছাড়ে।'

রাসূল [সা] সাহিত্যের শরীর বা বাহ্যকাঠামো সম্পর্কে বলেছেন, 'নিশ্চয় কিছু বর্ণনা জাদুময়'। বাক্যটিতে যেকোনো শিল্প বা কবিতার জন্য যে-মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়েছে, সেটি সমালোচনা-নীতির খুবই উন্নত-সৃষ্টিশীল মানদণ্ড। কারণ, যেকোনো শিল্পের মূল্য ও মাহাত্ম্য মূলত তার প্রভাবশক্তিতে, শিল্পের সিদ্ধিতে। আর প্রভাবশক্তির জন্য প্রয়োজন বর্ণে-বর্ণনায় জাদুময়তা। অর্থের সততা ও যথার্থতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বাহ্যিক উপাদান ও শৈলী : ভাষা ও বর্ণনা, অলঙ্কার, বাহ্যনন্দনশৈলীতে গতি ও সঙ্গতি, সতেজতা, সজীবতা, মাধুর্য ও মিষ্টতা যেমন থাকতে হবে, তেমনি থাকবে হবে : শব্দের সঙ্গে অর্থের সুদৃঢ় সাযুজ্য-বন্ধন, প্রকাশভঙ্গিতে অনুভূতির প্রাখর্য, চিন্তার শক্তিমত্তা। বর্ণনাশৈলীর মিষ্টি-জাল-টক-তিক্ততা মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও প্রেরণা-প্রকৃতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করার যোগ্যতা সাহিত্যে থাকতে হবে, যাতে কবিতা বা গদ্য এক জ্বলন্ত জাদু বা জাদুবাস্তবতা সৃষ্টি করতে পারে। তবেই তো একটি শৈল্পিক রচনা সাহিত্যিক কৃতিত্ব এবং শিল্পের উচ্চতম আদর্শিক উদাহরণ হতে পারে।

নবী [সা]-এর কথায় কৃত্রিমতা বা কৃত্রিম অলঙ্কারে কথার অপসৌন্দর্যবর্ধনকে অনুচিত মনে করা হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে, কঠিন শব্দের ব্যবহার ও বর্ণনাভঙ্গির জাটিল্য ছিল অপ্রাকৃতিক। ইসলাম ধর্মে যেহেতু কৃত্রিমতা বর্জনীয়, সেহেতু জীবনে ও সাহিত্যেও তাকে অশোভন মনে করা হয়েছে। এটাকে শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অসুন্দর ও অপরাধ মনে করা হত, তা নয়; বরং সে-যুগে কৃত্রিম ছন্দাসক্তিকে গণকদের কাজ ও তাদের অন্ধানুকরণ বলে গণ্য করা হত। এ কারণেও, বা এ কারণেই হয়তো, তিনি কৃত্রিমতা বর্জন করার লক্ষ্যে বলেছেন : 'কৃত্রিমভাবে বাকচাতুর্যপ্রদর্শন আমাকে বর্জন করতে হবে'। হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনা এসেছে 'তোমাদের দূরে থাকতে হবে'। ভাষার মৌলিক অলঙ্কার ও অধিকার রক্ষা না করে, কৃত্রিমভাবে শুধু ছন্দাসক্তিকে রাসূল [সা] পছন্দ করতেন না। সেটাকেও তিনি একধরনের কৃত্রিমতাই মনে করতেন। কারণ, যারা কৃত্রিম ছন্দমিল ও অর্ন্তমিলে আসক্ত, তারা অর্থের চেয়ে নিছক শাব্দিকতাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে তাদের কথা ও রচনা মূলার্থের প্রাণৈশ্চর্য হারিয়ে শব্দসর্বস্ব বাক্যসমষ্টিতে পরিণত হয়। সেখানে মূলবিষয় বা মূলভাবের স্তর দ্বিতীয় পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। অথচ প্রাণবান ভাষার ব্যবহার তো হয়ে থাকে অর্থকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য, শুধু শব্দের কঠিন স্তূপ নির্মাণের জন্য নয়। উম্মতের শিরাজ্ঞানী ও সমাজসচেতন হওয়ার কারণে নবী [সা] নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, মানুষ কৃত্রিমতা ও ছান্দসিকতার আড়ালে সত্যকে গোপন করার অপচেষ্টা চালাবে। এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছেও তাঁর যুগে। নবী স. এক ব্যক্তির ওপর এক ঘটনার প্রেক্ষিতে রক্তমূল্য আরোপ করলেন। ওই ব্যক্তি রাসূলের [সা] কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল এবং ভাষায় সে ছন্দ সাধল। ইচ্ছা ছিল প্রকৃত ঘটনার ওপর অসত্যের প্রলেপ দেওয়া। রাসূল স. তার

www.pathagar.com

বাকচাতুর্যের বদমতলব বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন, এ-ব্যক্তি কি আমাকে গ্রাম্যদের মতো ছন্দের চমক দেখায়।

। ৪ ।

রাসূলের সমালোচনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যবহ সমালোচনা হলো তিনটি : ইমরউল কাইস [মৃ. ৫৪০ খ্রি], আনতারা বিন শদ্দাদ [মৃ. ৬১৫ খ্রি] ও ইমাইয়া বিন সলত [৬২৪ খ্রি]-এর কবিতার সমালোচনা। সমকালীন কাব্যধারায় তাদের কবিতা ছিল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, শোতৃচিত্তচারী। তারা তিনজনই কাফের ছিলেন, পরেও মুসলমান হন নি। তা সত্ত্বেও রাসূল [সা] তাঁদের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, মত-পথনিরপেক্ষ শুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। একজন সৎ সমালোচকের প্রধান গুণ হলো শিক্ষা, সংস্কৃতি, সহৃদয়তা, উদারতা ও রসবোধ। এসব গুণের নিক্তিতে রাসূল [সা] ছিলেন পুরোপুরি উত্তীর্ণ। কেমন উদার হলে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম-মত-অনুসারী, এমনকি, একজন শত্রুর সৃষ্টিশীল কাজের ভারসাম্যায়িত স্বীকৃতি দিতে পারেন, তা রাসূলকর্তৃক ইমরউল কাইসের কবিতার সমালোচনা দেখলে বোঝা যায়। রাসূল [সা] ইমরউল কাইসের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি কবিদের শীর্ষ, তবে জাহান্নামীদেরও নেতা।' সৃষ্টিজগতের মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করে তাকে জাহান্নামী বলেছেন ঠিক, কিন্তু আবার তাকে শীর্ষ কবিও আখ্যায়িত করেছেন। উভয় জগতের জ্ঞানভাণ্ডার মহামানব রাসূল [সা] কেন তাকে শীর্ষ কবির সম্মান দান করলেন? কী ছিল তার কবিতায়? ইমরউল কাইসের কাব্যসমগ্রের দিকে নজর দিলে আমরা দেখব, তার কবিতায় ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ-ব্যবহারের দক্ষতা, অভিনব উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমাবেশ, ছন্দের পরিপাট্য ও দিলকাড়া দুলুনি ছিল, ছিল জীবনবোধের এক অপূর্ব দ্যোতনা। ইমরউল কাইস শ্রোতার কল্পনালোকে এক আশ্চর্য জাদুকরী সম্মোহনজাল বিস্তার করতে পারতেন। মহানবী তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সমালোচনা দ্বারা শিল্পকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, শিল্পকলার সৌন্দর্য ও জীবনের সৌন্দর্য এক নাও হতে পারে। কারো শিল্প হয়তো সুন্দর, কিন্তু জীবনবোধ পরিচ্ছন্ন নয়। অপরিচ্ছন্ন জীবনবোধসম্পন্ন শিল্পীর শিল্প যতই মনোহারী হোক, তা জাতির সঙ্কটমুহূর্তে তাদেরকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে না।

কবি আনতারা বিন শদ্দাদ [মৃ. ৬১৫ খ্রি] ছিলেন আরবে অন্যতম সৈনিক কবি। বলতে গেলে আমাদের সিরাজী ও নজরুলের মতো। তাঁর কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে বীরভাব। সহজ শব্দে কঠিন মনোভাব প্রকাশে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর কবিতায় রয়েছে বাণীভঙ্গির উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি ও আত্মশ্লাঘার মিশ্রণ। একসময় নবী [সা]-কে তাঁর কবিতা শুনানো হচ্ছিল। যখন এ পঙক্তি পর্যন্ত পৌঁছল, 'বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি কত/হালাল রিজিকের উপযুক্ত হতে পারি যেন'। এই কবিতা শুনে নবী [সা] মুগ্ধ হন, অভিভূত হন; হৃদয়ের তলদেশ যেন দুলে ওঠে এক আশ্চর্য আনন্দলহরীতে। তিনি উপস্থিত শোতৃবর্গকে লক্ষ করে বলেন, 'কোনো আরবীর প্রশংসা শুনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি অনুপ্রাণিত হই নি। কিন্তু সত্য বলতে কি, আমি এই

www.pathagar.com

কবিতারচয়িতার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহবোধ করছি।' কী ছিল তার কবিতায়? কেন রাসূলের এই মুগ্ধতা? শুধু এ-জন্যই যে, আনতারার কবিতাটি একটি সুস্থ জীবনের স্বচ্ছ ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছে। রাসূলের এই সপ্রশংস সমালোচনায় শিল্পের একটি বড় নীতি বিশ্লেষিত হয়েছে। আর তা হলো, শিল্প মানবজীবনের অধীন, মানবজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ; তার বৈরী বা উর্ধ্বস্থিত কোনো কিছু নয়। অর্থাৎ, শিল্পের খাতিরে শিল্প নয়, জীবনের জন্য শিল্প। কেউ হয়তো বলবে, নিছক মন্তব্য-মুগ্ধতা-প্রতিক্রিয়া কি আর সমালোচনা হয়? তা হলে আমরা বলব, নেহায়ত অসমালোচনাও হয় কি তা হলে? কারণ, তাবৎ সমালোচনা, বলতে গেলে, এই তিনটি জিনিসরই কাগজে-কলমে লিখিত প্রলম্বিত রূপ, কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণিক চিত্র। বলতে চাচ্ছি, সমালোচনা, একদিক থেকে, যেমন নিছক মন্তব্য-মুগ্ধতা-প্রতিক্রিয়া নয়, তেমনি আবার এ তিনটি জিনিসরই ব্যাখ্যায়িত ও বিশ্লেষিত রূপ নয় কি? বিশেষ করে, এ-তিনটি কাজ যদি একজন সংস্কৃতিবান, সহৃদয়, উদার ও রসবোধসম্পন্ন ব্যক্তির হয়, তা হলে তো এগুলি সৃষ্টিশীল সমালোচনারই নামান্তর।

কবি ইমাইয়া বিন সলত [৬২৪ খ্রি] প্রশংসাগীতি, গৌরবগাথা ও শোকগাথা– এ শাখাত্রয়ে অসাধারণ কৃতিত্বপ্রদর্শনের জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় আল্লাহর মহিমা ও পরকালের ভয়াবহতা পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম ও ধার্মিকতার তত্ত্ব। তাঁর একশটি কবিতা সাহাবীদের মুখে শুনার পর রাসূল [সা] সমালোচনা করেন, 'তাঁর কবিতা ঈমান এনেছে, কিন্তু তাঁর অন্তর এখনো কাফের'। উমাইয়া শুধু যে কাফের ছিলেন, তা নয়; বরং তিনি রাসূলের ঘোর শত্রুও ছিলেন। রাসূলের নাম শুনলে পর্যন্ত সে হিংসায় জ্বলে ওঠত। তবু রাসূল [সা] তাঁর একশ'টি কবিতা শুনলেন এবং প্রশংসায় টইটম্বুর মন্তব্য করলেন। রাসূলের সমালোচনাও সৃষ্টিশীল রচনার মর্যাদা রাখে। কত সুন্দর সমালোচনা! প্রতীকের আশ্রয়ে সমালোচনা। এখানে 'মুমিন-কাফের' মূলত প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ঈমান এনেছে' মানে তার সত্য উচ্চারিত হয়েছে। শিল্পের এমন নিরপেক্ষ সমালোচনা একমাত্র একজন নিষ্পাপ সত্তাই করতে পারেন। তা হলে 'তার অন্তর এখনো কাফের' কেন? হ্যাঁ, তা হতে পারে। কীভাবে, শিল্পের উদ্দেশ্যের খাতিরে। শিল্প জীবনের জন্য, নিছক শিল্পের জন্য নয়। কারণ সমালোচনায় একটি সামাজিক দায়িত্ব উদযাপিত হয়। সাহিত্যের সত্য কোনোদিন কোনো চলিষ্ণু সামাজিক সত্যের বিরোধী হতে পারে না– অন্তর্গত অর্থে। হতে পারে আপাত-বিরোধী, কিন্তু স্থায়ী সত্যের উপাদান তার মধ্যে থাকেই থাকে। সমালোচনা তো কোনো জীবনবিচ্যুত জীবনবিদ্বেষী অঙ্কিত তাত্ত্বিক রূপ মাত্র নয়। সমালোচনা জীবনশ্লিষ্ট এক ব্যাপার। সুতরাং সমালোচনা ব্যাপারটিই সামাজিক ব্যাপার। সমালোচনা সামাজিক।"

এ-তিনটি সমালোচনায় কেউ যদি প্রশ্ন করে, এখানে কবিতার শরীরবিচারের চেয়ে আত্মাবিচারের দিকে ঝোঁক বেশি। আমরাও বলি, রাসূলের সমালোচনায় ওটা বেশি। কারণ, আবদুল মান্নান সৈয়দের [১৯৪৩-২০১০] ভাষায় :

নিহিতার্থ সন্ধান সমালোচনার প্রধান কাজ। রূপকে সমালোচনা অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু

www.pathagar.com

তার অন্তিম গন্তব্য আত্মা। যে-সমালোচনা রচনার আত্মাকে আবিষ্কার করতে পারলো না, তা বৃথা। আজকালকার দেহাত্মবাদী সমালোচনারও তীর্থ আত্মাই। আধুনিক সমালোচকের কাছে আধার ও আধেয় তুল্যমূল্য।

আর কেউ যদি প্রশ্ন করে, এসব সমালোচনা ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক হয় নি, তা হলে আমরা বলব, 'সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক যিনি, তিনি সমালোচক নন।' আবারো সৈয়দের ভাষায় :

সমালোচনায় নৈর্ব্যক্তিকতার কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে নৈর্ব্যক্তিকতা একটা অসম্ভব ব্যাপার। সমালোচকও তো আদর্শবান, যে-আদর্শ তাঁর পাঠ, প্রস্তুতি, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার একটি কেলাসিত রূপ। প্রত্যেক সমালোচক তো অনন্য হয়ে ওঠেন তাঁর এই আদর্শ থেকেই। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক যিনি, তিনি সমালোচক নন।

রাসূলের সমালোচনাগুচ্ছে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করতে হবে যে, তিনি 'বাজে', 'খারাপ' বা 'কিচ্ছু হয় নি' ধরনের কোনো মন্তব্য বা সমালোচনা করেন নি। বরং তিনি বার বার ভালো ও উত্তীর্ণ কবিতাকেই নির্বাচন করেছেন এবং সেটিরই তারিফ করেছেন। কারণ :

খারাপ লেখাকে সবসময় চিহ্নিত করার দরকার নেই সমালোচকের, কিন্তু উত্তীর্ণ রচনা মাত্রকেই শনাক্ত করা প্রয়োজন। খারাপ লেখা আপনিই ঝরে যায়। কিন্তু ভালো লেখার তারিফ সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে, দিকনির্দেশের জন্যে দরকার। ভালো লেখা অপ্রশংসিত অবস্থায় পড়ে থাকা মানে সেই সাহিত্যের একটি সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া নয় কেবল– পরবর্তী সাহিত্যের অগ্রসরণও তাতে বাধাগ্রস্ত হয়। ভালো লেখা চিহ্নিত করা মানে রুচির নির্মাণ, রুচির উন্নয়ন, রুচির গুঞ্জরণ।

মনে রাখতে হবে, রুচিই হচ্ছে সমালোচনার আদি উৎস। রুচিই নির্বাচনের শক্তি যোগায়। কোনো কোনো সমালোচকের রুচি খারাপ, নির্বাচনের শক্তি নেই তাদের। তাই তাদের সমালোচনা পর্যবসিত হয় নিছক মনগড়া মন্তব্যে, কিংবা পরিণত হয় জাতপরিচয়হীন বক্তব্যে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এমন একটি যুগে, যখন সমালোচনাসাহিতের শিল্পরূপ গড়ে ওঠে নি, সমালোচনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের রূপ-রীতি প্রণিত হয় নি, তখনই নবী স. সমালোচনার কিছু নীতি নির্ধারণ করে দিলেন। সমালোচনাসাহিত্যের কুঁড়ি-না-মেলা সময়েই তিনি তাকে এক অসাধারণ ফুটন্ত ফুলের রঙ-রূপ দান করলেন। এবং রচনার উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড নির্ধারণ করলেন শৈলীর জাদুময়তা ও চিন্তার ধর্মমুখিতা। ঠিক সে-মুহূর্তে যখন সাহিত্যসমালোচনা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো স্তরই অতিক্রম করতে পারে নি, তখনই কুরআন ও রাসূলের বাণী রচনা ও কবিতাকে নতুন করে যাচাই-পরখ করার সুযোগ করে দিলেন এবং নতুন আঙ্গিকে সমালোচনার পথ দেখালেন। তাই বলা যায়, সেই জাহেলি যুগে রাসূল [সা] সমালোচনাসাহিত্যের পরিধি প্রশস্ত করলেন। কাব্যসমালোচনায় যুগ করলেন আধুনিকতা ও নতুন মাত্রা।

রাসূল [সা] তাত্ত্বিক সমালোচনা করে ক্ষান্ত হন নি, যেমনটা আমরা উপরে বর্ণনা করলাম। তিনি আরেক বিশেষ ধরনের সমালোচনারও প্রবর্তন করেন। সেটি হলো পরামর্শ ও নির্দেশনামূলক সমালোচনা, যা কবি-সাহিত্যিকদের হাত ধরে পথ দেখায়, যা

www.pathagar.com

অনুসরণ করলে সাহিত্য-কবিতা শিল্পমানে শিখরস্পর্শী হয়। তাদের রচনায় যেন ফুটে ওঠে রূপ-রসের বসন্ত। তিনি এক বাণীতে বলেন, 'সে-ব্যক্তির চেহারা আল্লাহ সজীব করে দিন, যে-ব্যক্তি প্রয়োজানুপাতে কথাকে সংক্ষেপ করে।' জারীর বিন আবদিল্লাহ বাজলীকে তিনি বললেন, 'হে জারীর! তুমি যখন কিছু বল, খুব সংক্ষেপে বল। কথা উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তুমি কৃত্রিমভাবে কথা বাড়ায়ো না।' তিনি ঈসা নবী কথা উল্লেখ করে বলেন, 'তোমরা মূর্খদের সামনে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বল না, তাতে প্রজ্ঞার মানহানি হবে। আর প্রজ্ঞাকে একেবারে এড়িয়েও চল না, তাতে মূর্খদের ওপর জুলুম হবে।'

এসব বাণীতে তিনি কথায়-কাজে মিল রাখার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে বাড়াবাড়ি-অতিরঞ্জন, কৃত্রিমভাবে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও অপ্রয়োজনীয় ছন্দমিল বর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ, এগুলো অর্থকে কলঙ্কিত করে, বাস্তবকে হত্যা করে, এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে অন্যায় ঘটকালি করে।

রাসূলের এসব সমালোচনা– তাত্ত্বিক ও দিকনির্দেশনামূলক– যা তিনি কবি-সাহিত্যিকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো বিদ্যায়তনিক পঠন-পাঠনের ওপর নির্ভর করে নয়; বরং তাঁর স্বভাবরুচি, পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তি, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, ধর্মের মূল প্রাণ ও প্রেরণা থেকে উদ্ভূত চেতনার ওপরই নির্ভর করে, এবং শব্দ, অর্থ, শৈলী ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ করে।

। ৫ ।

সমালোচনার আধুনিক পরিভাষার আলোকে রাসূলের সমালোচনাগুলোর বিচার করা হয়তো অযৌক্তিক হবে, কিংবা 'আমগাছের কাছে আতা ফল চাওয়া হলে যা হয়' তাই হবে। কারণ, যে-কালপরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সমালোচনার কুঁড়িফুটন, তার সঙ্গে আজকের সমালোচনা পরিভাষাগুলোর তুলনা হয় কী করে? পরিভাষা পরিপুষ্টির যুগের সঙ্গে পরিভাষাদুর্ভীক্ষের তুলনা হয় কীভাবে? তবুও, কাব্য-সাহিত্য যেহেতু মানুষের জীবনরই দর্পণ, সেহেতু নানাকৌণিক সাযুজ্য রাখা অস্বাভাবিক নয়। সমালোচনার আধুনিক পরিভাষাগুলো এবং রাসূলের সমালোচনাসমূহ নিবিড়ভাবে পাঠ করলে দেখা যায়, সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছরের আগের বিচারপ্রক্রিয়া আজকের অত্যাধুনিক বিচারপক্রিয়ার সঙ্গে আনুপূর্বিক না হলেও, মোটামুটিভাবে মিলে যায়। বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাই প্রসঙ্গটি আমরা কলমের নিবস্পর্শে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেতে চেষ্টা করব।

আগেই বলে নিতে হচ্ছে, সাহিত্য বা অন্যকোনো শিল্পকলার সংজ্ঞাদান গাণিতিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। যা সম্ভব, তা হলো– ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাছাকাছি ধারণায় পৌঁছা। তাই 'সাহিত ও সাহিত্য সমালোচনাকে বোঝার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ জটিল পথযাত্রা'। সরলীকরণ-অর্থে বলতে পারি, সাহিত্যের ভালো-মন্দ, সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য, উৎকর্ষ-অপকর্ষের সম্যক আলোচনা হলো সাহিত্য-সমালোচনা। সম্যক আলোচনা মানে, সাহিত্যের ভাব, বস্তু, রীতি, অলঙ্কার ও স্রষ্টার বিশেষ মানস-দৃষ্টির সামগ্রিক আলোচনা। উপরিউক্ত রাসূলের সমালোচনাগুলোতে এ-কথাগুলি বর্ণে-বর্ণে প্রযোজ্য। স্রষ্টার বিশেষ মানস-দৃষ্টির কথা যে বলা হয়েছে, সেটাও আমরা দেখতে পাই উমাইয়া বিন সলতের

www.pathagar.com

কবিতার সমালোচনায়, যেখানে বলা হয়েছে, 'তার কবিতা মুমিন, কিন্তু কলব কাফের'। কলব কাফের হয়ে কবিতা কীভাবে মুমিন হয়? এখানে রাসূল [সা] কবির মানস-দৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, তার কবিতায় ধর্ম-ধার্মিকতা, তৌহীদের কথা ও পরকালের বিশ্বাসের কথা রয়েছে, কিন্তু নবীর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিদ্বেষবশত সে মুমিন হতে পারল না। এটি ঐতিহাসিকভাবেও সত্য। তবে রাসূলের আলোচনা 'সম্যক' ছিল না। 'সম্যক' ছিল না এ-অর্থে যে, তাঁর সমালোচনা তো গ্রন্থের পাতায় মুদ্রিত, কিংবা 'বর্নাঢ্য' অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ছিল না। এবং তখন এটার প্রয়োজনও ছিল না, সম্ভবও না।

আধুনিক সমালোচনার প্রামাণ্য পুরুষ টি. এস. এলিয়ট বলেছেন, সমালোচনার কাজ দু'টো : 'শিল্পকর্মের উদ্ভাসন [the elucidation of a work of art] এবং রুচিবোধের সংশোধন [the correction of taste]।' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি রচনা সম্পর্কে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হয়। এবং সমালোচনার মধ্যে নিহিত মূল্যবোধ ও যুক্তিতর্কের কারণে সমকালীন রুচির মধ্যে পরিবর্তন আসে। ঠিক এ-কাজটি হয়েছিল রাসূলের যুগে। তাঁর সমালোচনার কারণে সমকালীন কবিদের কবিতা সম্পর্কে কাব্যভোক্তাদের ধারণা স্পষ্টতর হয়েছিল এবং সমকালীন এক বিশাল কবিগোষ্ঠির রুচির মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল প্রভূত পরিমাণে।

বাংলায় রচিত সাহিত্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থসমূহে সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতির সংখ্যাবিভিন্নতা লক্ষণীয়। গ্রন্থভেদে পাঁচটি, সাতটি, আটটি, নয়টি ও দশটি পদ্ধতির কথা রয়েছে। বিভিন্নতার মাঝে দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। শ্রেণীকরণের স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই রয়েছে। তবে সমালোচনায় বস্তুনিষ্ঠতাই কাম্য। সীমাবদ্ধকরণের জন্য নয়, আলোচনার সুবিধার্থে এ-কয়টি পদ্ধতি আমরা সামনে রাখতে পারি : ১. ঐতিহাসিক সমালোচনা [Historical Criticism], ২. শাখাভিত্তিক সমালোচনা [Specific Criticism], ৩. পরিসংখ্যানগত সমালোচনা [Statistical Criticism], ৪. তুলনামূলক সমালোচনা [Comparative Criticism], ৫. আলঙ্কারিক [বা বিশ্লেষণাত্মক] সমালোচনা [Analytical Criticism], ৬. সনাতন বিধিসম্মত [বৈধী] সমালোচনা [Classical Criticism], ৭. বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা [Objective Criticism], ৮. যুক্তিপন্থী সমালোচনা [Inductive Criticism], ৯. মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা [Psycho-analytical Criticism], ১০. তত্ত্বসন্ধানী সমালোচনা [Philosophical Criticism], ১১. ব্যক্তিগত সমালোচনা [Personal Criticism], ১২. আপেক্ষিক সমালোচনা [Relativistic Criticism]।

পূর্বোদ্ধৃত রাসূলের সমালোচনাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, সমালোচনাপদ্ধতির প্রথম চারটি তাঁর সমালোচনায় দুর্লক্ষ। ঐতিহাসিক সমালোচনা এ-অর্থে দুর্লক্ষ যে, তিনি যে-কাব্যসমালোচনা করেছেন, তা ইতিহাসভিত্তিক নয়। তবে এ-কথা যদি মেনে নেওয়া হয় যে, 'ইতিহাসের সঙ্গে অতীত অচিচ্ছেদ্য বটে; কিন্তু কেবল অতীতটা ইতিহাস নয়।' বরং, 'দেশ ও কালের মধ্যে ঘটমান আবর্তন ইতিহাসে নামে পরিচিত, সুতরাং ইতিহাস বলতে দেশের কথা ও কালের কথা–উভয়টার বোঝায়।' তা হলে তাঁর সমালোচনা যে ঐতিহাসিকও ছিল, তা সুস্পষ্ট। যেহেতু সে-যুগে সাহিত্যের শাখাবিভাজন হয় নি, তাই

www.pathagar.com

শাখাভিত্তিক সমালোচনা অসম্ভব। পরিসংখ্যানগত সমালোচনা : অর্থাৎ, সমালোচনার অন্যান্য পথ ছেড়ে, শুধু কোনো লেখকের বিচিত্র শব্দ-সম্পদ ও ভাব-কল্পের বিক্ষিপ্ত ব্যবহারের সংখ্যা নির্ধারণ করে, তার সাহায্যে কবি-মানসের ওপর আলোকপাত করা। উল্লেখ্য, সে-যুগে তো দূরের কথা, এ-যুগেও যে সাহিত্যাঙ্গনে এধরনের সমালোচনার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ, তা বলাই বাহুল্য। তুলনামূলক সমালোচনার অর্থ যদি এ হয় যে, 'এক দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অপর দেশের অনুরূপ সাহিত্যের তুলনা দিয়ে সাহিত্যসমালোচনা আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে।' তা হলে বলতে হবে, সে-যুগে যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থাহীনতার কারণে দেশ-কালের সীমা ছিল দুর্লঙ্ঘ্য, সেহেতু তুলনামূলক সমালোচনার কথা ওঠতেই পারে না। আর যদি তার অর্থ এই হয় যে, 'সাহিত্য-বিচারে দুইটি বিভিন্ন লেখকের শব্দ-সম্পদ বা পঙক্তির তুলনামূলক বিচারে উভয়ের কৃতিত্ব নির্ধারণ করা যাইতে পারে।' তা হলে বলা যায়, রাসূল [সা] যে একই জাতের ও একই সময়ের অসংখ্য কবিদের থেকে কোনো কোনো কবির কবিতা নিয়ে, একজনের কবিতা সম্পর্কে এক ধরনের মন্তব্য, আবার অন্যজনের কবিতা সম্পর্কে ভিন্ন মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন, সেটা কি এক ধরনের তুলনামূলক সমালোচনা নয়?

এগুলি ছাড়া, এবং অন্যান্য সমালোচনাপদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে শুধু 'আপেক্ষিক সমালোচনা'টা বাদ দিয়ে, অন্যান্য পদ্ধতিগুলো রাসূলের সমালোচনায় সহজলক্ষ। উপরিবর্ণিত সমালোচনাসমূহ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করলে এবং সমালোচনাপদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে তা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। এবং এ-কাজটি সচেতন, সন্ধানী ও বোদ্ধা পাঠকদের কাছে সোপর্দ করলাম।■

সহযোগিতায়

১। [ফুটনোটে উল্লিখিত উৎস ছাড়াও আরো যেসব উৎস থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে]

২। http://technologie.ahlamontada.com/t1206-topic

৩। http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t-31336.html

৪। কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল [সা] ও সাহাবীদের মনোভাব, ড. আবদুল জলীল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ [প্র. প্র]

৫। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মহানবী, মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫

৬। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, আ. ত. ম মুছলেহউদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ [প্র. প্র]

৭। আরবি তানকীদ : আহদে জাহেলি সে দাওরে ইনহিতাত্ তক [আরবি সাহিত্য-সমালোচনা : জাহেলি যুগ থেকে অবক্ষয়ের যুগ পর্যন্ত], ড. মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন নাদভী, হায়দরাবাদ, ভারত, ১৯৯০।

www.pathagar.com

আমার নিকাব গ্রহণ

মূল : সারা বোকার

তরজমা : মুহাম্মাদ ইউছুফ

আমি একজন আমেরিকান নারী যার জন্ম মধ্য আমেরিকার 'হার্টল্যান্ডে'। এই বড় শহরটিতে আমি বেড়ে ওঠি ঐ সমস্ত বালিকাদের মত যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো যৌনআবেদনময়ী জীবন গড়া । আর এই লক্ষ্যে আমি ফ্লোরিডা এবং মিয়ামীর 'দক্ষিণ সমূদ্র সৈকতে' আসা যাওয়া শুরু করলাম যা যৌনআবেদনময় স্থান হিসেবে খুব পরিচিত। আমি তা-ই করতে লাগলাম সাধারণত পশ্চিমা বালিকারা যা করছিলো। আমি আমার কর্ম এবং সৌন্দর্যকে নিয়োজিত করলাম এই জন্য যে, যেন অন্যদের চেয়ে আমার প্রতি বেশি মনোযোগ আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারি। আমি অবিরাম কাজ করতে থাকলাম এবং খুব তাড়াতাড়ি একজন ব্যক্তিগত ফিটনেস প্রশিক্ষক বনে গেলাম। সেখানে আমাকে সমুদ্রের দিকে মুখ করা একটি উন্নত মানের বাড়িতে জায়গা প্রদান করা হল। যার নিকটবর্তী বেলাভূমিতে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের লাইফ স্টাইল প্রদর্শনী চলতো।

কয়েক বছর পর আমার কাছে এটা অনুভূত হলো যে আমার আত্মমর্যাদা এবং সুখের তুলনায় আমার মেয়েলি আবেদনটাই বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে আমি পরিণত হয়ে গেলাম একজন ফ্যাশনের দাসী হিসেবে এবং আমার সৌন্দর্যের কারণে আমি ছিলাম জিম্মি।

www.pathagar.com

আরো কিছু সময়ের ব্যবধানে আমি আমার আত্মমর্যাদা এবং জীবনধারার মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করলাম। অবশেষে আমি মদ ও পার্টি থেকে পালিয়ে আশ্রয় পাওয়ার জন্য গভীর চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম। খুঁজতে লাগলাম বিকল্প ধর্ম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার তখনকার জীবনধারার সাথে উপত্যকাসম দূরত্ব সৃষ্টি হলো। আমি অবশেষ অনুভব করলাম এই সবকিছুই নিছক একটি ব্যথা নিরোধক অন্য যেকোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ব্যতীত।

তখন ছিল ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১। পরবর্তী ঘটনার আমি ছিলাম একজন প্রত্যক্ষদর্শী। যা ছিল ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঘোষিত এক লজ্জাজনক 'নতুন ধর্মযুদ্ধ'। আমি অন্যদের মাধ্যমে ইসলামের কিছু বিষয় সম্পর্কে অবগত হলাম। তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল ইসলাম হল, একটি নারী আবৃত তাবু, স্ত্রী পেটানো এবং নারীকে আবদ্ধ করে রাখাসহ বিশ্বে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী একটি ধর্ম।

একজন 'নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মী' এবং 'সবার জন্য উন্নত বিশ্ব' শ্লোগান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি এমন একজনের মুখোমুখি হলাম যিনি আগে থেকেই নির্বিশেষে সংস্কার এবং সবার জন্য সুবিচার আন্দোলনের নেতৃত্বে অনেক দূর অগ্রবর্তী ছিলেন। আমি তাঁর চলমান আন্দোলনে যোগ দিলাম যিনি নির্বাচন পুনর্গঠন, মানবিক অধিকার এবং অন্যান্য বিষয়সমূহের ব্যাপারে আন্দোলন করছিলেন। আমার কাজকর্ম এখন আগের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। বেছে বেছে সুবিচার প্রদানের পরিবর্তে আমি এখন এমন কিছু আদর্শ শিখতে পারলাম যেমন- সুবিচার, স্বাধীনতা ও সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার আছে এবং নিজের ভালো ও সকলের ভালোর মধ্যে কোন বিভেদ নেই। আমি প্রথমবারের মত এটাও জানতে পারলাম যে, প্রকৃত অর্থে কিভাবে "সকল মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান"। আমি আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারলাম যে, যাদের ঈমান আছে তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবী একটিই এবং তারা সৃষ্টিজগতের মধ্যে মিল খুঁজে পান।

একদিন আমি একটি বই পড়লাম যার প্রতি পশ্চিমারা অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষণ করত– আর এটি হল আল কুরআন। আমি প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলাম কুরআনের দিকে আহ্বানের কৌশল এবং উপস্থাপনা দেখে। আমি আরও আগ্রহী হয়েছিলাম সৃষ্টির অস্তিত্ব, জীবন, সৃষ্টিজগত, সৃষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পেরে। আমার মন এবং প্রাণের জন্য কুরআনই যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ঠিকানা তা বুঝার জন্য দোভাষী বা গীর্জার যাযক আর প্রয়োজন হলো না।

অবশেষে আমি মুহূর্তেই সত্য বুঝতে পারলাম। আরও বুঝতে পারলাম আমার সদ্য অর্জিত আত্মমর্যাদা ও বর্তমান জীবনধারার মধ্যে আর ইসলামের প্রতি শুধু বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই যেখানে ইসলামকে সকলক্ষেত্রে অনুসরণ করে আমি একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে শান্তিতে বাস করতে পারি।

আর এজন্যই আমি একটি সুন্দর লম্বা গাউন এবং স্কার্ফ ক্রয় করলাম যা মুসলিম সামাজিক আইনসম্মত মহিলাদের পোশাক হিসেবে পরিচিত। আমি চলাফেরা করতে লাগলাম একই শহরে এবং প্রতিবেশীদের সাথে যেখানে আমি কয়েকদিন আগেও চলাফেরা করেছি হাফপ্যান্ট এবং পশ্চিমা অভিজাত বাণিজ্যিক পোশাক পরে যদিও

www.pathagar.com

সেখানকার মানুষ, তাদের চেহারা এবং দোকানপাঠ গুলো ছিল সবই আগের মত। একটি বিষয় আমি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলাম যে ঐ পরিবেশে আমার নিকাব পরা উপস্থিতি প্রশান্তিজনক ছিল না। এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি আনন্দ বোধ করেছিলাম এইজন্য যে ঐ শহরের লোকগুলো আমাকে বিস্ময়ভরে দেখছে এবং সেখানে একজন শিকারী তার শিকার খুঁজছে যেখানে একদা আমি ছিলাম তার কাঙ্খিত মানুষ। হঠাৎ আমার কাছে মনে হলো আমার কাধ থেকে যেন একটি ভারি বোঝা সরে গেছে। আমি আমার সময় আর অপচয় না করে কেনাকাটা, মেকআপ, চুল ছাটাই বাদ দিয়ে সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়লাম। অবশেষে আমার কাছে মনে হল আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

আমি আমার হৃদয়জুড়ে ইসলামকে স্থান দিলাম।

কিছুদিন হিজাব পরার পর নিকাব গ্রহণের জন্য আমার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। আমি লক্ষ্য করলাম বহুসংখ্যক মুসলিম মহিলা নিকাব পরিধান করছে। আমি মুসলিম হওয়ার পর যে আমাকে বিয়ে করেছিল আমি আমার সে মুসলিম স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার নিকাব পরিধান করা উচিৎ অথবা আমি যে হিজাব পরছি তার সাথে নিকাব সংযুক্ত করে নিতে পারি কি না? আমার স্বামী আমাকে খুব সাধারণভাবে উপদেশ দিল ইসলামে যে বিশ্বাস করে তার জন্য হিজাব বাধ্যতামূলক কিন্তু নিকাব গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

তখন আমি যে হিজাবটি পরছিলাম তার সাথে মাথা ঢাকার একটি স্কার্ফ ছিলো যা আমার সকল চুল ঢেকে রাখতো শুধুমাত্র মুখ ব্যতীত এবং ঢিলেঢালা বড় কালো রংয়ের গাউন বা "আবায়া" টি আমার পায়ের পাতা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে রাখতো।

প্রায় দেড় বছর পর আমি আমার স্বামীকে বললাম আমি নিকাব নিতে চাই। আমি মনে করি আমি যদি নিকাব গ্রহণ করি তাহলে আমি আমার প্রভুর আরো বেশি বেশি সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব। আমার স্বামী আমার কথা সমর্থন করল এবং আমাকে একটি 'ইসডাআল' কিনে দিল যার ঢিলেঢালা কালো রং-এর গাউনটি আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখে আর নিকাব আমার সম্পূর্ণ মাথা এবং মুখ ঢেকে রাখে শুধুমাত্র চোখ ব্যতীত।

আমি লক্ষ্য করলাম ঐ সময়ে রাজনীতিবিদ, ভেটিকান গীর্জার যাযক, নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মী, তথাকথিত মানবাধিকার কর্মী এবং নারী স্বাধীনতার নামে যারা কাজ করছে তারা হৈ চৈ শুরু করে দিল এবং হিজাবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাসহ নিষিদ্ধ করার দাবি জানালো। আর অপবাদ দিতে থাকলো হিজাব মহিলাদেরকে বৈষম্যমূলক আচরণ শিখায় যা সামাজিক সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং কেউ কেউ এটিকে সেকেলে বলে অভিহিত করতে লাগল।

আমি মনে করি এটি একটি নির্লজ্জ প্রতারণা, যখন পশ্চিমা সরকার এবং তথাকথিত মানবাধিকার গ্রুপগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে নারী অধিকারের কথা বলে। অথচ তারাই একটি বিশেষ ধরনের পোষাক নারীদের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। শুধুমাত্র হিজাব বা নিকাব গ্রহণের কারণে যখন নারীরা তাদের অধিকার, কর্ম এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তখনও কথিত নারী স্বাধীনতাকামীরা নারী স্বাধীনতার বিকল্প রাস্তা খুঁজছে। বর্তমানে

www.pathagar.com

হিজাব পরিহিতা ও নিকাব গ্রহণকারী মহিলারা তাদের কর্মক্ষেত্র এবং অধিকার থেকে শুধুমাত্র তিউনেশিয়া, মরক্কো ও মিশরসহ সমগ্রবাদী সরকারের অধীনেই বঞ্চিত নয় বঞ্চিত হচ্ছে পশ্চিমা গণতন্ত্রের দাবিদার ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং বৃটেনেও।

অমি এখনো একজন নারীমুক্তিকামী তবে মুসলিম নারীমুক্তিকামী। যে মুসলিম নারীদের আহ্বান জানাচ্ছে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালনের জন্য এবং তাদের স্বামীরা যাতে একজন প্রকৃত মুসলিম হতে পারে সে ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য। তারা যাতে তাদের সন্তানদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলে যেন তারা সকল মানবতার জন্য নতুন আশার আলো জাগাতে পারে। তারা যেন ভালো কাজে অংশগ্রহণ করে এবং খারাপ কাজ পরিত্যাগ করে। তারা যেন কথা বলে সত্যের পক্ষে এবং সকল মন্দের বিপক্ষে। আন্দোলন চালিয়ে যায় তাদের অধিকার হিজাব ও নিকাব গ্রহণের পক্ষে যে পথে চললে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন।

হিজাব এবং নিকাব গ্রহণ করা আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা তাদের জন্য যারা এখনো পর্যন্ত হিজাব বা নিকাব গ্রহণ করতে পারেনি অথবা বুঝতে পারেনি হিজাব বা নিকাব গ্রহণ করা বলতে কী বুঝায় এবং কেন আমরা এটাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করি।

আমি এমন অনেক নারীকেই চিনি যারা পাশ্চাত্য সমাজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করে নিকাব গ্রহণ করেছে যাদের কেউ কেউ এখনো অবিবাহিতা। আবার এদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা হিজাব বা নিকাব গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের পরিবারের কিংবা পারিপার্শ্বিকতার পুরোপুরো সহযোগিতা পাচ্ছে না। অথচ এটা নারীদের ব্যক্তিগত অধিকার। যেখানে আমরা কেউ আত্মসমর্পন করতে চাই না।

ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক নারীরা আজ তাদের ভাসিয়ে দিয়েছে 'স্বল্প পোশাক না হলেই নয়" এই স্লোগানে যা আজ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে গেছে।

একজন প্রাক্তন অমুসলিম হিসেবে আমি এখনো নারীর সমান অধিকার চাই। সকলকে জানতে হবে নিকাব কিভাবে নারীর জীবনে নিয়ে আসবে সুখ ও শান্তি যা এনেছে আমার জীবনে। কিছুদিন আগেও 'স্বল্প পোষাকই' ছিল আমার স্বাধীনতার প্রতীক যা আমাকে অধ্যাত্মিকতা, প্রকৃত সত্য ও দায়িত্বসম্পন্ন মানবীয় গুণাবলী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

স্বল্প পোশাক, যৌনআবেদনময়ী জীবন এবং মিয়ামীর সাউথ বিচ আমার জীবনে সুখ আনতে পারেনি। জীবনে প্রকৃত সুখ চাইলে এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে এটা শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমেই সম্ভব। আর এজন্যই আমি নিকাব গ্রহণ করেছি। আমি আমার অনন্য অধিকার নিকাব গ্রহণ করেই মরতে চাই। বর্তমানে নিকাব হচ্ছে নারী স্বাধীনতার এক নতুন প্রতীক।

তাই আমি ঐ সমস্ত মহিলাদের বলতে চাই ইসলামী আদর্শের প্রতীক হিজাব বাদ দিয়ে যারা আত্মসমর্পণ করেছো পাশ্চাত্য কুৎসিত ধ্যান-ধারণায় তোমরা বুঝতে পারছো না যে তোমরা কি হারাচ্ছো।■

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ ও খেলাফতের যুগে মানবাধিকার

তৌহিদুর রহমান

ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম নয়, ইসলাম একটা দিন বা আদর্শিক জীবন ব্যবস্থা। অন্যান্য মতবাদের সাথে ইমলামের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম হচ্ছে দুনিয়ার বুকে ইনসাফভিত্তিক সর্বশ্রেষ্ঠ একটা আদর্শিক জীবন ব্যবস্থা। সমস্ত ভালো কাজই ইসলামে ইবাদতের সমতুল্য। রাস্তার একটা কাঁটা অপসারণও ইসলামে সওয়াবের কাজ। প্রতিবেশীর ঝগড়া মিটানোও সওয়াবের কাজ। যে মুসলিম যত ভালো কাজ করবে সমাজে সে তত বড় ধার্মিক। জ্ঞানার্জন ইসলামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা ভালো কাজ। কিন্তু নির্জনে জঙ্গলে বসে সারা জীবন আল্লাহর জিকির করা ইসলামে ভালো কাজ হিসাবে গণ্য নয়। 'কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন নাস...।' মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন, 'মানব জাতির মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা মানব জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করো।' আল্লাহ কোথাও কিন্তু বলেননি, যদি তোমরা সারা জীবন আল্লাহ আল্লাহ করে জীবন পার করে দাও তাহলে দুনিয়াতে তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। বৈরাগ্য সাধন বা পীরবাদের কোন স্থান ইসলামে নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন, ইকরা-পড়! আমাদের বুঝতে হবে একমাত্র পড়ার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। শুধু পড়া ও গবেষণার

www.pathagar.com

মাধ্যমেই চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, ভূ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। যে যত বড় বিজ্ঞানী বা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী মানব কল্যাণে অবদান রাখার সুযোগও তার তত বেশি। আর একজন সৎ মুসলিম বিজ্ঞানীই পারে সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে। ইসলাম মানব কল্যাণের সমস্ত বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। সেজন্যই ইসলাম পরিপূর্ণ একটা জীবনব্যবস্থা। ইসলাম জীবনের সব ব্যাপারেই পূর্ণাঙ্গ ও কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ মতবাদ হিসেবে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য স্পষ্ট নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা দান করেছে।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে বোমা মেরে মানবাধিকারের শিক্ষা দিচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে একদিন হয়তো বোমা মেরে অধিকার আদায় করা মানবাধিকারের প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়াবে। গোয়ান্তানামো, আবুগারিব আজ সাম্রাজ্যবাদীদের মানবাধিকার শিক্ষাদানের প্রধানতম কারখানা! এসব কারাখানায় বন্দীদের ওপর সর্ব নিকৃষ্ট রকমের নির্যাতন চালিয়ে বুঝানো হচ্ছে, বন্দী নির্যাতন হচ্ছে মানবাধিকার রক্ষার অন্যতম একটা শর্ত। আমরা দেখছি দুনিয়াতে যিনি যত অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবেন তিনিই পাবেন শান্তিতে নোবেল পুরস্কার। পশ্চিমাদের কাছে মানবাধিকারের লঙ্ঘনই হচ্ছে মানবাধিকার শিক্ষা দানের হাতিয়ার। আফগানিস্তানে মূর্তি ভাঙলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, অথচ বোমা মেরে লক্ষ লক্ষ শিশু, নারী ও মানুষ হত্যা করলে মানবাধিকার সুরক্ষিত হয়! ইরাকে টন টন বোমা ফেলে বুঝানো হচ্ছে, এগুলো মানবাধিকার রক্ষার হাতিয়ার। সাদ্দামকে কুরবানীর দিন ফাঁসি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শাস্তি কত ভয়ঙ্কর হতে পারে! গাদ্দাফি, হোসনে মোবারকসহ প্রায় সব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে দণ্ডিত– সমান অপরাধে অপরাধী মায়ানমার, চীন, ভারত, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রধানরা! অথচ তাদের কোন শাস্তি পেতে হচ্ছে না। যত দোষ নিরপরাধ মুসলিমদের এর নাম কী মানবাধিকার!

পাশ্চাত্য আজ বোমা মেরে নিরীহ মানুষ হত্যা করে, যুদ্ধবন্দীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে মানবাধিকারের শিক্ষা দিচ্ছে! অথচ ৬২৪ খৃস্টাব্দে মহানবী মুহাম্মাদ [সা] বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেন, বিজয়ী সৈনিকরা না খেয়ে হলেও যুদ্ধবন্দীদের খাওয়াবেন। যুদ্ধবন্দী শত্রু হলেও সে যেহেতু মানুষ তাই তার সমস্ত মৌলিক ও ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। কোন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা যাবে না। তাদের সাথে সর্বত্তোম ব্যবহার করতে হবে। যুদ্ধবন্দীদের অতিরিক্ত গরম ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করতে হবে। তারা কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করলে দ্রুত তা দূর করতে হবে। বন্দীদের মধ্যে কোন মাকে তার সন্তান থেকে আলাদা করা যাবে না, কোন আত্মীয়কে তার থেকে আলাদা করা যাবে না। বন্দীদের মান মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। জোর করে বন্দীদের কাছ থেকে কোন কাজ আদায় করা যাবে না। চৌদ্দশ' বছর আগে মুসলিমরা এসব নিয়ম-নীতি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে। অথচ, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! তাদেরকেই আজ বোমা মেরে মানবাধিকার শেখানো হচ্ছে!

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর [রা] সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে যাত্রার সময় নির্দেশ দিতেন, অর্থ-সম্পদ অপহরণ করবে না, তসরুপ করবে না, প্রতারণা করবে না। শিশু, নারী কিংবা বয়োবৃদ্ধকে হত্যা করবে না। ফলবান গাছ কাটবে না এবং ফসলের ক্ষেত পুড়িয়ে দেবে না। অন্য ধর্মের উপাশনালয় ধ্বংস করবে না।

হযরত ওমর [রা]-এর নির্দেশ হলো, যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করবে না। তোমার শক্তি থাকলেও কারো অঙ্গচ্ছেদ করবে না। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করবে না। বৃদ্ধ ও নাবালককে হত্যা করবে না। যুদ্ধের সময় শিশু, অসহায় নারী ও বৃদ্ধদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

মানবাধিকারের বিষয়টি ইসলামে সর্বত্রই সমান। মানবজাতিকে ইসলাম গৌরব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম মানুষকে সমান অধিকার, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ইসলামে বংশ মর্যাদা, শ্রেণীবিভেদ, জাতিগত বিভেদ ও বর্ণবিভেদ হতে সতর্ক করেছে। দাস-দাসী ও অধীনস্তদের প্রতি সুন্দর ও ন্যায়ানুগ ব্যবহার করতে শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম সাদা-কালো, আরব-আজম সবাইকে সমান মর্যাদা দান করেছে। সবারই পিতা-মাতা হযরত আদম [আ] ও হযরত হাওয়া [আ]। সবাই আদি পিতা-মাতা হযরত আদম [আ] ও হযরত হাওয়া [আ]-এর সন্তান। সবারই দেহে একই রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে। মানুষ সবাই ভাই ভাই। মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষ হিসেবে সবাই সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। মৌলিক অধিকার সবার সমান। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকারও সবার ক্ষেত্রে সমান। ব্যক্তি স্বাধীনতাও সবার ক্ষেত্রে সমান। মর্যাদার দিক দিয়ে ইসলামে ধনী গরীব সবাই সমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারও সবার ক্ষেত্রে এক। জানমালের নিরাপত্তার অধিকার একই। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্থাৎ বাকস্বাধীনতা সবার ক্ষেত্রে এক। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ইসলামে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সৎ পথে উপার্জন করার অধিকারও ইসলামে সবার জন্য সমান। অসহায়, প্রতিবন্ধী, এতিম, মিসকিন, নারী ও শিশু অধিকার ইসলাম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে আর নিজে পেট পুরে খায় সে ব্যক্তি মুমিন নয়। কৃষক, মজুর, শ্রমিকের অধিকারও মূল্যায়িত হয়েছে গুরুত্ব সহকারে। শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই মজুরি পরিশোধের তাকিদ দিয়েছে ইসলাম।

চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলাম মানবাধিকারের স্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছে। ৬২২ খৃস্টাব্দে বিদায় হজে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ [সা] যে অবিস্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ছিল মানবাধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি দলিল। মহানবী মুহাম্মাদ [সা] সেদিন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে, 'হে মানব সকল! অবশ্যই তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতাও একজন। সুতরাং আজ থেকে কোনো আরবের ওপর কোন অনারবের প্রাধান্য

www.pathagar.com

নেই। সাদা মানুষের ওপর কালো মানুষের এবং কালো মানুষের ওপর সাদা মানুষের কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একমাত্র আল্লাহভীতি ও মানব কল্যাণ হলো মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড।' তারপর তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মনে রেখো! প্রত্যেক মুসলমান একে অন্যের ভাই, সবাই একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কেউ কারো থেকে ছোট নয়, কারো থেকে কেউ বড়ও নয়। মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই সমান। নারী জাতির প্রতি অবহেলা করো না। নারীর ওপর পুরুষের যেধরনের অধিকার আছে, নারীরও পুরুষের ওপর সেধরনের অধিকার আছে। তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করো না। মনে রেখো! মাহন আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছ। সাবধান! ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে ইতিপূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

আমরা জানি ইসলাম প্রথমেই মানুষের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সর্বাধিক। ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, বাইরের আক্রমণ বা অন্য যেকোনো ধরনের বিপদ ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। সকল মানুষের সৎ পথে সম্পদ অর্জন এবং বৈধ পথে তা ভোগ করার সমান অধিকার দিয়েছে। সব সময় ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের সম্পদের নিরাপত্তা দিতে বাধ্য। চরম শত্রুরও জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী [সা] অমুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা দান করেছেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জোর করে কোনো লোকের সম্পদ দখল বা আত্মসাৎ করা ইসলাম সমর্থন করে না। মানুষের মান-সম্মান রক্ষার জন্যও ইসলাম নানা নিয়ম-নীতি প্রদান করেছে। গীবত অর্থাৎ পরনিন্দাকে ইসলাম মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছে। পরচর্চা, চোগলখোরি, জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদ, কুৎসা রটনা ইত্যাদিকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার প্রতি ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলের প্রতি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কোন মানুষ খুনের বদলে বা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করলো। আর যে কারো জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সকল মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিল। আমার রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে এসেছে, এরপরও তাদের বেশির ভাগ লোকই পৃথিবীতে বাড়বাড়ি করেছে।' [সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৩২)]

ইসলাম সব মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দান করেছে। এরশাদ হয়েছে, 'আপনি বলে দিন,...আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।'[সূরা আল কাফিরূন, আয়াত ৫-৬] ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে পারে। তাতে কোনো প্রকারের বাধা সৃষ্টি করার অধিকার কারো নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ের

www.pathagar.com

সংরক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে। কখনো ভিন্নধর্মের লোকদের জোর করে ইসলামে দাখিল করা যাবে না এবং তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও দেব-দেবী নিয়ে কটাক্ষ করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম ও সংখ্যালঘুদের প্রয়োজনীয় অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদে বলা হয়েছে, 'আজ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সমান। মদীনায় বসবাসরত ইহুদি, খৃস্টান, মূর্তিপূজারী ও মুসলমান সবাই একদেশি এবং সবাই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। সব ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ অন্য কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। মুহাম্মাদ [সা]-এর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে না। বাইরের শত্রুর দ্বারা মদীনা নগরী আক্রান্ত হলে সবাই সম্মিলিতভাবে শত্রুর মুকাবেলা করবে। এমনকি নিজেদের মধ্যে কোনো প্রকারের বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে।'

নারী-পুরুষ উভয়ের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার ইসলাম দিয়েছে। স্বামী যা উপার্জন করবে, তা স্বামীর অধিকারে থাকবে আবার স্ত্রী যা কিছু উপার্জন করবে, তা স্ত্রীর অধিকারে থাকবে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী নারীরাও পুরুষদের মতো সম্পদের মালিক হবে। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও নারীরা তাদের মৃত পিতা-মাতা, স্বামী ও সন্তানদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদাভাবে ভোগ-দখল করতে পারবে।

ইসলাম ধনীদের সম্পদে অসহায় ও মিসকিনদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, "ধনীদের সম্পদে গরিব ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" [আল-যারিআত, আয়াত-১৯]

একজন মুমিন মুসলমানের মৌলিক গুণাবলী কখনো মানবাধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে না। ইসলাম এমনিভাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির সব রকমের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করে সর্বাত্মক মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।■

www.pathagar.com

হে নবী [সা] ॥ আ ব দু ল হা লী ম খাঁ

এক.

লিখতে বসে হে রাসূল তোমার না'ত,
কেন যে দু'চোখ আমার করে অশ্রুপাত!
বড় অযোগ্য আমি অক্ষম এক কবি।
আঁকতে পারি না ভাষায় তোমার ছবি।
পৃথিবীর যেদিকে যত দূরে চাই,
তোমার তুলনীয় কিছু খুঁজে নাহি পাই।
যত ভাবি যত খুঁজি হে প্রিয় রাসূল
ত্রিভুবনে তোমার নেই যে কোন তুল।
স্রষ্টার অসংখ্য দানে ভরা চরাচর,
রহমত বর্ষিত হোক তোমার ওপর।

দুই.

তোমার মতো সুন্দর তোমার মতো ভালো,
আর কেউ দেখেনি এ পৃথিবীর আলো।
তুমিই দেখিয়ে গেছ চির সত্যের পথ,
কত নবী হতে চেয়েছে তোমার উম্মাত!
না চেয়ে হতে পেরেছি উম্মত তোমার,
কেমনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তার!
পেয়ে তোমার পায়ের একটু পরশ,
পৃথিবী হয়েছে ধন্য–হয়েছে সরস।
স্রষ্টার অসংখ্য দানে ভরা চরাচর,
রহমত বর্ষিত হোক তোমার উপর।

www.pathagar.com

তিমির আচ্ছাদিত মক্কা নগর ॥ জুলফিকার সাইদুল

তিমির আচ্ছাদিত মক্কা নগর। অযাচারি দিক
কলুষিত। মূর্খতার কুৎসিত পাপ পংকিলে আবৃত
ছিলো মানুষের মন। সমাজ রাষ্ট্রের আইন কানুন।
ভোগ্য পণ্য ছিলো যেথা নারী; নৃপতির ইচ্ছার বেসাতি।
রাষ্ট্র যন্ত্র ছিলো মদ মত্ত মোহে সমাহিত। নিশিদিন–
নারীর সম্পদ হতো অবাধে লুটপাট। রাজত্ব ছিলো
মদ জুয়া সুদে ভরপুর।
রাষ্ট্রপতি আবু সুফিয়ান,
ওৎবা, শায়বা, ছিলো উজির-নাজির-রণ সেনাপতি।
মুখের কথায় হতো দণ্ড শিরোচ্ছেদ। নারীর বিচ্ছেদ
হতো ইচ্ছা অনিচ্ছায়। এই ছিলো সমাজের চিত্রপট;
ছিলো গোত্রে-গোত্রে বিদ্বেষ হানাহানি। নির্দয় রক্তপাত।
জীবন্ত নরবলী দেবতার পদে খানায়ে কাবায়
ছিলো দেব-দেবী, হাজারো প্রতিমা; লাত মানাত হোবল;
আরো কত হাতে গড়া মৃত্তিকার খোদা। পূজার বিধান
বিবস্ত্র দেহে। নব নারী একত্রে; না ছিলো প্রভেদ।
অশ্লীলতা, ব্যভিচার ছিলো অনুপুংখ সমাজের ঘর।
জাহেলী আইয়্যাম; তথা আরবের মরু মক্কা নগর।

সেই তমসাবৃত কলুষ কাফন ছিঁড়ে একদা এলো
রবিউল আউয়াল বারো।
আসমানে আলোর বন্যায়
হলো তরঙ্গ উল্লাস। ভেঙে গেল নিদ্রার অচেতনতা;
সেদিনের রাঙা সূর্যদয় পৃথিবীকে জানালো সালাম,
জীন ইনসান কুল মাখলুক পড়ে নিলো প্রাণ ভরে
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।
সেদিনের প্রভাত–
বিশ্বের প্রথম আনন্দ। এত আনন্দ বিশ্বে কোন দিন,
হয়নি অনুভূত। খর্জ্জুর শাখা দিচ্ছিলো দোল-হিল্লোল।
সেদিনের মেষ শাবকেরা দুগ্ধ পানের কথা ভুলে গিয়ে
আনন্দে মরু উদ্যানে দিচ্ছিলো ডিগবাজী। মেষ মাতারা–
সেদিন করেনি দুগ্ধ দান।
ফেরেশতা হুর জান্নাতে
খুলে দ্বার আনন্দে বলেছিলো মারহাবা : মারহাবা!
দুলে উঠেছিলো মৃৎ-বত, ইব্রাহীমের কাবা ॥

www.pathagar.com

ভালোবাসার পরশ ॥ আমিনুল ইসলাম

ভালোবাসার পরশ বুলায়
রাসূল প্রেমের ভাষা
তাঁর স্মরণে যায় বেড়ে যায়
উদ্দীপনা আশা।

শিউলী বকুল হাসনাহেনা
গোলাপ ফুলের ঘ্রাণে
সরব হলো পাখ পাখালী
মাতলো গানে গানে
        নবীর আশেক হলে মনে
        থাকেনা নিরাশা ॥
আরব সাগর বান ডেকে যায়
মেঘনা যমুনায়
কোরাস সুরে কণ্ঠ ছেড়ে
নবীর গজল গায়
        ঢেউয়ের মতো ছন্দ তুলে
        জানায় ভালোবাসা ॥
সবুজ বনের পাতায় পাতায়
মুগ্ধ শিহরণ
মহান নেতার প্রেম বিরহে
কাঁপে হৃদয় মন
        নবীর প্রেমে বিলিয়ে দেব
        কান্না এবং হাসা ॥
বিশ্ব জুড়ে শান্তি শুধু
তাঁর দেখানো পথ
রাসূল হলেন আল্লাহ তায়ালার
শ্রেষ্ঠ নিয়ামত
        শোকর জানাই মহান প্রভুর
        মেটেনা পিয়াসা ॥

www.pathagar.com

রাসূল নামের মধু ॥ মা সু দা সু ল তা না রু মী

আমি রাসূল নামের মধু এনেছি
বিলাব জনে জনে,
এই মধুপান করে ধন্য হব
জীবন ও মরণে।
ওই নাম আমার ভালোবাসা
ওই নামে মিটাই পিপাসা
বিশ্ব ভুবন আঁধার দেখি
প্রিয় ওই নাম বিনে।

ওই নামের আয়নায় দেখি প্রভুর রূপা
ওই নামের প্রেম সাগরে দিয়েছি যে ডুব
আরশ মোকাম সব দেখি
ওই নামেরই গুণে।
ওই নাম আমার কান্নাহাসি
ওই নামে হৃদয়ে বাজে বাঁশী
আমি মুসলিম আজি
ওই নামের কারণে।

জুঁই চামেলী হাসনাহেনা
ওই নামে সবাই প্রেম দেওয়ান
ওই নাম জপি সকাল সন্ধ্যা
শয়নে স্বপনে।

www.pathagar.com

আর সব ক্ষমতার দাপট ॥ না জ মা ফে র দৌ সী

একজন নিরক্ষর মানুষ
কী করে এত কিছু জানেন
শিল্প,বিজ্ঞান,ইতিহাস,পরকাল
এ এক বিরাট বিস্ময়!

একজন কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ
ব্যবসায়ে হাত দিতেই
তিল তিল শ্রমে ঘামে
লাভের চূড়ান্ত চূড়া ছুঁয়ে দিয়ে
পাকা আমানতদার হয়ে উঠেছে
এমন কেউ কী শুনেছে আগে?

একজন সাদাসিদে মানুষ
মিথ্যার দাপুটে জনপদে
কবির অশালীন কাব্যকথাকে তুচ্ছ করে
নিশ্চিন্ত মনে মাথা তুলে হাঁটেন আর বলেন,
"কবির কবিতায় সবচেয়ে সুন্দর ও সত্যছন্দটি হবে,
আল্লাহ মহান! কেবল আল্লাহ মহান !
এছাড়া আর সব ক্ষমতার দাপট মিছে।"
কীভাবে একজন অ-কবি মানুষ
কাল-কালান্তরে জ্ঞানময়তা ছড়িয়ে
বেড়াতে পারেন!

নিজেদের সেরা সম্ভ্রান্ত মানুষটিকে
সবচেয়ে উপকারী বন্ধুটিকে
বিশ্বস্ত সত্যভাষী প্রতিবেশীকে
ঘরছাড়া করে দেশছাড়া করে
কী খ্যাতিলাভ করেছে ঐ লোকেরা !

যৌতুক, ইভটিজিং আর কুনজর

www.pathagar.com

সামলাতে যে মূর্খ যে পাষণ্ড দল
নিজহাতে প্রোথিত করেছে শিশুকন্যাকে,
ঘুরে দাঁড়িয়ে গেছে সে পঙ্কিল সমাজ
এ কোন আলোক বন্যাতে?

একজন নিরক্ষর মানুষ
একজন সাদাসিদে মানুষ
একজন সৎ ব্যবসায়ী মানুষ
কীভাবে সফল রাষ্ট্রপ্রধান হলেন,
কীভাবে ত্যাগের পর ত্যাগ, ভালবাসা
আর অসমসাহসী মাত্রিকতায় ......
কেবল ঐশী আলোর পথে
একটি জাতি জেগে উঠে,
খ্যাতনামা হয়ে উঠে,
ধনে-ধান্যে ভরে উঠে
কীভাবে মানবতার বিজয় আসে,
নারী-পুরুষ-শিশু-প্রবীণের মিলিত মোহনায়
কীভাবে শান্তি, সুখ আর সমৃদ্ধি সপ্তাকাশ ছাড়ায়
কৃতজ্ঞতার শিশিরে ভিজে উত্থিত উম্মাহর মন-প্রাণ
কালজয়ী নবীজির ক্যানভাসে।

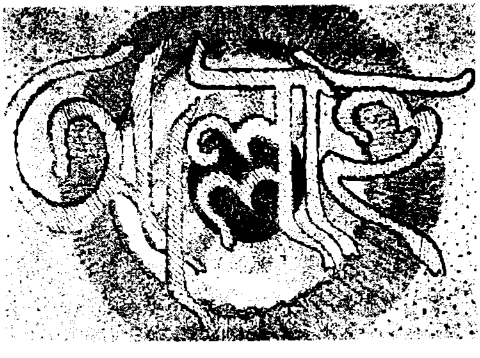

www.pathagar.com

ফরিয়াদ ॥ খন্দকার মজিবুল ইসলাম বেলাল

খোদা তোমার এই দুনিয়ায়
এ কেমন বিচার,
তোমার পথে চল্‌লেই আসে
জুলুম অত্যাচার ॥

ঈমান খাঁটি হয় বলে
দাও সান্ত্বনা,
কঠিন এ পরীক্ষা খোদা
আর কত সহিব প্রভু
নিঠুর অত্যাচার।

আর কত পথ বাইতে হবে
তাও তো অজানা,
আর কতকাল সইতে হবে
নিঠুর এ যাতনা;
আর কত মা সন্তান হারিয়ে
করবে হাহাকার।

সালাহ্উদ্দীন তিতুমীরগণ
আসবে না আর ফিরে,
কবে আবার বীর মুজাহিদ
জন্মিবে এ ধরাতে;
কুরআনের শাসন এ দেশে
আসবে কবে আর।
খোদা কবে ঘুচ্‌বে এই আঁধার!

www.pathagar.com

কিসরার পোশাক

জুবায়ের হুসাইন

এই দিনটির অপেক্ষায় এতদিন ছিলেন তিনি। আজ সেই পরম সৌভাগ্যের দিন। আনন্দের বানে উড়াল দেয়ার দিন। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠছে সে দিনটির ছবি- যেদিন তিনি শুনেছিলেন আজকের এই মুহূর্তটির ভবিষ্যৎবাণী। আর তখন থেকেই তো তিনি মনের মধ্যে একটা পুলক জমা করে আসছিলেন।

ধূসর মরুর ঊষর বুকে রহমতের বারিধারা ঝরাতে এসেছিলেন মানুষের পরম হিতৈষী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]। মানুষকে সকল দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-যাতনা আর যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে আলোময় দিনের পরম শান্তি উপহার দেয়ার জন্যই তাঁর আগমন। অথচ যাদের কল্যাণের জন্য তিনি জীবনের প্রায় তেইশটি বছর পার করে দিলেন, সেই তারাই তাঁকে নিজ বাসভূমিতে বাস করতে দিল না। অগত্যা মহান রবের ইশারায় তিনি হিজরত করলেন পাশের শহর মদিনায়। মদিনার লোকেরা তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়ে ধন্য হলো।

লোকটির চোখের সামনের স্মৃতির ক্যানভাসটিতে তখন আরেকটি দৃশ্যের অবতারণা হলো। তিনি তখন টগবগে যুবক। একদিন তিনি

www.pathagar.com

মক্কার অনতিদূরে কুদাইদ নামক স্থানে তাঁর গোত্রের একটি আড্ডায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় কুরাইশদের একজন দূত সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করল, 'এই মাত্র আমি শুনে এলাম কুরাইশ সর্দাররা ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ [সা]-কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারবে তাকে একশটি উন্নত জাতের উট পুরস্কার দেয়া হবে।'

একশ উটের কথা শুনে যুবকটির মধ্যে লালসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু অন্যের মধ্যেও এ লালসা সঞ্চার হতে পারে এ ভয়ে তিনি কোনো কথা না বলে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি সেই আড্ডা থেকে ওঠার আগেই তার গোত্রের অন্য একটি লোক এসে বলল, 'আল্লাহর শপথ, আমার পাশ দিয়ে এখনই তিন জন লোক চলে গেল। আমার ধারণা তারা মুহাম্মদ, আবু বকর ও তাদের গাইডই হবে।'

যুবকটি সাথে সাথে বলল, 'না, তা না। তারা হচ্ছে আমাদের পাশের গোত্রের লোক। তাই উট হারিয়ে গেছে, তাই হারানো উট তালাশ করছে।'

'তা হতে পারে' বলে লোকটি চুপ করে গেল।

আড্ডা থেকে সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলে অন্যদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, এ কারণে যুবকটি আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকল। তারপর কেউ যেন কিছু ধারণা করতে না পারে এমনই এক পরিস্থিতিতে তিনি চুপে চুপে বেরিয়ে এলেন। আর সোজা চলে গেলেন বাড়িতে। সেখানে পৌঁছেই তার দাসীকে বললেন, 'তুমি চুপে চুপে মানুষে না দেখে এমনভাবে আমার ঘোড়াটি ওই উপত্যকায় বেঁধে রাখবে।' আর দাসকে বললেন, 'তুমি এ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ির পেছন দিক থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেন কেউ না দেখে এবং আমার ঘোড়ার পাশে একস্থানে রেখে দেবে।'

এরপর তিনি বর্ম পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেই উপত্যকার কাছে গিয়ে পূর্বেই প্রস্তুত রাখা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন এবং মুহাম্মদ [সা]-কে ধরার জন্য দ্রুত ঘোড়া হাঁকালেন। তার মনে তখনও এই ভয় ছিল, কেউ হয়তো তার আগেই গিয়ে মুহাম্মদকে পাকড়াও করবে এবং পুরস্কার ছিনিয়ে নেবে। একশটি উন্নত জাতের উট, কম তো কথা নয়!

তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান কবি। পাশাপাশি ছিলেন তার গোত্রের দক্ষ ঘোড়সওয়ারদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘদেহী, বিশাল বপুধারী এবং পদচিহ্ন বিশারদ ছিলেন। এছাড়া তিনি যে কোনো বিপদে দারুণ ধৈর্যশীলও ছিলেন। আর তার ঘোড়াটিও ছিল বেশ উন্নত জাতের।

এগিয়ে চলেছেন তিনি রাসূলকে [সা] ধরতে। কিছুতেই তাঁকে মদিনায় পৌঁছতে দেয়া যাবে না। একশটি উট তার চায়-ই চায়।

তিনি সামনে এগিয়ে চললেন। এভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর তার ঘোড়াটি হঠাৎ হোঁচট খেল। ব্যস, তিনিও ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেলেন দূরে। এটাকে তিনি অশুভ লক্ষণ মনে করলেন। কিন্তু লোভের কারণে তিনি আবারও ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। একটু দূর যেতে না যেতেই ঘোড়াটি আবাও হোঁচট খেল। এবার তার অশুভ লক্ষণের ধারণা আরও বেড়ে গেল। তিনি ফিরে যাওয়ার চিন্তা করলেন, কিন্তু একশ উটের লোভ তাকে এ চিন্তা থেকে বিরত রাখল।

www.pathagar.com

এর পরপরই তিনি সামান্য দূরে দু'জন সঙ্গীসহ রাসূল [সা]-কে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার হাত বাড়িয়ে দিলেন ধনুকের দিকে। কিন্তু এ কী! তিনি যে হাতই নাড়াতে পারছেন না। যেন অসাড় হয়ে গেছে। পরক্ষণই তিনি দেখতে পেলেন তার ঘোড়ার পা শুকনো মাটিতে দেবে যাচ্ছে এবং সামনে থেকে প্রচণ্ড ধোঁয়া উটে ঘোড়া ও তার চোখ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তিনি দ্রুত ঘোড়া হাঁকানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘোড়াটি এমন স্থির হয়ে গেল যেন তার পা লোহার পেরেক দিয়ে মাটিতে গেঁথে দেয়া হয়েছে। এই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'হে মুহাম্মদ, আমার ওপর যা কিছু ঘটেছে তাতে আমার চোখ খুলে গেছে। আপনি দোয়া করুন যাতে আমার ঘোড়া জমিন থেকে বের হয়ে আসে। আল্লাহর কসম, আমার পক্ষ থেকে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।'

রাসূল [সা] দোয়া করলেন। তার ঘোড়া মুক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার লালসাও আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তিনি তার ঘোড়াটি আবারও নূরের রবির দিকে হাঁকালেন। এবারা আগের চেয়েও মারাত্মকভাবে ঘোড়ার পা মাটিতে আটকে গেল। এবারও তিনি তার ঘোড়া মুক্ত হওয়ার জন্য রাসূলকে দোয়া করতে বললেন। রাসূল [সা] দোয়া করলে ঘোড়া মুক্ত হলো। যুবকটির এবার বোধোদয় হলো। তিনি তখন বলে উঠলেন, 'আমি সুরাকা ইবনে মালিক। আল্লাহর কসম, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না এবং এমন কথাও বলব না যা আপনি অপসন্দ করেন। তবে সামনে অগ্রসর হওয়ার পর আপনি কিছু গোলাম পাবেন। তারা আমার উট চরাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে যত গোলাম এবং উটের প্রয়োজন হবে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

কিন্তু পরমদাতা রাসূলে পাক [সা] বললেন, 'আমাদের কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য তুমি আমাদের খবর কাউকে দিও না।

সুরাকা কসম খেয়ে বললেন, 'আমি দুশমনদের অনুসন্ধানকে আপনার পক্ষ থেকে ব্যর্থ করে দেব।' তারপর আরেকটু অগ্রসর হয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মদ, আমি নিশ্চিতভাবে জানি শিগগিরই তোমার দীন বিজয়ী হবে। আমার সাথে তুমি ওয়াদা করো, আমি যখন তোমার সাম্রাজ্যে যাব, তুমি আমাকে সম্মান দেবে। আর এ কথাটি একটু লিখে দাও।'

রাসূল [সা] আবু বকরকে দিয়ে একখণ্ড হাড়ের উপর তা লিখিয়ে সুরাকাকে দিলেন। সুরাকা যখন সেটি নিয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করল, তখন দীনর নবী [সা] বললেন, 'সুরাকা!'

সুরাকা থমকে দাঁড়ালেন। বরং থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। এ তো অন্য কারোর ডাক নয়, স্বয়ং পরমহিতৈষী দয়ার নবীর ডাক।

রাসূল [সা] বললেন, 'তুমি যখন কিসরার রাজকীয় পোশাক পরবে, তখন কেমন হবে?'

এবার তো চরম বিস্ময়ের পালা। এ কী বলছেন মুহাম্মদ [সা]! এও কি সম্ভব? বিস্ময়ভরা হৃদয় নিয়েই তিনি ফিরে এলেন। আর পথে যারা তখনও রাসূল [সা]-কে খুঁজছে, তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা ফিরে যাও। আমি এ অঞ্চলে বহুদূর পর্যন্ত খুঁজেছি। আর তোমরা তো জানোই, পদচিহ্ন অনুসরণকারী আমার চেয়ে ভালো এ তল্লাটে আর কেউ নেই।' তার এই কথায় লোকেরা সেখান থেকে চলে গেল।

www.pathagar.com

সুরাকার মন কিন্তু তখনই বদলে গেল। তিনি প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করতে লাগলেন যে, মুহাম্মাদের দীন অবশ্যই বিজয়ী হবে এবং তাঁর ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মূলত সেদিন থেকেই আজকের এই দিনটির প্রতীক্ষায় তিনি এতদিন ছিলেন। সেদিন রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সঙ্গে তার এই ভূমিকার কথা আবু জেহেলদের কানে যাওয়ার পর তারা তাকে বেশ তিরস্কার করল। তখন সুরাকা তার স্বরচিত দু'টি শ্লোক আবৃত্তি করলেন,

"আল্লাহর শপথ, তুমি যদি দেখতে আবু হিকাম,
আমার ঘোড়ার ব্যাপারটি, যখন তার পা ডুবে যাচ্ছিল, তুমি জানতে
এবং তোমার কোনো সংশয় থাকতো না, মুহাম্মদ প্রকৃত রাসূল–
সুতরাং কে তাঁকে প্রতিরোধ করে?"

আজ পারস্য বিজয় হয়েছে। খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর ফারুক [রা] মুসলমানদের খলিফা। পারস্য জয়ের সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন সেনাপতি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের দূত। সঙ্গে এনেছেন পারস্যের গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ। ওমর [রা] সেসব দেখে বিস্ময়ের সাথে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। এসবের মধ্যে ছিল কিসরার মণি-মুক্তা খচিত মুকুট, সোনার জরি দেয়া কাপড়, মুক্তার হার এবং এমন চমৎকার দু'টি জামা যা ইতিপূর্বে আর কখনও তিনি দেখেননি। তক্ষুনি তিনি সুরাকা ইবনে মালিককে ডেকে নিজি হাতে তাঁকে কিসরার জামা, পাজামা, জুতো ও অন্যান্য পোশাক পরিয়ে দিলেন। বিশাল কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন কিসরার তরবারি, কোমরে বেঁধে দিলেন বেল্ট, মাথায় রাখলেন মুকুট আর হাতে পরিয়ে দিলেন বালা। কতই না চমৎকার সে বালা!

কিসরার পোশাক পরানো শেষ হলে হযরত ওমর [রা] সুরাকার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাবাশ, সাবাশ! মুদলাজ গোত্রের ক্ষুদে এক বেদুঈনের মাথায় শোভা পাচ্ছে শাহানশাহ কিসরার মুকুট এবং হাতে বালা।' তারপর তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! এ সম্পদ তুমি রাসূলকে [সা] দাওনি, অথচ তিনি ছিলেন তোমার কাছে আমার থেকে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত। তুমি দাওনি এ সম্পদ আবু বকরকেও। তিনিও ছিলেন তোমার নিকট আমার থেকে অধিকতর প্রিয় ও মর্যাদাবান। আর তা দান করেছো আমাকে পরীক্ষার জন্য। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।' অত:পর তিনি সূরা মুমিনুনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করলেন, "তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধনৈশ্চর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তা দ্বারা তাদের সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বোঝে না।"

সুরাকার চোখের কোণাদ্বয় তখন ছলছল করে উঠছে। আহ্! আজ যদি এখানে দয়ার নবী রাসূলে খোদা [সা] উপস্থিত থাকতেন, তাহলে সুরাকাকে এ অবস্থায় দেখে কতই না খুশি হতেন। তারপরও তিনি যেন তাঁর সামনে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় রাসূল [সা]-কে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেলেন। রাসূল তাঁকে দেখছেন আর তার প্রশংসা করছেন। আজ মুহাম্মদ [সা]-এর সেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে বলতে দেখে সুরাকা মহান রবের কেবল শুকরিয়াই আদায় করতে থাকলেন।■

www.pathagar.com

তার পর আরো একটু অগ্রসর হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য মুখ খুলেছে কী সাংঘাতিক ব্যাপার, সে যেন বন্য হিংস্র প্রাণীদেরকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য নিজের দিকে আহবান জানাচ্ছে।' এ জন্য এটিকে একটি মৌলিক ও মহান কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একটি নিয়ম এ রকমই চলে আসছে যে, কাজ যত মহান বা কাজের পুরস্কার যত বড়, সে কাজের শাস্তিও তত বড়। মহান কাজটি করলে তিনি মহান হবেন এবং আখিরাতে বড় পুরস্কারের অধিকারী হবেন। অথচ এ মহান কাজটি যিনি করবেন না, তিনি তত বড় শাস্তির সম্মুখীন হবেন না এটি জুলুম। অবশ্যই তাকে তত বড় শাস্তি র সম্মুখীন হতে হবে এবং হওয়া উচিত বলে মনে করি। আল-কুরআন সেভাবেই মূল্যায়ন করেছে। যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে উল্লিখিত আয়াতে তার কথাকেই সর্বোত্তম কথা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর যে আল্লাহর দিকে ডাকে না তাকে নিম্নের আয়াতে বড় মাপের একজন জালেম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। "তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ্য বা সত্য রয়েছে সে তা প্রকাশ না করে গোপন করেছে।" [সূরা বাকারা : ১৪০]

সবশেষে বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহবান, যদি নিজেকে রাসূলের খাঁটি উম্মত দাবি করতে চান তবে আসুন আল্লাহ ও রাসূল [সা]-এর দেয়া আমানত তথা দায়িত্ব যথাযথ পালনের নিমিত্তে ইসলামী আন্দোলনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করি এবং মানুষকে অন্ধকারের গভীর খাদ থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে আল কুরআন নামক আমানতকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিই। আল্লাহতা'আলা বলেন, "আলিফ-লাম-রা। [হে মুহাম্মদ!] এটি একখানা কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যেন তুমি মানুষকে জমাটবাঁধা অন্ধকারসমূহ থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আস।" [সূরা ইবরাহিম : ১] আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর দেয়া আমানত যথাযথভাবে আদায় করার তাওফিক দিন। আমিন। ■

www.pathagar.com

সন্ত্রাস নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মাদ [সা]

এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি, বেকারত্ব নাগরিক অধিকার দলন, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলী প্রদর্শন প্রভৃতি আজ বিশ্ববাসীর জন্য রীতিমত উদ্বেগের কারণ। দেশে দেশে অন্যায়-অবিচার, যুদ্ধের বিভীষিকা, মানবতা বিধ্বংসী অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা আজ মানবাধিকারের প্রতি চরম হুমকি স্বরূপ। সন্ত্রাস এখন বর্তমান বিশ্বের মানবতা এবং সভ্যতার জন্য সর্বনাশী এবং সর্বগ্রাসী হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সন্ত্রাস নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবী [সা]-এর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই।

মহানবী [সা] এর আবির্ভাব ঘটেছিল জাহিলী পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত সমাজে। যে সমাজে জাহিলীয়াত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মহানবী [সা] এর আগমনের সমসাময়িক কালে মক্কার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল আবু জাহল, আবু লাহাব, উতবাহ, শাইবাহ প্রমুখের হাতে। যাদের হাতে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত ও পর্যুদস্ত হচ্ছিল। এমন এক বৈরী পরিবেশে আবির্ভাব হওয়ার পর মহানবী [সা] লক্ষ্য করেন যে, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বহু সন্তান পিতৃহারা হয়, অগণিত নারী হয় স্বামী কিংবা

www.pathagar.com

পুত্রহারা। মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হয় এই যুদ্ধ-বিগ্রহে। অসহায় দু:স্থ-দুর্গত লোকজন বঞ্চিত হয় তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে। ইয়াতীম-নি:স্ব বিধবাও বঞ্চিত হয় তাদের ন্যায্য পাওনা হতে। অত্যাচারীদের দোর্দণ্ড প্রতাব দুর্বল অসহায় লোকদের সদা সন্ত্রস্ত করে রাখে। সুতরাং এই বিপর্যয়কর অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য মাত্র ১৭ বছর বয়সে মহানবী [সা] মানবাধিকারের কতিপয় ধারা সংযোজন পূর্বক হিলফুল ফুযুল নামক এক সংগঠন গঠন করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ হতে সন্ত্রাস নির্মূল করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, পথিকদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য সহযোগিতা করা, মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং কোন অত্যাচারীকে মক্কায় আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়া।

হিজরতের পূর্বে ইয়াসরিব হতে মক্কায় আগত খাযরাজ গোত্রীয় লোকদেরকে আল আকাবা নামক স্থানে যে বায়আত বা আনুগত্যের শপথ করান তিনি, তাতেও সন্ত্রাস নির্মূল ও শান্তির ধারা লক্ষ্য করা যায়। মহানবী [সা] বলেন, তোমরা আমার হাতে এ বিষয়ে আনুগত্যের শপথ কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা-ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো বিরুদ্ধে মনগড়া কোন মিথ্যা অপবাদ দেবে না।

আল্লাহর নির্দেশে মহানবী [সা] বহুজাতিক ও বহুধর্ম ভিত্তিক অঞ্চল মদিনায় হিজরত করে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রধান হিসেবে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে যে লিখিত সনদ তথা সংবিধান জারি করেন, তা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে প্রসিদ্ধ। এ সনদে ৫৩ টি ধারা বিদ্যমান ছিল। যার অনেকগুলো ধারাই ছিল সন্ত্রাস নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ সনদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা-

* শান্তি ও যুদ্ধের সকল অবস্থায় মুসলমানের সাধারণ স্বার্থ এক ও অভিন্ন। তাঁদের মধ্য থেকে কোন লোকই পৃথক ভাবে তাদের নিজ ধর্মের শত্রুর বিরুদ্ধে কোন সন্ধি বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

* অমুসলমান সমাজের সহযোগী ও মিত্ররাও তাদের মত সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

* অপরাধী, অন্যায়কারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হবে। একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও কোন অপরাধীর ব্যাপারে সুপারিশ বা তাকে সমর্থন করা যাবে না।

* অপরাধীকে অবশ্যই পাকড়াও করতে হবে এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

* অমুসলিম ও মুসলিম সমাজের মিত্রদেরকে সহায়তাকারী হিসেবে সম্মান করতে হবে।

রাসূল [সা] সন্ত্রাস নির্মূল করে মদিনাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। যে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তারা এমন লোক, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" [সূরা হজ-৪১]

www.pathagar.com

মহানবী [সা] নামাজ কায়েম, যাকাত আদায়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তদানীন্তন সমাজে বাস্তবায়ন করেছিলেন।

নামাজ চরিত্র সংশোধনের সবচাইতে উত্তম মাধ্যম। তিনি নামাজের দ্বারা তৎকালীন যুব সমাজের চরিত্র সুন্দর করে উত্তম চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। নামাজ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহপাক বলেছেন, "নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।" [সূরা আনকাবুত-৪৫]

মহানবী [সা] নামাজ কায়েমের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ফলে তদানীন্তন সমাজের মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। নামাজের প্রভাবে তারা আল্লাহর ভয়ে এতই ভীত থাকতো যে, ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা, তা জানা সত্ত্বেও কেউ হয়তো নিজে নবী করীম [সা] এর নিকট এসে স্বীকার করতো যে, সে ব্যভিচার করেছে।

যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানেই সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ দূর করেছিলেন।

মহানবী [সা] রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সৎকাজের আদেশ প্রদান করে অতি সহজেই রাষ্ট্রের অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করেন। নবী করীম [সা] ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন, কিন্তু আল্লাহর আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোসহীন ও কঠোর।

অসৎ কাজের নিষেধের পাশাপাশি তা দমনে কঠোর হস্ত ছিলেন তিনি। একবার কুরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী তার হাত কেটে দেয়া হবে। উচ্চ বংশের একজন মহিলার হাত কাটা যাবে এতে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। নবী করীম [সা] এর নিকট তাকে মাফ করে দেবার সুপারিশ করা হলে তিনি বলেন, আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।

তদানীন্তন সময়ে সন্ত্রাসের মূল বাহক ছিল যুব সমাজ। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী শিক্ষার আলোকে মহানবী [সা] তৎকালীন পথভ্রষ্ট যুবসমাজকে আলোকিত যুব সমাজে রূপায়িত করেন। রাসূলের [সা] আধ্যাত্মিক শিক্ষা পেয়ে তারা চরিত্রবান ও পূতপবিত্র শ্রেণীতে পরিণত হন।

শিরক, ফিসক ও কুফরিতে আচ্ছন্ন যুবসমাজকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের চেতনায় সোনার মানুষে পরিণত করেন। নানা কারণে অশান্ত যুব সমাজকে আত্মশুদ্ধির জ্ঞান দিয়ে শান্ত করেন তিনি। ফলে অতি সহজেই সন্ত্রাসের আগুন নির্বাপিত হয়। প্রতিটি সমাজে যুব শক্তিই সাধারণত সন্ত্রাসের লাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই নবী করীম [সা] যৌবনের ইবাদতের ওপর গুরুত্বারূপ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, কিয়ামতের ময়দানে কঠিন সময়ে মহান আল্লাহর আরশে আজিমের ছায়ায় স্থান প্রাপ্ত সাত শ্রেণীর এক শ্রেণী সেই যুবক শ্রেণী যারা তাদের যৌবনকে ইবাদতে কাটিয়েছে।

রাসূল [সা] ক্ষমার এক মানস সরোবর ছিলেন। যে মক্কাবাসী মহানবী [সা] কে অমানুষিক

www.pathagar.com

নির্যাতন, যুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন এমনকি হত্যার প্রস্তুতিও নিয়েছিল, মক্কা বিজয়ের পর পরম সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও রাসূল [সা] তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। ফলে তারা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্ষমার এ আদর্শ আজও সন্ত্রাসের বিষদাঁত ভেঙে দিতে পারে।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনকে সুখী ও উত্তেজনামুক্ত রাখতে ধৈর্যের আবশ্যকতা অপরিহার্য। রাসূল ছিলেন ধৈর্যের এক অবিচল ব্যক্তিত্ব। রাসূল [সা] তাঁর নিজের জীবনে ধৈর্যের অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন। তায়েফের ময়দানে ইট পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়েও তায়েফবাসীর জন্য অভিসম্পাত করেননি, বরং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ধৈর্যের কি মহান দৃষ্টান্ত! তাঁর এই অনুপম আদর্শ সমাজের সন্ত্রাস নামক বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে পারে এবং বিশ্বকে শান্তির স্বপ্নপুরীতে পরিণত করতে পারে। কুরআন মাজিদেও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে এভাবে আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। [সূরা আনফাল-৪৭] দয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। ফলে সমাজে সন্ত্রাসের বীজ রোপিত হতে পারে না। মহানবী [সা] তাঁর সাহাবীদের পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহযোগিতা বৃদ্ধির শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, জমিনবাসীর প্রতি তুমি দয়া কর, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করবেন। [আবু দাউদ]

রাসূল [সা] মুমিনদের পারস্পরিক সহযোগিতার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, মুমিনগণ পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া এবং সহযোগিতায় এক দেহের ন্যায়, দেহের কোন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে সমগ্র শরীর বিনিদ্র রজনী যাপন করে। [সহীহ বুখারী]

বিদায় হজে প্রদত্ত মহানবী [সা]-এর ঐতিহাসিক ভাষণ সন্ত্রাস নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। কোন আন্দোলন কিংবা সংগ্রামের মুখে নয়, কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নয়, বরং সম্পূর্ণ নবুওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্যের খাতিরে স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রদত্ত ঐ ভাষণে তিনি যে সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন তা অবিস্মরণীয়।

তিনি বলেন, আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন তোমাদের নিকট পবিত্র, তোমাদের জীবন এবং সম্পদও অনুরূপভাবে পবিত্র। কারো নিকট কোন সম্পদ গচ্ছিত থাকলে তা প্রকৃত মালিকের নিকট অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। জাহিলী যুগের সমস্ত সুদ প্রথা রহিত করা হল, কিন্তু মূলধন ফেরৎ পাবে। সম্মতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ নয়। জাহিলী যুগের সকল রক্তের প্রতিশোধ রহিত করা হল। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আর অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যার শাস্তি হল একশত উট রক্তপন আদায়। তিনি বলেন, আরবকে অনারবের ওপর এবং অনারবকে আরবের ওপর কোনই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়নি।

তোমরা সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্টি। শোন, আমার পরে তোমরা পুনরায় পথভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ো না। অতিশীঘ্রই তোমরা

www.pathagar.com

তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তোমাদের নিকট হতে তোমাদের যাবতীয় কাজের হিসাব নেয়া হবে।

এ ছিল মানবতার প্রতি রাসূল [সা]-এর বিদায় হজের দিনের উপদেশ। কি গঠনমূলক! কি ভালোবাসার বারিসিক্ত এ উপদেশ! সন্ত্রাস দমনে নয় শুধু-মূলোৎপাটনে এরচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপত্র আর কে, কবে, কোথায় দিয়েছে এ ধরায়?

মহানবী [সা] এর পক্ষ থেকে আখেরাতে বিশ্বাস এবং পরকালীন জবাবদিহিতার তত্ত্বটি বর্বর আরব জাতির জীবনে এনে দিয়েছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সন্ত্রাসের বধ্যভূমিতে উড়িয়েছিল শান্তির শ্বেত কপোত। মৃত্যু মানুষের এক অনিবার্য পরিণতি, যার হাত থেকে এ পৃথিবীর কেউ রেহাই পাবে না। তাই আখেরাতের ওপর অবিচল বিশ্বাস ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় যার মনে জাগরুক থাকবে সে কখনও অন্যায় ও সন্ত্রাসের মত ঘৃণ্য কাজে ব্যাপৃত হবে না। আল্লাহর বাণী, "আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ হতে বিচ্যুত।" [মুমিন ৭৪]

আজকের বিশ্বে সন্ত্রাস নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে যে সকল অভিযান চালানো হচ্ছে তা যেন সন্ত্রাস বৃদ্ধি ও অশান্তির আগুন আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানব ইতিহাসে মানব কল্যাণে মহানবী [সা] এর সমরনীতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর সমরনীতি কখনো হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞকে উৎসাহিত করেনি। তিনি একমাত্র দীনে হক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন শেষে রণাঙ্গনে লড়েছেন। তাঁর যুদ্ধ ঘোষণার মাঝে ভোগ, লালসা, রাজ্য বিস্তার অযথা উৎপীড়ন কিংবা কোনপ্রকার রিপুর তাড়না ছিল না। তিনি তাঁর যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল এবং যুদ্ধ লব্ধ একগোছা উট বাঁধার রশি পাওয়ার আশা করলো, সে কোন পুণ্যেরই ভাগী হবে না। আল্লাহ শুধু ঐ ব্যক্তির সংগ্রামই গ্রহণ করবেন, যা শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তেই করা হবে, তাতে তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ থাকবে না। মহানবী [সা] আবহমান পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ও মুজাহিদও বটে। তাঁর আমৃত্যু সশস্ত্র সংগ্রামের রেকর্ড পৃথিবীর কোন সমর নায়কের নেই, আলেকজান্ডার, সিজার নেপোলিয়ন, হিটলার কি মন্টগোমারি কারো নেই। তিনি নিরাপদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গৃহে লুকিয়ে থাকা কোন খেতাবী ফিল্ডমার্শাল ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুদ্ধে তুমুল তাণ্ডবের মধ্যেও রণক্ষেত্রে অটল দণ্ডায়মান একজন আসল ফিল্ডমার্শাল। তিনি নিরীহ দরবেশী সমর নায়ক ছিলেন না।

রাসূল [সা] এর সশস্ত্র সংগ্রামকে অন্য দৃষ্টিতে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। এক শ্রেণীর কূপমন্ডক রাসূল [সা]এর সংগ্রামকে রক্তের ইতিহাস বলে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করতে চায়। তারা বলতে চায় ইসলাম এসেছে তরবারীর মাধ্যমে। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সফল বিপ্লব হচ্ছে রাসূল [সা] এর। তাঁর বিপ্লবে মাত্র ৭৫৯ জন কাফের নিহত ও মাত্র ১৫৯ জন মুসলমান শহীদ হন। মহানবী [সা] এর আগমনের পূর্বে একটি উটকে পানি পানের ঘটনায় বনু বকর ও বনু তাগলীব গোত্রের মাঝে প্রায় চল্লিশ বছরের অধিক যুদ্ধ অব্যাহত ছিল।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক গীবনের মতে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। মহানবী [সা] এর শাণিত বিপ্লব সকল প্রকার সন্ত্রাস সংঘাতের মূলোৎপাটন করে।

বিশ্বের বিগত মহাযুদ্ধগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, এতে ৬ কোটি মানব সন্তানকে হত্যা করা হয়। ১৫ কোটি মানুষের বাড়ি ঘর সম্পদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আড়াই কোটি মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিনদেশে যেতে বাধ্য হয়। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য মাওসেতুং চীনে বিরোধী দেড় কোটি কৃষককে হত্যা করেছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য স্ট্যালিন ৫ কোটি মুসলমানকে হত্যা করেছে। জার্মান জাপান যুদ্ধে ৮০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে।

বর্তমান ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মির ও ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের সর্বত্র যে হত্যাযজ্ঞ চলছে তা নিতান্তই কোন বর্বরতা নয়, এ যেন মানব হত্যার এক মহাউৎসব। প্রসঙ্গত বলা যায়, রাসূল [সা] সমর নায়ক হিসেবে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তিনি মানব হত্যার জন্য সংগ্রাম করেননি, বরং মানবতাকে রক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম ছিল সফল ও বিশ্বব্যাপী শান্তির সংগ্রাম। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, "আমি তোমাকে পৃথিবীবাসীর জন্য শান্তির অগ্রদূত হিসেবে প্রেরণ করেছি।"

অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস, অনাচার, অসাম্য ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ আজকের পৃথিবী। মানবতা আজ এক দুর্বিসহ বন্দিদশা অতিক্রম করছে। মানবতার রক্ষকরাই তার ভক্ষকে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় বিপন্ন মানবতার অধিকার আদায়ে বিশ্বে সন্ত্রাস নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবী মুহাম্মাদ [সা] এর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার ন্যায় সুমহান জীবন ধারায় আলোকিত সমাজ, রাষ্ট্র ও শান্তির বিশ্ব গঠন অপরিহার্য দাবি।

সে কাজ করতে হলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ইসলামের রঙে রঙিন হতে হবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে সদা জাগ্রত থাকতে হবে।■

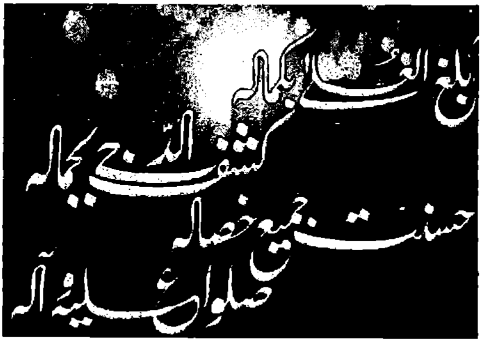

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ [সা]-এর সাথে কোন ব্যক্তির তুলনা চলে না

ফখরুদ্দীন আহমাদ

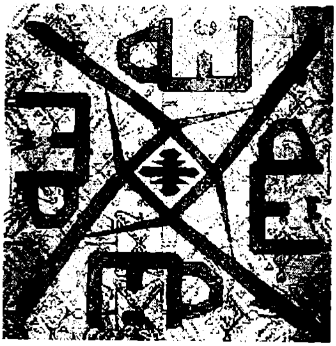

মর্যাদার দিক থেকে মুহাম্মাদ [সা]-এর সাথে কোন ব্যক্তি, বুজর্গ বা অলি তো দূরের কথা কোন নবীরও তুলনা চলে না। আল্লাহর বাণী বাহক হিসেবে নবী-রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মর্যাদাগত পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। মুহাম্মাদ [সা] সকল নবীর [সা] ইমাম বা নেতা। তাঁর মর্যাদা আল্লাহ ছাড়া আর সবার উপরে।

তবে আমলের [কর্মের] ক্ষেত্রে আমাদের আমলটা সঠিক হচ্ছে কি না, তা মুহাম্মাদ [সা]-এর আমলের সঙ্গেই মিলিয়ে দেখতে হবে।

অনেকে বলেন, "মুহাম্মাদ [সা]-এর সাথে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তুলনা চলে না কি?" কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে নিজেদের আমলকে একমাত্র তাঁর আমলের সঙ্গে তুলনা করেই দেখতে হবে যে, তা সঠিক না ভুল।

তিনি যে আমল যেভাবে করেছেন, সে আমল আমরা সে ভাবে করছি কি না, তা তুলনা না করে জানার উপায় কি? আমাদের আমলকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ [সা]-এর আমলের সাথে তুলনা করা শুধু জায়েযই নয় বরং অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই অনুসরণ করতে বলেছেন এবং তাঁকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন।

www.pathagar.com

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর।"

[সূরা আলে ইমরান : ৩১]

"আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

[সূরা আল আহযাব : ২১]

তাই যে কোন আমলই তাঁর আমলের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত। তা নামায হোক, রোযা হোক, জিক্‌র হোক, আচার-ব্যবহার হোক, লেন-দেন হোক, ব্যবসা-বাণিজ্য হোক, বিচার-ফায়সালা হোক, রাষ্ট্র পরিচালনা হোক, যুদ্ধ হোক, যা-ই হোক না কেন। যেমন– রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন,

"নামায সেভাবে পড়, যে ভাবে আমাকে পড়তে দেখ।"

[সহীহ আল বুখারী, মুসনাদে আহমাদ]

আমাদের নামাযকে তাঁর নামাযের সাথে তুলনা করে সংশোধন করা জরুরী। তিনি নামাযের সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের নিয়ে হাত তুলে মুনাযাত করতেন না।

আল্লাহর রাসূলকে [সা] অনুসরণ না করার ফলেই বিদ্‌আত জন্ম লাভ করে একের পর এক। 'মীলাদ' নামক বিদ্‌আত তো এতই প্রচলিত যে, সাধারণ মানুষ এটাকে এখন আলাদা একটা ইবাদাত গণ্য করে। মীলাদকারীরা কি সাহাবীদের [রা] চেয়েও বড় রাসূল প্রেমিক? কোন সাহাবী [রা] কখনো মীলাদ অনুষ্ঠান করেছেন কি?

আজকাল প্রায় প্রতিদিনই বাসা-বাড়িতে মীলাদ হয়। বিশেষভাবে নতুন বাড়িতে ওঠার সময়, নতুন দোকান উদ্বোধনের সময়, বিয়েসাদীর সময়...। মৃত্যু বার্ষিকীতেও মীলাদ মাহফিল হয়! 'মীলাদ' হচ্ছে জন্মদিন। মৃত্যু দিনে জন্মদিন পালন করা হাস্যকর নয় কি? কেউ কেউ মৃত ব্যক্তির লাশ কাফন-দাফনের পরপরই রাসূলুল্লাহর [সা] জন্মোৎসব শুরু করে দেয়। কারো ছেলে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, তিনি মসজিদের ইমাম বা কোন হুজুর ডেকে আনেন মীলাদ পড়াতে। তার ছেলের রোগের সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের জন্মদিনের কী সম্পর্ক? তাছাড়া এই যে প্রতিদিনই মীলাদ হচ্ছে, প্রতিদিনই কি রাসূলুল্লাহর [সা] জন্মদিন?

রাসূলুল্লাহ [সা] যা করেন নি এবং যা করতে বলেন নি, তা বর্জন করতে হবে। আমাদের সকল আমল রাসূল [সা]-এর অনুরূপ হওয়া অত্যাবশ্যক। এর মানে আবার এ নয় যে, তিনি প্রাইভেট কারে চলতেন না তাই প্রাইভেট কারে চলা যাবে না বা তিনি বিমানে চড়েন নি তাই বিমানে চড়া যাবে না বা তিনি অত্যাধুনিক বাড়িতে বাস করেন নি তাই অত্যাধুনিক বাড়িতে বাস করা যাবে না বা তিনি কম্পিউটার ব্যবহার করেন নি তাই কম্পিউটার ব্যবহার করা যাবে না...।

বিদ্‌আতপন্থীরা বিদ্‌আতকে যায়েজ করে নেয়ার উদ্দেশ্যে বলে বেড়ায়, মীলাদ, মাযার, ওরশ, ইত্যাদি যদি বিদ্‌আত [দীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি] হয় তাহলে গাড়ী, বিমান, অট্টালিকা, কম্পিউটার, এগুলোও তো বিদ্‌আত।

তাদের এ যুক্তি যে অযৌক্তিক ও হাস্যকর তা বলাই বাহুল্য। কারণ, ইসলাম মানুষের বৈষয়িক উন্নতি ও অগ্রগতির বিরুদ্ধে নয় বরং পক্ষে। সূরা আল জুমু'আর ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যখন নামায শেষ হয় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর

www.pathagar.com

অনুগ্রহ তালাশ কর।" সাওবান [রা] বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল [সা] বলেন, "কারো যদি বসবাসের একটি বাড়ি থাকে তাহলে ভালো। আর চলাচলের জন্য একটি বাহন [গাড়ী] থাকলে তো আরো ভালো।"

নাফে ইবনে আবদুল হারিস [রা] থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী [সা] বলেন, "কোন ব্যক্তির সৌভাগ্যের নিদর্শন হলো প্রশস্ত বসত-বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বাহন।" [আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৪৫৯]

বিদ্‌আতপন্থীরা বিদ্‌আত নিয়ে যতই আস্ফালন করুক, আমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরায়ে আল্লাহর রাসূলের আমলের দিকে তাকাবো এবং তাঁর আমল অনুসরণ করবো। যেমন–

১. রাসূলুল্লাহ [সা] সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন তাই আমরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবো।

২. তিনি স্বর্ণের জিনিস ব্যবহার করতেন না। আমরাও [পুরুষরা] স্বর্ণের জিনিস ব্যবহার করবো না।

৩. তিনি বেশি বেশি দান করতেন। আমাদেরও বেশি বেশি দান করা উচিত।

৪. তিনি উচ্চস্বরে হাসতেন না। আমাদেরও হা হা করে হাসা উচিত নয়।

৫. তিনি স্ত্রীর কাজে সাহায্য করতেন। আমাদেরও স্ত্রীর কাজে সাহায্য করা উচিত।

৬. তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। আমাদের মধ্যেও লজ্জা-শরম থাকা দরকার।

৭. তিনি দাড়ি বড় করতেন, গোঁফ ছোট করতেন, আমরা কি তা করি?

৮. তিনি সুদ খেতেন না, সুদ দিতেন না। আমরা সুদী লেন-দেন বর্জন করছি কি?

৯. তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। আমাদের দেশেও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা জরুরী।

১০. ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর ওপর বাধা এসেছে, আঘাত এসেছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করলে আমাদের ওপরও বাধা আসবে, আঘাত আসবে।

আল্লাহর রাসূল [সা] ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রচণ্ড বাধার মুখে পড়লে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই পূর্বের রাসূলদের [আ] তুলনা দিয়ে বলেন, "হে রাসূল! দৃঢ়চেতা রাসূলদের ন্যায় ধৈর্যধারণ কর।" [সূরা আল আহ্‌কাফ : ৩৫]

তাছাড়া সাহাবীগণ [রা] যখন কাফির মুশরিকদের দ্বারা ব্যাপক মার খাচ্ছিলেন তখন তাঁরা যাতে শত যুল্‌ম-নির্যাতনের পরও দীনের পথে অবিচল থাকতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল [সা] পূর্ববর্তী ত্যাগী ঈমানদার লোকদের উপমা তুলে ধরে বলেন " তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের কারো জন্য জমিনে গর্ত খোঁড়া হতো, তার মধ্যে শরীরের অর্ধাংশ পুঁতে মাথার ওপর করাত রেখে দুই ভাগ করে ফেলা হতো তারপরও তাকে দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। কারো শরীর লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস তুলে নেয়া হতো তবু তাকে দীন থেকে সরাতে পারতো না...।" [সহীহ আল বুখারী]

ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করায় আল্লাহর রাসূল [সা] এবং তাঁর সাহাবীদের [রা] ওপর বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা এসেছে, আঘাত এসেছে। এখনও ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসবে, আঘাত আসবে, এটাই স্বাভাবিক।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, কেউ কেউ সুবিধাজনক ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের [সা] সঙ্গেই তুলনা দেন। যেমন–

১. আল্লাহর রাসূল মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন।

২. তিনি খাওয়ার সময় সালাম দিতেন না এবং সালামের জবাবও দিতেন না।

৩. কেউ খাওয়ার দাওয়াত দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, এমন কি অমুসলিম হলেও।

৪. আল্লাহর রাসূল হাদিয়া গ্রহণ করতেন, ইত্যাদি।

মূলকথায় ফিরে আসি। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আমাদের আমলের তুলনা। তাঁর আমলের সঙ্গে তুলনা করিনা বলেই আজ আমরা বিভ্রান্ত। পীর, ফকীর, বুজর্গ, মুরব্বী, অলি, গাউস, কুতুব, বাবাজান, কেবলাজান ইত্যাদি ছদ্মাবরণে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে আমাদের বিভ্রান্ত করছে। এরা একেকজন একেক রকম তরীকা [পন্থা, পদ্ধতি] উদ্ভাবন করেছেন। চোখের সামনে আল্লাহর রাসূলের সহজ সঠিক ও স্পষ্ট তরীকা থাকা সত্ত্বেও এদের ভুল তরীকার দিকে আমরা কেন তাকাবো?

আল্লাহর রাসূলের তরীকা হচ্ছে :

১. তিনি মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র মালিক, প্রভু, উপাস্য, হুকুমদাতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীরূপে বিশ্বাস করার আহ্বান জানিয়েছেন।

২. তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা ঈমান আনেন, তাঁদের সমন্বয়ে তিনি একটি জামায়াত গড়ে তুলেছেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত দীন [জীবন-বিধান বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা] উৎখাত করে তাঁর দেয়া দীন কায়েমের নির্দেশ দেয়ায় রাসূল [সা] সাহাবীদের [রা] নিয়ে মদীনায় আল্লাহর দীন কায়েম করেছেন।

এই তিনটিই আল্লাহর রাসূলের মৌলিক তরীকা। তৃতীয় তরীকার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূল [সা] সাহাবীদের [রা] নিয়ে মদীনায় কি উপায়ে দীন কায়েম করেছেন? এর একটিই উত্তর : মদীনার লোকদের মধ্যে ইসলামী আইনের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে।

সবশেষ কথা হচ্ছে, আমাদের যে সব আমল আল্লাহর রাসূলের [সা] আমলের অনুরূপ নয় তা বর্জন করতে হবে এবং তিনি যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে, যেমন–

"জাবির [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] কবরে চুনকাম করতে বা কবরের ওপর ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।" [সহীহ মুসলিম]

তাহলে যারা আল্লাহর রাসূলের নিষেধ অমান্য করে কোন ব্যক্তি, পীর বা অলির কবরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন, তাদেরকে আশেকে রাসূল বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোক বলা যায় কি?■

www.pathagar.com

হে প্রিয় রাসূল ॥ আতিক হেলাল

আমাদের চার পাশে
শয়তান শুধু হাসে
বেড়ে চলে আমাদের
মিথ্যা ও ভুল।
কিভাবে যে পার পাবো
হে প্রিয় রাসূল!

আমাদের দেহ-মনে
শয়তান বাসা বোনে
নিভৃতে ফোটায় সে
বিষাক্ত হুল।
কিভাবে যে পার পাবো
হে প্রিয় রাসূল!

আমাদের পথে-ঘাটে
শয়তান সাথে হাঁটে
ভুলি তাই আদর্শ,
নিশানা ও কূল।
কিভাবে যে পার পাবো
হে প্রিয় রাসূল!

আমাদের বাড়ি-ঘরে
শয়তান খেলা করে
নড়বড়ে হয়ে গেছে
শিকড় বা মূল।
কিভাবে যে পার পাবো
হে প্রিয় রাসূল!

www.pathagar.com

তুমি যদি আমার হতে ॥ সো হ রা ব আ সা দ

তুমি যদি আমার হতে–
সাগর সাগর ডাগর নয়ন ঝরতো বারি,
কিংবা যদি হোস্নাগলা তুষার হতে
তপ্তনিলয় হিমেল হতো শোক বিদারি।
যদি হতাম ঐ চরণে হীরের নূপুর
গুলমেহেরের কপোল ছোঁয়া দীপ্ত দুপুর
মেশকপ্লাবী স্বেদকণিকা আমার সিনায়
পড়তো যেমন শিশির ঝরে টাপুর টুপুর।

এই শোনোনা বক্রকেশী পটল আঁখি
চাঁদের পরাগ গোলাপঠুটো ক্ষনিক তাকাও
ছন্নছাড়া এই পোড়াচোখ কোথায় রাখি,
দেখলে বারেক মন ভরে কী আর কিছুতে?
তুমি যদি আমার হতে।

মন ছুটে যায় নূরের যুগল কদম ছুঁতে
শুক্লা চাঁদের শুভ্র আনন হয়কি মলিন
একটু ছুঁলে বদ্ধপাপী এই কালোতে,
তুমি যদি আমার হতে!

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর আরব দেশে ॥ ন জ রু ল ই স লা ম শা ন্ত

আবে জমজম, আবে জমজম
তোমার কদর সারা জাহান,
নিখিল-ভুবন মাতোয়ারা
তাওহীদ ও রাসূলের শান।

আরব সাগর হর্ষে দোলে
কাঁদে সাহারা ভূমি,
তৃষ্ণা মেটাও মিষ্টি জলে
বেহেস্তি নহর তুমি;
বিশ্বনবীর আরব দেশে
নেই যে তোমার অবসান।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে
ভাসে নবীর তেলাওয়াত,
সেই, পাক কালাম আজ বিকশিত
হয়ে কতো শাহাদাত;
বিশ্ব নবীর উম্মতেরা
তোমার পানি করে পান।

তোমায় পেয়ে প্রাণ পেলো যে
আরবের জনগণে,
ইবরাহীম ও ইসমাঈল এর
নাম জপে তনুমনে,
আমার নবীর মরুর দেশে
নহর তুমি খোদার দান।

www.pathagar.com

হেরার আলো ॥ জা হি দ আ বে দী ন

রাসূলকে [সা] নিবেদিত কবিতা

হেরা হতে আলোর দীপ্তি
ছড়িয়ে বিশ্বময়
আঁধার রাতের বাধার প্রাচির
পেরিয়ে সংশয়,
মাজলুমানের আর্তনাদ
আহাজারির ভিড়ে
শুনিয়ে প্রভুর মুক্তি বাণী
শান্তি আনলে ফিরে,
খোদার দেওয়া সেরা উপহার
বাদশা দো'জাহান
শিখালে মোদের ভ্রাতৃ, সাম্য
সাজাতে গুলশান।

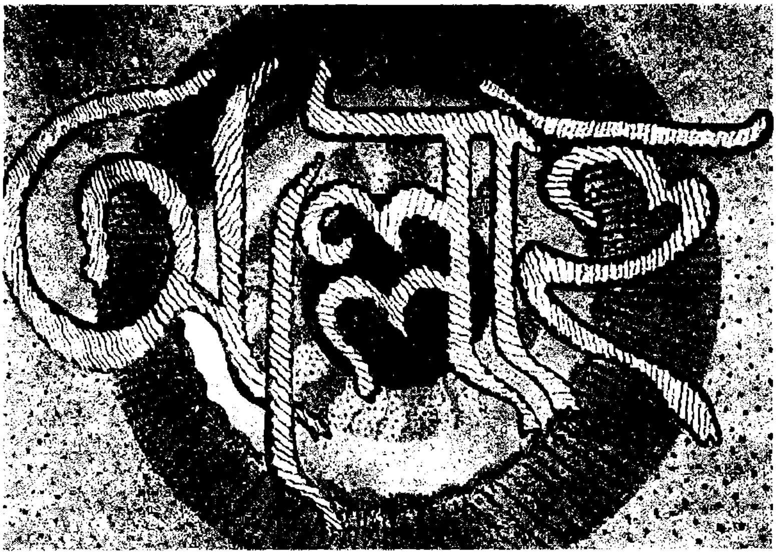

www.pathagar.com

সালমান ফারসী ॥ জ্যা স মি ন কা ন ন

বিশাল মরুপ্রান্তর
ঝরনার ধারে খর্জুর বন
খোলা আসমান
দেখে দু'চোখ ভরে
করে সত্য সন্ধান
সালমান !

সুরমা খচিত কালো রাতের মত সাইমুম ঝড়ে
যেথা পথ হারিয়ে ফেলে,
দূর যাত্রী কাফেলা ধূ ধূ বালুকার 'পরে
প্রখর রোদে, অস্থির বিহ্বলে
সেথা লইতে আসে সত্য সন্ধান
সালমান !
গীর্জার পুরোহিতের পোশাকে
লুকিয়ে ফিরে সিরিয়ার পথে
দামেশ্‌ক শহরে সুবেহ্-সাদেকে,
রেখে আত্মীয় পরিজন, অগ্নিপূজা
করে সত্য সন্ধান
সালমান !

কাটিল সহসা বিভীষিকাময় দিন!
মহা সৌভাগ্য রওয়ানা দিলেন মদীনার পথে
আনন্দ আর উত্তেজনায়
দেখিলেন, নব দীক্ষিত মুসলিম সবি মরুপথে
সম্ভাষণ জানাতে করিছে সত্য দিশারীর সন্ধান
সালমান !
জুড়িয়ে গেল চোখ, দুর্লভ লালিত স্বপ্ন আজি সত্য
এক জ্যোর্তিময় নূরের ধন্য নিখিল সত্য।
বুহিরা, যাকারিয়া তারই উপর ঈমান এনে
তোমাকে দিয়েছে সত্য সন্ধান
সালমান।

www.pathagar.com

হিজরতের প্রতিচ্ছবি

শহীদুল ইসলাম

নবুয়্যতের ত্রয়োদশ বছর। কওমকে হেদায়েতের পথে তুলে আনার জন্যে, দীনের কথা বোঝানোর জন্যে প্রিয় নবী [সা]-এর চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু নবুয়্যতের প্রথমদিনই কুরাইশরা নবীজীকে যেমন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, আজো তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্যে মুহাম্মদ [সা]-কে সমানে গালি দিচ্ছে। নিজ বংশ বনী হাশেম ও কুরাইশই তাঁর সবচেয়ে বড় দুশমন, এরাই তাঁকে অযথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। যে কুরাইশ ছেলেরা মুহাম্মদ [সা]-কে 'আল-আমীন' বলে ডাকতো এরাই আজ আল-আমীনের গায়ে পাথর মারে। তাঁর চলার পথে ময়লা, আবর্জনা, কাঁটা বিছিয়ে রাখে। পাগল, লাত-হুবালের দুশমন ইত্যাদি বলে তিরস্কার করে। এরাতো সবাই স্ববংশীয় কুরাইশ-বনী হাশেম গোত্রেরই লোক। এতো কিছু করেও এদের দুশমনী শেষ হলো না।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে এসে তাদের ক্রোধ-হিংসা চরম আকার ধারণ করল। কারণ, তখন মুহাম্মদ [সা]-এর পৃষ্ঠপোষক প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিব আর বেঁচে নেই। সুখ-দুঃখের একান্ত সঙ্গিনী, বিপদের সান্ত না, হৃদয়-সম্পদ উজাড় করে অহর্নিশ ছায়ার মতো অনুগামী, প্রিয়সহধর্মিনী, মহীয়সী খাদিজাতুল কুবরাও জান্নাতবাসী হয়েছেন।

www.pathagar.com

ঘরে মা-হারা ফাতিমা রা.-কে দেখে কেঁদে ওঠে নবী হৃদয়। আর ঘর থেকে বের হলে নরপশুরা বর্ষণ করে পাথর বৃষ্টি। "লাসতা মুরসালান, লাস্‌তা মুরসালান" -'তুমি নবী নও, তুমি রসূল নও' ইত্যাদি বলে চিৎকার করে। কাফেরদের এই কটুক্তিতে ব্যথায় ভরে ওঠে নবীজীর মন। দাওয়াত কবুলের আশা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় কাফেরদের এসব উচ্চারণ। কেউ তাকে উপহাস করে বলে, হে মুহাম্মদ! তোমাকে হত্যা করার জন্যে একটি উন্নত তরবারি কিনেছি, আবার কোনো দুরাচার বলে ওঠে, 'হে আহমদ! তোমাকে বধ করতে আমি একটা তেজী ঘোড়া ক্রয় করেছি! তবে কাফেরদের নির্যাতনে নবীজী [সা] কষ্ট পেয়েছেন ঠিকই; কিন্তু হতাশাগ্রস্ত হয়নি। এদের জন্যে বদদুআ করেননি কোনো দিন।

কুরাইশদের এ শত্রুতার অন্যতম কারণ ছিল এরা বুঝতে পেরেছিল, আমরা যত দুশমনিই করি না কেন, তারপরও মক্কার বহু কৃতিপুরুষ মুহাম্মদ [সা]-এর দলে ভিড়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন তাঁর সমর্থকের সংখ্যা বাড়ছে। একদল আত্মত্যাগী সাহসীও প্রভাবশালী লোক মুহাম্মদ [সা]-এর কল্যাণার্থে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। ১৮ বছরের বাহাদুর যুবক আলী [রা] যুলফিকার নিয়ে রাত-দিন তাকে পাহারা দেয়। আবু বকর [রা]-এর মত সম্পদশালী, জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞব্যক্তি ইসলামের স্বার্থে বৃষ্টির মত ঢেলে দেয় দিনার-দিরহাম। বীর পাহলোয়ান উমর [রা] মুহাম্মদ [সা]-এর আত্মরক্ষায় নিজের বুক পেতে দেয় সবার আগে। মহাবীর চাচা হামযা [রা] তার সাথে লেগেই থাকে সারাদিন। এছাড়া উসমান [রা], জাফর [রা] সহ মক্কার এমন আরো চারশ' প্রবীণ-তরুণ এবং তায়েফ ও মক্কার উপকণ্ঠে আরও প্রায় এক হাজার অধিবাসী মুহাম্মদ [সা]-এর দাওয়াত গ্রহণ করে তাওহীদের ওপর বিশ্বাস এনেছে। ওদিকে ইয়াসরিবের [মদীনার] ছোট-বড়, খ্যাত-অখ্যাত বলতে গেলে সব লোকই মুহাম্মদ [সা]-এর ভক্ত তাঁর কথায় খুব বেশি প্রভাবিত ও গভীর আস্থাশীল। এখনো যদি তাঁকে প্রতিরোধ করা না হয় তা হলে আমাদের তিয়াত্তর কাতারে ফেলে সে বাজিমাত করবে। আর ইয়াসরিবের লোকদের সাথে তাঁর যে দহরম-মহরম চলছে তাতে যে কোনো সময় সোনার হরিণ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল হয়ে উঠেছে। কাজেই কোনোভাবেই তাঁকে মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। তাহলে সে তাঁর যাদুমাখা বক্তৃতা আর কবিতা [কুরআন] শুনিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই জগতের মানুষকে ভক্ত বানিয়ে ফেলেবে। তারপর বিশাল বাহিনী সাজিয়ে সুযোগমত আমাদের ওপর যে আঘাত হানবে না সে গ্যারান্টি কে দেবে? কাজেই আর কালবিলম্ব করা চলবে না। এ সমস্যা এখনই চুকিয়ে ফেলতে হবে।

এদিকে রাসূল [সা]-এর নিকট কুরাইশদের এ ষড়যন্ত্রের কথা পৌছে গেল। নবীজী [সা] ও সাহাবীদের হিজরতের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। প্রতিদিন এক-দু'জন সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে যাচ্ছেন। কোনো কোনো সাহাবী আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বদেশ ত্যাগ করার চেয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দিন আমরা দুশমনদের ঘাড় ভেঙ্গে দেই।' তাদের এ কথার জবাবে রাসূল [সা] বললেন, 'নিঃসন্দেহে তোমরা সাহস রাখো এদের সাথে লড়তে। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে 'রাহমাতুললিল আলামীন' করে

www.pathagar.com

পাঠিয়েছেন। আমার ইচ্ছা হয় না, নিজ গোত্র-আত্মীয়দের সাথে লড়াই করতে। এর চেয়ে বরং দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো।'

'কিন্তু কি করে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব। বরং আপনার পরিবার-পরিজনসহ আমরা সবাই একিদিনে মক্কা ত্যাগ করে চলে গেলে কেমন হয়?'– বলেন সাহাবায়ে কিরাম।

'তোমাদের সাথে প্রকাশ্যে আমার যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। এভাবে যেতে দেখলে কুরাইশরা আমাদের ওপর চড়াও হবে। হেরেমে কাবাতে এমন রক্তপাত হোক, এ বেয়াদবি আমরা করতে পারি না। আর নিজ কওমের দুর্নাম ছড়াতেও আমি চাই না। কারণ 'ইন্নাকা লা 'আলা 'কুলুকিন আযীম' আপনি শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী' –তা আমার পরিচয়। তোমরা আল্লাহ, রসূলের নির্দেশে ঠাণ্ডা মাথা?" মক্কা ছেড়ে চলে যাও। এরপর অনেকেই মদীনা চলে গেলেন। তবে সকলের শেষে ওমর রা. প্রকাশ্যে দিনের বেলায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে স্বদেশভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় রওয়ানা হলেন।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর। মক্কার মিলনায়তন 'দারুন্ নাদওয়ায়' প্রতিদিনের মত আজও কাফেরদের বৈঠক বসেছে। শয়তান শায়খে নজদীর বেশ ধরে বৈঠকের সভাপতি একে একে কুরাইশ নেতৃবর্গ বক্তব্য রাখলো। অবশেষে সভাপতি হিসেবে শয়তান সিদ্ধান্ত দিলো, মুহাম্মদ [সা]-কে হত্যা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। যেই কথা সেই কাজ। সাথে সাথে আবু জাহেল ঘোষণা দিল, 'একক কোনো গোত্র মুহাম্মদকে হত্যা করলে হয়তো গোত্র কলহ দেখা দিতে পারে। কাজেই প্রত্যেক গোত্রের শক্তিশালী যুবকদের একটি দল সম্মিলিতভাবে আজ রাতেই মুহাম্মদ স.-কে হত্যা করবে।'

কাফেরদের চক্রান্ত হযরত জিব্রাইল আমীন রাসূল [সা]-কে জানিয়ে দিলেন জিব্রাইল বললেন, 'মুহাম্মদ! কাফেররা আপনাকে বন্দী করে রাখবে অথবা হত্যা করবে অথবা আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। এরা চক্রান্তের জাল বুনেছে, আল্লাহ তাআলাও কৌশল করেছেন যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সুকৌশলী।' জিব্রাঈল আ. আরো বললেন, 'হে নবী! আপনি সমুদ্র উপকূল ঘেঁষে 'কেনসারুন' শহর হয়ে সফরের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন,তা পরিবর্তন করে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন আপনাকে সোজা মদীনা চলে যাওযার জন্যে।' অত:পর আরো কিছু দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে জিবরাঈল আ চলে গেলেন।

হযরত আলী [রা]-কে সাথে নিয়ে মহানবী কাবা প্রাঙ্গণ থেকে বাড়ি আসার পথে দেখলেন, আবু জাহেলের নেতৃত্বে একদল কাফের বিজলী চমকানো নেজা-তলোয়ার নিয়ে রাস্তার মোড়ে টহল দিচ্ছে। নবীজী [সা]-কে দেখে পিশাচ আবু জাহেল বলে উঠলো, এইতো মুহাম্মদ! যে বলে বেড়ায়, 'তোমরা যদি আমার কথায় ঈমান আন, তাহলে আখেরাতে মর্যাদা ও জান্নাত পাবে; অন্যথায় তলোয়ারের আঘাতে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, আর জাহান্নাম হবে তোমাদের ঠিকানা।'

'হ্যাঁ! আমি যা বলি তা সত্য; অবশ্যই একদিন প্রতিফলিত হবে আমার কথা। নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের আস্তাকুঁড়ে।' দৃঢ়কণ্ঠে একথা বলে নবীজী [সা] বাড়ি চলে এলেন। বাড়ি এসে আলী [রা]-কে বললেন, 'আলী! আজ রাতেই আমাকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তুমি আমার বিছানায় শুয়ে থাকবে। ভয় নেই! কাফেররা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' আলী বললেন, 'এ আমার চরম সৌভাগ্য।' ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জীবনের ভয় করি না। আপনি সুখে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন।' পাশ থেকে ফাতিমা [রা] সব কথা শুনে ভয়ে-শংকায় তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠলো। তার দু'চোখ গড়িয়ে পড়লো অশ্রুধারা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আব্বাজান, এ অভাগা মেয়েকে আপনি কোথায় ফেলে যাচ্ছেন?' রাসূল [সা] বললেন, 'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না মা! আলী ও তোমার সৎমা সাওদা তোমার কাছেই থাকবে।'

'আব্বাজান! আপনাকে ছাড়া আমি কিভাবে থাকব?' বললেন ফাতিমা! নবীজী জবাব দেন, 'তোমাদের বিরহ ব্যথা আমাকেও বিচলিত করে তুলছে মা! তবে খুব তাড়াতাড়ি তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে। কান্নাকাটি করো না, জেনে রাখ, বিচ্ছেদ ছাড়া প্রকৃত মিলনের আনন্দ উপভোগ ও উপলব্ধি করা যায় না।'

১২ই সেপ্টেম্বর। ২৭শে সফরের অন্ধকার রাত। তারকারাজিও যেন লজ্জায় মেঘের কোলে লুকাতে চাচ্ছে। নিকষ কালো আঁধারে জগতময় থমথমে ভাব। প্রায় মধ্যরাত। নবীজী [সা] বিছানা ছেড়ে ওঠে অজু বানিয়ে আলী [রা]-কে ডাকলেন। কতিপয় লোকের নাম উচ্চারণ করে বললেন, আমার কাছে আমানত রাখা এ মাল সম্পদগুলো তুমি তাদের কাছে পৌছে দিও। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি দরজা বন্ধ করে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ো।

নবীয়ে দু'জাহাঁ [সা] দরজা খুলে বেরিয়ে দেখলেন, ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত কাফের দল তাঁর ঘরের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে। কি আশ্চর্য! ওরা সব যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন! তিনি একমুষ্টি ধুলো হাতে তুলে সূরায়ে ইয়াসীনের ক'টি আয়াত পাঠ করে শত্রুদের প্রতি ছুঁড়ে মারলেন। আল্লাহর নির্দেশে প্রতিটি কাফেরের চোখে গিয়ে বিধল তার নিক্ষিপ্ত বালু কণা। আল কুরআনে এ বিষয়টিকে আল্লাহ তাআলা এভাবে তুলে ধরেছেন :"আর [আপনি যখন বালু নিক্ষেপ করছিলেন], তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহর কুদরতি হাতই নিক্ষেপ করেছিল।" কাফের দল অন্ধের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। নবীজী [সা] এদের বেষ্টনী ভেদ করে সোজা আবু বকর [রা]-এর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন।

আবু বকর [রা] তখনও তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান। তিনি নবীজীকে ঘরের পিছনের দরজা খুলে ভেতরে বসালেন। ব্যস্ত নিঃশ্বাস নিয়ে মহানবী [সা] বললেন, 'আবু বকর! এক্ষুণি আমাদের রওয়ানা করতে হবে।' সৃষ্টির সেরা, মানবতার নবী, সাইয়্যেদুল মুরসালীন [সা]-কে রাতের আঁধারে পিছনের খিড়কি দিয়ে বিদায় জানালো আবু বকর রা. পরিবার। তাঁরা মোনাজাত করছিলেন, "হে প্রভু! রাসূল [সা]-কে তুমি হিফাজত করো। সমূহ বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করো। তাঁর কোনো অমঙ্গল করো না তুমি।"

www.pathagar.com

আবু বকর [রা]-এর ঘর থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে "গারে সাউর"। জনপদ ছেড়ে আবু বকর [রা] রাসূল [সা]-কে নিয়ে বিজন পথে হাঁটতে লাগলেন। ধারালো মরু কাঁকরের আঘাতে আর কাঁটাযুক্ত লতাগুল্মো পেঁচিয়ে নবীজীর স্বাভাবিক পথ চলা বারবার ব্যাহত হচ্ছিল। বারবার হোঁচট খেয়ে তিনি পাথরের ওপর পড়ে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পথ চলায় আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলো নবীজীর পদদ্বয় মোবারক। মহাবিপদের একান্ত সাথী সিদ্দিকে আকবর [রা] এ সময় রাসূলে আকরাম [সা]-কে নিজের পিঠে তুলে নিলেন। রসূলকে পিঠে তুলে এ কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে অতিকষ্টে তিনি "গারে সাউর" পর্যন্ত পৌছুলেন। তখন পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে ওঠেছে। কাঁটা ও পাথরের আঘাতে আবু বকর [রা]-এর পা থেকে দর দর করে রক্ত ঝরছে। কিন্তু এদিকে তার কোনোই ভ্রুক্ষেপ নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা পরিষ্কার করে নিজের চাদর টুকরো টুকরো করে গর্তগুলো বন্ধ করে নবীজী [সা]-কে ভেতরে ডেকে নিজের উরুর ওপর কাত করে শুইয়ে দিলেন সিদ্দিকে আকবর। একটি ছিদ্র যা খোলা ছিল সেটি ছিল পায়ের গোড়ালি দিয়ে চেপে রাখলেন যেন এর ভিতরের সাপ-বিচ্ছু বেরুতে না পারে। চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় গুহাভিমুখে তাকিয়ে রইলেন আবু বকর [রা]। প্রিয় সঙ্গীর উরুতে মাথা রাখাবস্থায়, দুর্গম পথের ক্লান্তি রসূল [সা]-এর চোখে তন্দ্রা নিয়ে এলো। এমন সময় গর্ত চেপে রাখা পায়ে সর্পদংশনে অসহ্য ব্যথায় নবী সঙ্গীর এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো রসূল [সা]-এর বদন মোবারকে। নবীজী [সা] চোখ মেলে দেখলেন' আবু বকর [রা]-এর সর্বাঙ্গ বিষে কালো হয়ে গেছে। তারপরও তিনি রসূল [সা]-এর আরামে আঘাত হয় এ আশংকায় একচুলও নড়েননি। রসূল [সা] দু'আ পড়ে ক্ষত স্থানে পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন আবু বকর [রা]।

ঘর ছেড়ে নবীজী [সা] চলে আসার একটু পরেই শয়তান এসে কাফেরদের হাঁকদিলো, ওহে আহমকের দল! তোরা বসে কি করসিছ! মুহাম্মদ তো তোদের চোখে ধুলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কাফের দল চোখে মুখে হাত কচলিয়ে দেখলো, ঠিকইতো বলছে বুড়ো! কিন্তু উঁকি দিয়ে ঘরে একজনকে শোয়া দেখতে পেয়ে আর তেমন আমল দিল না তারা বুড়ো কথায়। সকাল বেলা নবীজীর বিছানায় হযরত আলী [রা]-কে পেয়ে চরম বিস্ময়ের সাথে কাফেররা হযরত আলী [রা]-কে বললো– বল, মুহাম্মদ কোথায়? আলী [রা.] স্বচ্ছেদে বললেন, তোমরা কি আমাকে পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলে? আমি কি জানি? তোমরাই পাহারা দিলে রাতভর।' আবু জাহেল এসে বললো– ওহে নির্বোধের দল! তোমরা ব্যর্থ হয়ে একে শুধু ধমকাচ্ছো। দিকে দিকে ছুটে যাও, কোথায় পালিয়েছে খুঁজে বের করা চাই। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর সারা মক্কা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, মুহাম্মদ স. মককা ছেড়ে চলে গেছে। তাঁকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে ঘোষিত হলো আকর্ষণীয় নানা পুরস্কার। পুরস্কার লোভী কাফেররা চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। একদল কাফের 'গারে সাউর'-এর কাছে গিয়ে বললো, 'রাতের বেলায় ওরা আর বেশি দূর যেতে পারেনি। হয়ত এই গুহায় মধ্যেই ওরা লুকিয়ে আছে। এ গুহায়ই তাদের পাওয়া যাবে।'

আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প সময়ের মধ্যে মাকড়সা জাল বানিয়ে গর্তের মুখ ঢেকে দিয়েছিলো।

www.pathagar.com

আর একটি কবুতর এসে ডিম পেড়ে তাতে তা দিচ্ছিল। দলের অন্যরা তাকে ধমক দিয়ে বললো, 'দেখতে পাচ্ছো না গর্তের মুখে মাকড়সা জাল বানিয়ে রেখেছে, আর কবুতর ডিমে তা দিচ্ছে? মানুষ ঢুকলে মাকড়সার জাল থাকতো নাকি? আর কবুতর বুঝি বাসা বানাতো মানুষের মাথার ওপর?' অন্য একজন চেঁচিয়ে বললো, 'আমি মুহাম্মদ [সা]-এর জন্মের আগ থেকে এ গর্তটিকে এমনই দেখছি। চলো এখানে সময় নষ্ট না করে অন্য দিকে খুঁজি।' এ সময় আবু বকর [রা] গর্ত থেকে কাফেরদের কথোপকথন শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নবীজীকে বললেন, "ওরা যদি আমাদের দেখে ফেলে।" মহানবী [সা] তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ভর করো না আবু বকর! আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন।"

১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রসূল [সা] ও আবু বকর 'গারে সাউরে' অবস্থান করলেন। রাতের বেলায় সুযোগমত উভয়ে বেরিয়ে আসতেন ক্ষণিকের জন্যে। আবু বকর [রা]-এর আযাদ গোলাম আমের বিন জুহাইরা ছাগল চরানোর ভান করে পাহারাদারীর কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। আর তাঁদের আহারের জন্যে বকরীর দুধের ব্যবস্থা করতেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর [রা] দৃশ্যত কাফেরদের সাথে উঠাবসা করে তাদের গতিবিধি ও কবরাখবর রাতে নবীজী [সা]-কে অবহিত করতেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর ১লা রবিউল আউয়াল, রবিবার। শুক্লপক্ষের চাঁদ ক্ষণিকের জন্যে উদিত হয়ে আঁধারে তলিয়ে গেছে। পাহাড়গুলো নীরব নিঃস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। নীল আকাশের তারাগুলো যেন ঝুঁকে পড়ছে 'গারে সাউরে'। 'গারে সাউরের' কাছে হাওদা সাজানো চারটি উট জাবর কাটছে। কাতারের প্রথম উঠটি হলো আমের বিন ফুহাইরার [রা]। যিনি আঁধার রাতে রাসূল [সা]-এর সফর সঙ্গী। দ্বিতীয় উটটি আব্দুল্লাহ বিন দাইলামী রা.-এর, যিনি এ কাফেলার রাহবার। তৃতীয় উটটি নবীজী [সা]-এর হিজরতের সময় সওয়ার হওয়ার জন্য চারশত দিরহামের বিনিময়ে আবু বকর [রা] খরিদ করেছেন কিছুদিন আগে। গুহা থেকে মাত্র চার গজ দূরে সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আবৃত এক ভাগ্যবতী বালিকা একটি পুঁটলি হাতে দাঁড়িয়ে। নাম তাঁর আসমা।

'মা আসমা! খাবারের পুঁটলিটা দাও, আমার হাওদার সাথে বেঁধে নেই'– বললেন আবু বকর [রা] আসমা [রা] এগিয়ে পিতার হাতে পুঁটলিটা তুলে দিলেন। 'বেটি! পাথেয় তো আনলে, কিন্তু এটি বাঁধার জন্যে তো কোন রশি আননি।' একথা শুনে আসমা একটি বালিয়াড়ির আড়ালে গিয়ে নিজ পরিধেয় কাপড়ের নিম্নাংশ ছিঁড়ে এনে দিলেন তাঁর আব্বার হাতে। তা-ই রশি বানিয়ে আবু বকর খাদ্যের পুটলিটা উটের হাওদার সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নিলেন। নবীয়ে দু'জাহা এদৃশ্য অবলোকন করে বললেন, 'আবু বকর [রা]-এর পরিবার তাঁদের নবী [সা]-এর জন্যে যে অবর্ণনীয় সেবা করেছে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।'

'[আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক] ইয়া রাসূলাল্লাহ [সা]! আপনার বিরহ যে কত বেদনাবিধূর তা বুঝাতে পারব না।' এই বলে আসমা ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বেটি কেঁদে কেঁদে নিজেদেরকে দুর্বল করে ফেলো না, অচিরেই তোমাদের সাথে আমরা মিলিত হবো, ইনশাআল্লাহ।' আসমা [রা]-কে সান্ত্বনা দিয়ে দুআ পড়ে

www.pathagar.com

নবীজী [সা] কাসওয়াতে আরোহণ করলেন, অতঃপর রাহবার আবদুল্লাহ বিন আরিকাত দাইলামী [রা] পথ দেখানোর জন্যে তাঁর উটকে আগে বাড়িয়ে সফর শুরু করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল 'গায়ে সাউরের' সেই ছোট্ট জান্নাতী কাফেলা।

শত্রুর শ্যেণ দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে রাহবার আবদুল্লাহ [রা] নববী কাফেলাকে সমুদ্র উপকূলের জনপদ ছেড়ে অচেনা ও দুর্গম পথ দিয়ে মদীনায় নিয়ে চললেন। দৃষ্টি তাঁর অত্যন্ত সতর্ক। তাঁর এক হাতে তরবারি অন্য হাতে উটের লাগাম। পিছনে নবীজী [সা]-এর উঠনি 'কাস্ওয়া'। এরপর হযরত আবু বকর [রা]। সবার পিছনে শেরদিল আমের বিন ফুহাইরা [রা]। একটানা ১৪ দিন চললো এই কাফেলা। পথে কত বিপদ দুঃখ কষ্ট যে তাদের বরণ করতে হয়েছে তা সবিস্তারে এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়। জনমানবহীন এলাকা দিয়ে অগ্রসর হলেও এক পথিকের কাছে সন্ধান পেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সুরাকা বিন মালেক এসে হাজির হয়েছে নবীজী [সা]-কে ধরে নেয়ার জন্যে। কিন্তু কাছাকাছি পৌছালে আকস্মিকভাবে তার ঘোড়ার পা শক্ত মাটিতে ধসে গেল। সে নবীজী [সা]-এর কাছে ক্ষমা চাইল এবং অঙ্গীকার করল যে, কোনো কাফেরকে সে একাফেলার সন্ধান দিবে না। ফলশ্রুতিতে রাসূল [সা]-এর দূআর বরকতে সুরাকা তার ঘোড়া বালি থেকে তুলে সোজা মক্কার পথে চলে আসে এবং অন্য যারা খুঁজছিলো তাদেরকেও একথা বলে ফিরিয়ে দেয় যে, আমি এ পথে দেখে এসেছি, তোমরা অন্য দিকে খোঁজ কর।

একদিন চরম ক্ষুধা ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কাফেলা নিয়ে নবীজী উম্মে মা'বদ নামক এক মহিলার বাড়িতে উঠলেন। কিন্তু মহিলা অত্যন্ত অতিথি বৎসল হলেও তখন তাঁর ঘরে কোনো আহার এবং দুধালো বকরী ছিল না। কিন্তু নবীজী [সা] তাঁর একটি দুর্বল-শীর্ণকায় বকরীর উলানে হাত দেয়া মাত্রই তা হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে দুধে ভরে গেল। নবীজী [সা] তা থেকে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে উম্মে মা'বাদের ঘরে রেখে আসেন পরশমণির ছোঁয়া।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে ১৪ দিন পর রসূল স. মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌছালেন। পথে যদিও কষ্ট অনুভব হয়েছিলো কিন্তু যখন মদীনার সুবিন্যস্ত বাড়ি-ঘর ও খেজুর বাগানের নৈসর্গিক দৃশ্য চোখে পড়ল তখন মহানবীর প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সকল ক্লান্তি ও দু:খ তিনি ভুলে গেলেন। এদিকে মক্কা থেকে রওয়ানা হবার পর পরই মদীনায় খবর পৌছে গিয়েছিল যে, রাসূল [সা] মদীনায় আসছেন। তারপর থেকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনকারীরা প্রতিদিন মদীনার উপকণ্ঠে এসে সারাদিন রসূলের জন্য উপেক্ষা করে সন্ধ্যা বেলা যার যার ঘরে চলে যেত।

৩০শে মে'র শেষ বেলা। সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। অন্যান্য দিনের মতো অভ্যর্থনা জ্ঞাপনকারী দল ভগ্নমনে যার যার ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পাহাড়ের চূড়া থেকে এক ইহুদী হেঁকে উঠলো, হে মদীনাবাসী! তোমাদের নবী [সা] এসে গেছেন। ডাক শুনে মদীনার আনসারগণ পঙ্গপালের মতো নবীজী [সা]-এর উটনিকে ঘিরে ফেললো। কিছুলোক শহরবাসীকে সংবাদ দেয়ার জন্যে শ্লোগান দিতে দিতে আগে চলে গেল।

www.pathagar.com

মুহূর্তের মধ্যে মদীনার কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়লো মহানবী স.-এর আগমনী সংবাদ। সারা মদীনা জুড়ে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী তথা সর্বস্তরের মানুষের ঢল নেমে এলো মদীনার উপকণ্ঠে। যে নবীকে স্বীয় বংশের লোকেরা তাড়িয়ে দিল তাঁকেই হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধাঞ্জলী দিয়ে বরণ করে নিলো মদীনাবাসী। কী পরম সৌভাগ্য তাদের। মদীনার আনসারগণ সেদিন বিশ্বনবী [সা]-কে যে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা দিয়েছিলেন, পৃথিবীর কোনো নেতা হৃদয়ের মাধুরী মাখা এমন অকৃত্রিম অভ্যর্থনা লাভের কল্পনাও করতে পারে না। এমন অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান পৃথিবী কোনেদিন প্রত্যক্ষ করেনি, করবেও না কোনেদিন। আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী [রহ] বলেন, মদীনার অন্তপুরবাসিনী বধূরাও সেদিন অতি আনন্দ ও আবেগে বেরিয়ে এসেছিলেন মহানবী [সা]-কে স্বাগত জানাতে।

ইয়াসরিবের উপকণ্ঠেই কুবা পল্লী। এ পল্লীতে রাসূল [সা] ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং কুলসুম বিন হাদামের জায়গার ওপর একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। যে মসজিদ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– 'এ সেই মসজিদ, তাওকওয়াও পরহেজগারীর ওপরই যার প্রতিষ্ঠা।' ১৪ দিন পর শুক্রবার কু'বা পল্লী থেকে রাসূল [সা] মদীনার মূল শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। পথে বনীসালেম গোত্রে জুমার নামায আদায় করেন এবং খুত্‌বা দেন– যা ছিল রসূল [সা]-এর প্রথম জুমআ। নামায শেষে মদীনার সকল সাহাবী পরিবেষ্টিত হয়ে নবীজী [সা] আবার রওয়ানা হলেন। 'আল্লাহু আকবার' তাকবীরে মদীনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠলেন। রাস্তার দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে জনতা। নাজ্জার গোত্রের যুবকরা খুশিতে নেজা তরবারি নিয়ে পথে পথে মহড়া দিচ্ছিল। রাসূলে পাক [সা]-এর সওয়ারী যখন কোনো বাড়ির পাশ ঘেঁষে চলত তখন আত্মনিবেদিত মানুষের ভিড় ঠেলে আনসারগণ এসে আরজ করতেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ঘর, এই মাল, এই সম্পদ, এই প্রাণ সবই আপনার জন্যে উৎসর্গিত– আপনি কবুল করুন।' তাদের এ শুভ কামনার জন্যে রাসূল আকরাম [সা] তাদের কল্যাণে দু'আ করতেন। আনসারগণ তখন নবীজী [সা] ও আবু বকর [রা]-কে সাদা কাপড়ের জামা পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই নবাগত অনেকেই কে উস্তাদ আর কে শিষ্য ঠাওর করতে পারছিলেন না। অবস্থা আঁচ করে আবু বকর [রা] তখন একটি চাদরের দু'কোণ উঁচু করে ধরে আর দু'কোণ আরেকজনের হাতে দিয়ে মহানবী [সা]-এর মাথার ওপর শামিয়ানার মত উঁচু করে ধরেন। যার ফলে নবাগতদের আর নবীজী [সা]-কে চিনতে অসুবিধা হলো না।

মহানবী [সা] মদীনা শহরের কেন্দ্রে পৌছলে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে খুশি আর আনন্দে পুরুষ-নারীগণ সমস্বরে গাইছিলো–

মিনছানিয়াতিল বেদাঈ
ওয়াজাবাশ শুকরু 'আলাইনা
মাদাআ'লিল্লাহি দাঈ।

www.pathagar.com

কবির ভাষায়–

'দেখ চেয়ে ওই চাঁদ উঠেছে
গগন কিনারায়
তাঁর হাসির আভা ছাড়িয়ে গেল
নিখিল দুনিয়ায়।'

দফের তালে তালে নেচে ওঠলো নাজ্জার গোত্রের কচি মেয়েরা। শ্রদ্ধামাখা হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে তারা গাইতে শুরু করলো–

'আমরা বালিকা সব বনী নাজ্জারের
কি মজা, মুহাম্মদ [সা] পড়শী মোদের।

রাসূলে পাক [সা] বালিকাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা কি আমাকে ভালোবাসো,' আমাকে চাও?' তারা সমস্বরে আওয়াজ তুললো জী 'হ্যাঁ'! আমরা আপনাকে চাই আপনাকে ভালোবাসি।'

আল্লাহর হাবীব [সা] বললেন, 'আমিও তোমাদের চাই। তোমাদের মাঝেই থাকব।' সেই আনসারী ছোট্টমণিদের কণ্ঠে আজো ভেসে বেড়াচ্ছে ইথারে। কিন্তু আমাদের শোনার মত কান, উপলব্ধি করার মতো হৃদয় নেই। তাই আমরা তা বুঝতে ব্যর্থ। মদীনায় রসূল আকরাম [সা]-এর মেহমানদারী করার সৌভাগ্য কে অর্জন করবে এ নিয়ে আনসার সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। রসূল [সা] ঘোষণা দিলেন, আমার উটনি যে বাড়িতে গিয়ে থামবে, সে বাড়িতেই আমি মেহমান হবো। অবশেষে আবু আইউব আনসারী [রা] হলেন সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। অবশ্য আবু আইউব আনসারী [রা]-এর সাথে রাসূলে পাকের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল পূর্ব থেকেই। মসজিদে নববী ও রসূল পাকের জন্য হুজরা তৈরি হওয়া পর্যন্ত তিনি সাত মাস সেখানেই অবস্থান করলেন।

মদীনা আসার পর বিশ্বনবী [সা] পোষ্য পুত্র যায়েদ [রা]-কে মক্কায় পাঠালেন পরিবারের অন্যদের নিয়ে আসতে। আবু বকর [রা] ও চিঠি দিলেন আবদুল্লাহকে মদীনায় চলে আসার জন্যে। কিছুদিনের মধ্যেই যায়েদ [রা] হযরত ফাতিমা, উম্মে কুলসুম ও উম্মুল মু'মিনীন সওদা [রা] এবং আবদুল্লাহ, হযরত আয়েশা [রা]-কে নিয়ে মদিনায় আগমন করলেন। আপনজনদের পেয়ে এবার নবীজী [সা] মদীনায় রাষ্ট্র গঠন ও মুহাজির আনসারদেরকে সুসংগঠিত করার প্রতি আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই ইতি হলো মহানবী স.-এর মক্কা জীবন।■

www.pathagar.com

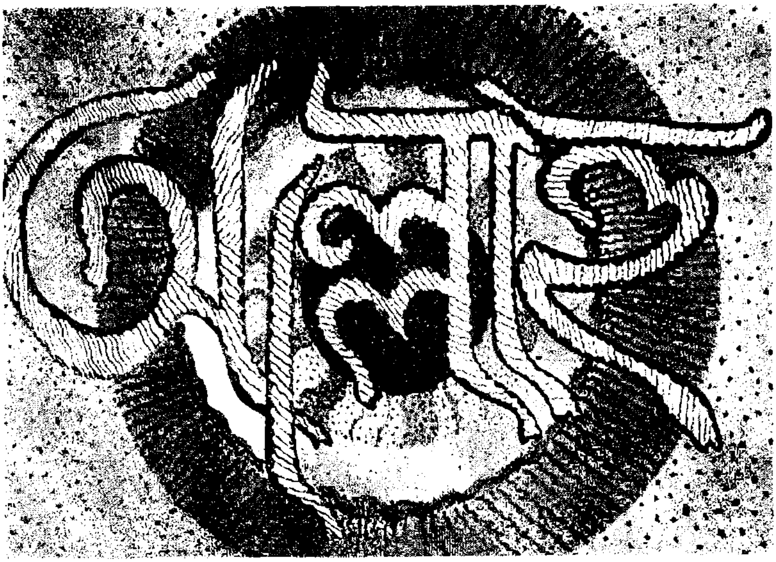

www.pathagar.com

সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

সত্যের শাশ্বতবাণী আপনার হৃদয়মূলে পৌঁছে দিতে

কবি মতিউর রহমান মল্লিক -এর গানের DVD ও VCD প্রত্যাশা ১ ও ২

আজই সংগ্রহ করুন!!

অন্যান্য প্রকাশনা

নাটক	পরিচালক
আহবান	শেখ আবুল কাসেম মিঠুন
ওরাও মানুষ	শেখ আবুল কাসেম মিঠুন
ধলা মানুষ	নিউ জেনারেশন
আল্লারাখা	কমল চাকমা

যোগাযোগ করুন

বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র

২/২ কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড, ৮ম তলা, মিরপুর রোড, কল্যাণপুর, ঢাকা

০১৬৭৮-১২১৮২২, ০১৮১৯-৫১৫১৪১, ০২-৮০৫০৯৩১

www.pathagar.com

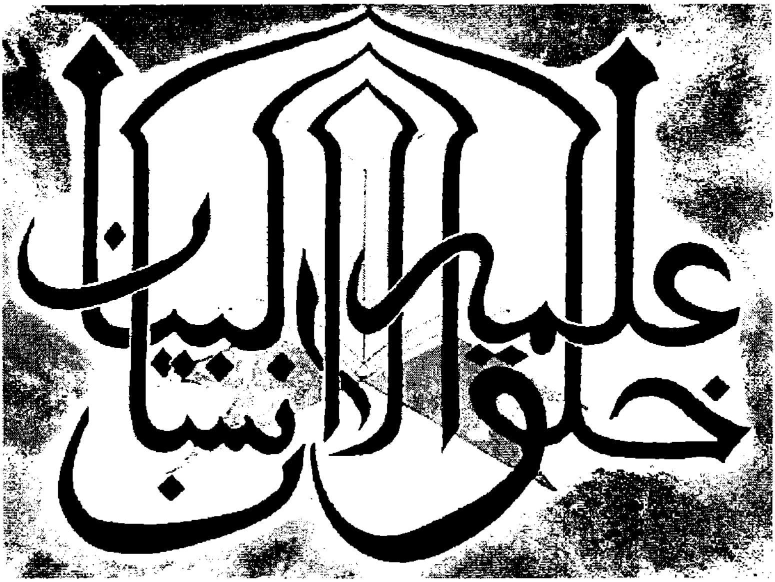

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

বার্ষিক প্রতিবেদন

(মে-২০১০ - এপ্রিল-২০১১)

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

প্রারম্ভিকা

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, সুস্থ ধারার মননশীল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি দেশের গন্ডি পেরিয়ে বহি:বিশ্বেও সাড়া জাগিয়েছে। অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, মজিবুর রহমান মন্‌জু ও আসাদ বিন হাফিজের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এর সার্বিক কার্যক্রম। পাঠক আপনাদের জানার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে বিগত বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরা হলো-

সাহিত্য সংস্কৃতি "সীরাত স্মারক" ২০১০

সীরাতুন্নবী সা. স্মারক ২০১০ কবি মোশাররফ হোসেন খান এর সম্পাদনায় এবারও প্রকাশিত হয়। শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদারের চমৎকার প্রচ্ছদে এ স্মারক দেশের খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের লেখায় সমৃদ্ধ। সমকালীন বাংলা ভাষায় এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সীরাত স্মারক হিসাবে সুধী মহলে সমাদৃত। এর মূল্য রাখা হয়েছে ১৫০ টাকা।

"সাহিত্য সংস্কৃতি" মাসিক বুলেটিন প্রকাশ

এপ্রিল ২০০৯ থেকে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের মাসিক বুলেটিন "সাহিত্য সংস্কৃতি" নামে প্রকাশ শুরু হয়। কবি আসাদ বিন হাফিজের সম্পাদনায় এ

www.pathagar.com

বুলেটিনে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ছাড়াও দেশের এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অংগনের গুরুত্বপূর্ণ খবর স্থান পায়।

ইসলামিক টিভিতে "হেরার আলো" ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিজস্ব প্রযোজনায় অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর এর পরিচালনায় প্রতি শুক্রবার রাত ৯ টায় ইসলামিক টিভিতে **"হেরার আলো"** নামে একটি মনোজ্ঞ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে ধারাবাহিক নাটক, ডকুফ্লিম, গান, আবৃত্তি, প্রতিবেদন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে টক শো-সহ বৈচিত্রপূর্ণ সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। টক-শোতে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ, শাহ আবদুল হান্নান, আবুল আসাদ, আলমগীর মহিউদ্দিন, হামিদুর রহমান আযাদ এমপি, ড. এম কোরবান আলী, কবি আল মুজাহিদী, মাহবুবুল হক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আব্দুল হাই শিকদার, আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ, আসাদ বিন হাফিজ, শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, হাসান আলীম, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, তোফাজ্জল হোসাইন খান, ডা. স ম রফিক, মাওলানা তারিক মুনাওয়ার, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও হুসনে মোবারক।

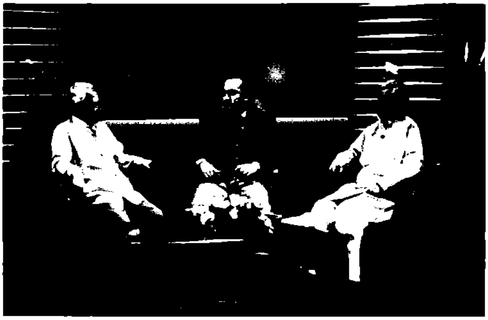

ইসলামিক টিভির টকশোতে ড. এস.এম. লুৎফর রহমান, দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ ও উপস্থাপক অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

কার্টুন প্রদর্শনী ২০১০

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কার্টুনিস্ট ফোরামের উদ্যোগে বিগত ১০ থেকে ১২ মে ২০১০ জাতীয় প্রেসক্লাবে হয়ে গেল তিনদিনব্যাপী কার্টুন প্রদর্শনী। ১০ মে সকাল ১১ টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বরেণ্য সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব শফিক

প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখছেন জনাব শফিক রেহমান

ফিতা কেটে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন অতিথিবৃন্দ

রেহমান। চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আতাউস সামাদ। অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পেরে লিখিত ভাষণ প্রেরণ করেন। লিখিত ভাষণে তিনি বলেন-

আপনারা আমার সালাম নিবেন। বাংলাদেশ কার্টুনিস্ট ফোরাম আয়োজিত কার্টুন প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম। তবে এও মনে হয়ে ছিল যে আপনারা অপাত্রে বিরল সম্মান দান করছেন। আমার অতি দুর্ভাগ্য যে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি এই মহতি উদ্যোগে শামিল হতে পারলাম না। আমার অপারগতা আপনারা ক্ষমা করে দিবেন। বাংলাদেশে আপনাদের মতো ভাল কার্টুনিস্ট আছে জেনে খুবই আনন্দ লাগছে। আপনাদের সাহসী ও মহৎ প্রচেষ্টার পরও আমরা যে দিনে কয়েক মুহুর্তের বেশী হাসতে পারি না তা এ ও বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমরা কি কষ্টের মধ্যে বাস করছি। আমি আন্তরিকভাবে আপনাদের মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করছি এবং বাংলাদেশ কার্টুনিস্ট ফোরামকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

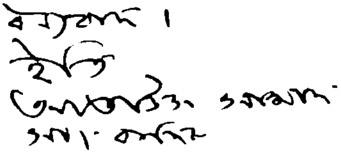

কার্টুনের জন্ম, তার সামাজিক দায়বদ্ধতা, সমাজ বদলে কার্টুনের প্রভাব, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কার্টুনিস্টদের ঐতিহাসিক ভূমিকা, বাংলাদেশে কার্টুনের সূচনাসহ নানা প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক জনাব শফিক রেহমান। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই দেখা গেছে কার্টুন সমাজ বদলের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কার্টুন শুধু হাসির খোরাক নয়, সমাজের দর্পন, জনমতের প্রতিধ্বনি। কার্টুন শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই বুঝতে পারে, ফলে এর ভাষা সার্বজনীন।

প্রদর্শনীতে সাতজন কার্টুনিস্টের মোট ১০৮টি কার্টুন স্থান পায়। এগুলোর মাধ্যম ছিল ডিজিটাল প্রিন্ট ও জলরঙ। কার্টুনগুলোর মূল উপজীব্য ছিল সমসাময়িক জাতীয় রাজনীতি এবং সামাজিক অস্থিরতা ও অসঙ্গতি। প্রদর্শীতে অংশ গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার চীফ কার্টুনিস্ট জনাব আসিফুল হুদা, দৈনিক আমাদের সময়ের কার্টুনিস্ট শেখ তোফাজ্জাল হোসেন তোফা, দৈনিক সংগ্রামের সিনিয়র কার্টুনিস্ট ইব্রাহীম মন্ডল (ই. মন্ডল), দৈনিক নয়াদিগন্তের সিনিয়র কার্টুনিস্ট জাহিদ হাসান বেনু, ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের মাসিক পত্রিকা কিশোর নিউজ লেটারের আর্টিস্ট মহিউদ্দিন আকবর (মহি), নয়া দিগন্তের আর্টিস্ট আজিজুর রহমান তালুকদার (নিয়ন) ও কিশোর কার্টুনশিল্পী হাসান মাহমুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রদর্শনীর আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিল্পী আসিফুল হুদা। উপস্থাপনায় ছিলেন নাট্যশিল্পী আহসান হাবীব খান। তিনদিনের এ প্রদর্শনীতে বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগত হয়। নারী, পুরুষ, শিশু, শিক্ষার্থী, বিভিন্ন পেশাজীবী, সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের মানুষ সময়োপযোগী এ প্রদর্শনীর আয়োজন করায় বাংলাদেশ কার্টুনিস্ট ফোরামকে ধন্যবাদ জানান।

কবি গোলাম মোহাম্মদ স্মরণ সভা

১৫ মে ২০১০ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র মিলনায়তনে কবি গোলাম মোহাম্মদের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। কবি মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আসাদ বিন হাফিজ এবং প্রধান আলোচক ছিলেন কবি সোলায়মান আহসান। কবি গোলাম মোহাম্মদের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কবি হাসান আলীম, কবি নাসির হেলাল ও মো: তৌহিদুর রহমান। প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি ওমর বিশ্বাস ও কবি নাজমুস সায়াদাত। কবি গোলাম মোহাম্মদের গান পরিবেশন করেন শিল্পী আবদুর রউফ, শিল্পী আমিনুল ইসলাম ও শিল্পী মশিউর রহমান। কবির কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন আবৃত্তি শিল্পী শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও আহসান হাবীব খান। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি সোলায়মান আহসান, ইব্রাহীম মন্ডল, রেদওয়ানুল হক, ইয়াকুব বিশ্বাস প্রমুখ।

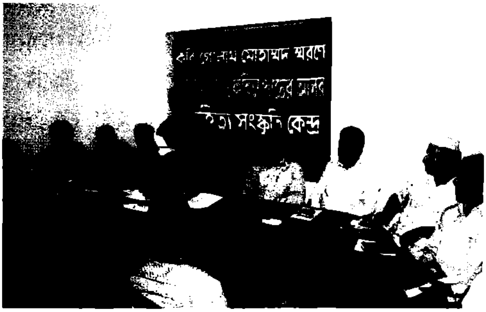

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন কথা সাহিত্যিক মাহবুবুল হক

বক্তাগণ বলেন, কবি গোলাম মোহাম্মদ পবিত্র কোরআনের সূরা আশ শোয়ারায় উল্লেখিত আল্লাহর প্রিয় কবিদের কাব্যধারাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি ফররুখের সার্থক উত্তরসূরী। তাঁর কবিতা মুক্তিকামী মানুষকে প্রেরণা জুগিয়ে যাবে যুগ যুগ ধরে।

www.pathagar.com

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আবদুল হাই শিকদার

জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উদযাপন

২৪ মে সন্ধ্যায় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। কবি হাসান আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত নজরুল গবেষক এবং নজরুল ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক কবি আবদুল হাই শিকদার। জাতীয় কবির জীবন ও কর্মের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি আসাদ বিন হাফিজ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি নাসির হেলাল, গবেষক শাহ্ সিদ্দিক, কবি মনসুর আজিজ ও কবি আহমদ বাসির। নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম। কবির কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। কবির ভাষণ পেশ করেন নাট্যকার ও আবৃত্তি শিল্পী আহসান হাবীব খান। সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি নূর আল ইসলাম, প্রদীপ বানার্জি, হারুন ইবনে শাহাদাত, তৌহিদুর রহমান, ইয়াকুব বিশ্বাস, আমিনুল ইসলাম, আবু হাসান তাহের, মনসুর আজিজ, রেদওয়ানুল হক প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, নজরুল আমাদের জাতীয় চেতনার নাম। তাঁকে বাদ দিলে আমাদের আর কিছুই থাকে না। তিনি ছিলেন স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের আতংক। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার কবিতা ও গান যেভাবে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল তেমনি আজকের দু:শাসন থেকে মুক্তির জন্য নজরুলের কবিতা ও গানের কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

ফেসবুকে রাসুল সা. বিরোধী কার্টুনের প্রতিবাদে মানব বন্ধন

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগী সংগঠন সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট হযরত মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে ফেসবুকে ব্যঙ্গ কার্টুন আঁকার প্রতিবাদে গত ২৮ মে ২০১০ সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক বিশাল মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। বৈচিত্রময় এ মানববন্ধনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের আহবায়ক কবি আসাদ বিন হাফিজ আগত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তাগণ বলেন, কোন ভাল মানুষই ধর্মবিরোধী ও ধর্মবিদ্বেষী হতে পারে না। যারা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে তারা মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের ওপর আঘাত হানে। বক্তাগণ বলেন, কেবল মুসলমান নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিতেও বার বার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসাবে যে নামটি শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়েছে সে নামটি হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ সা.।

ফেসবুকে রাসুল সা. বিরোধী কার্টুনের প্রতিবাদে আয়োজিত মানব বন্ধনের একটি বিশাল ভিউ

সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট আহুত এ মানব বন্ধন কর্মসূচীতে ঢাকার প্রায় অর্ধশত সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এস এম লুৎফর রহমান, চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. আবদুস সাত্তার, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. তারেক শামসুর রহমান, নয়াদিগন্তের সম্পাদক জনাব আলমগীর মহিউদ্দিন, দৈনিক নিউনেশন সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপাল কবি আশরাফ আল দীন, চিত্র পরিচালক জনাব হাফিজ উদ্দিন, চিত্রনায়ক শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, পরিবেশ আন্দোলনের নেতা জনাব নাজিমউদ্দিন, ডিউজের সাধারণ

www.pathagar.com

সম্পাদক বাকের হোসাইন, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান মন্‌জু, সিএনসির জনাব মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, বাংলাদেশ কার্টুনিস্ট ফোরামের উপদেষ্টা ও দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার চীফ কার্টুনিস্ট আসিফুল হুদা, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির আহবায়ক ইব্রাহীম মন্ডল, কবি হাসান আলীম, কবি মহিউদ্দিন আকবর, সংবাদ পাঠক টিভি উপস্থাপক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, ডিউজের নির্বাহী সদস্য শরীফ আবদুল গোফরান, কবি আবদুল কুদ্দস ফরিদী, প্রখ্যাত গীতিকার আবুল হোসাইন মাহমুদ, সাংবাদিক সায়াদাত হোসাইন, কাজী হাফিজ, প্রখ্যাত অনুবাদক মাওলানা মোজাম্মেল হক, নাট্য পরিচালক আল হোসাইন পিয়ারু, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, ছড়াকার নুরুজ্জামান ফিরোজ, শিল্পী মালিক আবদুল লতিফ, সুরকার ও শিল্পী মশিউর রহমান, কবি তৌহিদুর রহমান, কবি নাজমুস সায়াদাত, জনাব গোলাম রব্বানী খান, গল্পকার হারুন ইবনে শাহাদাত, খালিদ সাইফ ও সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের সদস্য সচিব আবেদুর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও অংশগ্রহণ করেন বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর এবং তাদের মায়েরা। মানব বন্ধনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ, কবি আল মাহমুদ, বিচারপতি আবদুর রউফ, প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান মিয়া, ড. মাহবুউল্লাহ, জনাব আবুল আসাদ, জনাব শওকত মাহমুদ, জনাব কামাল উদ্দিন সবুজ, রুহুল আমিন গাজী, কবি আসাদ চৌধুরী, কবি আল মুজাহিদী, কবি আবদুল হাই শিকদার, ডিউজের সভাপতি আবদুস শহীদ প্রমুখ।

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আবদুল কাইউম স্মরণে শোক বানী ও দোয়ার মাহফিল

প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংগঠক ও সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব হাসান আবদুল কাইউম সেলিম গত ২১ মে ২০১০ শুক্রবার রাতে রাজধানীর ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তিনি ছিলেন বহু গুণের অধিকারী একজন সফল সাংস্কৃতিক সংগঠক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি ঢাকার পরিচালক জনাব এস এম রইসউদ্দিন

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ মরহুম হাসান আবদুল কাইউম সেলিমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বাণীতে বলেন, তিনি ছিলেন দেশের মূলধারার সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে নিবেদিত প্রাণ একজন সংগঠক। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন প্রতিভাবান ও দরদী সংগঠককে হারালো। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩০ মে সন্ধ্যা ছয়টায় মতিঝিলস্থ বুক সোসাইটি মিলনায়তনে কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে এক শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদুর রহমানের পরিচালনা এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি ঢাকার পরিচালক জনাব এস এম রইসউদ্দিন। আলোচনায় অংশ নেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম হক, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, ইব্রাহীম বাহারী ও তৌহিদুর রহমান। আলোচনা শেষে তাঁর মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

কবি ফররুখ আহমদের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

কবি ফররুখ আহমদের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র নিজস্ব মিলনায়তনে ১৫ জুন ২০১০ সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসর করে। সংগঠনের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে সভায় আধ্যাত্মিক কবি ফররুখ আহমদ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি নূর আল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর আজগর তালুকদার। আলোচনায় অংশ নেন কবি ও সাহিত্য গবেষক হাসান আলীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশ্বকোষ প্রকল্পের গবেষক নাসির হেলাল, শিশু সাহিত্যিক কবি শরীফ আবদুল গোফরান। ফররুখের কবিতা আবৃত্তি করেন নাট্যকার আহসান হাবীব খান। ফররুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম ও শিল্পী মশিউর রহমান। নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন কবি পাভেল ফাতেমী, কবি নুর আল ইসলাম, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি রফিকুল ইসলাম ফারুকী, কবি জানে আলম ও সাবিত সারওয়ার প্রমুখ।

বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের সাহিত্য সম্পাদক কবি হাসান আলীম

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতির কেন্দ্রের ইফতার মাহফিল

২৭ আগস্ট ২০১০ শুক্রবার কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন কবি মাহবুল হক, কবি আসাদ বিন হাফিজ, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, ইব্রাহীম বাহারী ও হারুন ইবনে শাহাদাত। উপস্থিত ছিলেন কবি হাসান আলীম, নাট্যকার শাহ আলম নূর। আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার আহসান হাবীব খান। এ ইফতার মাহফিলে বিভিন্ন জোনের দায়িত্বশীল ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

মিডিয়া সার্কেলের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠান

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর ২০১০ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র জোন-২ এর মিডিয়া সার্কেলের উদ্যোগে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও মিডিয়া সার্কেলের কর্মী গোলাম মর্তুজা চৌধুরী স্মরণে আলোচনা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জোন সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, বক্তব্য রাখেন জোন সেক্রেটারী কবি মো: আমিনুল ইসলাম, গীতিকার সুরকার শিল্পী হাসিনুর রব মানু ও লিটন হাফিজ চৌধুরী। উপস্থাপনায় ছিলেন শিল্পী যাকিউল হক জাকী।

ইফতারপূর্ব দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ

ঈদের কবিতা উৎসব

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদ বলেছেন, আধুনিক বাংলা কাব্যকে এগিয়ে নিতে হলে কবিদের নতুন কিছু দিতে হবে। নতুন শব্দ, নতুন

www.pathagar.com

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন দুই বাংলার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ

উপমা, নতুন কল্পনা, নতুন প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতাকে বিকশিত করতে হবে। ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগী সংগঠন নাবিক সাহিত্য সংসদ আয়োজিত ৬ষ্ঠ ঈদের কবিতা উৎসবে কবি আল মাহমুদ এসব কথা বলেন। নাবিকের উপদেষ্টা ইব্‌রাহীম বাহারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সবচে বড় উৎসব ঈদ। গভীর ধর্মীয় আবেগ নিয়ে এ দেশের মানুষ তা উদ্‌যাপন করে। এই ধর্মীয় আবেগের সাথে কবিকে একাত্ম হতে হবে।

উপস্থিত কবি সাহিত্যেক শিল্পীদের একাংশ

অনুষ্ঠানে কবিতা ও ছড়া পাঠ করেন প্রখ্যাত ছড়াকার সাজজাদ হোসাইন খান, ছড়াকার আবু সালেহ, কবি জয়নুল আবেদীন আজাদ, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম, কবি সোলায়মান আহসান, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, কবি নাসির হেলাল, কবি ইব্রাহীম মন্ডল, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি মনসুর আজিজ, কবি আমিন আল আসাদ, কবি আমিনুল ইসলাম, কবি কামাল হোসাইন, কবি ওয়ালী ফরহাদ, কবি রেদওয়ানুল হক, কবি মালেক মাহমুদ, কবি রানা হামিদ, কবি রিয়াদ হায়দার, কবি আজিম হোসেন আকাশ, কবি জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ, কবি মোজাম্মেল প্রধান প্রমুখ।

ঈদের এ আনন্দ ঘন কবিতা উৎসবে ঈদের কবিতা আবৃত্তি করেন সংবাদ পাঠক

www.pathagar.com

আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত আবৃত্তি শিল্পী মুস্তাগিছুর রহমান মোস্তাক ও কবি আহমদ বাসির। ঈদের গান পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী হুমায়রা ও সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক স্মরণে নাগরিক শোক সভা

প্রখ্যাত গীতিকার, শিল্পী, সুরকার ও সংগঠক কবি মতিউর রহমান মল্লিক স্মরণে

নাগরিক শোক সভায় বক্তব্য রাখছেন শিল্পী মোস্তাফা জামান আব্বাসী, মঞ্চে উপস্থিত আছেন বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ শাহ আবদুল হান্নান, আবদুল মান্নান তালিব, জুবাইদা গুলশানারা, কবিপত্নী সাবিনা মল্লিক, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানুছুরসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় নাগরিক স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন, কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন মানবতাবাদী কবি। তিনি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী হিসাবে বড় মাপের ছিলেন, ব্যক্তি হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের। তাঁর আজন্ম স্বপ্ন ছিল এ দেশে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতার মুক্তি।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ

১৬ অক্টোবর ২০১০ রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জনাকীর্ণ স্মরণ সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এস এম লুৎফর রহমান, শিশু একাডেমীর সাবেক চেয়ারম্যান কথাশিল্পী জুবাইদা গুলশান আরা, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী, প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সালাহউদ্দিন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক তোফাজ্জল

www.pathagar.com

হোসাইন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান চৌধুরী মাহমুদ হাসান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল আমীন গাজী, বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক প্রখ্যাত লেখক ও অনুবাদক আবদুল মান্নান তালিব, ফররুখ একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সিএনসির পরিচালক কথাশিল্পী মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের উপ পরিচালক প্রখ্যাত অভিনেতা চিত্রনায়ক শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম, প্রখ্যাত কথাশিল্পী কবিপত্নী সাবিনা মল্লিক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের রেজিস্টার ও অঙ্গীকার ডাইজেস্ট সম্পাদক আ জ ম ওয়ায়েদুল্লাহ, মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজের বাংলার প্রভাষক কবি আসাদ বিন হাফিজ, কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী আবেদুর রহমান, বার্তা টুয়েন্টি ফোরে ডটকমের এডিটর এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সেক্রেটারী সরদার ফরিদ আহমদ, কবি বন্ধু হাসান আলীম, কবির ঘনিষ্ট বন্ধু এডভোকেট কবি গাজী এনামুল হক, ঐতিহ্যবাহী সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক হুসনে মোবারক, কবিকন্যা নাজমী নাতিয়া প্রমুখ।

হল উপচেপড়া উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান পরিবেশন করছে সন্দীপন শিল্পীগোষ্ঠীর শিশু শিল্পীরা

মল্লিক ভক্তদের উপচেপড়া ভীড়ে অনুষ্ঠানে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অতিথিবৃন্দ আলোচনা ও স্মৃতিচারণ করে বলেন, মল্লিকের গান আজ বিশ্বব্যাপি

বক্তব্য রাখছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সহধর্মীনি প্রখ্যাত কথাশিল্পী সাবিনা মল্লিক

www.pathagar.com

সমাদৃত হচ্ছে। কবিতা ও গানের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে তিনি চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের যে বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই ধারাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এখন তার ভক্তদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। গানের ক্ষেত্রে তিনি যে শতাধিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এখন দায়িত্ব নিতে হবে তাদের।

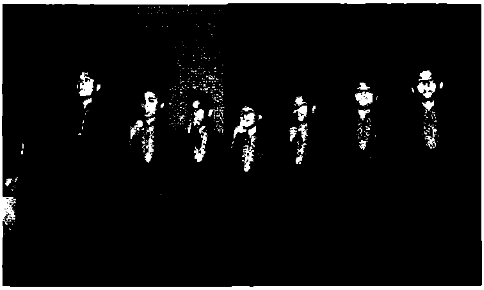

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান পরিবেশন করছে অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদের শিশু শিল্পীরা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব নিতে হবে তাঁর স্বপ্নের দোসর ও লেখকবন্ধু কলম সৈনিকদের। অনুষ্ঠানে বক্তৃতার ফাকে ফাঁকে চলে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের লেখা কবিতার আবৃত্তি ও গান। হামদ, নাত , গান ও কবিতা পরিবেশন করেন শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী, শিল্পী সালাহউদ্দিন আহমদ, সংবাদপাঠক ও আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, আবৃত্তিকার ও নাট্যভিনেতা মুস্তাগিছুর রহমান, কবি ও আবৃত্তি শিল্পী আহমদ বাসির, নাট্যকার আহসান হাবীব খান এবং সাইমুমসহ ঢাকার বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ।

উল্লেখ্য কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিগত ১২ আগস্ট ২০১০ বুধবার রাত পোনে ১ টায় পবিত্র রমযানের প্রথম প্রহরে স্কয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন, কবির ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ।

ঈদ পুনর্মিলনী '১০

সাহিত্য সংস্কৃতি জোন-২ এর উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর ২০১০ স্থানীয় একটি অডিটরিয়ামে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। জোন সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানুছুর। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি গীতিকার মজিবুর রহমান মন্জু, সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। বক্তব্য রাখেন সহকারী সেক্রেটারী আবেদুর রহমান, জোন সেক্রেটারী কবি মো: আমিনুল ইসলাম, শিল্পী

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

www.pathagar.com

হাসিনুর রব মানু, যাকিউল হক জাকী, নাট্যকার শাহজাহান কবির সাজু, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মুস্তাকীম। মজার গান পরিবেশন করেন শিল্পী মো: শহীদুল্লাহ, গাজী আনাছ, হাসনাইন যায়েদ প্রমুখ। আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার আহসান হাবীব খান, কৌতুক পরিবেশন করেন বদিউর রহমান সোহেল, জহিরুল ইসলাম ও আবদুল গনি বিদ্বান।

মহান বিজয় দিবসে আলোচনা ও কবিতা পাঠ

১৬ ডিসেম্বর ২০১০ কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় জমজমাট আলোচনা ও কবিতা পাঠের আসর। কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি আল মুজাহিদী। আলোচনায় অংশ নেন, কেন্দ্রের সাহিত্য সম্পাদক কবি হাসান আলীম, কবি নাসির হেলাল, কবি মো: কামরুজ্জামান, সংবাদিক হারুন ইবনে শাহাদাত এবং কবি আহমদ বাছির। কবিতা আবৃত্তি করেন আহসান হাবীব খান। গান পরিবেশন করেন শিল্পী মো: আমিনুল ইসলাম ও শিল্পী সুরকার মশিউর রহমান লিটন।

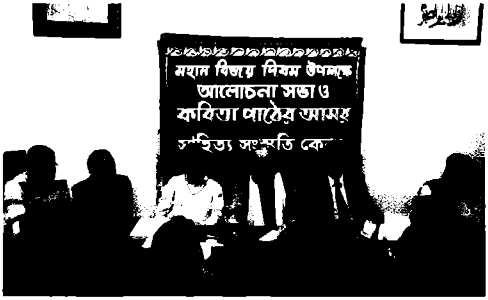

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট কবি আল মুজাহিদী

সাহিত্য সভা ও প্রকাশনা অনুষ্ঠান

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে নিয়মিত সাহিত্য সভা ও কয়েকজন লেখকের বই প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আল মুজাহিদী। বক্তব্য রাখেন কবি হাসান আলীম, কবি নাসির হেলাল, কবি আহমদ বাছির, আবদুল কুদ্দস ফরিদী। প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি খালিদ সাইফ। সঙ্গীত

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

www.pathagar.com

পরিবেশন করেন শিল্পী বোরহান মাহমুদ, আবৃত্তি করেন আহসান হাবীন খান। মোড়ক উন্মোচন করা হয় রহমাতুল্লাহ খোন্দকার এর বই "নেই দৈঘ্য প্রস্থ বেধ", শাহাদাত ফাহিমের "ছড়ার দোকান" এবং লোকমান হোসেন জীবনের "তোমাকে শুনতেই হবে"। কবিতা পাঠ করেন নবীন প্রবীন কবিবৃন্দ।

ভাষা দিবসের আলোচনা

ঢাকা বিশ্বদিব্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম লুৎফর রহমান বলেন, ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে। তা না হলে বিভ্রান্তি কাটবে না। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বিজাতি তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বলে যারা মনে করেন, তাদের সাথে আমি একমত নই। কারণ ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসীরাই। তমদ্দুন মজলিস নামের যে সংগঠন এ আন্দোলনের সূচনা করেছিল এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী খাঁটি মুসলমান ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের ঢেউ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে গ্রাম পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। এটা শুধু ছাত্ররা নয়, আপামর জনগণ এই আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন।

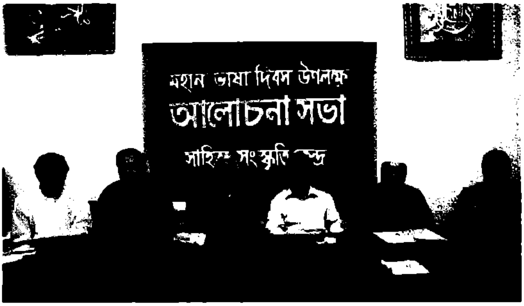

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ড. এস.এম. লুৎফর রহমান

গত ২১ ফেব্রুয়ারী মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজ, চিত্রনায়ক শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, সংবাদ পাঠক আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, সাংবাদিক হারুন ইবনে শাহাদাত প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর বলেন, একটি জাতি নিজস্ব সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য বর্তমানে আমরা হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হারাতে বসেছি। বিজাতীয় সংস্কৃতিকে পরিকল্পিতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। ইসলামী ঐতিহ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে পদে পদে। এব্যাপারে আমাদের দায়িত্বশীল আচরণ করা প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলনসহ আমাদের জাতীয় জীবনের যাবতীয় অর্জন সঠিকভাবে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে।

www.pathagar.com

১ম শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রফি প্রতিযোগিতা ২০১১

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় প্রথম শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১১। পবিত্র রবিউল আউয়াল ও মহান ভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও ক্ষুদে শিশু-কিশোর শিল্পীরা। শিশু-কিশোরদের আঁকা বৈচিত্রময় সব ক্যালিগ্রাফিতে বর্ণিল হয়ে ওঠে প্রেস ক্লাব মিলনায়তন।

প্রতিযোগীরা গভীর মনোযোগের সাথে ক্যালিগ্রাফি আঁকছে

রঙ আর পেন্সিল দিয়ে এসব ক্ষুদে শিল্পী ও শিক্ষার্থী বাংলা, আরবী ও ইংরেজি অক্ষর সাজিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে তাদের চিত্রকর্ম। তাদের হাতের তুলিতে ফুটে ওঠে মহান রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠত্ব গাঁথা আল্লাহু আকবর, বিসমিল্লাহসহ আল্লাহর বিভিন্ন গুনবাচক নাম ও কুরআনের উল্লেখযোগ্য আয়াতের অংশ। এছাড়া তারা এঁকেছে ৫২'র ভাষা শহীদের রক্তে রাঙানো মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মৃতিবিজড়িত, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়। জাতীয় প্রেস- ক্লাব মিলনায়তনে ক ও খ দুই গ্রুপে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তার এ ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশ বিজ্ঞানী ও মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. আবদুর রব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মানারাত স্কুল এন্ড কলেজের

www.pathagar.com

অতিথিবৃন্দের সাথে ফটোসেশনে প্রতিযোগীতায় বিজয়ীরা

অধ্যক্ষ কবি আশরাফ আল দীন, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, কবি আসাদ বিন হাফিজ, শিল্পী শহিদুল্লাহ এফ বারী ও প্রতিযোগিতা কমিটির আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন সংবাদ পাঠক ও টিভি উপস্থাপক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহ-সেক্রেটারী মো: আবেদুর রহমান, শিশু সাহিত্যিক মাহবুবুল হক , চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, কবি শরীফ আবদুল গোফরান,অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী, ক্যালিগ্রাফার আবদুর রহিম প্রমুখ। অধ্যাপক ড. আবদুর রব বলেন, অনেক কথার চেয়ে একটি সুন্দর শিল্পকর্ম বেশি শক্তিশালী। ক্যালিগ্রাফি, শিল্পের এক চমৎকার মাধ্যম। এর মাধ্যমে শিল্পীরা সুন্দরভাবে অক্ষরকে সাজিয়ে উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তার বলেন, বিশ্বের সর্বত্রই ক্যালিগ্রাফি চর্চা হচ্ছে। বড় বড় শিল্পীরা শিল্পের এ শাখায় চর্চা করছেন। এই প্রতিযোগতার মাধমে এ শিল্প আরো জনপ্রিয় হবে।

প্রতিযোগতায় ক গ্রুপে প্রথম হয়েছে মারানাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের ৪র্থ শ্রেনীর ছাত্রী সুমাইয়া ফাতিমা শরীফ, ২য় হয়েছে ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ৪র্থ শ্রেনীর ছাত্রী মাসকুরা বিন্‌তে মান্নান ও তৃতীয় হয়েছে লিটল এনজেলস স্কুলের ২য় শ্রেনীর ছাত্র মুবাশ্বির রহমান সিদ্দিকী স্বচ্ছ।

খ গ্রুপে প্রথম হয়েছে বিএএফ শাহীন কলেজের ১০ম শ্রেনীর ছাত্রী সাদিয়া

www.pathagar.com

নার্গিস, ২য় জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়ার ৯ম শ্রেনীর ছাত্র মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন ও তৃতীয় হয়েছে আই ই এস স্কুলের ৯ম শ্রেনীর ছাত্র রাসেল আহমদ। বিজয়ীদের প্রত্যেককে সংগঠনের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট, বই ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

নিয়মিত সাহিত্য সভা

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিমাসের ১৫ তারিখ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সম্পাদক কবি হাসান আলীম এর পরিচালনায় এ সব সাহিত্য সভায় দেশের খ্যাতিমান কবি লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। এর অংশ হিসাবে ১৫ মার্চ সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে মনোজ্ঞ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মানারাত কলেজের প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট কবি আশরাফ আল দীন। আলোচনায় আংশ নেন সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আবেদুর রহমান, কবি নাসির হেলাল, কবি ইব্রাহীম মন্ডল প্রমুখ, কবিতা পাঠ করেন নবীন প্রবীন কবিরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আশরাফ আল দীন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে দিনব্যাপী মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক কর্মশালা, স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গান, স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদদের জন্য সম্মিলিত দোয়াসহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করে কেন্দ্রের সর্বস্তরের কবি, সাহিত্যিক, ছড়াকার, গীতিকার, সুরকার, নাট্যজন, অভিনেতা, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ।

বক্তব্য রাখছেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক কর্মশালায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পী ও কর্মীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে। সঙ্গীত, অভিনয়, লেখালেখির বিভিন্ন বিষয়, প্রচার, অর্থ ও অফিস ব্যবস্থাপনাসহ নানা বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ।

দুপুরে নামাজ ও খাওয়ার বিরতির পর উপস্থিত কবি ও ছড়াকারবৃন্দ স্বরচিত ছড়া-কবিতা পাঠে অংশ নেয়। এরপর শুরু হয় গানের জলসা। চমৎকার এ আয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল, অধ্যাপক মতিউর রহমান, সাহিত্যিক মাহবুবুল হক, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, মুজিবুর রহমান মন্‌জু, কবি আসাদ বিন হাফিজ, জনাব আবেদুর রহমান, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আবুল কাশেম মিঠুন, গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী তোফাজ্জাল হোসাইন খান, কবি হাসান আলীম, টিভি উপস্থাপক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী ও গীতিকার আবু তাহেল বেলাল।

নববর্ষের বর্ণিল আয়োজন

বৈশাখ মানে পুরাতনকে পিছনে ফেলে নতুনকে এবং যা কিছু সুন্দর তাকে গ্রহণ করা। সম্রাট আকবরের সময় থেকে যে বাংলা সাল গণনা শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় দিন, মাস, বছর শেষে প্রতি বারই আমাদের মাঝে ফিরে আসে বাংলা নববর্ষ। বাংলাদেশে নববর্ষ উদযাপনে থাকে নানা বৈচিত্র। যদিও এক্ষেত্রে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। মূলধারায় সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বাংলা নববর্ষ ১৪১৮ কে বরণ করতে ঢাকার অদূরে তামান্না ওয়ান্ড ফ্যামিলি পার্কে-"বাংলা আমার, আমি বাংলার এসো মিলি প্রাণের উৎসবে" শীর্ষক গান আবৃত্তি অভিনয় ও কথামালার বর্নাঢ্য আয়োজন করে। দুই বাংলার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এস এম লুৎফর রহমান, কথাশিল্পী আতা সরকার, কবি আশরাফ আল দ্বীন, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, চলচ্চিত্র অভিনেতা শেখ আবুল কাশেম

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ

www.pathagar.com

মিঠুন, তামান্না ওয়াল্ড ফ্যামিলি পার্কের এম.ডি মোঃ আসাদুল হক মামুন ও কেন্দ্রের সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আবেদুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমীর সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, কথাশিল্পী মাহবুবুল হক প্রমুখ।

ছড়াগান পরিবেশন করছে শিশু-কিশোর শিল্পীরা

বক্তারা বলেন-আবহমানকাল ধরে পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ন দিন। সম্রাট আকবরের সময় থেকে শুরু হওয়া ঐতিহ্যবাহী এই দিনটি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতীতে পহেলা বৈশাখে ব্যবসায়ীরা তাদের হালখাতা নবায়ন, নতুন বছরের কল্যাণ কামনায় দোয়া মোনাজাত, গ্রাম বাংলায় মেলা, খেলাধুলার আয়োজনসহ নানাবিধ কর্মসূচীতে যে প্রানের স্পন্দন লক্ষ্য করা যেত বর্তমানে এর অনেকাংশই অনুপস্থিত। এখন বৈশাখ উদযাপনের নামে বানিজ্যি করণের পাশাপাশি বিজাতীয় সংস্কৃতিকে জাতির উপর পরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে যা কোনভাবে কাম্য নয়। বক্তারা এক্ষেত্রে সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মী ও সচেতন নাগরিকদের উদ্যোগী ভূমিকা রাখার আহবান জানান।

আলোচনা শেষে শরীফ বায়জীদ মাহমুদের উপস্থাপনায় শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের লেখা বৈশাখী গান "আয় বৈশাখ আয়রে আয়-,দেশের গান "ধানের ক্ষেতে-- । এ ছাড়াও সাইমুম থিয়েটরের একাংকিকা সবাইকে আনন্দ দেয়। উচ্চারণ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা পরিবেশন করে "গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান"ও ঘুরলাম কত দেশ বিদেশে-। অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের বৈশাখী গান "আয়না সবাই এক হয়ে যায়" এবং সমকালিন গান এফ এম রেডিও। মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করেন আবু তাহের বেলালের লেখা ও মশিউর

কোরাস পরিবেশন করছে সাইমুম, অনুপম, উচ্চারন ও সন্দীপন শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা

www.pathagar.com

রহমানের সুরে "আমাদের চেতনায় ফেলানির নাম ও আর নয় ব্যথা" সমকালিন ও দেশাত্ববোধক গান। সন্দীপন শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করে "তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে" ও আব্দুস সালামের লেখা ও সুরে বৈশাখী গান "এলো বৈশাখ"। নিমন্ত্রন শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করে একাংকিকা "কালচারাল ফ্যামিলি" ও টুনটুনি আসরের ক্ষুদে শিল্পীরা চমৎকার দুটি ছড়া গান পরিবেশন করে। শিল্পী রোকনুজ্জামানের ভাওইয়া গান এবং শিল্পী মোঃ শহীদুল্লাহ এর গাওয়া পল্লীগীতি উপস্থিত হাজারও দর্শক শ্রোতাকে আনন্দ দেয়। এছাড়াও স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। আবৃত্তি করেন নাট্যকার ও আবৃত্তিশিল্পী আহসান হাবীব খান।

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্যরা স্বপরিবারে এই আয়োজন করাতে বাংলা নববর্ষ উদযাপনে এনে দেয় ভিন্ন স্বাদ যোগ হয় নতুন মাত্রা।

এ ছাড়াও সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের শিল্পসম্পাদক ইব্রাহীম মন্ডলের পরিচালনায় প্রতি জুমআবার কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে ক্যালিগ্রাফি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী তোফাজ্জল হোসাইন খানের পরিচালনায় এ বছর প্রথম শুরু হয়েছে গান লেখা ও সুর প্রশিক্ষণের ক্লাস। এতে কেন্দ্রের সভাপতি, সেক্রেটারীসহ গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীরা উপস্থিত থাকেন।

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের নেতৃত্বে গত ২০ এপ্রিল সদ্য কারামুক্ত আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী সেক্রেটারী আবেদুর রহমান, অর্থ সম্পাদক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, জোন সভাপতি ড. মুজাদ্দেদ হাসান তাদনান ও সিনিয়র সাংবাদিক ওলিউল্লাহ নোমান।

মোটামুটি এই ছিল আমাদের এবারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

www.pathagar.com

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার-টেকনাফ
মেরিন ড্রাইভওয়ে সংলগ্ন রুহামা সী-লাইফ সিটি-তে

১৫% ডিসকাউন্টে বুকিং চলছে!

ঢাকার উত্তরা, পুরানা পল্টন, মিরপুর, বনশ্রী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন লোকেশনে
এককালীন মূল্যে রেডি ফ্ল্যাট / কিস্তিতে প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ চলছে

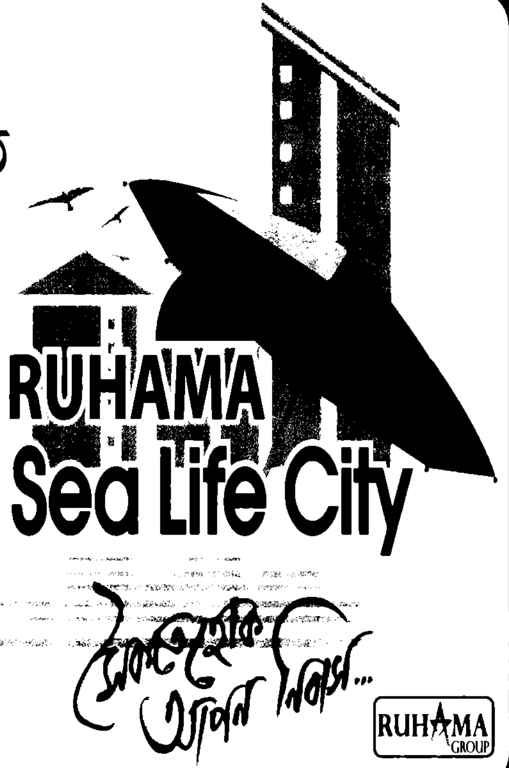

ISO Certified 9001:2008

RUHAMA PROPERTIES LTD

Member of REHAB, BLDA, DCCI, Enlisted by RAJUK, CDA
51 Purana Paltan (7th floor), Dhaka 1000. Tel. 7160742, 7161363
E-mail: ruhamagroup@yahoo.com, www.ruhamagroup.com
Cell. 01750016331 - 6

www.pathagar.com

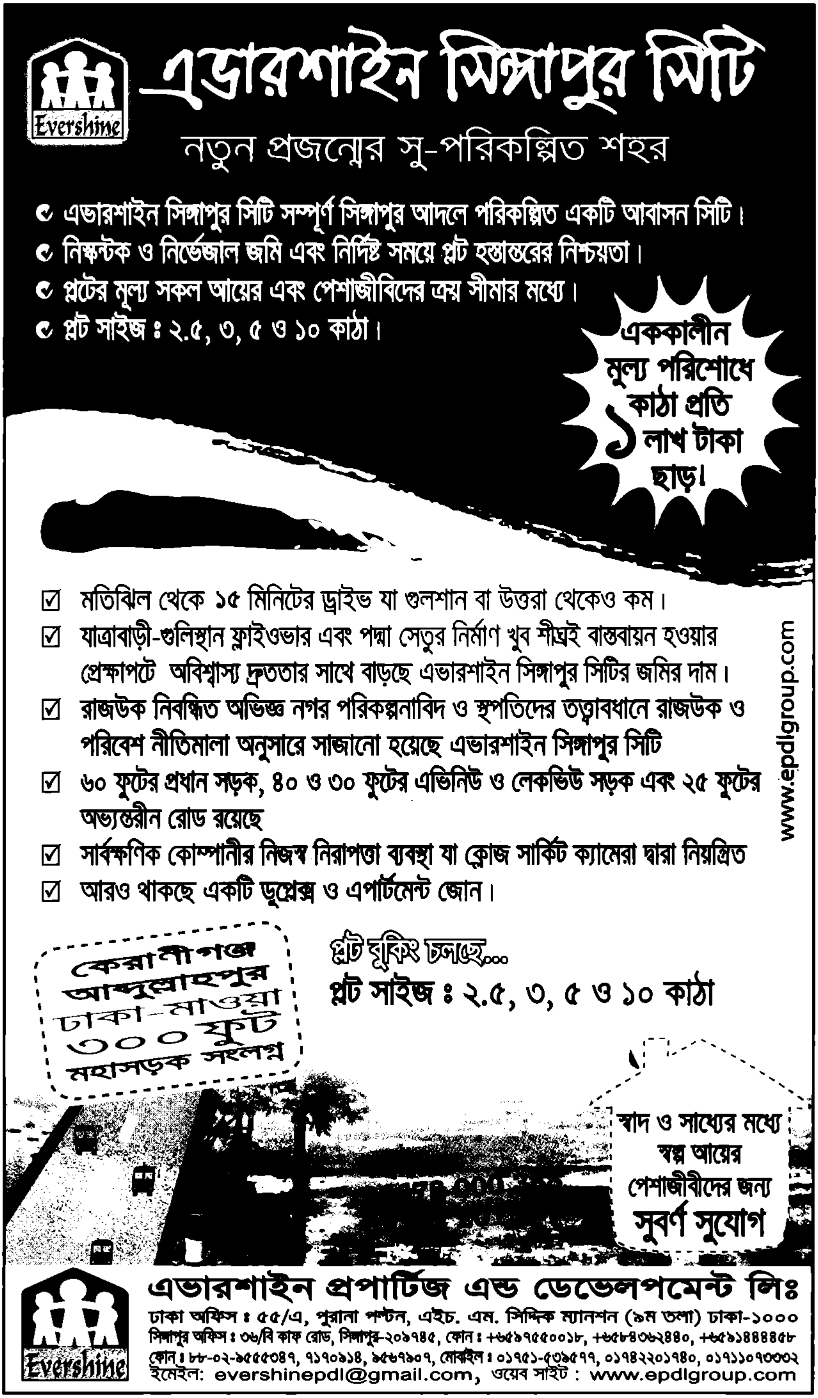

www.pathagar.com

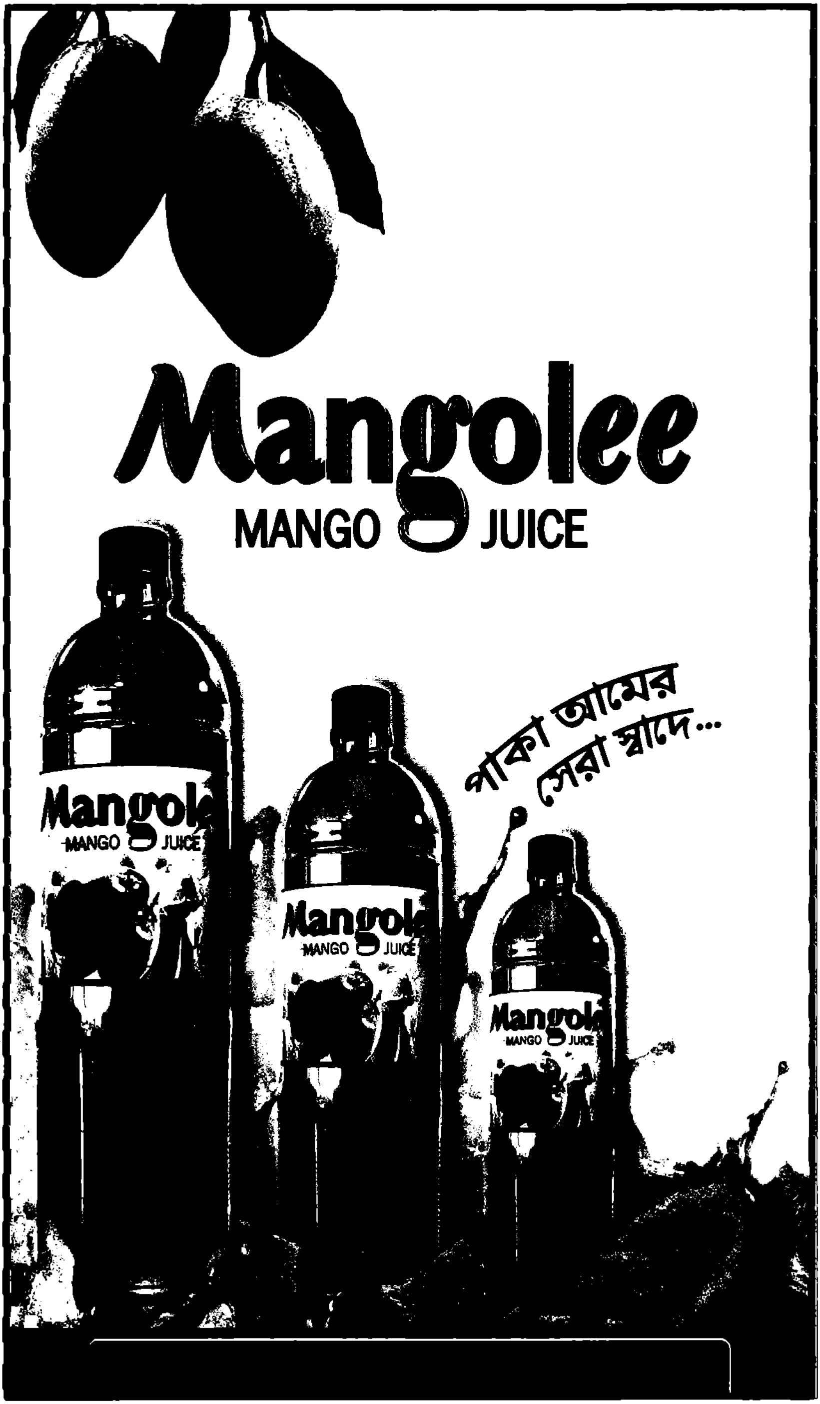

www.pathagar.com

দাঁতের যত্নে ইবনে সিনা

আমাদের সেবাসমূহ

দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ডেন্টাল সার্জন দ্বারা চিকিৎসা-সেবা

সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা বিশেষজ্ঞ দেখানোর সুযোগ

সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে

- এক সিটিং-এ রুট ক্যানেল
- আঁকা-বাঁকা ও উঁচু-নিচু দাঁতের স্থায়ী চিকিৎসা
- দুর্ঘটনায় ভেঙ্গে যাওয়া মুখ ও চোয়ালের হাড় সংযোজন
- ফিলিং, স্কেলিং ও পলিশিং
- দাঁত উঠানো, বাঁধানো এবং ওরাল এন্ড মেক্সিলোফেসিয়াল সার্জারীসহ সব ধরনের সার্জারী

IBN SINA

ইবনে সিনা ডেন্টাল সেন্টার

বাড়ি নং-৪৭, রোড নং-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা

ফোন: ৯১২৮৮৩৫-৭,৯১২৬৬২৫-৬, ০১৭৪৭৪৪৪২৫৪

www.pathagar.com

নতুন সংযোজন

ইউনিস্যালাইন® ফ্রুটি

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা ও যে কোন ধরনের
তিনটি ভিন্ন পানি স্বল্পতা পূরণের জন্য BNF ফর্মূলায় তৈরী
ফলের স্বাদযুক্ত খাওয়ার স্যালাইন।

IBN SINA

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি লিঃ

এন্ডোস্কোপি আপনি যতটা
কষ্টকর মনে করেন
আসলে তা ততটা
কষ্টকর নয়

থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপি অপারেশনের বিকল্প

বিনা কষ্টে কোন রকম কাটা ছেঁড়া ছাড়াই
এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে খাদ্য নালির রক্তক্ষরণ,
খাদ্যনালি থেকে ফরেন বডি (যেমন- পয়সা,
কৃত্রিম দাঁত, হাড় ইত্যাদি) বের করা কিংবা স্টেন্ট
বসানোর মতো জটিল অপারেশনের বিকল্প চিকিৎসা করা যায়

ইআরসিপি'র মাধ্যমে অপারেশন ছাড়াই পিত্তনালীর পাথর অপসারণ,
কৃমি বের করা ও ক্যান্সারে টিউব (Stent) বসাতে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Crescent Gastroliver & General Hospital

25/i, Green Road, Dhanmondi, Dhaka.
[Eastern end of Dhanmondi Road # 7]
Phone : 8621612, 8611936, Mobile : 01926 100 100

www.pathagar.com

MANARAT INTERNATIONAL UNIVERSITY MIU

A Center of Academic & Moral Excellence

Admission Summer 2011

MIU *Offers*

Main Campus

- BBA
- BA in English
- CSE
- MA in English
- ECE
- MBA (Regular & Executive)

Mirpur Campus

- B.Pharm* Bi-Semester Fall admission
- LL.B(Hons.)
- MBA (Evening)
- MA in English(Evening)

Waiver For Undergraduate Programs

		Waiver
		50%
		40%
		30%
		20%
		10%

Why MIU?

- Govt. & UGC Approved
- MIU maintains international standard
- Up to 100% tuition fee waiver
- Open Credit System
- Distinguished faculty with national & International exposure
- Provision for credit transfer to and from other universities
- Peaceful academic environment
- Excellent academic facilities at minimum cost.

Open on Friday

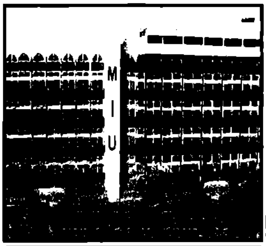

Abul Basher Khan, Registrar

Main Campus
Plot-CEN 16, Road-106, Gulshan, Dhaka-1212
Tel: 8817525, 9862251, 9884736, 01819 245895, Fax: 9862226

Mirpur Campus
Plot-01, Block-B, Sectiom-01, Mirpur-01, Dhaka-1216
Tel: 8059990, 8059991, Cell: 01716-627078

admission@manarat.ac.bd   www.manarat.ac.bd

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সাঃ] বলেছেনঃ

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি কাজ ব্যতীত তার আমলের সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তা হচ্ছে ছাদাক্বাহ জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।

-মুসলিম, তিরমিযী

প্রস্তুতকারক
মেসার্স জেসমিন টেক্সটাইল
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

www.pathagar.com

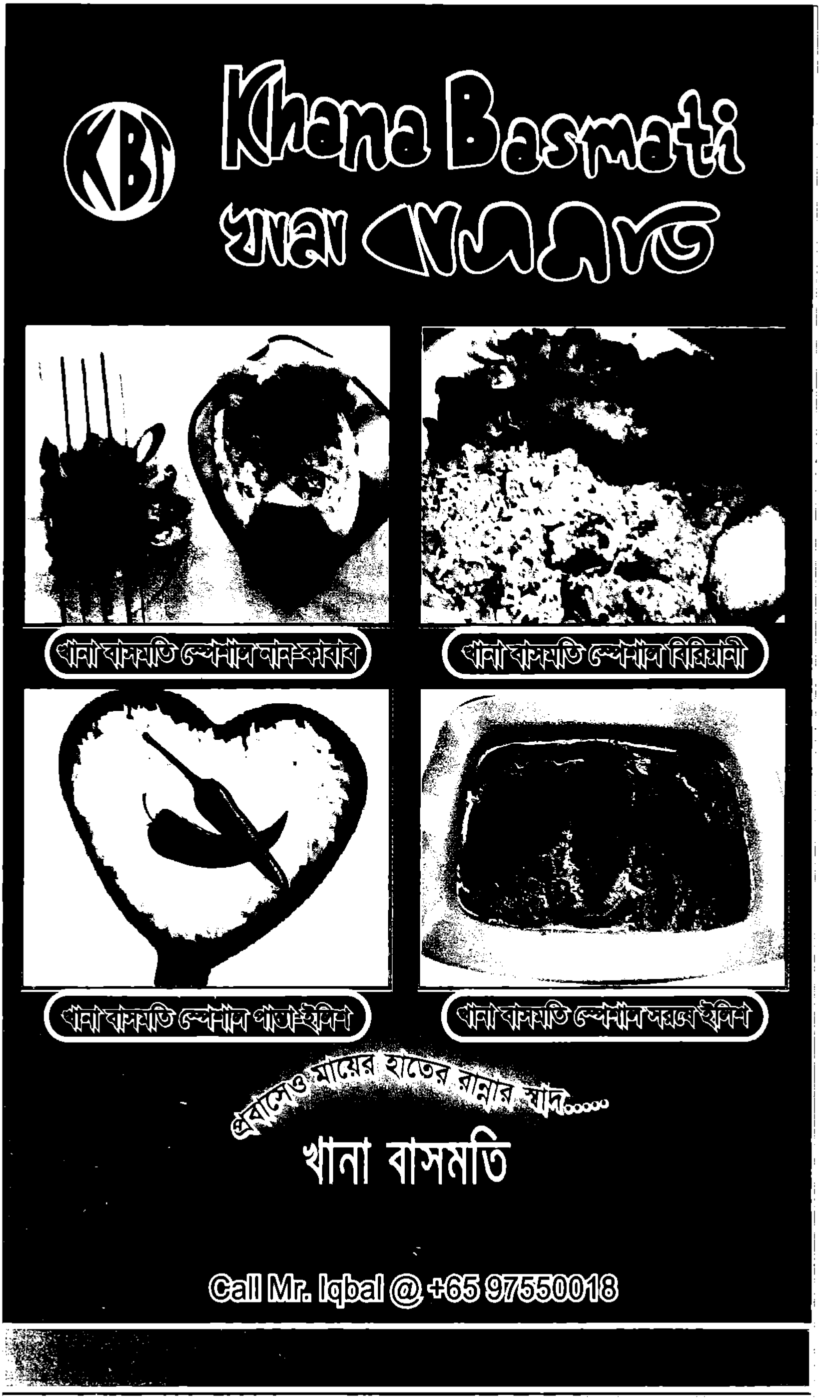

www.pathagar.com

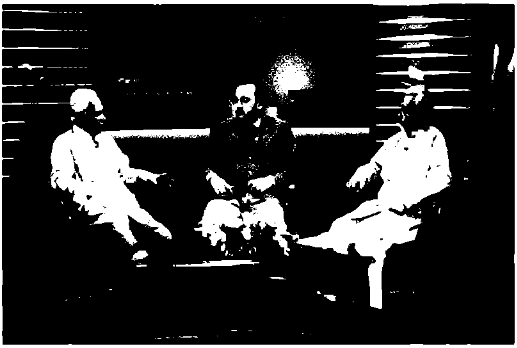

প্রতি শুক্রবার রাত ন'টায় ইসলামিক টিভিতে দেখুন
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রযোজিত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান

পরিচালনায়
অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

www.pathagar.com

কেন্দ্রের অন্যান্য প্রকাশনা

১.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ১৯৯৭	সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
২.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ১৯৯৭	সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
৩.	াহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ১৯৯৯	সম্পাদনা: খন্দকার আব্দুল মোমেন
৪.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০০	সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৫.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০১	সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৬.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০২	সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
৭.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৩	সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
৮.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৪	সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
৯.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৫	সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১০.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৬	সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১১.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৭	সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১২.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৮	সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১৩.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০০৯	সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১৪.	সাহিত্য সংস্কৃতি- সীরাত সংখ্যা ২০১০	সম্পাদনা: মোশাররফ হোসেন খান
১৫.	নাবিক- ১৯৯৭	সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৬.	পিকনিক শালনায়- ১৯৯৯	সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৭.	চড়ুইভাতির এই মেলায়- ২০০১	সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৮.	এলো বৈশাখ- ২০০২	সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
১৯.	১ম হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক- ২০০১	সম্পাদনা: গোলাম মোহাম্মদ
২০.	গাঙচিল মন নৌ-ভ্রমণ স্মারক-২০০২	সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
২১.	ঐ নূতনের কেতন ওড়ে- ২০০৩	সম্পাদনা: শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
২২.	হিজল বনের পাখি- ২০০৩	সম্পাদনা: শরীফ আবদুল গোফরান
২৩.	২য় হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক- ২০০৪	সম্পাদনা: হাসান আলীম
২৪.	সীরাত গ্রন্থ প্রদর্শনী স্মারক- ২০০৪	সম্পাদনা: নাসির হেলাল
২৫.	৩য় হামদ-না'ত-কবিতা সন্ধ্যা স্মারক- ২০০৬	সম্পাদনা: হাসান আলীম
২৬.	সমুদ্রের ঘ্রাণ- ২০০৭	সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ
২৭.	লেখক সম্বর্ধনা স্মারক- ২০০৮	সম্পাদনা মোঃ আবেদুর রহমান
২৮.	ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি স্মারক	সম্পাদনা: মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
২৯.	লেখক অভিধান	সম্পাদনা: নাসির হেলাল
৩০.	আশির দশক: নির্বাচিত কবিতা	সম্পাদনা: হাসান আলীম
৩১.	১ম শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা স্মারক-২০১১	সম্পাদনা: শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

www.pathagar.com

Islami Bank

A Bank of Excellence

- Highest AA+ rated Bank by CRISL
- Nationally and internationally recognized Bank
- Leading Bank in deposit, investment, import, export & remittance collection
- Business partner of 60 lac depositors and 5 lac investment clients
- Priority on SME investment and entrepreneurs development
- Imitable contribution in rural development, agricultural investment and poverty alleviation including Rural Development Scheme
- Highest investment in Industrialization and employment generation
- Remarkable services for the changes of fate of destitute people

Islami Bank My Bank
AA+ Bank

Pioneer in Welfare Banking
Islami Bank Bangladesh Limited
Based on Islamic Shari'ah